Registered No 65

# তত্ত্ব-কৌমুদী

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৩ম ভাগ ১ম সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ, সোমবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১ 14th April, 1930. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা।

হে চিরন্তন দেবতা, তুমি চিরপুরাতন হইয়াও নিত্য নবীন— তুমি প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন ভাবে নূতন রূপে প্রকাশিত হও, নূতন কর্ত্তব্য ও নূতন জীবন লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হও। তুমি নিত্যকর্ম্মা পুরুষপ্রধান, তোমার কর্ম্মের বিরাম নাই—নিয়ত তুমি তোমার বিশ্বসংসারকে অনন্ত কল্যাণ ও উন্নতির পথে নিয়া চলিয়াছ, কাহাকেও মৃত্যু ও অকল্যাণের মধ্যে পড়িয়া থাকিতে দেও না। আমরা কত সময় আলস্য আরামে দিন কাটাইয়া দিতে চাই, উদাসীনতা অবহেলার মধ্যে আপনার কল্যাণচেষ্টা ভুলিয়া যাই! কিন্তু তুমি নানা অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া, নানা উপায়ে তাহা দূর করিয়া, প্রাণে নূতন আকাঙ্ক্ষা, নূতন উদ্যম ও চেষ্টা জাগাও; হৃদয়ে নূতন আশা ও বল আনিয়া দেও। নতুবা আমরা কোথায় পড়িয়া থাকিতাম, কোন্ আবর্ত্তে ডুবিতাম কে জানে? তোমার এত জীবন্ত করুণা পাইয়াও যে আমরা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে আমাদিগকে অর্পণ করিতে পারিতেছি না, তোমার বাধ্য সন্তান হইয়া তোমার পথে চলিতে পারিতেছি না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছু নাই। হে করুণাময় পিতা, তুমি এবার আমাদের এই দুর্ব্বলতা দূর কর। আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত করিয়া লও। আমরা নব আকাঙ্ক্ষা ও নূতন উৎসাহ লইয়া, নববর্ষে নব জীবনের পথে অগ্রসর হই, নব বলে বলীয়ান্ হইয়া নূতন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি। আর যেন আমরা এই অমূল্য জীবনকে বৃথা নষ্ট না করি। তোমার শুভ ইচ্ছাই আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি পূর্ণ হউক।

---

## নিবেদন।

"প্রাণ ব্রহ্মপদে"—সংসারে কত কোলাহল, কত কর্ম্মব্যস্ততা, কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাত! মানুষ যে দিশেহারা হ'য়ে যায়—কোন্ পথে যাবে, কোন্ কাজে হাত দিবে, কিরূপে জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করবে, তা বুঝতে পারে না। কে পথ দেখিয়ে দিবে? কে অভয়বাণী শুনাবে? "প্রাণ ব্রহ্মপদে" প'ড়ে থাক্। প্রাণটি যদি ঠিক তাঁর চরণে রাখতে পার, তবে আর ভয় নাই; তবে শত বিপদ আপদ, শত ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও তুমি ঠিক পথে চলতে পারবে। অন্ধকারেও আলোক দেখতে পাবে। প্রাণ যদি তাঁর চরণে প'ড়ে থাকে, তবে তিনি তোমার জীবন-তরণীর কর্ণধার হ'য়ে অকূল সমুদ্রের কূলে নিয়ে যাবেন! প্রবল তরঙ্গের মধ্যেও নিরাপদ ভূমিতে রাখবেন। তাঁর চরণে প্রাণটি রাখ; ভয় নাই, নির্ভয়ে চ'লে যাবে।

---

নামেই আনন্দ—তুমি যে তাঁকে ভালবাস, তার পরিচয় কি? তোমার প্রিয়জন যে, যাকে তুমি প্রাণ দিয়া ভাল বাস, তার নাম শুনলেও তোমার প্রাণে কি এক ভাবের তরঙ্গ উঠে, আনন্দে প্রাণ উথলিয়ে উঠে!—তোমার মনে হয়, আমি তার জন্য কি না করতে পারি, তার জন্য কোন্ দুঃখ না সইতে পারি, তাঁর কোন্ ইচ্ছা না পালন করতে পারি। প্রভুকে যে তুমি ভালবাস তার পরিচয় কি? তাঁর নাম শুনলে কি তোমার প্রাণে ভাবের তরঙ্গ উঠে? হৃদয়ে নূতন আনন্দের সঞ্চার হয়? সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চ দিয়ে উঠে? তাঁকে কি বলতে ইচ্ছা হয়, তোমার জন্য সব সইতে পারি, তোমার সব কথা শুনতে প্রস্তুত আছি? তোমার নাম মধুর; তোমার প্রসঙ্গ মধুর; তোমার প্রসঙ্গ পেলে আর কোনও কথা ভাল লাগে না; তোমার কাছে বসতে পেলে আর উঠতে

ইচ্ছা হয় না; এমন দুঃখ নাই, যা তোমার জন্য আনন্দে গ্রহণ কর্‌তে না পারি। এমন বোঝা নাই, যা তোমার আদেশে বহন কর্‌তে না পারি। এমন কাজ নাই যাহা তোমার ইঙ্গিতে আনন্দে কর্‌তে না পারি। তোমার নামে আনন্দ, প্রসঙ্গে আনন্দ, সঙ্গে আনন্দ; তোমার জন্য দুঃখবহনে আনন্দ, তোমার আদেশপালনে আনন্দ।

**একনিষ্ঠ চিত্তে**—ওগো আমার দেবতা, আমি যে আমার প্রিয়জনদের এত স্নেহ করি, এত ভালবাসি, তা বুঝি তুমি সইতে পার না! তুমি চাও একনিষ্ঠ চিত্তে, অবিচলিত হৃদয়ে তোমাকেই ভালবাসি, তোমাকেই সমগ্র হৃদয় অর্পণ করি। আমি যে অন্যকেও হৃদয়ে স্থান দেই, তোমাকে দূরে রেখে অন্যকে প্রাণে বসাই, তা তুমি চাও না। তাই বুঝি এক এক ক'রে আমার প্রিয়জনদের নিয়ে যাচ্ছ? তাই বুঝি আমার প্রিয়জনসকল দূরে স'রে পড়্‌ছে, আমার স্নেহের সাড়া দিচ্ছে না? তুমি বুঝি আমার প্রাণের বাঁধনগুলি ছিন্ন ক'রে দিয়ে একমাত্র তোমার সঙ্গে বেঁধে রাখ্‌তে চাও; তুমি বুঝি চাও সব কে'ড়ে নিয়ে তুমি যাহা দিবে, তাতেই আমি সুখী থাকি। হে আমার প্রাণের দেবতা, তুমি যে এত নিষ্ঠুর তাহা ত পূর্ব্বে জান্‌তাম না! তুমি যদি আমার হৃদয় শূন্য ক'রে সেখানে এসে বস্‌তে চাও, তবে তা-ই হোক। আমি অশ্রুপ্লাবিত বক্ষে তোমাকেই বরণ করব; আমি প্রিয়জনের বিরহ ও উপেক্ষা তোমার মুখ দেখেই সহ্য করব; তুমি কি দিবে, তার প্রতীক্ষায়ই আমি ব'সে থাক্‌ব; একনিষ্ঠ হ'য়ে তোমাতেই চিত্ত অর্পণ ক'রে সুখী হব।

## সম্পাদকীয়

**নববর্ষের নূতন ব্রত**—সকলের বর্ষশেষ ও নববর্ষ এক না হইলেও, সকল দেশের সকল জাতির লোকই পুরাতন বর্ষের অবসান ও নূতন বর্ষের আগমনকে একটা বিশেষ চক্ষে দেখিয়া থাকে। আবার, এই বিশেষ দৃষ্টির মধ্যে নানাপ্রকার বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটা মৌলিক একতা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ মানুষ পুরাতনকে একটু দুঃখের সহিত পরিত্যাগ করিলেও, নূতনকে সমধিক আদরের সহিতই বরণ করিয়া লয়, নূতনের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করে। যদিও সময় সময় সে পুরাতনকে একটু ধরিয়া রাখিতে চায়, এবং অতি পুরাতনের প্রতি একটা অতিরিক্ত আকর্ষণও তাহার মধ্যে দেখা যায়, তথাপি সে তাহাতে কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, নূতনের উপরই সকল আশা ভরসা স্থাপন করিয়া থাকে। তবে, এমন লোক যে মোটেই নাই, যে নূতনের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া একমাত্র অতি পুরাতনের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে না, তাহার জন্যই ব্যাকুল হয় না, সে কথা অবশ্য বলা যায় না। তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে যে আবার জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, চিন্তাশীল ও চিন্তাহীনের অনুভব ও দৃষ্টিতে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অলস আরামপ্রিয় মূর্খ লোক অতীতের জন্য বৃথা দুঃখ করিয়াই অথবা ভবিষ্যৎ বিষয়ে সুখকর অসার কল্পনা করিয়াই জীবন ও সময় ক্ষয় করে; আর, অধিকাংশ চিন্তাশীল কল্পনাপ্রিয় মানুষ অতীত দুঃখ তাপ হইতে মুক্ত একটা কাল্পনিক সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতে থাকে। অতি অল্প লোকই অতীত হইতে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়া, অতীতের ভুল ভ্রান্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভবিষ্যৎ বিষয়ে সাবধান হয়, অনাগতের জন্য প্রস্তুত হয়। তদপেক্ষা আরও অল্প লোকই অনাগত ভবিষ্যতের ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া সম্মুখস্থিত বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্রে আপনাকে সমগ্র মন প্রাণের সহিত নিযুক্ত করে। অথচ ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। কেবল পুরাতন বা অতীতের চিন্তায় মগ্ন থাকিলে যেমন বর্ত্তমানকে ভুলিতে হয়, তেমনি শুধু নূতন বা ভবিষ্যতের ভাবনায় ডুবিয়া থাকিলেও যাহা হাতে আছে তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। নূতন নিকটে আসা মাত্রই তাহার নূতনত্ব হারাইয়া ফেলে, আবার পুরাতন হইয়া যায়। নূতন ও পুরাতন উভয়েরই একটা মোহ আছে, অতীত ও ভবিষ্যৎ উভয়ই হাতের বাহিরে। হয়ত উহাই মোহেরও কারণ। সে যাহা হউক, যাহা হাতের বাহিরে তাহা আমরা কোনও প্রকারেই কাজে লাগাইতে পারি না, তাহার উপর আমাদের কোনও কর্তৃত্বই খাটে না। যাহা হাতে আছে একমাত্র তাহাকেই আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারি; একমাত্র তাহারই আমাদের নিকট বাস্তব সত্তা বর্ত্তমান আছে। অতীত ও ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণরূপে যে অগ্রাহ্য করা চলে না, বর্ত্তমান যে বহু পরিমাণে অতীতেরই ফল, আর ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিলে যে বর্ত্তমানকে ঠিক পথে চালান যায় না, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহার সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং বর্ত্তমানকে উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়া, বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার না করিয়া, আমরা যে কোনও প্রকারেই সত্য জীবন গড়িতে পারি না, উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারি না, তাহা অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। উহার উপর দাঁড়াইয়াই আমরা সম্মুখ দিকে পা বাড়াই, উহাকে ভিত্তি করিয়াই ঊর্দ্ধদিকে উঠি; উহাই জীবনগতির প্রতিষ্ঠাভূমি। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে, এই জীবনগতির যেমন বিরাম নাই, অবিরাম গতিতেই উহাকে অনন্তকাল চলিতে হইবে, তেমনি এখানে উহার কোনও অচল প্রতিষ্ঠাভূমিও নাই, এই প্রতিষ্ঠাভূমিও চিরগতিশীল, চির-উন্নতিশীল। অনন্ত কালপ্রবাহে কোনও একটা বিশেষ দিনে বা মুহূর্ত্তে নববর্ষ আবদ্ধ নহে—প্রতি মুহূর্ত্তেই পুরাতন বর্ষ শেষ হইতেছে ও নূতন বর্ষ আরম্ভ হইতেছে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তই একটা যুগসন্ধিরূপে পুরাতনকে অতিক্রম করিয়া নূতনকে আনিয়া দিতেছে। এজন্য আমরাও প্রতি মুহূর্ত্তেই জীবনের সন্ধিস্থলে উপনীত হইতেছি, এবং তখন যে পথ ধরিতেছি তাহার উপরই জীবনের গতি, উন্নতি ও অবনতি, নির্ভর করিতেছে। কোথাও বিরাম বিশ্রামের অবকাশ নাই। প্রত্যেক মুহূর্ত্তই আমাদের নিকট একটা সত্য কর্ত্তব্য লইয়া উপস্থিত হইতেছে। সেই কর্ত্তব্যটি যথাযথ ভাবে সেই মুহূর্ত্তে সম্পন্ন না করিলেই

আমরা প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে বিচ্যুত হইলাম, অগ্রসরগতি রুদ্ধ হইল। অসার কল্পনার আবর্জ্জনারাশির দ্বারা পূর্ণ করিতে গেলেও উহা শূন্যই থাকিয়া গেল, উহার উপর দাঁড়াইয়া অগ্রসর হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই রহিল না। আমরা চাই আর না চাই, নিজেরা যে অতীতকে গড়িয়া তুলি তাহা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, তাহার হাত হইতে আমরা কিছুতেই একেবারে মুক্ত হইতে পারি না। যাহা শূন্য ছিল তাহা আবার গড়িয়া তুলিতেই হইবে, যেখানে নীচে নামিয়া গেলাম সেখান হইতেই আবার উঠিতে আরম্ভ করিতে হইবে—এ রাজ্যে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক অগ্রসর হইবার কোনও উপায় নাই—সরল আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা যত্ন থাকিলে, জীবন-বিধাতার হাতে আপনাকে অর্পণ করিলে, গতিটা দ্রুততর করা যায়, এই মাত্র। কাজেই দেখিতেছি, পুরাতনকে অগ্রাহ্য করিয়া চলিবার উপায় নাই, তাহার দ্বারা আমাদের গতি বহু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইবেই। অথচ সেই পুরাতনকে আমরাই নিত্য গড়িয়া তুলি। আমাদের বর্ত্তমানই পুরাতন হইয়া আবার আমাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করে, আমাদের বন্ধুর বা শত্রুর কার্য্য করে, আমাদিগকে অগ্রসর করিয়া দেয় বা গতিকে রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ দিকে টানিয়া রাখে। ইহা হইতে সহজেই আমরা আমাদের কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনুভব করিতে পারি। আবার, আমরা নূতনের কোন্ রাজ্যে উপনীত হইব, তাহাও যে আমাদের বর্ত্তমান গতি বা প্রতিষ্ঠার উপরই নির্ভর করে, সেখানেও শুধু কল্পনাবলে বা ইচ্ছামাত্র কিছু আয়ত্ত করিতে পারি না, অভীপ্সিত স্থানে পৌঁছিতে পারি না, তাহা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ভবিষ্যৎটাও আমরা বহু-পরিমাণে বর্ত্তমান দ্বারাই গড়িয়া তুলি—কল্পনার সৌধ যতই মনোরম প্রতীয়মান হউক না কেন উহা কখনও সত্য বাসগৃহ হইতে পারে না। সুতরাং নূতনের জন্য আত্যন্তিক তৃষ্ণা, তাহার উপর অত্যধিক আশা ও নির্ভর শুধু ব্যর্থ নয়, অনিষ্টকরও। কেন না, তাহার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা অনেক সময় বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করি, সম্মুখস্থ কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে বিচ্যুত হই। এই হেতু, যদিও আমাদিগকে নিত্য নূতনকে আয়ত্ত করিতে হইবে, তথাপি কখনও এক নূতনকে পুরাতনে পরিণত না করিয়া অপর নূতনের পশ্চাতে ছুটিলে চলিবে না। আয়ত্তীকৃত বর্ত্তমান আমাদিগকে আপনা হইতেই নূতনে লইয়া যাইবে। যে দিক দিয়াই দেখি না কেন, নূতন ও পুরাতনের উপর দৃষ্টি না করিয়া, একমাত্র বর্ত্তমানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চলিলেই যে আমরা কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারি তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তই যে সমান মূল্যবান, যথাযথ ভাবে প্রত্যেক কর্ত্তব্যসম্পাদনের উপরই যে প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করে, এ কথা ভুলিয়া থাকি বলিয়াই আমরা বাহিরের ঘটনা ও অবস্থার হাতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দেই এবং নূতন বা পুরাতনের মোহে বৃথা জীবন ও সময় নষ্ট করি। আমরা এই মহা ভ্রান্তি পরিত্যাগ করিয়া এখন হইতে যাহা আমাদের আয়ত্তাধীন, প্রধান ভাবে তাহার উপরই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি, এবং নিরন্তর আমাদের প্রতি দিনের প্রতি মুহূর্ত্তের বর্ত্তমান কর্ত্তব্যগুলি যাহাতে ভাল করিয়া সম্পাদন করিতে পারি সে বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হই। এ সম্বন্ধে যে আমাদের গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা যেন আমরা আর কিছুতেই ভুলিয়া না থাকি। আলস্যে আরামে বিশ্রামে যে এ পথে চলা যায় না, ইহা যে অতীব কঠিন, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া ভীত হইবার কোনও কারণ নাই। কঠিন হইলেও ইহা কঠোর নয়। করুণাময় পিতা ইহাকে আনন্দে ও কল্যাণে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং এই পথের সহায় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার হাতে আপনাকে অর্পণ করিয়া সরল ভাবে এ পথে চলিতে গেলে দেখা যাবে অনেক কাঠিন্যই চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার অপার প্রেম ও করুণা সহজ স্বাভাবিক ভাবেই আমাদিগকে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া লইয়া চলিয়াছে। সরল ব্যাকুল প্রার্থনা ও আনুগত্যকে সম্বল করিয়া চলিলে কোনও প্রতি-বন্ধকতাই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। নূতন বর্ষে আমরা বিশেষভাবে এই কথাটা স্মরণ করিয়া চলি, এই ব্রতটা গ্রহণ করি। তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইব। বর্ষশেষে আর বৃথা মনস্তাপ ভোগ করিতে হইবে না। করুণাময় পিতা আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও বল প্রদান করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

**উপাসনা শিক্ষা**—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মহাশয়কে ডাঃ পি কে রায় ইংরাজীতে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—"প্রিয় হেমচন্দ্র, Indian Messenger এর ১৬ই ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত পত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতিরূপে প্রদত্ত তোমার যে অভিভাষণ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ করিলাম। তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা ঠিক। ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য অতি উচ্চ হইলেও আমাদের দেশবাসীর নিকট হইতে আমরা সে বিষয়ে অতি অল্পই সায় পাইয়াছি। আমি পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি এবং আজও বলিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যোগ্য ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী কমিটি গঠিত করা হউক।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম শতাব্দীর, বিশেষতঃ তাহার উত্তরার্দ্ধের, কার্য্যপ্রণালী তত ফলপ্রসূ হয় নাই। আমাদের সমাজের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা প্রচার করা। তোমার অভিভাষণে তাহাই উক্ত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ গত ৫০ বৎসরে বিশেষভাবে মন্দিরের বেদী হইতে ব্রহ্মোপাসনা ও বক্তৃতাই করিয়াছেন। ইহার প্রথম অবস্থায় সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া তাহার দ্বারা চরিত্রগঠনের সহায়তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী কালে ইহার প্রয়োজনীয়তা যেন আর সেরূপ বিশেষভাবে অনুভূত হয় নাই।

বর্ত্তমান কালে কিরূপে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইবে এবং অপরকে, বিশেষতঃ আমাদের পুত্র কন্যাগণকে, এই বিষয় শিক্ষাদিতে হইবে তাহা গভীর ও বিস্তৃত ভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। ইহার জন্য একটী যোগ্যতর কমিটি গঠিত করিতে হইবে। আমরা যে বাহির হইতে কোন সহানুভূতি বা সাহায্য প্রাপ্ত হই না তাহার কারণ এই নয় যে আমাদের এই কার্য্য কেহ পছন্দ করেন না। আমরা আমাদের বর্ত্তমান প্রণালীটীকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমরা সকলের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতেছি।

মানুষ ব্রহ্মোপাসক কি না তাহার পরিচয় তাহার জীবনে ও চরিত্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, দীর্ঘ দীর্ঘ প্রার্থনার বাক্য দ্বারা তাহা পরিস্ফুট হয় না। আমাদের সমস্ত প্রার্থনা কেবল শূন্য বাক্যেই পরিণত হইতেছে, আমাদের জীবনে তাহা ফুটিয়া উঠিতেছে না। সেই জন্যই আমরা আমাদের আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।

আমরা বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কেবল আমাদের নেতৃবৃন্দের প্রণালীগুলিই অন্ধ ভাবে অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। ইহাকে বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত করিয়া নূতন প্রণালীতে চালিত করিতে পারিতেছি না। এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। ৫০ বৎসর ধরিয়া যে মণ্ডলী গঠিত হইয়া আসিতেছে তাহার কার্য্যপ্রণালী এখন নূতন ভাবে গঠিত করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি বর্দ্ধিত করিবার সময় আসিয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় সমাজমণ্ডলী বলিয়া কিছু ছিল না। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটী নূতন সমাজমণ্ডলী গঠিত হইয়া উঠিল। এবং তাহাই কালে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান নাম গ্রহণ করিল। এই মণ্ডলীকে প্রকৃত উপাসকমণ্ডলীতে পরিণত করার যে সমস্যা তাহা আর পূর্ব্বের ন্যায় তত সরল নহে। এখন এই মণ্ডলী বর্দ্ধিত হইয়া দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এখন নানা সামাজিক অবস্থার লোক এখানে আশ্রয় লইয়াছেন। ধনী, নির্ধন, প্রবীণ নবীন, বিবাহিত, অবিবাহিত প্রভৃতি নানা অবস্থার ব্যক্তিও আসিয়াছেন। এক্ষেত্রে ইহাদের সকলকে প্রকৃত ব্রাহ্মোপাসক রূপে গঠিত করিয়া তুলা একটী অতি জটিল সমস্যা।"

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই পত্র লিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিবার জন্য ও তাহার কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া কমিটি গঠিত করিয়াছেন:—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এবং ডাঃ হেমচন্দ্র সরকার (সম্পাদক)।

সকলকে সত্য আধ্যাত্মিক উপাসনা শিক্ষা দেওয়া, মণ্ডলীর সকলের জীবনে এই উপাসনাকে প্রতিষ্ঠিত করাই যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; এ বিষয়ে সকলে গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া আপনাদের মীমাংসার ফল জ্ঞাপন করিলে বিশেষ উপকারলাভের আশা করা যায়। এদিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। আমরা নিজে আজ কিছু বলিলাম না। পরে আমরা এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব।

## বাংলা নববর্ষ।

আমাদের দেশে ১লা বৈশাখের সময়ে ব্যবসায়ীরা "হালখাতা" খোলে। ১লা বৈশাখের পূর্ব্বেই তাহারা সারা বছরের দেনা পাওনা আদায় উসুলের হিসাব করে। ১লা বৈশাখে গ্রাহকদের কাছ থেকে পুরাতন প্রাপ্য উসুল কর্‌বার চেষ্টা করে, এবং নূতন বছরেও তাঁদের খরিদ্দাররূপে পাবার আশায় নিমন্ত্রণ করে।

অনেক স্থলে এই সময়ে নববর্ষোৎসবে ব্রাহ্মসমাজের বেদী থেকে হালখাতা সংক্রান্ত ব্যাপারের তুলনা দিয়ে ধর্ম্মজীবনের ও ধর্ম্মসমাজের কাজের হিসাবনিকাশের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু ১লা বৈশাখে অব্দগণনার প্রথাটির মূল কথার ভিতরে প্রবেশ কর্‌লে মনে হয় যে, দেনা পাওনা আদায় উসুল হিসাব নিকাশ হালখাতা প্রভৃতির চেয়ে উচ্চতর এক ভূমিতে গিয়ে জীবনকে ও ধর্ম্মমণ্ডলীকে দেখ্‌বার জন্য জীবনদেবতা আমাদের আহ্বান কর্‌চেন। আমি ক্রমে ক্রমে সেই প্রসঙ্গেই উপস্থিত হব।

কিন্তু দেনা-পাওনা ও হালখাতার কথাটিও যে এই সময়ে আমার মনে আসে না, তা নয়। কারণ ওটিও তুচ্ছ কর্‌বার বিষয় নয়। ব্রাহ্মগণ নিজ দেয় শোধ কর্‌বার সম্বন্ধে ব্রাহ্মোচিত ভাবে চল্‌বেন, এটি কখনও তুচ্ছ বিষয় হ'তে পারে না। মনে কর্‌লে গভীর দুঃখ হয় যে কত ব্রাহ্ম এ বিষয়ে অত্যন্ত শিথিল। ব্রাহ্ম নিজের নিয়মিত আয়ের মধ্যে নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ কর্‌বেন; ব্রাহ্ম নিজের দেয় শোধ কর্‌তে তাগাদার জন্য অপেক্ষা কর্‌বেন না; ব্রাহ্ম, নিজের মাসিক আয়ের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ ধর্ম্মার্থে ব্যয় কর্‌বেন, এবং বিনা তাগাদায় তাহা সমাজে দিয়ে আস্‌বেন। এই ধর্ম্মার্থ ব্যয়ের জন্য যদি সমাজ থেকে তাগাদা আসে, তবে ব্রাহ্ম তাহা অতিশয় লজ্জার বিষয় ব'লে অনুভব কর্‌বেন। ব্রাহ্ম, নিয়মিত মাসিক ব্যয়ের জন্য কখনও ঋণ কর্‌বেন না। এই সকল আদর্শ এখন কত অবহেলা করা হয়। আমি বলি, হে ব্রাহ্ম, "হালখাতার" কথাটি আজ যদি তোমার মনে আসে, তবে তাকে তুমি কেবল আধ্যাত্মিক ব্যাপারের মধ্যেই ফেলে রেখো না; বাস্তব-রাজ্যে নিয়ে এস। দেনা-পাওনা বিষয়ে তুমি কর্ত্তব্যপরায়ণ হও। দেনা শোধ বিষয়ে তুমি খুব তৎপর হও। ঋণ করা সম্বন্ধে তুমি সতর্ক হও।

কখনও কখনও বিপন্ন হ'লে সংসারের মানুষকে কোনও বন্ধুর কাছে ঋণ গ্রহণ কর্‌তে হয়, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু চাউল ডাল তেল ঘি প্রভৃতি দৈনিক আহার্য্যের জন্য, কিংবা জামা কাপড় প্রভৃতি নিত্য ও নিয়মিত ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির জন্য, ব্যবসায়ীর কাছে ঋণী থাকা আমি আদর্শবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া মনে করি। যাহার কিছু সঞ্চিত টাকা আছে, সে তাহা হইতে প্রত্যেক মাসে নগদ দামে জিনিস ক্রয় করুক। মাসের শেষে ব্যবসায়ীকে বিল্ করিতে বাধ্য করিয়া এবং বহুবার তাগাদা করিতে বাধ্য

করিয়া তার দেয় শোধ করা, এক মাসের প্রথম ভাগে আনীত দ্রব্যের জন্ত পরের মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তাহাকে অপেক্ষা করানো,—ইহা ভাল নয়। যাঁহারা এক বৎসর পরে হিসাব চুকাইয়া দেন (অথবা তখনও সম্পূর্ণ চুকাইয়া দেন না) তাঁহাদের ব্যবহার আরও লজ্জাজনক। এই জন্য আমি বলি, হে ব্রাহ্ম, আজ হালখাতার শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিও না, শুনিও না। যাহাতে আগামী বৎসর হইতে কোনও দোকানে তোমার নামে ঋণের সুদীর্ঘ হিসাব না থাকে, এমন কি, যাহাতে মাস শেষে তোমার কাছে কোনও পাওনাদারের বিল না আসে, সেই ভাবে চলিবার সঙ্কল্প গ্রহণ কর। ব্যক্তিগত জীবনের হালখাতা বিষয়ে আমি আজ আমার নিবেদনসূত্রে এইটুকু ছাড়া আর কিছু বলিব না।

বৎসরান্তে প্রত্যেক মানুষ যেমন নিজের আয়-ব্যয়-স্থিতি অঙ্কের হিসাব করে, পরস্পরের নিকটে দেয় ও প্রাপ্যের হিসাব করে, বৎসরান্তে ধর্ম্মসমাজের কাজকে এবং ধর্ম্মসাধনকেও সেইরূপ হিসাবের ভূমিতে দণ্ডায়মান ক'রে দেখা সম্ভব। কোন্ সাধনের পথে কতখানি অগ্রসর হওয়া হ'ল, কোন্ সুঅভ্যাস কতখানি অর্জ্জন করা হ'ল, মানুষ বৎসরান্তে তাহা পরীক্ষা ক'রে দেখে। কার উপরে ন্যস্ত কাজ সে কতখানি সমাপন করল, সমাজের অঙ্গীভূত কোন্ প্রতিষ্ঠানটি এক বৎসরে কি কি কাজ সম্পন্ন করল, কিংবা উন্নতির পথে কতখানি অগ্রসর হ'ল, তার রিপোর্ট দিবার ও লইবার ব্যবস্থা মানুষ করে।

কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অথবা ধর্ম্মসমাজের কার্য্যের হিসাব-নিকাশের বিষয়টি আমাদের নিকটে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হইলেও, তাহার জন্য ১লা বৈশাখের নববর্ষ গণনার রীতিটি এদেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

যুগে যুগে ভারতবর্ষের মানুষ বর্ষারম্ভ গণনার যত প্রকার রীতি স্থির করিয়াছে, সবই প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সহিত সংসৃষ্ট। "বর্ষ" কথাটিই এই সত্যের সূচনা করে যে এক সময়ে বর্ষাকাল আসিলে মানুষ বৎসরের আবর্ত্তন বুঝিতে পারিত। সেইরূপ বৎসর অর্থে "শরৎ" শব্দের ব্যবহার, শীতের প্রথম মাসের "অগ্রহায়ণ" নাম, প্রভৃতি দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে এ দেশে নানা যুগে মানুষ শরৎ, শীত ও বর্ষা হইতে বৎসরের পরিবর্ত্তন গণনা করিত।

১লা বৈশাখ হইতে বৎসর গণনার রীতিটি বসন্ত ঋতুর সহিত যুক্ত। বৎসরের যে তারিখে দিন রাত্রি সমান হয়, যাহার পর হইতে শীতের দীর্ঘ রাত্রি আর থাকে না, পৃথিবী সূর্য্যের উত্তাপ অধিক লাভ করিতে থাকে, বৃক্ষলতা নূতন পাতায় ফুলে শোভিত হইতে থাকে, সেই তারিখটিকে মানুষ স্বভাবতঃ বসন্ত ঋতুর চিহ্ন বলিয়া মনে করে। শীতপ্রধান দেশে ঐ তারিখটির পরবর্ত্তী কালকে বসন্ত ঋতুর আরম্ভ বলিয়া ধরা হয়। এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান বলিয়া ঐ তারিখটির অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালকে বসন্তকাল বলিয়া মানুষ গণনা করে। এইরূপে, অনুমান ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে, ১লা বৈশাখ হইতে নববর্ষ গণনার রীতিটি ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন চৈত্র মাসের শেষ দিনে দিন ও রাত্রি সমান হইত। এখন দিন রাত্রি সমান হয় ৮ই কি ৯ই চৈত্র।

এই জন্য ১লা বৈশাখে অব্দগণনার রীতিটি বিশেষ ভাবে প্রকৃতির নবজীবনের সহিত যুক্ত। মানুষের সংসারের সহিত নয়, মানুষের ক্ষুদ্র কার্য্যক্ষেত্রের সহিত নয়,—সমগ্র পৃথিবীর সহিত ও তাহার নবজীবনের সহিত যুক্ত। এই দিনটি যেন সেই নবজীবনের দিকে চাহিবার জন্য বিশ্বদেবতার আহ্বান আজ সেদিকে চাহিয়া দেখি; দেখি তাঁহার কিছু আলো পাওয়া যায় কি না।

প্রায় এক মাস পূর্ব্বে একদিন সকালবেলা আমি কোন কাজে কলিকাতার দাক্ষণ অঞ্চলে গিয়াছিলাম। পার্ক ষ্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে সার্কুলার রোডের ট্রাম হইতে নামিতে হইল। সে স্থানটি ধূলি ও কোলাহলে পরিপূর্ণ। খানিকটা অনাবৃত জমি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে আবর্জ্জনার স্তূপ, নিকটবর্ত্তী খোলার ঘরের চালে ও গাছের পাতায় অজস্র ধূলি। স্থানটি এমন কদর্য্য যে তাকাইতে ইচ্ছা হয় না। সে দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া পশ্চিম অভিমুখে পার্ক ষ্ট্রীট দিয়া আমি চলিলাম। সে রাস্তার দুই পাশে পুরাতন সমাধিস্থান। স্থানটি অতি নির্জ্জন। কতদিন ঐ পথ দিয়া যাইতে যাইতে মনে হইয়াছে, নির্জ্জন চিন্তার জন্য এখানে আসিয়া বসিলে হয়। সে দিন সকালবেলা সেই রাস্তায় প্রবেশ করিয়াই যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে চমকিত হইতে হইল। দুই ধারে সারি সারি বিশাল প্রাচীন দেবদারু গাছ। নব বসন্তে গাছগুলির শীর্ষদেশ নূতন পত্রে সজ্জিত হইয়াছে। কচি কচি পাতাগুলির রং সবুজ ও হ'লুদের মাঝামাঝি; তাকাইলে যেন চক্ষু জুড়াইয়া যায়। এই রূপে সারি সারি গাছ কতদূর পর্য্যন্ত চলিয়াছে। মনে হইতে লাগিল, এই জনতাময়ী কলিকাতা নগরীতেই প্রকৃতির এমন সুন্দর শোভা দেখিতে পাওয়া যায়? কি আশ্চর্য্য! আমি মুগ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সে শোভা দেখিতে লাগিলাম। প্রত্যেকটি পাতা তো ঐরূপ সুন্দর বর্ণে শোভিত। আবার পাতা-গুলির অন্তরাল-স্থানসকলও পাতার সেই রঙ্গের আভায় আভাষিত। দুটি রঙ্গীন বস্তু পরস্পরের খুব কাছে থাকিলে তাদের অন্তরাল-স্থানটি উভয় হইতে উভয়ের দিকে প্রতিফলিত আলোর দ্বারা আভাষিত হ'য়ে উঠে। খুব দূরে দূরে অবস্থিত বস্তুর মধ্যে এই আভা দেখা যায় না। সে দিন দেখিলাম, পাতার রঙ্গে এবং পাতা হইতে পাতায় প্রতিফলিত আভাতে প্রত্যেকটি গাছের শীর্ষদেশ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

দেখতে দেখতে যাচ্ছি, আর ভাবছি, এতো হবেই। ফাল্গুন চৈত্র মাসে বসন্ত ঋতুর আগমনে গাছের শোভা তো হবেই। ইচ্ছা হ'ল, বন্ধুদের ডেকে এনে দেখাই।

তারপর মনে হ'তে লাগল, এই কলিকাতা সহরে এই শোভা কে বা দেখবে? কার জন্য বা এত সুন্দর আয়োজন? পথচারী হাজার লোকের মধ্যে একজনও এদিকে তাকাবে কি না, সন্দেহ; তাকালেও, যিনি সকল সৌন্দর্য্যের আকর, তাঁর দিকে মন দিবে কি না, সন্দেহ।

মন যখন এইরূপ চিন্তায় পূর্ণ, তখন মনের মধ্যে যেন প্রভুর তিরস্কার শুনতে পেলাম। তিনি যেন বল্লেন, "তুমি জগৎকে ভুল চোখে দেখছ। আমার কোন স্থানই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কেবল

বিষয়ী লোকের বাসস্থান নয়, অথবা কেবল বিষয় কর্ম্ম করবার স্থান নয়। এই কলিকাতা সহরও তা নয়। এই সহরেও মানব-রচিত কল কারখানা ধূলি কোলাহল প্রভৃতি যত সত্য, তাহা অপেক্ষা অধিক সত্য ব্যাপার এই যে, আমার কত ভক্ত এখানে রহিয়াছেন। শরীরী ও অশরীরী উভয় ভাবে কত ভক্ত এখানে বাস করেন। তাঁদের সঙ্গে আমার নিরন্তর দৃষ্টি-বিনিময় ভাব-বিনিময় হয়। তাঁরা আমাকে দেখেন, আমি তাঁদের দেখি। তাঁরা আমাকে খোঁজেন, আমি তাঁদের খুঁজি। আমার এই গাছের শোভা নিরর্থক নয়, নিষ্ফল নয়। এই শোভা দেখ্‌বার জন আছেন; এই শোভা যাঁদের দেখিয়ে আমি সুখী, আমার এমন জন আছেন। তাঁরা এ শোভা দেখেন, তাদের সঙ্গে এই শোভার মধ্য দিয়ে আমার চোখো চোখি হয়।"

বিধাতার নিকট হইতে যেন এই তিরস্কারবাণী শ্রবণ করলাম। মনে পড়্‌ল, জগতে কেন এত সৌন্দর্য্য, তার ব্যাখ্যা-সূত্রে ভক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় একদিন ব'লেছিলেন, "রূপ খেলিয়ে বেড়ান ঠাকুর, খুঁজে ফেরেন কোথায় রাই।" যেখানে সেই প্রেমময়ের সৌন্দর্য্য খুব উজ্জ্বল, সেখানেই বুঝতে হবে যে তিনি তাঁর রূপ খেলিয়ে বেড়াচ্ছেন; খুঁজ্‌ছেন, কোথায় আমার ভক্ত? আমার সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হবে কে? আমার কাছে প্রাণ দেবে কে?

সেই দিন হ'তে এক মাস ধ'রে ভাব্‌ছি যে, দুটি বিষয়ে আমরা বড় ভুল করি। সংসারে বাস করে কারা? আর, সংসারে হয় কি কাজ? সংসারে কেবল সংসারী লোকেরাই বাস করে না। পৃথিবীটা কেবল বিষয়াসক্ত মানুষের বাসস্থান নয়। This world is not peopled by worldly men and women alone.—যদি এই পৃথিবীতে কেবল সাংসারিক ভাবাপন্ন বিষয়াসক্ত মানুষেরাই বাস কর্‌ত, পৃথিবীটা এত সুন্দর এত মিষ্টি হ'ত না। না—না! শরীরী এবং অশরীরী অনেক ভক্ত এখানে বাস করেন। কেন আমরা কেবল বাজারের ও রাজপথের জনতা দেখি? দিব্য দৃষ্টিতে কেন দেখি না যে কত অশরীরী ভক্ত এই পৃথিবীর সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন কর্‌ছেন, দর্শন ক'রে মুগ্ধ হচ্ছেন? পৃথিবীকে কেন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কেবল বিষয়ী লোকের বাসস্থান ব'লে মনে করি?

দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীতে প্রধানতম ব্যাপার কি? মানুষের বিষয় বাণিজ্য নয়; আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রের ও আফিসের কাজ কর্ম্ম নয়; যার হিসাব করা যায়, আর রিপোর্ট লেখা যায়, টাকা-আনা-পাই দিয়ে লাভ ক্ষতি গণনা করা যায়, এমন সব কাজ নয়। ধর্ম্মসমাজের কাজ ব'লে যাকে আমরা মনে মনে বড় ক'রে তুলি, যা আমাদের কার্য্য-বিবরণে বাহির হয়, তাও নয়। এ জগতের প্রধানতম ব্যাপার, ভক্ত ও ভগবানের পরস্পরকে অন্বেষণ, এবং মানুষদের মধ্যে বিবিধ প্রেমে একে-অন্যকে অন্বেষণ। এ জগতের প্রধানতম ব্যাপার এই যে, এখানে ভক্তপ্রাণ ভগবানকে খোঁজে, ভগবান্ ভক্তকে খোঁজেন। এখানে মানুষের প্রাণ মানুষের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি প্রেম-ভক্তিতে বিকশিত হ'য়ে উঠে, এবং সেই পরম প্রেমময় উৎসুক হ'য়ে, তৃপ্ত হ'য়ে, তা দর্শন করেন। এখানে মা সন্তানকে চায় ও পেয়ে তৃপ্ত হয়; এখানে ভাই ভাইকে চায় ও পেয়ে তৃপ্ত হয়; এখানে ধর্ম্মগুরু স্নেহাস্পদ প্রিয় শিষ্যকে চান ও পেয়ে তৃপ্ত হন। এখানে নানা ভাবে মানবপ্রাণ মানবপ্রাণকে চায় ও পেয়ে তৃপ্ত হয়, এবং ঊর্দ্ধ হ'তে সেই অনন্ত প্রেমস্বরূপ মানব হৃদয়ে এই প্রেমের বিকাশ দেখ্‌তে চান, ও দেখে তৃপ্ত হন। জগতে যেখানে যেখানে মানুষে মানুষে হৃদয়ের খেলা, সেখানেই সেই অনন্ত প্রেমময় সেই দুইয়ের সঙ্গে তৃতীয় হ'য়ে, আপনার প্রেমের আলো আপনার প্রেমের দৃষ্টি তাঁদের দৃষ্টির সঙ্গে মিশ্রিত করেন। যেমন সেই গাছের পাতায় দেখেছিলাম, প্রত্যেকটি পত্রে তার নিজ হরিৎ বর্ণের আভা, আবার পত্র হইতে পত্রে সেই আভা এবং রবির কিরণ উভয়ই প্রতিফলিত, এবং তাহাতে পত্রগুলির অন্তরালস্থানসকলও আভাময় হ'য়েছে, সমস্ত বৃক্ষটি যেন আলোময় হ'য়ে গিয়েছে,—তেমনি এ সংসারে প্রত্যেক মানবের অন্তরে তার নিজ স্নেহ প্রেম দয়া ভক্তির আভা র'য়েছে, আবার সমগ্র সংসারটাতে মানুষ হ'তে মানুষে, মানুষ হ'তে ঈশ্বরে, ঈশ্বর হ'তে মানুষে, এই ত্রিবিধ প্রতিফলিত প্রেমের আভা খেলে বেড়াচ্ছে। সংসারটা প্রধানতঃ এরই স্থান।

এই পবিত্র ভাবগুলি মনে আসিতে লাগিল। আমি আপনাকে ধিক্কার দিলাম। কেন জগতে চারিদিকে তাকিয়ে কেবল কাজ, কেবল ধূলি, কেবল কোলাহল দেখি? কেন সে দৃষ্টি নাই যাতে জগৎকে প্রেমময়ের প্রেমের আভায়, ও শত শত মানবপ্রাণ হ'তে প্রতিফলিত প্রেমের আভায় রঞ্জিত দেখি? আরব্যোপন্যাসে প'ড়েছিলাম, এক সন্ন্যাসী এক বণিকের চক্ষে কি এক অঞ্জন লাগিয়ে দিলেন, তাতে জগতে যেখানে যত লুকানো মণিমুক্তা আছে সব সে দেখ্‌তে পেল। কে আমাদের চক্ষে সেই অঞ্জন লাগিয়ে দিতে পারে, যাহাতে বিশ্বময় ব্যাপ্ত যে প্রেমের আভা এখন আমাদের চক্ষের অগোচর র'য়েছে, তাহা চক্ষের গোচর হ'য়ে যাবে?

সংসার আলোময় হয় কিসে? হিসাবের দৃষ্টিতে নয়, পরীক্ষার দৃষ্টিতে নয়। সহৃদয়তার দৃষ্টিতেই তা হয়। ছাত্রটি কেমন লেখাপড়া শিখেছে, ভৃত্যটি কেমন কাজ কর্‌ছে, কর্ম্মচারী-টির জন্য যতটাকা খরচ হয় তার উপযুক্ত বিনিময় তার কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে কি না, এ সকলের প্রকৃত বিচার কোন্ দৃষ্টিতে করিতে পারা যায়? তাহা পরীক্ষার দৃষ্টিতে হয় না, হিসাবের তে হয় না; আর এক রকম দৃষ্টি সংসারে আছে, তাতেই হয়! ছেলেটি যে প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌ছে, সহৃদয় শিক্ষক তা দেখেন। পিতা মাতা যে কত ক্লেশে সন্তানকে পালন করেন, কত ব্যাকুল স্নেহে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, সন্তান তা দেখে ও নিজ হৃদয় দিয়ে তাহা অনুভব করে। বার বার পরাস্ত শিষ্যও যে উঠ্‌বার জন্য কত প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌ছে, সহৃদয় গুরু তা লক্ষ্য করেন। এই সকল সহৃদয়তার দৃষ্টি সংসারে আছে ব'লেই, মানুষে মানুষে চক্ষে চক্ষে এইরূপ দৃষ্টিবিনিময় হয় ব'লেই, সংসার আলোময় হয়।

সংসারের এই ছবিই ঠিক ছবি। কলিকাতা সহরটাকে মানুষ যতই ধূলি ও কোলাহলে পূর্ণ করুক না কেন, তাই তার সর্ব্বশেষ কথা নয়, চরম কথা নয়। এখানেও আছেন ভক্তগণ; আর আছেন

সেই চিরসুন্দর। ব্রাহ্মসমাজকে যতই আমরা আমাদের কর্ম্ম-ব্যস্ততার দ্বারা ধূলিময় ক'রে তুলি না কেন, পরস্পরের কার্য্য-ক্ষমতার অথবা অক্ষমতার বিচারের দ্বারা উত্তপ্ত ক'রে তুলি না কেন, ইহা কেবল আমাদের কর্ম্মভূমি নয়। এখানে আছেন ভক্তগণ; আছে তাঁদের প্রাণের ভক্তি, প্রেমের জ্যোতি। আছে আমাদের মতন সাধারণ মানুষের প্রাণেরও কত প্রেমের আভা; আছে মানুষের পরস্পরের প্রতি স্নেহ ভালবাসার সহস্র ঝলক। আজ সকালে ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়ের* মুখে শুনেছিলাম, "প্রেমে তোমায় যদি না দেখ্‌ব, পরস্পরের স্নেহভালবাসায় যদি না দেখ্‌ব, দুঃখীর জন্য মানুষের সমবেদনায় তোমায় যদি না দেখ্‌ব, তবে আর তোমায় কোথায় দেখ্‌ব?" ঠিক কথা। ঐ তাঁকে দেখ্‌বার প্রধান ক্ষেত্র; এবং এ সংসারটা সেরূপ দর্শনেরই স্থান।

আজ অনুভব করি, বিধাতার এই সংসারটা আলোময়। ঈশ্বর হ'তে মানুষে, মানুষ হ'তে ঈশ্বরে, মানুষ হ'তে মানুষে, এই ত্রিবিধ প্রেমের কিরণ প্রতিফলিত হ'য়ে সংসার আলোকময় হ'য়ে আছে। এ মর্ত্তাভূমি, এই জড়ের দেশ, এই ধূলির দেশ,—শুধু আমাদেরই দ্বারা অধ্যুষিত নয়। এখানে আছেন ভক্ত-আত্মা, আছে দুর্ব্বল মানুষেরও অজস্র প্রেম, যা আমাদের চক্ষে জগৎকে সুন্দর ক'রে দেয়। আমাদের দৃষ্টি যেন বদলে যায়, যেন এই পবিত্র চক্ষে সংসারকে সর্ব্বদা দেখি, এই তাঁর কাছে আজ ভিক্ষা করি।

### পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসব।

১১ই মাঘ, প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত আচার্য্যরূপে হিন্দী ভাষাতে যে উদ্বোধন ও উপদেশ প্রদান করেন, তাহার বাঙ্গালা মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

"জাগো পুরবাসী ভগবত-প্রেমপিয়াসী," এবং "ধন্য হোগা মানব জন্ম গাওরে ব্রহ্ম নাম" এই দুই সঙ্গীতের পর, ভগবানকে প্রণাম ও সাধু ভক্তগণকে স্মরণান্তে—"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা" ইত্যাদি সঙ্গীত হিন্দী অনুবাদসহ গীত হয়—

> শুনো শুনো দেবলোকবাসী,
> অমৃতকে জো তুম্ হো সন্তান,
> জানা হৈ উসে অবিনাশী
> জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মহান্;
> সুরয কী কিরণ সা জো,
> অন্ধেরা সে পরে হৈঁ জো,
> উন্হী কো জানকর প্রাণী অমর হো জায়,
> মৃত্যুসে বাঁচনে কা ঔর নাহীরে উপায়॥
> সদাহী জো রহে হৈঁ অপনেমেঁহী ভরপূর,
> উন্হে জানো,—জাননে কা ক্যা হৈ ঔর উন্সে পর;
> উন্হে জান কর হুয়ে হৈঁ জ্ঞান তৃপ্ত ঋষিজন,
> সুফলত, ভয়হীন, মুক্ত ঔর প্রশান্ত মন,—
> উন্হীকো জানকর প্রাণী অমর হো জায়,
> মৃত্যু সে বাঁচনেকা ঔর নাহীরে উপায়।

এই সঙ্গীতের পর উদ্বোধন হয়।

আজ আমরা কোন্ বাণী শুন্‌বার জন্যে এ মন্দিরে এসেছি? সেদিন দিল্লীতে ভারতের রাজনৈতিক নেতারা বড়লাটের আহ্বানে মিলিত হয়েছিলেন। আশা ছিল রাজপ্রতিনিধি রাজার কাছ থেকে কোন্ আশার বাণী, মুক্তির বাণী এনেছেন, শোনাবেন। সে বাণী শুন্‌বার জন্যে সমস্ত ভারতবর্ষ দিল্লীর দিকে উৎকর্ণ উন্মুখ হয়ে ছিল।

আজ ১১ই মাঘ, এই ব্রহ্মমন্দিরে আমরা কার আহ্বানে এসেছি, কোন্ বাণী শুন্‌বার আশায় এসেছি? শত বছর পূর্ব্বে যেতে হবে। একশো বছর পূর্ব্বে এই দিনে কলিকাতায় একটি নবনির্ম্মিত গৃহে, কয়জন মাত্র বন্ধুর সঙ্গে, কয়শত মাত্র লোক ডেকে, রামমোহন যে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে কার আহ্বানে, কোন বাণী শোনাবার জন্যে?

তখন ভারতে সর্ব্বত্র ঘোর অন্ধকার এবং মৃত্যু রাজত্ব কর্‌ছিল। হাজার হাজার মন্দিরও ছিল। কোন মন্দির হ'তে নবজ্যোতি নব প্রাণ সঞ্চারের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। এমন মন্দির একটিও ছিল না। এ মহা প্রাণ-মন্দির, বিশ্বপতির দরবার খাস—এতে সকলের মহা নিমন্ত্রণ, চিরজ্যোতি নব প্রাণ লাভ কর্‌বার জন্যে। বিধাতার প্রেরণায় রামমোহন এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত ক'রে, সকলকে আহ্বান ক'রে বলেছিলেন—"ভাবো সেই একে"। দেশ জাতি বর্ণ ভাষা পোষাক শাস্ত্র গুরু নির্ব্বিশেষে সকলের জন্যে সেই পরম একের উপাসনার মিলনের ক্ষেত্র, সশ্রদ্ধ সংযত সকল নরনারীর উপাসনার স্থান। এ মন্দির মহাভারতের মহামিলনের মহাতীর্থ, সম্মিলিত ও মুক্ত ভারতের ভিত্তি প্রস্তর।

এ মন্দির হ'তে বিশ্বপতি রাজ-রাজেশ্বরের মহা আহ্বান, মুক্তি স্বাধীনতা ও স্বরাজ দেবার জন্যে তাঁর আশার বাণী, শত বছর ধ'রে ঘোষিত হয়েছে। যাঁরা সে আহ্বান শুনেছেন, সে বাণী মাথা পেতে নিয়েছেন, তাঁরা স্বরাজ পেয়েছেন, ধন্য হয়েছেন, তার দৃষ্টান্তে শত বছরের ইতিহাস পূর্ণ।

আমরা আজ সেই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার, সেই বাণীঘোষণার শত বার্ষিক উৎসব কর্‌তে এসেছি কেন? কিছু কি পেতে চাই? আশার বাণী শুন্‌ব? নব আলোক দেখ্‌ব, বল পাব, এই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে এসেছি কি? দিল্লীর দিকে যেমন উৎকর্ণ উন্মুখ হয়েছিল সকলে, তেমনি ব্যাকুল হয়ে তবে সেই পরম-দয়ালের পানে তাকাই। "হে প্রভু দেখাও সেইরূপ সেই শোভা, শুনাও সেই আশার বাণী, যাতে নবজীবন লাভ হয়।"

তারপর, "আজ দেও প্রভু ঐসা দরশন, জিস্ দরশন সে মৃত প্রাণী নূতন পাওয়ে জীবন"—এই সঙ্গীতের পর আরাধনাদি হয়। তারপর "ধন্য ধন্য ধর্ম্মবিধানবিধাতা", এই সঙ্গীত হয়। তারপর হিন্দী ভাষায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ বিবৃত হয়:—

[ ১লা বৈশাখ ১৩৩৬, ১৪ই এপ্রিল ১৯২৯, রবিবার সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক নিবেদিত। ]

* শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের।

## পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বরাজ

এখনও একমাস হয় নাই। এই নগরে, ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধিগণ ও নেতাগণ, জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত হয়ে, জাতীয় মহাসভায় ঘোষণা করেছেন "পূর্ণস্বাধীনতা" চাই? "স্বরাজ" চাই? তার উপায় "নন্-কো-অপারেশন্" "আইন অমান্য", "বিপ্লব"।

এ সংসারের রাজা, মানুষ রাজা ও রাজশক্তি, ইচ্ছায় হোক্ অনিচ্ছায় হোক্ ভুল করে, অন্যায় করে, অত্যাচার করে। সহজে খাজনা না পেলে, হুকুম না মান্‌লে, জোর ক'রে খাজনা আদায় করে, ধ'রে কাজ করিয়ে নেয়, সৈন্যদলে ভুক্ত করে, ধন প্রাণ সব নেয়, কিন্তু কত সময়, যথোপযুক্ত রূপে প্রজাদের রক্ষা ও সুখশান্তির পানে তাকায় না। এজন্যে রাজায় প্রজায় গোল বাঁধে। প্রজা যতটা অধিকার ও স্বাধীনতা ও শক্তি চায়, সুখ চায়, রাজশক্তি ততটা দিতে চায় না। তাই সংগ্রাম ও অন্যায় আইন অমান্য, নন্-কো-অপারেশন।

কিন্তু এ মন্দির হ'তে যে রাজার বাণী ঘোষণা করা হয়েছে, তিনি কেমন রাজা? সেই রাজার রাজা, সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বপতি মহান প্রভু সকলের দয়াল পিতা, প্রেমময়ী মাতা। তাঁর ধৈর্য্যের সীমা নাই, ক্ষমার অন্ত নাই। তাঁর আইন কানুন যে অন্য রকম—সে সব যে কল্যাণময়। তাঁর রাজ্য, তাঁর অতুল ঐশ্বর্য্য, তাঁর অনন্ত ভাণ্ডার পূর্ণ অক্ষয় সম্পদ, জ্ঞান প্রেম শান্তি আনন্দ—সবই যে আমাদেরই ভোগের জন্যে। তিনি যে স্বয়ংই সর্ব্বদা সে সকলকে ডাকছেন, নিজ অধিকার গ্রহণের জন্যে, স্বরাজ লাভের জন্যে। নিজের গৃহে স্বাধীন হয়ে সব সুখ সম্পদ তো তাঁর জন্যে। এজন্যে তাঁর কত আহ্বান। দিন রাত অন্তরে বাহিরে, প্রত্যেকের হৃদয়ে হৃদয়ে তিনি নানাভাবে বল্‌ছেন,—"সন্তান, তুমি যে রাজার ছেলে, রাজবাড়ীতে এসো, নিজের সম্পদ ভোগ কর, গরীবের মত কেন বাহিরে পড়ে আছ?"

কিন্তু আমাদের কি অবস্থা? এমন রাজার প্রজা, এমন পিতার সন্তান হয়ে, আমরা তাঁর সঙ্গে Non-co-operation (নন-কো-অপারেশন) করছি; তাঁর মঙ্গল বিধি অমান্য করছি, তাঁর বিরুদ্ধে কত প্রকারে বিদ্রোহ করছি? স্বাধীনতা স্বরাজ, মুক্তি, সুখ শান্তি, তিনি দিতে চাচ্ছেন, আমরা নিতে নারাজ। আমরা ইন্দ্রিয়গ্রামের পচা গলিতে, পাপপ্রবৃত্তির অধীন হয়ে, পরিণাম-দুঃখ ক্ষণিক সুখের নেশায় মত্ত হয়ে, ভুলে আছি। নরনারী তাঁর সন্তান, নিজের উচ্চ অধিকার ভুলে দুর্গতিতে ডুবে আছে, পাপের বন্ধনে রয়েছে, পাপবিকারে পাগল হয়ে তাঁর বিদ্রোহাচরণ কর্‌ছে, এ দেখে তাঁর করুণার বিরাম নাই। দিন রাত হৃদয়ে হৃদয়ে কতরূপে কতবার নিজে মুক্তির কথা বল্‌ছেন, আবার নিজের সুপুত্রগণকে লোকের দ্বারে দ্বারে পাঠাচ্ছেন, সকলকে জাগাবার জন্যে, স্বাধীনতা, সুখ সম্পদ উচ্চ অধিকার দেবার জন্যে। দেশে দেশে যুগে যুগে, নানা আকারে বিশ্বপতির এই আহ্বান ঘোষিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে।

সকল দেশের সকল যুগের বিধাতার সব আহ্বান এই মন্দিরে সম্মিলিত হয়ে মহা আহ্বানে পরিণত হয়েছে। তাঁর আহ্বান বহন ক'রে, ঘোষণা ক'রে, যাঁরা গিয়েছেন, এবং যাঁরা পরে আসবেন, তাঁরা সকলে মিলিত হয়েছেন এবং হবেন এই মন্দিরে। এখানে বিশ্বপতির পাপ তাপ অপহারী মহাপতাকার নীচে সম্মিলিত হয়ে, তাঁর দূতগণ বিধাতার অভয়বাণী সমস্ত মানবজাতিকে ডেকে শুনতে বল্‌ছেন।

এ আহ্বান প্রেম রাজ্যের আহ্বান। এ রাজ্যে জোর জুলুম নাই। এরাজ্যের রাজা ভিখারী, তাঁর সৈন্য সেনাপতিরাও ভিখারী। তাঁরা গাল খান, মার খান, অপমান পান, তবু রাগ নাই; কেবল সপ্রেমে আহ্বান করেন প্রেম-দেবার জন্যে, স্বাধীনতা উচ্চ অধিকার, প্রেম সম্পদ দেবার জন্যে। তিনি দেবার ভিখারী। "প্রভু দ্বারে দ্বারে নাকি ফের, কত পাষণ্ড সন্তান করে অপমান, তথাপি ছাড়িতে নার।" এমন দয়াল প্রভুর দয়ার কথা জগতকে শতমুখে শোনাবার জন্যে, ঘোষণা কর্‌বার জন্যে এ মন্দির।

এ মন্দির হ'তে শত বছর ধ'রে যে স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করা হয়েছে, যে নবজীবনের কথা বলা হয়েছে, যে স্বরাজের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, তা ইহলোকের দুদিনের স্বাধীনতা বা স্বরাজ নয়; সে নবজীবন, সে স্বাধীনতা, সে স্বরাজ অনন্ত কালস্থায়ী। সে রাজ্যে রাজায় প্রজায় বিরোধ নাই। সেখানে সকলেই দিতে ব্যাকুল, সেবা কর্‌তে ব্যাকুল। জগতের নরনারী এমন স্বরাজ্যের অধিকারী হয়েও, মোহের ঘোরে Non-co-operation করেছে, জীবন ব'লে মৃত্যু, সুখ ব'লে দুঃখ বরণ ক'রেছে। এ যে উল্টো Non-co-operation তাই, বিশ্বভুবনপতি পরম দয়াল পুত্র কন্যাগণকে মরণের পথ হ'তে ফিরাবার জন্যে, ভারতের তপোবনে ও হিমালয়ে, হোরেব ও হিরা পর্ব্বতে, পঞ্চনদের তীরে এবং গঙ্গার ধারে—নিত্য নব নব বিধান প্রেরণ করেছেন; জনক যাজ্ঞবল্ক্য শাক্য, ঈষা মুষা মহম্মদ, কবীর নানক চৈতন্য, সকলে সেই প্রেমধামের স্বরাজের বাণী ঘোষণা করেছেন।

সকলে একই রাজার বাণী, একই রাজ্যের আহ্বান ঘোষণা করেছেন; কিন্তু তা নিয়েও জগতে বিরোধ চলেছে। এ মন্দিরে সে সকলের মহামিলন হয়েছে। এখানে সব দেশ, সব কাল, সব নরনারী, সব সাধু, সব শাস্ত্র, সব সত্য, সব তত্ত্ব, সব জ্ঞান প্রেম পুণ্য মিলিত হয়ে, এক মহা স্বরাজ, সকলের স্বরাজ, সকলের পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্র রচিত হয়েছে। এই ভারতে সব জাতি সব ধর্ম্মবিধান এসে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে; সে সকলকে এক মহা ধর্ম্মরাজ্যে পরিণত করা ভগবানের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন কর্‌বার জন্য শত বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে রাজা রামমোহন রায় বিধাতার প্রেরণায় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সকলকে ডেকে বলেছিলেন—"ভাব সেই একে" সেই পরম একক ডেকে, সেই একক দেখে, তাঁকে ধ'রে যে জীবন, যে মিলন, তাই সত্য জীবন, তাই সত্য স্বরাজ। তাতেই সত্য স্থায়ী স্বাধীনতা, মুক্তি ও আনন্দ। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

"রে মৃত ভারত, সেই এক পথ আছে, নাহি অন্য পথ।"

শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতের মুক্তির সেই এক পথ আছে। এ মন্দিরে এ আধ্যাত্মিক সম্মিলনে, ভারতের ও জগতের নিত্য মুক্তির ও সত্য রাজ্যের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে।

এ মন্দিরের যাঁরা উপাসক তাঁদের গুরুতর দায়িত্ব আছে। তাঁহাদিকে পরম পিতার মহা আহ্বানের ঘোষণার সাক্ষ্য দিতে হবে, প্রমাণ দিতে হবে এতে যে স্বরাজ লাভ হয়, এতে স্বাধীন হওয়া যায়। পরম ধন লাভ হয়, জীবন ধন্য হয়, তা দেখাতে হবে।

ভগবান ডাক্‌ছেন,—"এসো, এ প্রেম রাজ্যের প্রজা হও, এ প্রেমের বিধান, মিলনের বিধান স্বীকার কর। এ রাজ্যের রাজা, এবং সৈন্য সেনাপতি সকলকে প্রেম দিবার ভিখারী, সেবা করবার ভিখারী। এই ভিখারীদলে মিশে, দাসদল গঠন কর, পরস্পরের সেবক হও, সেবার দায়িত্ব, প্রেমের দায়িত্ব গ্রহণ কর। জগতকে মহা স্বরাজের শোভা দেখাও, জীবনে পরিবারে সমাজে কর্ম্মক্ষেত্রে সে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত কর।" আমরা এ আহ্বান স্বীকার ক'রে ধন্য হই। তাঁর কৃপার জয় হোক্।

## অমর কথা (১৭)

( A joy in the hour of death ).

### মরণক্ষণে জয়োল্লাস

ধূলোর মাঝে ধূলি হব,
তবুও দেখ হাসি;—
সবার বুকে চেতন-পুরে
আনন্দেতে ভাসি।
পিতা মাতা পবিত্রতা,
কোথায় আমার ভয়?
শুদ্ধরূপে উঠ্‌ছি জেগে,
নিত্য বরাভয়।
যখন আমি একলা হব,
সকল যাবে চ'লে,
স্বরগপুরে জাগ্‌ব গেয়ে,
ব্রহ্মনামের বলে।
মরণ-ঘুম আস্‌বে যবে
আমার নয়নপাশে,
জানি গো জানি উঠ্‌ব হেসে—
ঐ যে সবাই হাসে।
বুকের ধন আস্‌ছ নেমে
প্রেম-সোহাগে মেখে,
জুড়িয়ে গেল সকল জ্বালা
ঐ জ্যোতির রেখা দেখে।
নাই বা কেউ বেসেছে ভাল
এ ধরণীর বুকে,
নাই বা কেউ জান্‌লে মোরে—
সকল গেছে চুকে।
নাই বা কেউ কাঁদ্‌লে আর
এ অভাগার তরে,
নাই বা কেউ ফেল্‌লে জল
এ সমাধির 'পরে।

প্রকৃতির বুকে সব ঝরে পড়্‌ছে—পশুপক্ষী তৃণলতা ফলপুষ্প সবার কোথায় গতি! ধরণীর বুকে আনন্দে খেলা ক'রতে ক'রতেই কেবলই বিদায়ের গান বেজে উঠ্‌ছে—কোথায় যেন যেতে হবে। কে জানে কখন? হয়ত আজ প্রভাতেই, হয়ত বা কালই সন্ধ্যায়—দুদিন আগেই হউক আর পরেই হউক, খেলা শেষ ক'রতেই হবে। যা একবার হ'য়ে গেছে আর ফিরে আস্‌বে না—শিশুর কোমল তনু আর বৃদ্ধের জীর্ণ দেহ, সকলেরই ধূলি পরিণতি। বংশপরম্পরা চলেছে এই অখণ্ড নিয়মধারা। কে কার গতি রোধ করে? সকলেরই একই গম্য পথ।

সকলেই ত এ কথা ভাল ক'রেই জানি, তবে কেন ক্ষণিক ভীতির অন্ধ ওড়না? একদিন যেতেই হবে। কে জানে প্রিয়জনদের মঙ্গল আবেষ্টনের ভিতর আমার আনন্দে মহাপ্রয়াণ হবে, কি নিঃসঙ্গ ক্লান্ত রোগশয্যায় শায়িত হ'য়েই আমার খেলা শেষ হবে—কে জানে? কিন্তু একদিন শেষ হবে এ কথা ধ্রুব সত্য। কি বিচিত্র ইন্দ্রজাল মহাযাত্রার অব্যক্ত রহস্য পরিণাম। কেবলই ক্ষণে ক্ষণে সাংসারিক আনন্দ-যাত্রায় বেদনার করুণ গান মরণ-মলিনিমা ঢেলে দেয়—কিন্তু কে জানে হয়ত ঐ বেদনার তিক্ত রসের ভিতরই, মরণগম্ভীর পরিচয়ের ভিতরই, একদিন মিষ্টতার নিত্য সুধাধারা ঝ'রে পড়বে। কই সে আনন্দবাঁশি মরণপুরে সবাই শুন্‌তে পাই—কই সে চিন্তা? চলেছে ত অগণ্য মানুষ জীবন ভ'রে ধনসঞ্চয় ক'রে—ভবিষ্যতে মূলধন সঞ্চিত ক'রে আত্মীয় পরিবারের ঐহিক সুখের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে। হয় ত সংসারে কত প্রতিষ্ঠা হোল, কত আনন্দগরিমা লাভ হলো। এই আনন্দই কি চরমানন্দ? প্রিয় জনের ভবিষ্যৎ কল্যাণ কি আমার সঞ্চিত অর্থ দান কোরবে? প্রতিজনের হিতসাধন, প্রতিজনের আত্মোৎকর্ষ, ভগবদ্‌প্রেম সাধনাসাপেক্ষ। জাগতিক ধনরত্ন সংসার-সুখে মুগ্ধ জনকে তৃপ্ত করে সত্য, কিন্তু চিরদিনের সত্য সুখ কোথায়?

আবার কত অসংখ্য যাত্রী ত্যাগের মহিমার ভিতর দিয়াই জীবন উৎসর্গ ক'রলেন, শত্রুকে ক্ষমার মন্ত্রে জয় ক'রলেন। রাগহিংসাদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা প্রতিহিংসাপরায়ণ চিত্তের কিসে তৃপ্তি? সংসারপথে কত ক্লান্তি, কত নিষ্পীড়ন, কত বিবাদ বিসম্বাদ, কত মোহ পরমাদ—কিন্তু অন্তিম শয়ানে ও কি দৃশ্য? ভীত কাতর চিত্ত একবার শেষে ক্ষমার মন্ত্রে জাগতে চায়, সকলের কাছে শেষ ক্ষমার কথা ব'লে যেতে চায়।

কত পরদুঃখকাতর প্রাণ দুঃখীর জন্য সর্ব্বস্ব দান ক'রে গেলেন, কত জনহিতপ্রতিষ্ঠানে সমস্ত আত্মদানে চিরস্মরণীয় হ'য়ে গেলেন! যতই কেন দানের মহিমা প্রচারিত হউক না, একদিন মহাযাত্রার ভিতর অব্যক্ত করুণ সুর হৃদয়তন্ত্রীকে বাজিয়ে তুলবে।

মহাযাত্রার মঙ্গল মুহূর্ত্তে কি আমার প্রিয়জনেরা আমায় ঘিরিয়ে দাঁড়িয়েছেন? তাঁদের স্নেহপ্রেমবিগলিত অশ্রুধারায়

কি আমার মরণক্ষণের সকল গ্লানির অবসান হ'য়ে যাচ্ছে? মহাযাত্রার গম্ভীর স্বরূপে কে না ব্যথিত হয়? অতি বড় অপরিচিত জনের মৃত্যু সময়েও হৃদয়নিভৃতে সমবেদনার করুণ ব্যথা বেজে ওঠে। আর যাদের সঙ্গে এতখানি খেলা খেলে এলাম, যাদের বুকে এতদিন আনন্দে মাথা রেখে এলাম, আজ তাঁরা আমার মহাযাত্রালীলায় শেষ গান গাইতে এসেছেন, তাই কি আমার পরিতৃপ্তি? আমার দেহত্যাগে জগতের শত বুক কেঁদে ওঠে—এ কথা ভাবতেও শান্তি। আবার কত শাস্ত্র ভক্ত প্রাণ জগতের কঠোর বিচারে নিন্দা গ্লানির ভিতর মরণক্ষণের বেদনার ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেলেন, আজ হয়ত লক্ষ প্রাণ সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন ক'রছে!

কেমন ক'রে শেষ গানটী আনন্দে গেয়ে যাব? কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে আনন্দে আনন্দময়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়্‌ব? এমনি ক'রে আনন্দে যদি উৎফুল্ল হ'য়ে থাকি, বাক্য চিন্তা আনন্দময়ের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে থাকে, তবে কোথায় দুঃখ? যাঁর জীবন ভগবৎপ্রেমে উদ্বুদ্ধ তিনিই আনন্দে শেষ গান গেয়ে যান। বিধাতার বরপুত্র তিনি, ধন্য প্রেমসুধাপানে স্নিগ্ধ মধুর জীবন।

জানি না কে আমার জন্য শোক ক'রবে কি না ক'রবে, চোখের জল ফেল্‌বে কি না ফেল্‌বে, আমি আমার স্রষ্টা পাতা বিধাতার বুকে আছি, সেই বুকেই আমার মহাযাত্রা, চির অবলম্বন।

কি হবে বহির্মুখীন স্মৃতিমাহাত্ম্যে? আমার সত্যধন লাভ হোল কি সংসারে? আমি আনন্দে ভবপারাবারে চলেছি কি! জানি না সে আনন্দের গান কে শুনবে? কেমন ক'রে ভবিষ্যতের বুকে ধর্ম্মপ্রেরণা জেগে উঠ্‌বে? আমার জীবনখানি কি ধন দিয়ে গেল সংসারে? সবই ছাই হ'য়ে গেল—দেবতার দান তাও কি লয় হবে? দেব-আশীর্ব্বাদই আমার জীবনের সার্থকতা—সে কল্যাণ ইচ্ছায় আত্মনিবেদন—আহা, বিশ্ববুকে কি আনন্দ সমাধি! যে বঞ্চিত হোল সে ধনে, কেমন ক'রে হবে তার সে অনুভূতি? ধন্য সে সৌভাগ্যবান যাঁর ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা বিশ্বমানবের বুকে ধর্ম্মের জয়গানে সুপ্রতিষ্ঠিত। ধন্য সে জয় সঙ্গীত। হয়ত কত জনের অভিশাপ, আবার হয়ত কত স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের সকল অর্ঘ্য আমার জন্য নিবেদিত হোচ্ছে!

নিঃসন্দেহ আমি একদিন যাবই যাব। হয়ত সে যাত্রায় আমার গ্লানির অবসান হবে। আমার কিসের অপেক্ষা? আমার কেন মৃত্যুবিভীষিকা—জাগুক সে আনন্দসাধনা যাতে আনন্দে ভবপারাবারে চলে যাই। যদি কালই রাত্রে, কি এ মাসেই আমি চলে যাই—জানি না ত কখন—তাই কি আমার ঐহিক সম্ভোগ পরমানন্দে ভোগ করি? এই মুহূর্ত্তে মরণগানে কি আমি আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠি? আমার কোন অনুশোচনা নেই, আমি শুদ্ধ সুনির্ম্মল, আমার কোন হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, আমার বাক্যবাণ কাকেও বিদ্ধ করেনি, আমি সকল কর্ত্তব্য পালন করেছি, আমার কোথায়ও অপ্রেম নেই,—এমনি ক'রে নিশ্চলতার ভিতর আমার চিরশান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ হ'য়েছে কি? তবে আর ক্ষোভ কেন?

যাব ত নিশ্চয়, দেবতার বুকে আত্মনিবেদন—অন্তর্য্যামী শুদ্ধ সুন্দর, তাঁর অনিমেষ আঁখি সবই দেখেছে জেনেছে—কই সে সুনির্ম্মল সুন্দর জীবন হোল? এখনও কত ভাঙা চোরা, কত কলুষ ফাঁকি—এখনও কত কিছু সংশোধন প্রয়োজন! তাইত আমার মহানন্দযাত্রায় এত দুঃখ, এত বেদনা—যে পথ দিয়ে গেলাম, যদি সবাইকে সুখী ক'রে যেতে পার্‌তাম কোথায় আমার দুঃখ? হায়! হায়! এখনও যে কত অনুশোচনার গ্লানিতে দগ্ধ বুক!

হে মঙ্গলবিধাতা, দাও সে নবদীক্ষা—কঠোর প্রতিজ্ঞা—আমি নিশ্চয়ই সুনির্ম্মল সুন্দর হব। ভক্তপদানুসরণ ক'রে শুদ্ধ হব। ধন্য যাঁরা তোমার হ'য়ে গেছেন, ধন্য তাঁদের কঠোর সাধনা—অগ্নিদীক্ষা

# বিবাহের উপদেশ।

[ ২৭শে ডিসেম্বর ১৯২৯ শ্রীযুক্ত লালমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র সুধাংশুমোহনের সহিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ীর কন্যা জ্যোৎস্নার বিবাহে আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উপদেশ। ]

স্নেহের সুধাংশু, স্নেহের জ্যোৎস্না, তোমরা আজ সত্যস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের করুণায় ও তাঁহারই পবিত্র সন্নিধানে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'লে। আজ তোমরা সেই বিধাতাকে জীবনে বিশেষভাবে সত্য ব'লে অনুভব কর। কে তোমাদের আজ মিলিত করেছেন? তোমাদের পরস্পরের দীর্ঘকালের আকর্ষণ, পরস্পরকে মনোনয়ন, অভিভাবকগণের অনুমোদন,—শুধু এ সকলকেই আজ দেখো না। আজ তোমাদের জীবনে বিধাতার যে বিধান প্রকাশিত হ'ল, তার তুলনায় মানুষের সকল নির্ব্বাচন ও অনুমোদন, সব ব্যবস্থা, এমন কি তোমাদের উভয়ের প্রবল আকর্ষণও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বস্তু। অভিভাবকগণের অভিজ্ঞতার সম্মুখে, কিংবা তোমাদের উভয়ের আকর্ষণের সম্মুখে, তোমাদের দুজনের জীবনের ভবিষ্যৎ গতি, তোমাদের ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ, কিছুই প্রকাশিত নয়। কিন্তু যিনি তোমাদের পরম অভিভাবক, তোমাদের সকল ভবিষ্যৎ যাঁহার চক্ষে স্বচ্ছ, মানবমনের সকল স্নেহ প্রেম ভক্তির বন্ধনের ভিতরে যাঁহার হাতের বাঁধন, যিনি সকল জীবের, সকল পরিবারের, সকল মানব সমাজের নিয়ন্তা ও বিধাতা,—তিনিই এতদিন তোমাদের উভয়ের জীবনে বিধাতা হ'য়ে বর্ত্তমান ছিলেন; তিনিই আজ আবার তোমাদের দুজনকে মিলিত ক'রে নূতন জীবনের পথে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছেন। এই পুণ্যমুহূর্ত্তে একবার তোমরা আর সব ভুলে যাও; সেই জীবনের বিধাতার সম্মুখে তোমরা দুজনে উপস্থিত, কেবল ইহা অনুভব কর; তাঁকে সাক্ষী ক'রে এই মন্ত্রে যে পবিত্র প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ কর্‌লে তার দায়িত্ব ও গাম্ভীর্য্য অনুভব কর।

আজ আমরা তোমাদের দুজনকে কি আশীর্ব্বাদ কর্‌ব? তোমরা যে এতদিন ধ'রে অন্তরে অন্তরে পরস্পরকে ভালবেসে আস্‌ছিলে, সে প্রণয়কে আমরা পরম শ্রদ্ধায় পরম আদরে গ্রহণ করি। আমাদের দীর্ঘতর জীবনে আমরা কত সংগ্রাম, কত দুঃখ শোক, কত বিপদ ঝঞ্ঝা স'য়েছি। কিন্তু বিধাতা প্রথম যৌবনে

আমাদের হৃদয়ে প্রণয়ের যে আলো জ্বেলে দিয়েছিলেন, সারা জীবন সকল সংগ্রাম ও অন্ধকারের ভিতরে সেই আলো আমাদের জীবনের পথকে আলোকিত ক'রে এসেছে। আমরা তোমাদের ব'লে দিচ্ছি, পবিত্র প্রণয়ের এই আলোর মত', মানবজীবনে বিধাতার এমন আশীর্ব্বাদ আর নাই; আমরা ব'লে দিচ্ছি, এর আলো ইহ-পরলোকের আড়ালখানি ভেদ ক'রেও পরলোকের জীবনকে উজ্জ্বল করে। আজ তোমাদের এই মঙ্গল অনুষ্ঠানের দিনে আমরা এ কথা ভুলি নাই যে তোমাদের জন্যও কত সংগ্রাম কত বিঘ্ন বাধা অপেক্ষা করছে। সে সকলের ভিতরে তোমাদের এই ভালবাসা চির উজ্জ্বল থেকে যেন চিরজীবন তোমাদের পথকে আলোকিত করে, হৃদয়েশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি। তোমাদের এই নব প্রণয়ের আলোর দিকে আমরাও উৎসুক নয়নে চেয়ে আছি। ইহার আলোতে আমাদের ঘর আলো হবে, ইহার স্নিগ্ধতায় আমাদের বার্দ্ধক্যসীমায় উপনীত সংগ্রামময় জীবন স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠবে, আমাদের রুক্ষ ও ঈষৎ কঠোর জীবনে তোমাদের প্রণয়ের সরসতা একটি কোমল ফুলের তাজা গাছের মত' সর্ব্বদা সৌরভ ও আনন্দ বিস্তার করবে. আমরা এই আশা নিয়ে আজ তোমাদের দিকে তাকাচ্ছি। এ আশা পূর্ণ হোক, এই প্রার্থনাই আজ তোমাদের জন্য ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করি।

বিধাতা যে একটি পুরুষ ও একটি নারীকে দাম্পত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ করেন, তা তো শুধু এ জন্য নয় যে একটি নূতন সংসার রচনা হবে, ও তাঁর সংসার-প্রবাহ রক্ষিত হবে। সংসার তো তাঁরই। কিন্তু যে শুধু সংসারের দিক থেকে এই বিবাহ ব্যাপারকে দেখে, সে ইহাকে বড় ছোট ক'রে দেখে। বিধাতা এই দাম্পত্য সম্বন্ধের ব্যবস্থা ক'রেছেন, আমরা মানুষ হব ব'লে। আমরা মানুষ হই কিসে? মানুষ হই অন্যের জন্য আপনাকে ভুলে; অন্যের জন্য আপনার ইচ্ছা রুচি সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে; অন্যের জন্য খেটে, স'য়ে, ভার বহন ক'রে। প্রেমের আত্মত্যাগের শিক্ষাটি দিয়ে বিধাতা আমাদের সমগ্র প্রকৃতিকে উন্নত করেন ও মধুময় করেন। ফলটি যতদিনে পক্ব হয়, সূর্য্যকিরণ তাকে স্পর্শ ক'রে ক'রে তার প্রতি মুহূর্ত্তে যেমন তার কঠিনতাকে কোমলতায় পরিণত করে, তার কটু কষায় অম্ল রসকে মিষ্ট রসে পরিবর্ত্তিত করে, তেমনি এই দাম্পত্য জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তে বিধাতা দুটি প্রাণকে স্পর্শ ক'রে ক'রে তাদের অন্তরকে কোমল করেন, মধুময় করেন। যখন তাঁর এই অপূর্ব্ব বিধি আমাদের জীবনে অনুভব করি, তখন তাঁর কাছে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় আমাদের মস্তক নত হ'য়ে যায়। আজ তোমরা তাঁর এই পবিত্র বিধির কাছে বিশেষভাবে মস্তক নত কর।

বিধাতা মানবজীবনে তাঁর এই শিক্ষাটি দাম্পত্য সম্বন্ধের দ্বারা বড় মিষ্ট ক'রে দান করেন। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে একটি অপূর্ব্ব নিগূঢ় আকর্ষণ, তা দিয়ে তিনি এই শিক্ষাকে বড় আনন্দময় ক'রে দান করেন। কিন্তু তোমরা এই আকর্ষণকেই যেন প্রেম-বস্তু ব'লে ভ্রম ক'রো না। যদিও তোমাদের দুজনের মধ্যে এই আকর্ষণ বহুকাল হ'তেই জন্মেছে, তবু আমি বলি, শুধু এর উপরে তোমরা ভরসা রেখো না। শুধু এই আকর্ষণ হ'তে, মানুষকে বোঝবার জন্য যে সহানুভূতি প্রয়োজন, তা আসে না। শুধু এই আকর্ষণ, দম্পতীকেও পরস্পরকে বোঝবার ঠিক চক্ষুটি দেয় না। এতে আপনার দাবী ও অভিমান ছাড়বার শক্তি আসে না। শুধু পরস্পরকে ভাল লাগা,—ইহা ঝড় ঝঞ্ঝায় পরীক্ষিত, উন্নত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত, নিত্য অনুপ্রাণনময় দাম্পত্য জীবনের ভিত্তি হ'তে পারে না। তোমরা সেই উন্নত প্রেমের জন্য নিত্য প্রার্থনা ক'রো, যাতে, "আমি কি পেলাম, কি না-পেলাম" এ ভাবের রেখাটিও হৃদয়ে পড়ে না; যাতে, "আমি কত খাটছি, কত ভার বহন করছি" এ হিসাব মনের ত্রিসীমানায় আসতে পায় না; যাতে, "আরও কত খাটতে, কত বইতে, কত সইতে আমি যে প্রস্তুত, তার সীমা নাই" এই ভাবে মন নিরন্তর পূর্ণ থাকে। এই আত্মদানই প্রেমের সার কথা। তোমরা এই উন্নত প্রেমের সাধনা কর।

স্নেহের পুত্র কন্যা, তোমাদের চেয়ে অল্প বয়সে যারা বিবাহিত হয়, যারা কৈশোরের উচ্ছ্বাসময় প্রকৃতি নিয়ে এবং অপেক্ষাকৃত ভারমুক্ত মন নিয়ে দাম্পত্য সম্বন্ধে প্রবেশ করে, তাদের কাছে বিবাহের দিনটি উচ্ছ্বসিত আনন্দের দিন হ'য়ে আগমন করে। তোমাদের মিলনের ব্যাপারটি সেরূপ হচ্চে না। তোমরা বয়স্ক হ'য়েছ; জীবনের দায়িত্ব বুঝেছ; বিধাতা আমাদের জীবনে যে সকল ভার দিয়ে আমাদের মানুষ করেন, তার কিছু কিছু আগে থেকেই তোমাদের স্কন্ধে এসে প'ড়েছে। তোমাদের এই মিলনের উপরে সংসারের মেঘের কত ছায়া এসে প'ড়েছে, তাও আজ আমরা ভুলতে পারছি না। এক দিকে একটি পরিবার জননীর অভাবে ভগ্নপ্রায়; অপর দিকে আর একটি পরিবারে একটি রুগ্ন ভগিনী দিদির সাহায্য হ'তে বঞ্চিতা হ'তে যাচ্ছেন। তোমরা কি দুঃখ কর যে, আর সকলের মত' তোমরা ভারমুক্ত মনে, উচ্ছ্বসিত আনন্দে, কেবল হাসতে হাসতে, কেবল আমোদ করতে করতে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করবার অধিকারটি লাভ করলে না? আমি বলি, তোমরা এতে আনন্দ কর। তোমরা বল, "ধন্য প্রভু, যে আমাদের জীবনে প্রথম হ'তেই তুমি এমন ভার দিয়েছ, যাতে জীবনে ধৈর্য্য আসে।" বল, "প্রভু, তুমি আমাদের মিলিত জীবনের হালখানি ধর! আমরা দুইজনে তোমার মুখের দিকে চেয়ে তোমার আদেশ বহন ক'রে, সকল তরঙ্গ কাটিয়ে, জীবনতরী চালিয়ে নিয়ে যাই"।—আমি বলি, পুত্র কন্যা, অতি উন্নত ভাবে এ জীবনে প্রবেশ করবার অধিকার তোমরা লাভ ক'রেছ।

স্নেহের সুধাংশু ও জ্যোৎস্না, তোমরা উভয়ে মনে রেখো যে এমন পরিবারের রক্ত তোমাদের দেহ-মনে প্রবাহিত, যাঁরা ধর্ম্মধনকে সংসারের আর সকল বস্তু অপেক্ষা বড় মনে ক'রে এসেছেন। কারো কারো কাছে ধর্ম্মটা শুধু সংসারের সুখ-সম্পদকে গিলটি করবার জিনিস। সংসারের সুখ-সম্পদই তারা খোঁজে, তার উপরে ঈশ্বরের নামের শোভা তারা চায়। আবার কারো কারো কাছে ধর্ম্ম এমন জিনিস, ধর্ম্মানুগত জীবন এমন মূল্যবান্ ধন, যে, তাকে বুকে ধরতে গিয়ে, তাকে রক্ষা করতে গিয়ে, তারা সংসারের আর সব তুচ্ছ করতে প্রস্তুত হয়। সুধাংশু, তুমি মনে রেখো, তোমার পিতাকে, তোমার মাতামহীকে, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য ত্যাগ করতে হয়েছিল। তুমি মনে রেখো, তোমার স্বর্গগতা জননী ঈশ্বরের পূজা না ক'রে দিনযাপন করাকে কত ক্লেশকর মনে করতেন। জ্যোৎস্না, তুমি মনে রেখো, তোমার পিতাকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য, সর্ব্বস্ব উৎসর্গ ক'রতে হ'য়েছে। তোমাদের বিবাহসম্বন্ধের দ্বারা দুটি পরিবারের মধ্যে যে নূতন বন্ধন আজ বাঁধা হচ্চে, তার চেয়ে অনেক দৃঢ় ধর্ম্মের একটি বন্ধন আগে থেকেই বাঁধা রয়েছে। "সেই পরম প্রভুর জন্যই আমাদের সব, এবং আমাদের ধর্ম্মাদর্শ রক্ষার জন্য আমরা সব ছাড়তে, সব বিকিয়ে দিতে পারি," এই এক মন্ত্রে তোমাদের উভয় পরিবারের অভিভাবকগণ দীক্ষিত। এই যে এক ধর্ম্ম-রক্তের সম্বন্ধ, এখনও ইহাই প্রধান সম্বন্ধ; ইহার উপরে তোমাদের বিবাহ-জনিত নূতন সম্বন্ধ এসে আমাদের সেই পুরাতন বাঁধনকে আরও দৃঢ় করুক মাত্র। আজ তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, তোমরা ধর্ম্মের জন্য এই প্রবল ব্যাকুলতাকে নিজ গৃহে রক্ষা করবে তো? যে কোন সঙ্গ, যে কোন প্রভাব,—তা সংসারে যত বড় ও যত প্রতিপত্তিশালী মানুষের সঙ্গ ও প্রভাব হোক না কেন,—যে সঙ্গ যে প্রভাব মানব-মনে ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলতাকে নিস্তেজ করে, ধর্ম্মের মূল্য-বোধকে খর্ব্ব করে, তা হ'তে নিজ পরিবারকে সতর্ক হ'য়ে রক্ষা করবে তো?

তোমরা সেই সঙ্কল্প লও। "আমরা আমাদের প্রভুর কাছে, ধর্ম্মের কাছে, ও আমাদের গুরুজনের কাছে চিরবিশ্বস্ত থাকব", এই সঙ্কল্প আজ প্রাণে গ্রহণ কর।

স্নেহের সুধাংশু, তোমাকে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করব! আজ তোমার জীবনে দয়ালের দয়াই দেখি। তোমার জীবনের গুরুভার বহনে সাহায্য করবার জন্য, ভালবাসার দ্বারা তোমার জীবনকে স্নিগ্ধ করবার জন্য, বিধাতা যে তোমাকে এমন এক জন সঙ্গিনী দিলেন, তোমার জীবনে তাঁর এই অপার কৃপার জন্য তুমি আজ কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হও। তুমি মনে মনে বল, "আমি এমন অমূল্য ধন পেলাম, আমি সমগ্র হৃদয়মনকে উন্নত ক'রে, জীবনের দৃঢ়তা ও উৎসাহকে শতগুণ অধিক প্রজ্বলিত ক'রে, বিধাতার এই দানের যোগ্য হব।" এই পবিত্র সম্বন্ধ তোমার জীবনে নিত্য নব অনুপ্রাণনের উৎস হোক্।

মা জ্যোৎস্না, তুমি আমাদের ভাঙ্গা সংসার জুড়ে দেবার জন্য আমাদের ঘরে আসচ। দয়াল বিধাতা তোমার হৃদয়পাত্র ভালবাসায় এমন ক'রে উপচে দিন, যেন আমাদের এই ভঙ্গা ঘরের সকল প্রাণগুলিকে তা ভাসিয়ে দেয়, ঘিরে লয়, স্নিগ্ধ ক'রে দেয়। স্বর্গ হ'তে আমাদের বোন্ প্রমীলা আজ তোমাকে কত আশীর্ব্বাদ করচেন! তুমি তাঁর ঘর রক্ষা করবার জন্য অগ্রসর হ'লে। আমরা বলি নির্ভয়ে অগ্রসর হও। ভালবাসায় সম্পন্ন করতে না পারে এমন কঠিন কাজ নাই, বইতে না পারে এমন গুরু ভার নাই, সমাধান করতে না পারে এমন জটিল প্রশ্ন নাই।

তোমাদের দুজনকে বলি, প্রভু পরমেশ্বরের চরণে না ব'সে, তাঁর আলোকের সামনে তোমাদের জীবনকে তুলে না ধ'রে, একটি দিনও যাপন করবে না। তাঁর কাছে সরল আত্মনিবেদন, প্রতি বিষয়ে তাঁর ইচ্ছার অনুসরণ, ব্রাহ্মসমাজের পবিত্র আদর্শ সকলের অনুসরণ তোমাদের পূজনীয় গুরুজনগণের পবিত্র আকাঙ্ক্ষা সকলের অনুসরণ,—ইহাই যেন তোমাদের জীবনের মন্ত্র হয়।

যখন কোনও নূতন দেশে মানুষ যায়, বন্ধুরা ভাল ক'রে পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নিতে বলেন। জগতের সাধু সাধ্বী দম্পতীগণের পরীক্ষিত, আমাদের বিবাহিত জীবনে পরীক্ষিত, সুখের দুঃখের সম্পদের বিপদের আলোকের আঁধারের একমাত্র সম্বল, একমাত্র পাথেয়, ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা। তোমরা সুখে প্রার্থনা ক'রো, দুঃখে প্রার্থনা ক'রো, সম্পদে প্রার্থনা ক'রো, বিপদে প্রার্থনা ক'রো। যদি কোন দিন দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়, প্রার্থনা ক'রো। যদি কোন দিন পরস্পরের প্রতি সংশয় আসে, প্রার্থনা ক'রো। যদি কোন দিন ঈশ্বরে সংশয় আসে, তবু সেই অন্ধকারের ভিতরে প্রার্থনাই ক'রো। এই প্রার্থনা কবচ তোমাদের গলায় আমরা বেঁধে দি। এই কবচ নিয়ে তোমরা তোমাদের জীবনের পথে অগ্রসর হও। যুগে যুগে যত সাধু সাধ্বীগণ দাম্পত্য-জীবনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের পবিত্র ও মধুময় সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তাঁদের সকলের আশীর্ব্বাদ তোমাদের মস্তকে পতিত হোক্।

---

## ব্রাহ্মসমাজ

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১লা এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে রায় বাহাদুর শশিভূষণ মজুমদার ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নানাপ্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইবে।

বিগত ২রা এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে মিঃ যতীন্দ্রনাথ রায় ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে পরিচিত সকলেই বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন। দুঃখের বিষয় ডাক্তার পি কে রায় মহাশয়কে আবার এই বৃদ্ধ বয়সে জামাতার শোক বহন করিতে হইল। বিগত ১৩ই এপ্রিল পুত্রকন্যাগণ তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১০ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেনের ভ্রাতৃবধূ (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনের মাতা) ৫৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ১২ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হরদৎ সিংহের দ্বাদশবর্ষবয়স্কা কন্যা সরলা পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ৫ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ফকীরচন্দ্র সাধুখাঁর শিশু পৌত্রী (শ্রীমান চারুচন্দ্র সাধুখাঁর কন্যা) পরলোকগমন করিয়াছেন।

কিছুদিন হইল কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দের একটি পুত্র বসন্তরোগে পরলোকগমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন এবং আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

**প্রাপ্তি স্বীকার**—শিবনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারের সম্পাদকগণ কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন:—

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ৫০০০৲ পরলোকগত কালীমোহন সেন ৩০০০৲, পরলোকগত লর্ড সিংহ ৩০০০৲, শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ ব্যানার্জ্জি ১০০০৲, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত ১০০০৲, কুমারী সরোজিনী ঘোষ ১০০০৲, পরলোকগত স্যার কে জি গুপ্ত ১০০০৲ পিঠাপুরমের মহারাজা ১০০০৲, মিঃ আর বি সেন ১০০০৲. মিঃ জি বি ত্রিবেদী ১০০০৲ মিঃ মাডগাওকর ৫০১৲, পরলোকগত এস্ পি দাস ৫০০৲, শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৫০০৲, সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র ৫০০৲, শ্রীযুক্ত অশোকমোহন বসু ৫০০৲, পরলোকগতা হেমপ্রভা বসু ৫০০৲, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৩৫০৲, মিসেস কে এন রায় ৩০০৲ পরলোকগত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ২৫০৲ সার আর বেঙ্কটরত্নম্ ৩০০৲, শ্রীযুক্ত রোহিণীমোহন দাস ৩০০৲, পরলোকগত ভূপতিনাথ বসু ২৫০৲, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বিশ্বাস ২৫০৲, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী ২০০৲, পরলোকগত রাজচন্দ্র চৌধুরী ১০০৲, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ২০০৲, ডাক্তার ডি আর দাস ২০০৲, শ্রীযুক্ত অজিতমোহন বসু ২০০৲, মিঃ এম আর হলদার ২০০৲, শ্রীযুক্ত অমৃতনাথ মিত্র ২০০৲, সার বি সি মিত্র ২০০৲, মিঃ পি এম কৈলাসম্ পিলে ২০০৲, রায় বাহাদুর পি কে দাসগুপ্ত ২০০৲, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ধর ২০০৲, শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসু ২০০৲, ডাঃ ব্রজলাল ভল্লা ১৫০৲, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ১৫০৲, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র লাহিড়ী ১৫০৲, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস ১৫০৲, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র রায় ১৫০৲, শ্রীমতী বিভুবালা (সরকার) বকসী ১৫০৲, মোট ২৬,২০১৲।

ক্রমশঃ।

## সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

**An Introduction to the Study of the Bhagabad Gita**—শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বাগীশ প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। ইহাতে উদারভাবে গীতার সার শিক্ষা ইংরেজী ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহা পাঠে ধর্ম্মার্থী ব্যক্তি বিশেষ উপকার লাভ করিবেন এবং গীতার সারমর্ম্ম গ্রহণে সাহায্য পাইবেন। অন্যান্য ধর্ম্মের সার শিক্ষাও ইহাতে, সংক্ষেপে হইলেও, উদার ভাবেই বিবৃত হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। অসবধানতা বশতঃ ৪১ পৃষ্ঠাতে "যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে... বিদ্যতে হয়নায়" শ্লোকটি বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে উহার সামান্য দুইটি অংশ মাত্র বৃহদারণ্যকের দুই স্থান হইতে গৃহীত। উহা বিভিন্ন উপনিষদের বিভিন্ন অংশ সংযুক্ত করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থেই ঐ আকারে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৩১শে বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত

৫৩ম ভাগ | ১৬ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
২য় সংখ্যা। | 29th April, 1930. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা।

হে করুণাময় পিতা, তুমি ত তোমার অসীম প্রেমে ও স্নেহে তোমার এই সুন্দর জগতের মধ্য দিয়া এবং আমাদের অন্তরের অন্তরে তোমার মধুর আহ্বান আমাদের নিকট নিয়ত প্রেরণ করিতেছ! আমরা মোহবশতঃ বাহিরের নানা কোলাহলে মত্ত থাকিয়া, উদাসীন বা বধির হইয়া তাহা না শুনিলেও তুমি কখনও ক্ষান্ত হও না—সকল কোলাহল ভেদ করিয়া, সকল মোহ কাটিয়া, তাহা সময় সময় আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়, আমাদিগকে জাগ্রত ও ব্যাকুল করিয়া উঠায়। কিন্তু তাহা যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, আমাদিগকে চিরদিনের জন্য সকল দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা হইতে মুক্ত করিয়া তোমার পথে চলিতে সমর্থ করে না, এই ত মহা দুঃখের কারণ। তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকে আমরা এই দুঃখের কথা জানাইব? আর কে এই দুঃখ দুর্ব্বলতা দূর করিতে পারে? আমরা যে কত দুর্ব্বল তাহা ত তুমি জান। তুমি অন্তর-দৃষ্টি খুলিয়া না দিলে, অন্তরে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত না হইলে, অ যে বাহির লইয়াই কিরূপ মুগ্ধ হইয়া থাকি, তাহা ত তুমি দে খতেছ! হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের নিকট সত্যরূপে প্রকাশিত হও। হে প্রেম-স্বরূপ, তুমি আমাদিগকে তোমার প্রেমে আকৃষ্ট কর, তোমার জন্য ব্যাকুল কর,—আর সমস্তকে তুচ্ছ করিতে শিখাও। হে জীবনবিধাতা, তুমি আমাদিগকে হাত ধরিয়া তোমার পথে লইয়া যাও, তোমাকে সত্য ভাবে পূজা করিতে, সকল বিষয়ে তোমার অনুগত হইয়া চলিতে সমর্থ কর। তুমিই আমাদের সকলের একমাত্র গুরু ও চালক হও। তোমার ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে পূর্ণ হউক।

## নিবেদন।

**আমায় রিক্ত ক'রে**—যাকে এত ভালবাস্‌তাম, এত স্নেহ কর্‌তাম, যে আমার ব্যথা এত বুঝ্‌ত, সে চ'লে গেল কেন? আমায় রিক্ত ক'রে সে উদাসীন হ'লো কেন? প্রভু তাকে আমার সরিয়ে নিলেন কেন? আমি বুঝি তাকে পেয়ে প্রাণের দেবতাকে ভু'লে যাচ্ছিলাম, আমি বুঝি পাতিব্রত্যধর্ম্ম হ'তে চ্যুত হচ্ছিলাম! তাই তুমি তাকে সরিয়ে নিলে? তবে নাও প্রভু, তোমার আমার ভিতরে যত ব্যবধান আছে, সব স'রে যাক্; তুমি এসে একমাত্র বন্ধু স্বামী হ'য়ে হৃদয় জু'ড়ে বস। আমি অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে তোমাকেই বরণ ক'রে লই। প্রিয়জনবিরহবিধুর হ'য়ে, তোমাকেই আঁকড়িয়ে ধরি। সকল শোক, সকল উপেক্ষা, তোমার দিকে চেয়ে, তোমারই জন্য সহ্য করি। চোখের জল প'ড়ে প'ড়ে চক্ষু অন্ধ হ'লো,—তবুও তাতে যদি তোমার একনিষ্ঠ দাস হ'তে পারি, তবে তাহাই হোক; তুমি যখন তাকে ফিরিয়ে দিবে, তখন আবার পাব, আবার সে তোমার প্রেমের দান হ'য়ে নূতন রূপে ফিরে আস্‌বে,—যে দূরে গিয়েছে সে আস্‌বে, যে ওপারে গিয়েছে সে-ও আস্‌বে। আর, তোমার যদি ইচ্ছা হয় যে তারা আর আস্‌বে না, তবে তাহাই হোক! তুমি তবুও ছেড় না; এই রিক্ত প্রাণ পূর্ণ ক'রে তুমি থাক।

---

**প্রাণের ক্রন্দন**—প্রাণ থেকে থেকে কেঁদে উঠে; কি যেন চাই, কি যেন পাই না, কিসের অভাব যেন অনুভব করি; তাই প্রাণ কেঁদে উঠে। ধন আছে, জন আছে, মান প্রতিপত্তি আছে; লোকের স্নেহ ভালবাসা আছে; তবুও প্রাণের আশা মিটে না, আকাঙ্ক্ষা পূরে না, ক্রন্দন থামে না। কার জন্য প্রাণ কাঁদে! শিশু যেমন মায়ের স্তন্যের জন্য কেঁদে উঠে,

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী যেমন মুক্ত বায়ুতে উড়্‌বার জন্য ছট্‌ফট্‌ করে, মানবচিত্ত যেমন ভালবাসা পাবার জন্য অস্থির হয়, সেরূপ মানব-আত্মা ঈশ্বরের জন্য কেঁদে উঠে। দুর্ব্বল, অজ্ঞ, অপূর্ণ মানুষ চায় শক্তি, চায় সত্য, চায় পূর্ণতার দিকে যেতে। কে এই অভাব পূর্ণ কর্‌বে? এক প্রেমময়, সর্ব্বশক্তিমান, পূর্ণ-ব্রহ্মই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর্‌তে পারেন, প্রাণের ক্রন্দন দূর কর্‌তে পারেন। এই যে মন্দির, মস্‌জিদ, গির্জ্জা নির্ম্মিত হ'য়েছে, এই যে কত কবিতাতে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করা হ'য়েছে, কত বিজ্ঞান দর্শন রচিত হয়েছে, কত সাহিত্য প্রেম-কাহিনীতে পূর্ণ হ'য়েছে, কত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে,—সকলই মানবের প্রাণের ক্রন্দন, ঈশ্বরের জন্য আকুল বেদনা প্রকাশ ক'চ্ছে। এই ক্রন্দন থাম্‌বে না তাঁকে না পেলে, এই আকাঙ্ক্ষা মিট্‌বে না তিনি প্রাণে প্রকাশিত না হ'লে।

**ইঙ্গিতের জন্য প্রতীক্ষা**—জীবনে সংগ্রাম এসেছে, পরীক্ষা এসেছে; ঈশ্বরের কৃপায় উত্তীর্ণ হ'য়েছ। এখন কি কর্‌বে? কত পথ আছে, কত দিক দিয়ে ডাক আসে, তুমি কোন্ দিকে যাবে? নিজে ত কিছু ঠিক কর্‌তে পার্চ্ছো না। প্রতীক্ষা কর, প্রার্থনা সহকারে প্রভুর আদেশ ও ইঙ্গিতের জন্য প্রতীক্ষা কর। লোকে নানা কথা বল্‌বে, নিজেও অলসতার ভার অনুভব কর্‌বে। কিন্তু তিনি চান তুমি তাঁরই আদেশের জন্য প্রতীক্ষা কর। তোমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা থাক্‌বে না,—তোমার ইচ্ছা যে তাঁর ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগত কর্‌তে হবে। তাই সব নিন্দা টিট্‌কারী সহ্য ক'রেও প্রতীক্ষা কর্‌তে হবে। জীবনের ঘটনাবলি প্রার্থনা সহকারে পাঠ কর, চারিদিকের অবস্থার ভিতরে তাঁর ইচ্ছার ইঙ্গিত দেখ। প্রার্থনা কর—জীবনগ্রন্থ, প্রকৃতি-গ্রন্থ পাঠ কর। ইঙ্গিত দেখ্‌বার জন্য, আদেশ শুন্‌বার জন্য প্রতীক্ষা কর। তিনি তোমাকে ডেকে বল্‌বেন, এস, এই কাজে এস, এই পথে চল। তোমার এই-ই পথ, অন্য পথে চল্‌বে না।

## সম্পাদকীয়

**ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা**—বিগত সংখ্যায় আমরা ডাক্তার পি কে রায় মহাশয়ের যে পত্রখানা প্রকাশিত করিয়াছি তাহাতে তিনি সত্য আধ্যাত্মিক উপাসনাকেই ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রধান কাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেই শিক্ষা-প্রদানকেই বর্ত্তমানের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও তৎসমাধানে বিশেষ ভাবে নিযুক্ত হইবার জন্য সকলকে সাগ্রহ অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই অভাব তিনি কত তীব্র ভাবে অনুভব করেন এবং এ সম্বন্ধে তিনি কত গভীর-রূপে চিন্তা করেন তাহা আমরা বিশেষ রূপেই অবগত আছি। তিনি তাঁহার অভিভাষণ ও পত্রাদিতে এবং আলাপ আলোচনাতে এই বিষয়ে বহুবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার গভীর চিন্তার ফলও অনেক সময় আমাদিগকে জানাইয়াছেন। এক সময় তিনি নিজেও এ সম্বন্ধে অনেক কাজ করিয়াছেন, স্বয়ং যুবকদিগকে দীর্ঘকাল শিক্ষা দিয়াছেন—প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঢাকাতে যে কাজ করিয়াছেন তাহাও হয়ত এখনও কাহারও কাহারও স্মরণে আছে। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনবাসেও তাঁহার প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের জন্য যেরূপ আকুল প্রাণে গভীর ভাবে চিন্তা করেন, তাহা আর কয় জনের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় জানি না। তাই জীবনের এই প্রান্ত সীমায় উপনীত হইয়াও এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার জন্য সকলকে বিশেষ ভাবে আহ্বান করা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। আমরা নানা কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে বাহির লইয়াই অনেক সময় ব্যস্ত থাকি, মূলে প্রবেশ করিয়া, ধীর ভাবে চিন্তা করিবার বা গতানুগতিক পথ পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর সুফলপ্রদ নূতন কার্য্যপ্রণালী আবিষ্কার করিবার অবসর পাই না। অথচ সফলতা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বদাই অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া নূতন অবস্থার উপযোগী আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ একটি ধর্ম্মসমাজ, সর্ব্বোপরি একটি উপাসক-মণ্ডলী। অনাবিল ধর্ম্মই, সত্য আধ্যাত্মিক ব্রহ্মোপাসনা ও সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল বিষয়ে ব্রহ্মানুগত জীবনযাপনই উহার প্রাণ। তাহা ব্যতীত যে শুধু উহার কোনও বৈশিষ্ট্যই থাকে না এমন নহে, উহার মৃতদেহ অচিরেই পুতিগন্ধময় ও নানা বিষের আকর হইয়া অশেষ অকল্যাণের কারণও হইয়া উঠিবে। সুতরাং উহার অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আর কোনও মতভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু কি উপায়ে তাহা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহার মীমাংসা কোনও প্রকারেই সহজ নয়। নানা কারণেই সমস্যাটা অতীব জটিল হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম সময়ে ব্রাহ্মসমাজ একটি উপাসকমণ্ডলীরূপেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সত্যভাবে পরব্রহ্মের আধ্যাত্মিক পূজা এবং আপনাদের বিশ্বাস ও আদর্শানুযায়ী বিশুদ্ধ ব্রহ্মানুগত জীবনযাপন করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও সঙ্কল্প লইয়াই সকলে সম্মিলিত হইয়াছিলেন—নূতন সমাজ গড়িয়াছিলেন। খাঁটি ধর্ম্মজীবনযাপনই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাহার জন্য তাঁহারা সংসারের আর সমস্তই অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা ইহাকে কত বহু মূল্যবান জ্ঞান করিতেন, ইহার জন্য কিরূপ ব্যাকুল ছিলেন, তাহা তাঁহাদের অসাধারণ ত্যাগ ও অপরাজেয় ধৈর্য্যের সহিত নানা প্রকার কঠোর অত্যাচার উৎপীড়ন বহন উজ্জ্বলভাবে প্রমাণ করিবে। কিন্তু তাঁহাদের এই উৎসাহ উদ্যম, আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা, যে চিরকালই সকলের মধ্যে সমভাবে ছিল, কালপ্রবাহে কিছু মাত্র শিথিলতা প্রাপ্ত হয় নাই, কেহ কেহ আবার সংসারের নানা মোহেও অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে মোহগ্রস্ত হন নাই, এরূপ কথা কিছুতেই বলা যায় না। কাহারও পক্ষে ইহার যে কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই, কাহারও কাহারও মধ্যে যে উহা বর্দ্ধিতও হয় নাই, এ কথাও অবশ্য কেহ বলিতে পারে না। তবে মোটের উপর তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই সেই ভাব কিছু পরিমাণে ম্লান হইয়াছে

বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রথম যুগের ব্রাহ্মদিগকে যেমন কঠোর ত্যাগ ও নির্যাতনের মধ্য দিয়া আসিতে হইয়াছিল, পরে আর তাহা করিতে হয় নাই। সকল প্রকার কুসংস্কারবর্জ্জিত, অশেষবিধ নাগপাশের বন্ধন হইতে মুক্ত, একটা উন্নত সমাজের সুখ সুবিধার জন্যও ক্রমে বহুলোক ইহার আশ্রয়ে আসিয়াছে। ধর্ম্ম ইহাদের কাহারই প্রধান লক্ষ্য নয়। ধর্ম্মবিরোধী না হইলেও, ইহাদের সকলেই সে সম্বন্ধে উদাসীন—বিরোধী যে একবারে কেহই নাই, তাহাও বলা যায় না। সমাজের ধর্ম্মজীবন যদি ইহাদিগকে প্রভাবান্বিত ও পরিবর্ত্তিত না করিতে পারে, তবে তাহা যে ইহাদের দ্বারা কিছু পরিমাণেও, এবং সংখ্যাধিক্য হইলে বহু পরিমাণেই, প্রভাবিত হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কাজেই আপনার প্রাণরক্ষার জন্যই ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা একান্ত আবশ্যক। উদাসীনতা বা বিরোধিতার পরিবর্ত্তে ইহাদের প্রাণে ধর্ম্মের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও আকুলতার উচ্চতর জীবনযাপনের জন্য আগ্রহ ও চেষ্টা জাগাইয়া না দিতে পারিলে, কাহারও কল্যাণ নাই। তৃতীয়তঃ, এই উভয় শ্রেণীর গৃহেই বহু সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহারা এখন আর সমাজের একটি উপেক্ষণীয় অঙ্গ নহে। তাহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ভুক্ত হইবার যোগ্য কেহ কেহ থাকিলেও অধিকাংশকেই যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য করিতে হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে সকল গ্লানি তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের প্রাণকে ব্যথিত করিয়াছিল এবং সত্য ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াই তাহারা বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রথম সময়ের জীবন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা তাহারা দেখে নাই, অপেক্ষাকৃত শিথিলভাবের মধ্যেই তাহারা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাদের অনেকেই আবার ধর্ম্মহীন অথবা ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন পরিবারের মধ্যেই জন্মিয়াছে ও বাড়িয়াছে। তদুপরি বাহিরের বিরুদ্ধ প্রভাবও তাহাদের জীবনের উপর যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছে। তাহার কুফল-নিবারণের জন্য পরিবার বা সমাজ যে বিশেষ কোনও উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও বলা যায় না। তাহাদের শারীরিক সুখ সুবিধা বর্দ্ধনের জন্য, সাংসারিক জীবনে তাহাদিগকে কৃতী ও যশস্বী করিয়া তুলিবার জন্য, যেরূপ শিক্ষাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যেরূপ যত্ন লওয়া হইয়াছে, তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবন-বিকাশ ও পরিপোষণ, ধর্ম্মজীবনগঠন, হৃদয়ে সংসারাতীত উন্নত আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা মুদ্রণ করিবার জন্য সেরূপ কোনও আয়োজনই করা হয় নাই। ধর্ম্মটাই যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু, উহাকেই যে পরম লোভনীয় ও লভনীয় আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ ভাব প্রাণে মুদ্রিত হইবার কোনও আয়োজনই তাহারা তাহাদের আবেষ্টনের মধ্যে দেখিতে পায় না। বরং এই সংসারের সুখ সুবিধা মান প্রতিপত্তিটাই যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জিনিষ, চারিদিকে তাহাই দেখিতে পায়। এরূপ অবস্থায় তাহাদের অধিকাংশই যদি ধর্ম্মবিষয়ে উদাসীন হয়, এবং সংসারসর্ব্বস্ব হইয়া উঠে, তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অন্যরূপ ফল আশা করাই নিতান্ত অযৌক্তিক হইবে। এমতাবস্থায় বর্ত্তমান সমাজকে আবার একটা সত্য জীবন্ত উপাসকমণ্ডলীতে পরিণত করা যে কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই হেতুই সমস্যাটা নিতান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের মতে ও কার্য্যে একটা বিশেষ নূতনত্ব ছিল। কৌতূহলবশতঃও অনেকে তাহা শুনিতে ও দেখিতে আসিত এবং আসিয়া ইহার সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইত, সহজেই উহাকে অতি লোভনীয় মূল্যবান বস্তু বলিয়া অনুভব করিত। এখন আর সে নূতনত্ব নাই, নূতনত্বের আকর্ষণও নাই। প্রায় সকলেরই এ সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা জন্মিয়াছে, তাই উহার মধ্যে কোনও বিশেষত্ব দেখিতে না পাইয়া উহাকে ভাল করিয়া জানিবার জন্য কোনও আগ্রহ অনুভব করে না, উহার প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্যও কোনও চেষ্টা করে না। বর্ত্তমানে লোকের মধ্যে যে একটা অস্বাভাবিক একদেশদর্শী তীব্র সমালোচনার প্রবৃত্তি প্রবল হইয়াছে, তাহাতে ভাল দিকটা উপেক্ষা করিয়া সামান্য দোষ ত্রুটিকে বড় করিয়া দেখিবার একটা ভাব মানুষের মনে বিশেষ করিয়া জাগিয়াছে; শ্রদ্ধার ভাবটা বহু পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এই শ্রদ্ধাহীনতাবশতঃ লোকের মধ্য হইতে ভাল ভাব গ্রহণ করিবার, যেখানে যাহা কিছু মহত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বাছিয়া লইবার শক্তি চলিয়া গিয়াছে। তদুপরি আমাদের আদর্শ ও জীবনের মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে, আমাদের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় জীবন্ত ভাব দেখা যাইতেছে না। অপরকে আকর্ষণ করিবার, প্রভাবান্বিত করিবার, শক্তি আর আমাদের পূর্ব্বের মতন যথেষ্ট পরিমাণে নাই। দুঃখের সহিত এসকল কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই অবস্থায় প্রশ্নের মীমাংসাটা যে আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

প্রশ্ন যতই জটিল হউক না কেন, উহার মীমাংসার উপর যখন আমাদের সমস্ত কল্যাণ, জীবন মরণ, নির্ভর করিতেছে, তখন উহার সমাধানের জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করিতেই হইবে,—বাধা বিঘ্ন দেখিয়া ভয়ে পশ্চাৎপদ, নিরাশায় অবসন্ন হইলে চলিবে না। বলা হইয়াছে, আমাদের বর্ত্তমান প্রণালী যথোচিতরূপে ফলপ্রদ হইতেছে না। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া উহা যে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য, উহার কোনও উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা নাই, এরূপ কথা কেহই বলে না। উহা যথেষ্ট নয়, তদতিরিক্ত অন্য উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে, কোন কোনও বিষয়ে উহার কিছু সংশোধনও করিতে হইবে, এরূপই বলা হইয়া থাকে। আমাদের বর্ত্তমান প্রণালী প্রধানতঃ নিয়মিত সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনা ও সাময়িক বক্তৃতাদি। নিতান্ত অশক্ত না হইয়া পড়িলে কোনও ব্রাহ্মই পূর্ব্বে ইহাতে অনুপস্থিত থাকিতেন না। তাঁহারা ইহা হইতে যথেষ্ট উপকারও লাভ করিতেন। বর্ত্তমানে সমাজের অধিকাংশ লোকই উপস্থিত থাকেন না। এই অনুপস্থিতির কারণ যাহাই হউক না কেন, এই হেতু যে উহা যথেষ্টরূপে ফলপ্রদ হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

হয়, যাহাতে তাঁহারা উপস্থিত হন সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, না হয় তাঁহাদের জন্য অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। অধিকাংশ উপাসনাই অতি দীর্ঘ, প্রাণহীন ও শুধু বাক্যময় হইয়া যায়, এই একটা অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও যে একবারে ভিত্তিহীন, এরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না। সকলের সব উপাসনা সব সময় সমান অনুপ্রাণনময় ও চিত্তাকর্ষক হয়, কাহারও উপাসনাই কখনও প্রাণহীন শুধু বাক্যময় হয় না, এরূপ কথা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু এই ওজর সামাজিক উপাসনায় উপস্থিত না হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ হইতে পারে না। উপাসনা সম্বন্ধে হ্রস্ব দীর্ঘ কথাটার বিশেষ কোনও মূল্য নাই—হৃদয়স্পর্শী হইলে অতি দীর্ঘও হ্রস্ব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আর তাহা না হইলে অতি হ্রস্বও সুদীর্ঘ বলিয়া অনুভূত হয়। আবার, যাহা অনেকের নিকট হৃদয়স্পর্শী, প্রাণপ্রদ, তাহাও অনুরাগবিহীন উদাসীনের নিকট অনুপ্রাণনহীন, নিতান্ত রসশূন্য ও বিরক্তিকর বোধ হইতে পারে। তথাপি, নিশ্চয়ই এ বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতিসাধনের স্থান আছে। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা শুধু আচার্য্যের উপরই নির্ভর করে না, উপাসকমণ্ডলীর উপরেও বহু পরিমাণে নির্ভর করে—কেবল আচার্য্যই যে মণ্ডলীকে অনুপ্রাণন দেন এরূপ নহে, মণ্ডলীও আচার্য্যকে অনুপ্রাণিত করেন। কাজেই বহুসংখ্যক উপাসক যদি হৃদয়ের ব্যাকুলতা বিশ্বাস ভক্তি নিষ্ঠা লইয়া উপস্থিত হন, তবে উপাসনা নিশ্চয়ই অধিকতর জীবন্ত ও প্রাণপ্রদ হয়, প্রাণহীন শুধু বাক্যময় থাকিতে পারে না। কিন্তু এরূপ হইলেই যে সকলে উপস্থিত হইবেন তাহার কোনও সম্ভাবনাই নাই। বহু লোকের এ বিষয়ে কোনও অনুরাগই নাই, কোনও প্রয়োজনীয়তাবোধই নাই। তাহাদের জন্য নিশ্চয়ই অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে তাহাদের মধ্যে এই প্রয়োজনীয়তাবোধটা জন্মাইতে হইবে, তাহাদের প্রাণে ইহার জন্য আগ্রহ ও অনুরাগ জাগাইতে হইবে। শিক্ষালাভের জন্য যাহার আগ্রহ নাই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায় কি প্রকারে? অনুরাগ না জন্মাইয়া শুধু উপদেশপ্রদানে সে কার্য্য সাধিত হয় না। শিক্ষাটা প্রকৃত পক্ষে বাহির হইতে দেওয়া যায় না। বাহির হইতে কতকগুলি খবর বা তত্ত্বমাত্র জানাইয়া দেওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে না। ধর্ম্মশিক্ষা ত এভাবে কিছুতেই হইতে পারে না।

হৃদয়ের পরিবর্ত্তন, সাংসারিক সুখ সুবিধা আরাম অপেক্ষা প্রেম ভক্তি পুণ্যের উপর অধিকতর মূল্যস্থাপন, প্রয়োজন হইলে সমস্ত সংসার বিসর্জ্জন দিয়াও ব্রহ্মানুগত জীবনলাভের জন্য আগ্রহ ও চেষ্টা, ইহাই ধর্ম্মের প্রধান কথা। ইহা বাহির হইতে দেওয়া যায় না, অন্তরেই প্রত্যেককে অর্জ্জন করিতে হয়। ইহার জন্য অন্তরদৃষ্টি চাই, গভীর চিন্তা ও আত্মপরীক্ষা চাই—হৃদয়ের প্রীতিকে ইন্দ্রিয়াতীত মহত্তর বিষয়ে নিবদ্ধ রাখা চাই, প্রবৃত্তিগুলিকে আত্মবশে আনা চাই। এ সমস্ত প্রধানভাবে প্রত্যেকের নিজের উপর নির্ভর করিলেও যে বাহিরের কোনও সাহায্যেরই প্রয়োজন হয় না, এমন কথা বলা যায় না। সে শিক্ষা ও সাহায্য যেরূপই হউক না কেন, উহা চিরদিনই স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করিয়াই চলিবে। পরে যে সকল বিশেষ শিক্ষা ও সাহায্য প্রয়োজন হয়, সে সম্বন্ধে আজ কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। প্রাণে ধর্ম্মজীবনলাভের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ জাগিলে লোকে আপনা হইতেই তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবে। এই আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহটা জন্মানই সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য, সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। এজন্য ব্যক্তিগতভাবে সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনা একান্ত আবশ্যক, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ উপায়। ইহাতে চিন্তা ও বিচারের উদয় হয়, অন্তরনিহিত ভাব ও বৃত্তিগুলি আপনা হইতে বিকশিত হয়, সকল সংশয় সহজে বিদূরিত হয়। শুধু উপদেশপ্রদানদ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয় না। তাহার পর, সমাজ মধ্যে ধর্ম্মজীবনগঠনের অনুকূল হাওয়ার সৃষ্টি করা একান্ত আবশ্যক। অলক্ষিত ভাবে কাজ করিলেও, জীবনের উপর উহার প্রভাব অত্যন্ত বেশী। অতি শিশুকাল হইতেই উহা পরোক্ষভাবে জীবনকে গড়িয়া উঠায়। বর্ত্তমান হাওয়া ধর্ম্মজীবনের অনুকূল নহে। সমাজের সাধারণ ভাবে ব্যবস্থায়, চিন্তা আলাপ আলোচনায়, ধর্ম্মকে সংসারের ধন পদ মানের অনেক উচ্চে স্থান দেওয়া চাই, উহাকে সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্যস্থানে রাখা চাই। তাহা না হইলে কিছুতেই ধর্ম্মজীবনলাভের জন্য আগ্রহ অনুরাগ জন্মিবে না, উহা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বলিয়া গৃহীত হইবে না, বর্ত্তমান উদাসীনতা ও সাংসারিকতা বিদূরিত হইবে না। তীব্র সমালোচনার বিষাক্ত হাওয়ার পরিবর্ত্তে ধীর শান্ত বিচারের এবং শ্রদ্ধা বিনয় ও গুণগ্রাহিতার সুনির্ম্মল জীবনপ্রদ বাতাস প্রবাহিত করিতে হইবে। উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্ত্তময় হাওয়ার পরিবর্ত্তে সংযত নিয়মানুবর্ত্তিতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ শান্ত স্বাধীনতার পবিত্র হাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। ধর্ম্মই যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু, মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, এই ভাবের মহৎজীবনপোষণকারী স্বাস্থ্যকর হাওয়া জন্মাইতে হইবে। ইচ্ছা বা বলা মাত্রই যে ইহা সাধিত হইবে অথবা হঠাৎ উহা সর্ব্বত্র বিস্তারলাভ করিবে, এইরূপ কোনও সম্ভাবনা নাই। ইহার জন্য স্বাভাবিক পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমতঃ কেন্দ্রস্থানে অল্পসংখ্যকের মধ্যেই সে পবিত্র জীবনপ্রদ হাওয়া জন্মাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রকার পাপ মলিনতা ও ক্ষুদ্র সাংসারিকতা ধ্বংসকারী প্রবল ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। ক্রমে সে হাওয়া, সে অগ্নি শক্তিসঞ্চয় করিয়া আপনা হইতেই চারিদিকে বিস্তারলাভ করিবে, আপনাকে প্রসারিত করিবে। প্রকৃত শক্তিকে, সত্য জীবনকে, কেহ চাপিয়া মারিতে পারে না, কোনও প্রতিবন্ধকতাই উহার গতিকে রোধ করিতে পারে না। অলক্ষিত ভাবে হইলেও অব্যর্থ রূপেই উহা সর্ব্বত্র কার্য্য করে।

সর্ব্বাগ্রে উপাসনার প্রয়োজনীয়তা জন্মিলেই, তাহার জন্য ব্যাকুলতা ও আগ্রহ প্রাণে জাগিলেই, উপাসনা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইবে, সহজও হইবে। তাহার পূর্ব্বে নয়। উপাসনা-সাধনেরও একটা স্বাভাবিক প্রণালী আছে, উহা শিক্ষা দেওয়ারও একটা স্বাভাবিক পথ আছে। সে সম্বন্ধে আজ আমরা কোনও আলোচনাই করিলাম না। তাহার বেশী প্রয়োজনও নাই।

যাহারা সে বিষয়ে যথার্থই আগ্রহান্বিত তাঁহারা সহজেই তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবে, শ্রদ্ধার সহিত উপযুক্ত শিক্ষকের সমীপবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না। তাহাদের ভাবনা সমাজ না ভাবিলেও বেশী ক্ষতি হইবে না। কেন না, তাহারা নিজেই আপনার ভাবনা বিশেষ করিয়া ভাবিবে। আর, সে কাজটা বেশী কঠিনও নয়।

আমাদের সামান্য দুই একটি চিন্তা সকলের নিকট উপস্থিত করিলাম। এবিষয়ে অনেকে আরও গভীররূপে চিন্তা করিয়া প্রকৃষ্ট মীমাংসায় উপনীত হইবেন, অধিকতর ফলপ্রদ উপায় নির্দেশ করিবেন। এ সম্বন্ধে কেহ কিছু লিখিয়া পাঠাইলে আমরা উহা সাদরে প্রকাশ করিব। করুণাময় পিতা আমাদিগকে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে সমর্থ করুন। আমাদের সমাজকে তাঁহার সত্য উপাসকমণ্ডলী করিয়া তুলুন।

## কর্ম্ম*

গীতাকার বলিয়াছেন:—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। ২।৪৭। কেবল কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্ম কর। কর্ম্মফলের আশা কদাচ করিও না।

ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আবর্ত্তনের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখিয়া এবং তন্মধ্যে বিশ্ববিধাতার হস্তস্পর্শের অনুভূতি লাভ করিয়া তাঁহার "কর্ত্তব্য" বিষয়ক গীতিকবিতায় ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়াছেন—"তুমিই সমস্ত তারকারাজিকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছ। হে চিরনবীন, তোমারই নবীনতার মধ্যে এই চিরপুরাতন আকাশ সজীবতা লাভ করিতেছে।" কবি যেখানে ঈশ্বরের মহিমা দর্শন করেন, "ব্রহ্মবাণীর কঠোরহৃদয়া কন্যারূপী" কর্ত্তব্যের অঙ্গুলীনির্দ্দেশ দর্শন করেন, বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ নিউটন তাহার মধ্যে অধিকতর গদ্যময়ী দৃষ্টিতে, এক জাগতিক নিয়মের কার্য্যমাত্র প্রত্যক্ষ করেন। তিনি এই বিধানের মধ্যে কেবল কেন্দ্রাভিসারিণী শক্তি ও কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকেন। যদি এই শক্তির একটীরও ক্রিয়া জগতে বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে এই মনোরম জগতের কোন অস্তিত্বই থাকিত না। কেন্দ্রাভিসারিণী শক্তি পৃথিবীকে নিয়ত সূর্য্যের দিকে আকর্ষণ না করিলে, উহা আলো ও জীবনের উৎস হইতে চিরকালের জন্য দূরে চলিয়া যাইত এবং আমরা এই যে সুন্দর পৃথিবীতে বাস করিতেছি এবং ইহার মধ্যে যে অসংখ্য প্রকারের কার্য্য দেখিতেছি তাহা কখনও সম্ভবপর হইত না। অপর দিকে যদি শুধু এই কেন্দ্রাভিসারিণী শক্তিই কার্য্য করিত এবং ইহার বিরোধিতা ও সমতা সাধনের জন্য কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি না থাকিত, তবে পৃথিবী সূর্য্যের সর্ব্বগ্রাসী আলিঙ্গনের মধ্যে প্রবল বেগে আসিয়া উহার নির্ব্বাণহীন অগ্নিতে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্বের পক্ষে এ দ্বিবিধ শক্তির একান্ত আবশ্যক।

প্রাকৃতিক জগতে যেরূপ, মানবসমাজের মধ্যেও আমরা সেইরূপ দুইটী স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ক্রিয়ার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। অতি প্রাচীনতম কাল হইতে বর্ত্তমানের সভ্যপ্রিয়তার যুগ পর্য্যন্ত মানবসমাজের সকল অবস্থার মধ্যেই ইহাদের কার্য্য চলিতেছে। সমাজগঠনের পক্ষে ইহারা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। মানবসমাজে ইহারা স্বার্থপরনীতি ও পরার্থপরনীতি নামেই অভিহিত। আত্মরক্ষা বা বাঁচিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কাম, প্রতিহিংসা প্রভৃতিকে কেন্দ্রাপসারিণী এবং প্রেম, সহানুভূতি আত্মত্যাগ প্রভৃতি সামাজিক বৃত্তিসমূহকে কেন্দ্রাভিসারিণী শক্তির সহিত তুলনা করা যায়। একের অভাবে মানুষের অস্তিত্বই যে লোপ পাইত এবং অপরের অভাবে যে সমাজ গঠন সম্ভবপরই হইত না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই দুই শক্তির প্রভাবে মানবসমাজ গঠিত রক্ষিত ও উন্নত হইতেছে। মাতার মধ্যেই আপনাকে ভুলিয়া যাইবার বৃত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। নিম্নতম হইতে উন্নততম জীবরাজ্যে এই সন্তান প্রতিপালনের বৃত্তিটি "দন্ত ও নখড়ে রক্তাক্ত প্রকৃতি-রাজ্য" মধ্যে একটি রৌপ্যনির্ম্মিত সূত্রের ন্যায় আদি অন্ত পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছে দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে, পশুতুল্য অবস্থা হইতে উন্নত সভ্যাবস্থায় মানব জাতিকে উন্নয়ন, এই দুই শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত দ্বারাই আরব্ধ হইয়াছে।

Lecky প্রণীত ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রের ইতিহাসগ্রন্থে মানবীয় গুণগুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। একটী পুরুষোচিত গুণ, যথা—সাহস, স্বপ্রতিষ্ঠা, উদারতা, হিতৈষিতা প্রভৃতি; অপরটী নারীজনসুলভ গুণ, যথা—পবিত্রতা, বিনয়, প্রেম, কোমলতা প্রভৃতি। এই দুইটী গুণকে ভারতীয় ভক্তিশাস্ত্রে যথাক্রমে শাক্ত ও বৈষ্ণব গুণ রূপে অভিহিত করা হইয়াছে। এবং ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে, মানব-অন্তরনিহিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী ভাবের বিভিন্ন অবস্থাদ্বারা পাপ ও পুণ্য উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের প্রভাবের তারতম্যেই একজন পবিত্রচেতা সাধু পুরুষে পরিণত হইতেছে, অপর জন দুষ্ক্রিয়ান্বিত ব্যক্তিরূপে পরিচিত হইতেছে।

মানব সভ্যতার বিভিন্ন অবস্থাতে তাহাদের চরিত্রের মধ্যেও নানা পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। এমন কি একই দেশে নানা অবস্থার পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহাদের জাতীয় আদর্শও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপ আদর্শপরিবর্ত্তনের সঙ্গে জাতির রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার যে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। গ্রীসদেশীয় ধর্ম্মমত গ্রীক জাতিকে দেবতাদের সহিত মানবের সম্বন্ধ যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ তাহা কখনও শিক্ষা দেয় নাই। এবং সমগ্র গ্রীসদেশীয় সাহিত্যে "তৃণাদপি সুনীচেন" প্রভৃতি চৈতন্য দেবের উক্তির ন্যায় কোন উক্তিই লক্ষিত হইবে না। পুরাকালে মানবদিগের মধ্যে পুরুষোচিত গুণ অর্জ্জন করিবার একটী প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত ছিল। কালের পরিবর্ত্তনে, প্রভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, পুরুষোচিত গুণের পরিবর্ত্তে

* ২ মাঘ অপরাহ্নকালে উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ কর্ত্তৃক গীতে প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মানুবাদ।

নারীজনসুলভ ধর্ম্মই মানবের আকাঙ্ক্ষার বস্তুরূপে পরিণত হইতে লাগিল।

এখন দেখা যাক্, গীতার যে উক্তি উদ্ধার করিয়া আমার বক্তব্য নিবেদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহা বাস্তব জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় কি না। ইহা যদি স্বীকার্য্য হয় যে, ব্যক্তিগত জীবন এবং সামাজিক জীবনের অস্তিত্ব পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধা শক্তির উপরই নির্ভর করিতেছে, তাহা হইলে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, মানবের স্বাভাবিক উন্নতিও তাহার স্বপ্রতিষ্ঠাবৃত্তি ও আত্মত্যাগের উপর নির্ভর করে। মানবের সর্ব্ববিধ চেষ্টার মধ্যে কৃতকার্য্য হইবার বা জয়লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাই মানবের স্বপ্রতিষ্ঠাবৃত্তি। এই আকাঙ্ক্ষা বা বৃত্তি পরিহার করিলে মানবের ব্যক্তিগত জীবনে বা সামাজিক জীবনে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম-ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিহারপূর্ব্বক কোন কার্য্য করা মানবের পক্ষে অসম্ভব। গীতাকার যাঁহার মুখদিয়া এই বাক্য উচ্চারণ করাইয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ কি যখন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জ্জুনকে ভীষ্মের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতে উৎসাহিত করিতেছিলেন তখন ইহা দ্বারা পাণ্ডবগণ কি ফল লাভ করিবেন তাহা মনোমধ্যে কল্পনা করেন নাই? অতএব দেখা যাইতেছে যে, মানুষ যতই না কেন পুরুষোত্তম গুণে ভূষিত হউন, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষার উর্দ্ধে উত্থিত হইতে তিনি একেবারেই অক্ষম।

এই উক্তির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আচার্য্য বঙ্কিমের ব্যাখ্যার প্রতি আমাদিগকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। তিনি বলিতেছেন—কার্য্য করিতে হইবে, ইহা তোমার কর্ত্তব্য; কৃত কার্য্যের ফললাভের উপর তোমার কোন হাত নাই; অতএব ফললাভের জন্য অত্যধিক ব্যস্ত হইও না এবং ফললাভাকাঙ্ক্ষায় অত্যধিক অন্ধ হইয়া তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইও না। এ বিষয়ে মার্কিণ ঋষি এমার্সন একটী অতি সুন্দর উক্তি করিয়াছেন—"কর্ম্ম অতি মনোরম, যখন আবশ্যক হইবে কর্ম্ম করিতেই হইবে। কিন্তু কর্ম্মশূন্যতাও সুন্দর, যখন শান্তভাবে বসিয়া থাকা আবশ্যক তখন কেন বৃথা আমরা অত্যধিক ব্যস্ততা অবলম্বন করিব? কর্ম্মশীলতা ও শান্তভাব উভয়ই মানব জীবনে সমান সত্য।" অন্যত্র—"তোমার শক্তি ও অনুরাগ, মানবপ্রীতি ও খ্যাতিলাভের আকাঙ্ক্ষা তোমাকে যে কার্য্য করিতে আহ্বান করিতেছে তাহা করিবার জন্য তুমি ব্যস্ত হইয়া প্রস্তুত হইতেছ। কিন্তু তোমার মনে কি এই কথাটি উদয় হয় নাই যে, উহা হইতে প্রতি-নিবৃত্ত হইবার জন্য যদি তুমি তুল্যরূপে প্রস্তুত না হইয়া থাক তবে তোমার সে কার্য্যে যাইবার কোনও অধিকার নাই।" সমাজের অতি উচ্চ স্তরের ব্যক্তিগণও কর্ম্মের এই উচ্চ সঙ্কেত স্মরণ করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে অসমর্থ হন।

ভগবদ্গীতা অতি উচ্চকণ্ঠে নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে উক্ত হইয়াছে, সাধকের ভগবৎপ্রীতি এরূপ গভীর হওয়া উচিত যে তাহাদ্বারা তিনি এরূপ তন্ময় হইবেন যাহাতে মুক্তিও তাঁহার নিকট অতি সামান্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে অর্থাৎ তিনি ভগবদ্ভক্তিতে এরূপ মগ্ন থাকিবেন যে মুক্তিলাভে বিরত হইবেন।

যদি অত্যধিক ক্রিয়াসক্তি আমাদের বর্জ্জনীয় হয় এবং যাহাতে নিষ্ক্রিয় হইয়া না পড়ি তাহার জন্য সতর্ক থাকা আবশ্যক হয়; যে পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে কর্ম্মে উৎসাহিত করে তাহাও বর্জ্জনীয় হয়, অথচ আমাদের পরস্পরের সেবায় শিথিলতা-প্রদর্শনও বাঞ্ছনীয় না হয়, তাহা হইলে আমরা কোন্ আদর্শ গ্রহণ করিয়া জীবনের কার্য্যে অগ্রসর হইব? এ বিষয়ে গীতাকার তাঁহার গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের সপ্তবিংশ শ্লোকে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহাই আমাদের গ্রহণীয়। শ্লোকটী এই:—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎকুরুষ মদর্পণম্॥

হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কিছু আহার কর, যাহা কিছুর আহুতি দান কর এবং যাহা কিছু কাহাকেও দান কর তাহা আমাকেই দিতেছ, এইরূপ মনে স্থির করিয়া সমস্ত অর্পণ করিবে। সাধু পলও তাঁহার উপদেশে এই কথাই বলিয়াছেন—"যাহা কিছু করিবে সমস্তই ঈশ্বরের প্রীতির জন্য ও তাঁহারই মহিমার জন্য করিবে।" প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমস্ত উপদেষ্টাই এক বাক্যে মিলিত কণ্ঠে এই উপদেশই দিয়াছেন—"কর্ম্ম কর, তাহার ফললাভের জন্য নিজে ব্যস্ত হইও না বা তাহার জন্য তোমার মনের শান্তি নষ্ট করিও না। বীজ বপন কর, তাহার পর সমস্তই ঈশ্বরের উপর ছাড়িয়া দাও। তোমার নিজের ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতার দিকেই কেবল লক্ষ্য রাখিয়া কোন কার্য্য করিও না। জীবনের অতি সামান্য কার্য্যকেও পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিও। সর্ব্বোপরি যাহা কিছু করিবে সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়াই করিবে এবং নিরন্তর প্রার্থনা করিবে 'হে প্রভু, আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা নয়, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক।' ইহা স্মরণ করিয়া নিজেকে ঈশ্বরের হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কুম্ভকারের হস্তের কর্দ্দমের ন্যায় নিজেকে মনে করিতে হইবে। তিনি আমাকে যে ভাবে গড়িতে চান যেন সেই ভাবেই গড়িয়া উঠিতে পারি, এই রূপে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে।

## অমর কথা (১৮)

**Thoughts at the graves of those we love.**

### প্রিয়জনের সমাধিতে চিন্তারাশি

নিভে গেল প্রাণ-দীপ
ক্ষণিক আলো জ্বেলে,
জ্বলে ওঠে দিব্য বিভা,
হাসিল নয়ন মেলে।
কভু হাসি কভু কাঁদি,
কভু ছুটি কভু জাগি,
দুঃখের করুণ গানে
কি জানি কি ধন মাগি।
ব্যথার নিবিড় ঘোরে
কত যে উঠিল জমি,

মরণ-দেবতা এল,
ধন্য দেব নমি নমি।
থেমে গেল সব খেলা,
ভাল মন্দ হেলা ফেলা,
জীবন-সাগরে আজি
ভাসিল জীবন-ভেলা।
দেববালা এল শেষে—
মধুর মোহন বুলি—
গায় কি বা চুপে চুপে—
সকল বেদন ভুলি'।
দিলে ঢেলে প্রেম-সুধা,—
কি আনন্দ, কি আরাম—
নিভে গেল সব আলো,
অনন্তে সে বিরাম।
থেমে গেল ধুক্ ধুক্,
জীবন-বাহিনী খেলা,
এই কি মরণ-সখা,
আনন্দ-শরণ-মেলা!
কোথা গেল ধরণীর
চাঁদের মোহন ছটা,
ওকি ও মোহন আলো—
ধন্যরে বিরাট ঘটা।
দেববালা গায় মরি,
আনন্দ অমিয় খেলে,
উড়ে যায় প্রাণ-পাখী
আনন্দে পাখাটী মেলে।
সমাধি! তোমার নাম,
ধন্য তব জয় গান,
বেদন-আগুন-বাণ
বাড়ালো গো তব মান।

অমৃতলোকে আমার বাঞ্ছিতেরা বাস করেন, একথা ভাব্‌তেও যে আমার আরাম। আমার আকুল হৃদয় কেমন ক'রে তোমাদের বিস্মৃতি কল্পনা কোরবে? দেখ আমার কাতর প্রতীক্ষা, দেখ তোমাদের জন্যই এ ধূলিকণাও স্বর্গে যেতে চায়। ওগো আমার ভালবাসার ধনেরা, তোমরাই ত দেবলোকে অক্ষয় যোগে যুক্ত ক'রেছ। তোমাদের অম্লান স্নেহ-প্রেমাঞ্জলি আমায় মরণ-সাজে প্রস্তুত করে, সকল ভীতির মোহ দূর করে। তোমাদের মিলন-চিন্তা সকল তুচ্ছ তরল আমোদের ঊর্দ্ধে সুখময় মধুময় ধর্ম্মসুধাপানে পিপাসিত করে। প্রিয়জনের সমাধিতে নিত্য অশ্রুভরা অর্ঘ্য নিবেদনের প্রাণতত্ত্ব কে বুঝ্‌বে? এ যে ব্যথার পূজা, এই ত প্রাণময় আনন্দ অধিকার বিরহীর জীবনে! কত সময় কত জনে ব্যথার অভিযোগে এ আনন্দদানে বঞ্চিত হোয়ে কেঁদে উঠেন! কে তুমি কঠোর বিধাতা, তোমার জগতে এ নিষ্ঠুর ব্যবস্থা কেন?

বিশ্বাস করেন তত্ত্বপ্রাণ তিনি মঙ্গলময়, তিনি সকলের কারণ, তিনি কল্যাণ-উৎস। সকলই তাঁরই দান। যাকে মৃত্যু বলি, এ ত দেবলোকে নিয়ে যাবার আয়োজন। যিনি মরণ-সখার কোমল স্নিগ্ধ মাধুরী দেখ্‌তে পান না তাঁর কাছে মৃত্যু কি ভয়াবহ! মৃত্যুর ভিতরই যে অমৃতের দিব্য আলো, পুণ্য ছবি ফুটে ওঠে, তাইত মরণসখার স্বরূপখানির বিচিত্র গাম্ভীর্য্য-পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য, তাইত মৃত্যুবাসরে পরম কল্যাণময় আশীষ-বর্ষণ। এ যে সুনির্ম্মল আনন্দধাম অমৃতসোপান। তাইত মরণ-গাথা এত বরণীয়,—কোথায় দুঃখ, কোথায় নিরাশা? এ কি আশার গান গোপনে গোপনে মর্ম্মস্থল স্পর্শ ক'রে গেয়ে যায়!

চিরবাঞ্ছিতের সমাধিবুকে প্রাণে প্রাণে যখন হৃদয়ের মর্ম্মকথা নিবেদন ক'রতে চাই, কেন দুনয়ন অশ্রুজলে ভ'রে ওঠে? এ কি আমার অবিশ্বাসজনিত ভীতিব্যঞ্জক অশ্রুধারা? তা ত নয়। এ যে বুকভরা প্রেমের আকুল অব্যক্ত পরিচয়। এ যে আমার আকুল প্রতীক্ষার বুকফাটা নিবেদন। বোঝাব কেমন ক'রে এই ব্যথার অশ্রুজলেই যে আমার বিরহানন্দভোগ। থাকুক আমার এ বেদনার সম্ভোগ। এ ব্যথার গভীর ক্ষোভ থাকুক, এই সাংসারিক আমোদপ্রমোদমুখরিত যাত্রাপথে। এ ব্যথার পরিচয় কে দেবে? কে শুন্‌বে তপ্তবুকের নিভৃতপুরে সে বেদনার করুণ ঝঙ্কার? সে কি কান্ত সুনির্ম্মল সমাবেশ।

হারাণো ধনদের বুকে জনক জননীর শোকাবনত স্বরূপ-খানির কি মঙ্গল মাধুরী! প্রাণপুত্তলির স্মৃতিমঙ্গলবাসরে কি সুর বাজে? স্মৃতিগন্ধ বুকের গোপন কুঞ্জে কি সুবাস ছড়িয়ে দেয়? সন্তান চলে নম্র হৃদয়ে পিতামাতার স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে। অভাগিনী নারী চলেছে প্রাণপতির প্রেমোপহার বুকে ধ'রে। কত ভাবে আত্ম মিলনের যোগানন্দ প্রেমপুলক প্রকাশ। কত ছবিতে, লেখনী পরিচয়ে, কত সুরে সুরে তাকে জড়িয়ে রাখ্‌তে চায়! পতিহারা সতী জীবনপ্রভাতে ওকি বিরহব্যথা বুকে নিয়ে দিনরজনী নীরবতার মাঝখানে ব্যথার ঘনশ্বাস ফেলে চুপে চুপে প্রিয় নাম জপ ক'রেই চলেছে! সমাধিবুকে দর দর অশ্রুধারা! এ কি প্রেমের গভীর মরণহীন পরিচয়ই দান করে না? বেদনবিরহের ভিতরই স্বর্গের অব্যক্ত আনন্দ জ্যোতি। হৃদয়ের অনাবিল আকুল আবেগধারা উদ্বেলিত হোয়ে ওঠে, তবু চলে নীরবে ব্যথার অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে। তাইত এই বেদনার অসহ্য তাপ বুকে বহন করা সম্ভব হ'য়েছে। ওগো আমার প্রিয়ধনেরা, তোমাদের কথা ভেবেই তৃপ্তি। প্রেম-উৎস সতত উৎসারিত—কই দুঃখ? জানি আমার প্রেম সঙ্কীর্ণ, তবুও তোমাদের উদার প্রেমেই উদ্বোধিত হ'য়ে চলেছি। ধূলিমুষ্টি হোয়েও অম্লান প্রেম-কুসুমে তোমাদের পূজার অর্ঘ্য রচনা করিতে চাই। জানি, তোমরা উন্নত লোকে ভাগবতী তনু লাভ করেছ। আর আমি জীর্ণ দেহ মন নিয়েই প্রেমের অর্ঘ্য হৃদয়-নিভৃতে সজল নয়নে রচনা করি। ভালবাসার প্রতিদানেই ত প্রেমের নিবিড়তা। কে তিনি প্রেমময় যিনি গ্রহ উপগ্রহকে বিচিত্র আকর্ষণে বেঁধেছেন—আর আমার হৃদয়ের এই অন্তঃসলিলা স্নেহপ্রেম-মন্দাকিনীধারাই কি দেহান্তে লীন হোয়ে যাবে? না গো না, এ বুকভরা ভালবাসা কখনও মরে না। সমাধির নীরব শুভ্র প্রহেলিকার ভিতরই যে প্রেমের মাখামাখি চলেছে কেমন ক'রে তা ভুল্‌ব বল? আমার রিক্ত কাতর

হৃদয় কেবলই যে তোমাদের চাইছে। দেখ আমার হৃদয়-নিভৃতে গোপন প্রেমের নীরব উচ্ছ্বাস। তোমরা দেবত্ব লাভ করেছ বোলে কি এ প্রেমের সাড়া দেবে না?

ঝর ঝর অশ্রুধারা ঝরুক তবে দিন রজনী। রক্তাক্ত হৃদয় আমার প্রেমবিধ্বস্ত বুকে বাজুক শত বেদনার আঘাত। আমার প্রিয়বিরহ আর কি ধন দেবে আমায়? আমারই বা আর কি আছে দেবার? তাই দেবতার সুনির্ম্মল অশ্রুজল ঢেলে দিই প্রিয়স্মৃতিপূজায়। ঢাল ঢাল নয়নজল ঢাল। ব্যথার ক্ষত গভীরতর হউক। রক্ত ফেটে পড়ুক্। এই নিবিড় ব্যথা আমার সকল ঐহিকতা দৈহিকতার বন্ধন মোচন করুক্। তোমাদের কথা ভেবে ভেবেই দেহাতীত হোয়ে যাই। আত্মপুরে জ্যোতির্ম্ময় আলো জ্ব'লে উঠুক্। যদি আমার ভাগ্যবিধাতা থাকেন তবে কেমন ক'রে মৃত্যু হবে? কেমন ক'রে অভিযোগ কোরব? জানি চিরমিলনসুন্দর নিত্য প্রেমের উদ্বোধনে চিরমিলনবোধনসুরে জাগিয়ে তুল্‌বেন।

এ কি আমার দীন পিপাসা—বিরহব্যথায় আকুল হ'য়ে সে দিব্য আত্মাকে আজ আমার রূপের স্বরূপের মাঝখানে তেমনি ক'রে দেখ্‌তে চাই! তাইত ভ্রম, বুঝি না তাইত ভাবি আমার প্রিয় ঐ হিমশীতল বুকে, বুঝি বা ভস্মমুঠিতে, ঐ বুঝি সমাধির বুকে—এই যে সুখ দুঃখের অনুভূতি কোন্ জড়ের ঘরে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা!

আমার দৈহিক লালসা মিট্‌ল না, তাই কি প্রিয়তমের দেহখানি চ'লে গেল বোলে এ বুকফাটা ঘোর অবসাদ? শিশু কাঁদে তার খেলার সাথী চলে গেল বোলে, আর তার খেলনাগুলি বুকে নিয়ে ঘোরে। রূপের জন্যই কি আমার কাঁদার পালা? চেতনবিহীন মৃত্যুমলিন রূপখানির ত আর সুখ দুঃখের স্পন্দন নেই। ধূলির দেহ ধূলিতে গেল—এখন অমর আত্মার কি মঙ্গল সাজ কে জানে?

বুক ফেটে যায় ভাব্‌তে এই কি আমার প্রিয়ধনের চরম পরিণতি! সুকোমল স্নিগ্ধ শুভ্র সুনির্ম্মল উজ্জ্বল দেহকান্তির কি এই অস্থি পরিণতি! হায়! হায়! এমনি ক'রে অচেতনে চেতনকে দেখ্‌তে চাই! জানি যদি অবিনশ্বর আত্মপ্রকাশ, তবে কেন এ অজ্ঞান মোহ ক্রন্দন?

আহা! মহাযাত্রার ও কি বেদনাভরা করুণাশ্রু! যাত্রীর ও কি বন্ধনমুক্তির অসহ্য সংগ্রাম! বুক যে ফেটে যায়! তবে অশান্ত মন একবার আত্মস্থিত হও, বুঝে নাও বেদনবিজয়ী মুক্ত আত্মার সচ্চিদানন্দ বিহার। মৃত্যু সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিল। সকল ব্যাধির পীড়ন শেষ হোল। রোগমুক্ত প্রিয় আত্মাকে যখন দেহের ঘরে ফিরে পাই আনন্দে গদ গদ হ'য়ে উঠি; কিন্তু যদি দেহাতীত হয়ে যান, দুর্ব্বল আঁখি যখন সে আত্মজ্যোতি-দর্শনে বঞ্চিত তখনই বুকফাটা বিলাপ। ন্যায়দাতা বিধাতা মানবের বুকে অফুরন্ত স্নেহপ্রেম-উৎস উৎসারিত ক'রেছেন কেন তবে? অসংখ্য প্রাণী ত আছে সংসারে। মানব সন্তানের জন্য তবে এ নির্ম্মম বিধান কেন? ওগো ঠাকুর, এ মৃত্যুবাসরে ব'সে চোখের জলে কি বলি বল? হে পরমাত্মন্! বোঝাও তোমাতে জীবাত্মার আত্ম-জাগরণ, ঐ প্রেমেই আত্মসমাধি।

মরণভয়ে ভীত যাত্রীর সে অনুভূতি কই? শিশুযাত্রী, যে কিছু জানে না, তার কি আনন্দে আনন্দ প্রয়াণ! হয়ত কত ঘোর বিকারের বিভীষিকা ক্রন্দন, বেদনা ব্যঞ্জক মূর্চ্ছা, জনক জননী আত্মীয় স্বজন কেঁদে আকুল, কিন্তু যাত্রীর কোথায় ভয়? বাহিরের যাতনা দেখে বিলাপ করি, অথচ যাত্রীর হয়ত সে যাতনার উপলব্ধি নেই।

কেন মৃত্যুভয়? ভবিষ্যতে না জানি আমার জন্যও আরও কঠোরতম পরীক্ষা অপেক্ষা কোরছে, তাই যাত্রামুহূর্ত্তে সশঙ্কিত অনুতপ্ত বক্ষ। যদি আত্মস্থিত নির্ভরপ্রাণ হই তবে ভয় কোথায়? ইচ্ছাময়েই আত্মনিবেদন।

দেবতার নামে কত অভিযোগ! কেন পুণ্যাত্মা মানুষ এমন ব্যাধির পীড়নে পীড়িত; আবার অসাধু জন হয়ত হাস্‌তে হাস্‌তে চ'লে যায়; কিন্তু অন্তস্থলের মর্ম্মকথা কে জানে? কে জানে পাপীর বুকে কি ব্যথা? মরণমুহূর্ত্তে কত সাধক জনও এস্ত হ'য়ে ওঠেন, তখনও হয়ত কত ঐহিক মায়ার বন্ধন জেগে ওঠে! কিন্তু এ উদ্বেগও ত ক্ষণস্থায়ী। সত্য আত্মজাগরণ যখন হোল, তখন আনন্দে দেবপ্রয়াণ, তখন সকল বন্ধন কেটে গেল। দেবজ্যোতি ফুটে উঠ্‌ল। এখন তবে আনন্দে বিদায় গান। এ কি সার্থকতা! না জানি সে কি আনন্দ, কি প্রেমসমাধি, সে কি শোভা! কতদিন পরে আজ জনকজননী প্রাণপুতলির মুখ চুম্বন ক'রে ধন্য হবেন। আজ প্রেমাস্পদের বুকে প্রেমিকার নিত্য সম্মিলন। জয়ধ্বনি উঠ্‌ল দেবলোকে। নব লোকে নব সত্তা, এ কি রহস্য! এ কি জীবন থেকে নবজীবনে যাবার আয়োজন! ধন্য এ মৃত্যু-কুহেলিকা।

কেন তবে সংসারের অন্ধকার—অজানার আনন্দপুরে কেন ভীত এস্ত অজ্ঞ মানুষ? আমরা কি জেনে শুনে ধরণীবুকে আনন্দকুঞ্জে জননীজঠোরে গ'ড়ে উঠেছি? কে অনাদিকাল-বিকসিত বসুধা-জননীর বুকের রক্তে আমার হৃদয়রক্ত নাচিয়ে দিল? কে আমার জন্য ভালবাসার নিবিড় হৃদয়কুঞ্জখানি রচনা করিল? কে আমার সুখ দুঃখের হিসাব করে? ধন্য সেই পূর্ণ মঙ্গল প্রেম। যিনি আদি অনাদি, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ, যাঁর অস্তিত্বেই আমিত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, আজ কি তিনি ভুলে গেলেন? যখন আমি বিস্ময়ে আনন্দপুলকে দেবতার চরণে পূজার অঞ্জলি সাজিয়ে নিয়ে এলাম, তখনি কি তিনি পরিত্যাগ কোরবেন? কখনও নয়। দেবাদিদেব মহাদেব, তুমি কখনও পরিত্যাগ করনি, ক'রবেও না। তুমি কেমন ক'রে ছাড়্‌বে বল? যখন সৃষ্টি করেছ, তখন ওগো স্রষ্টা, তোমার বুকেই আছি। যাঁরা ছিলেন তোমাতেই ছিলেন, এখনও আছেন। তাইত আশা, তাইত বিদেহী পুরে যোগানন্দ, তাইত প্রেমনির্ম্মাল্য! তাইত মধু গন্ধ! ধন্য হবে সব, তোমাতেই হেসে উঠি, তোমারই জয়।

---

## পরলোকগতা রেণুকা চৌধুরী

(শ্রাদ্ধ-বাসরে পঠিত)

পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে, যে পরলোকগত আত্মার কল্যাণের জন্য ভগবৎচরণে প্রার্থনা ও তাহার প্রতি স্নেহ, প্রেম, কৃতজ্ঞতা ও-

শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছি, তাহার ১৯০২ খৃঃ অব্দের ২৮শে অক্টোবর মাসে, মাণিকতলার মাতুলগৃহে জন্ম হয়। জন্মকালে, দাদামহাশয়, দিদি মা, পাঁচজন মাসী ও চারিজন মামা বর্ত্তমান থাকায় এবং মাতা পিতার জ্যেষ্ঠা তনয়া হওয়ায়, রেণুকা শৈশবকাল হ'তেই সকলের স্নেহ আদর ও স্নেহভাজন হয়। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যেই, দাদা মহাশয়, দিদি মা এবং দুই মামা ও মাসী ব্যতীত সকলেই পরলোকে গমন করেন। শৈশবকাল হ'তে, রেণুকাকে আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদের মধ্যে বর্দ্ধিত হ'তে হয়েছিল ব'লে, তাহার জীবনে সংসারের অনিত্যতা অজ্ঞাতসারে ফুটে উঠে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই মাঘে যখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়, তখন হ'তেও কষ্টের সীমা ছিল না। বোধ হয় সেই কারণে তাকে অন্যান্য সমবয়সী বালক ও বালিকাদের মত খেলায় ও আনন্দে মেতে থাকৃতে দেখ্‌তে পেতাম না। বাল্যকাল হ'তেই তার প্রকৃতিতে নীরবতা, নির্জনপ্রিয়তা, চিন্তাশীলতা ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পায়।

রেণুকা, তাহার মায়ের বড়ই আদরের পাত্রী ছিল। যাহাতে এই বালিকার শিক্ষা ও চরিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তাহাই মাতৃদেবীর জীবনের সাধনা হ'য়ে উঠেছিল। এইজন্য সাংসারিক নানা কাজের মধ্যেও তিনি নিজে সেলাই, সঙ্গীত ও সাহিত্যচর্চ্চা করিতেন। মায়ের বিশেষ যত্নেই রেণুকার হস্তাক্ষর এরূপ পরিষ্কার ও সুন্দর হয়। তিনি যখন অপরাহ্নে রেণুকে সুন্দর পোষাকে সজ্জিত ক'রে মাঠে পাঠিয়ে দিতেন, তখন আমাদের অবস্থা যে এত অস্বচ্ছল, তাহা সহজে কেহ বুঝিতে পারৃত না। মাতৃদেবীর পরলোকগমনের কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই রেণু আমাকে কেঁদে বল্‌ল, "বাবা, আমাকে এবার কে পড়াবে?" আমি বল্‌লাম 'মা, আজ হ'তে আমি তোমার পড়াবার ভার লইব'। আমি সে কর্ত্তব্য ভাল ক'রে সম্পন্ন করৃতে পারি নি ব'লে, মার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করৃছি।

ছয় সাত বৎসরে রেণুকে তাহার মাতৃদেবী আমাদের বাটীর সংলগ্ন Diocesan schoolএ প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার পরলোকগমনের পর বাটী পরিবর্ত্তন ও অর্থের অনাটনবশতঃ উক্ত বিদ্যালয় হ'তে ছাড়াইয়া Elgin রোডস্থ London Mission বালিকা বিদ্যালয়ে তাহাকে ভর্ত্তি করাতে বাধ্য হলাম। এই সময় হ'তে এই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ Miss Rirettএর সর্ব্বতোমুখীন প্রতিভা, সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্যপরিচালনেক্ষি প্রকারিতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার ধর্ম্মজীবন ও চরিত্রের সৌরভ, রেণুকার চরিত্রের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ভবিষ্যৎ জীবনে, যদি তার কার্য্যে কিছু সফলতা হ'য়ে থাকে ত, এই মাতৃস্থানীয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ার গুণেই তাহা সম্ভবপর হয়। তাহার হস্তলিপি Miss Rirett এর হস্তাক্ষরের মত এরূপ অবিকল হ'য়ে উঠে যে Miss Rirett আমাকে একদিন বলেন যে তিনি নিজের ও রেণুকার হস্তলিপির মধ্যে অনেক সময়ে পার্থক্য বুঝ্‌তে পারেন না।

বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে রেণুকা Middle English পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২বৎসর বৃত্তি পায় এবং অন্যান্য সকল শ্রেণীতেই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে পারিতোষিক পাইত। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয় এবং মেয়ে ছাত্রীদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার ক'রে মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি পায়। ইহার পর রেণুকা Diocesan Collegeএ প্রবেশ করে। Intermediate পরীক্ষায় সে সমুদয় ছাত্রদের মধ্যে উনবিংশস্থান ও মেয়ে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি পায়। গণিতে সে অতি উচ্চ নম্বর রাখিয়া সমুদয় পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে দ্বিতীয়স্থান লাভ করে। B. A পরীক্ষায়, ইংরাজী সাহিত্যে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হ'লেও, আদর্শমত উচ্চস্থান অধিকার করিতে না পারায় সে বিশেষ ক্ষুব্ধ হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রতি তার একটা বিতৃষ্ণার ভাব জেগে উঠে।

এই সময়ে, স্বর্গীয় ডাক্তার গিরিশচন্দ্র দে মহাশয়ের বাটীতে, স্নেহাস্পদ স্বর্গীয় ললিতকুমার দের শ্রাদ্ধে প্রাতঃস্মরণীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ( মুখার্জ্জীর ) সঙ্গে রেণুকার প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। প্রথম আলাপে সার আশুতোষের বাহ্য পরিচ্ছদে উদাসীনতা, পুষ্ট কলেবর, তাঁহার হৃদ্যতা ও সর্ব্বোপরি তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাহাকে মুগ্ধ করে। সেই মহানুভবও রেণুকাকে নির্জনে ডেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি নিজে রেণুকে University Post Graduate ক্লাশে ভর্ত্তি করিয়ে এবং free studentship এর বন্দোবস্ত করিয়ে তাহার পাঠের জন্য বিশেষ উৎসাহ দেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে, Universityতে tramএ একাকী যাওয়া বিশেষ কষ্টকর ছিল। সে প্রায়ই আমার কাছে অভিযোগ করিত যে, অধিকাংশ দেশীয় ভদ্রলোকও মেয়েদের সম্মান ও আরামের প্রতি বিশেষ উদাসীন। বর্ষার সময় তাহার বিশেষ কষ্ট হইত। এক এক দিন, প্রায় সমস্ত সময় তাহাকে ভিজা কাপড়ে কলেজে থাকিতে হইত। এই সময়ে, শ্রীমতী নির্ম্মলা বসুর (পরে শ্রীমতী নির্ম্মলা সিংহ) সাহচর্য্য লাভ করায় এ কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব হয়। এই বন্ধুতা পরজীবনে এতই গভীর হয় যে, তাহারা পরস্পরকে না দেখিয়া বেশী দিন থাকৃতে পারৃতেন না। এইরূপ অসুবিধার মধ্যে দুই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাতে এবং মায়ের অভাবে বাড়ীতে তেমন যত্ন না পাওয়ায়, তাহাকে সময়ে সময়ে অজীর্ণ রোগে কষ্ট পাইতে হইত। পরীক্ষার সময় এই অজীর্ণতা এরূপ বেড়ে উঠ্‌ল যে আমি পরীক্ষা বন্ধ করিতে মনস্থ করিলাম; কিন্তু আমাদের সমাজের আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ সতীশবাবু রেণুকাকে এরূপ স্নেহ করিতেন যে, তিনি নিজে এসে তাঁর শ্যালকপুত্র ডাক্তার গোপাল বাবুকে ডেকে, চিকিৎসা করিয়ে, ও সঙ্গে ঔষধ দিয়া, পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করৃলেন।

এরূপ অবস্থায়, M. A পরীক্ষায় সফল হলেও, তাহার নিজের ও অধ্যাপকগণের আদর্শমত উচ্চস্থান অধিকার কর্ত্তে না পারায়, সে মনে বিশেষভাবে আঘাত পায়। পরীক্ষায় উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে অসমর্থ হ'লেও, ইংরাজী সাহিত্যচর্চ্চায় আগ্রহ ও স্বাভাবিক মেধা দেখিয়া, রেণুর অধ্যাপকগণ তাহার ভবিষ্যৎ কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হন। Tutorial Classএর প্রবন্ধের প্রতি, যাহাতে পূর্ণমাত্রায়

সুবিচার হয়, তজ্জন্য রেণুকা নিজে, ইংলণ্ড, আমেরিকা হ'তে দুষ্প্রাপ্য পুস্তক আনাইয়া ও প্রবন্ধ সংক্রান্ত বহুপুস্তক আদ্যোপান্ত অতি গবেষণার সহিত পাঠ ও চিন্তা করিয়া লিখিতে বসিত। এ বিষয়ে, তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম দেখিয়া তাহার সহপাঠী ও অধ্যাপকগণ বিস্মিত হতেন। তাহার জনৈক অধ্যাপক রেণুকার একটী প্রবন্ধের লিপি-কৌশলে এরূপ বিমুগ্ধ হন যে, তিনি বলেন 'কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মত সে ইংরাজী লেখে।' বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে, কবিবর সেলীর আদর্শ, রেণুকাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে এবং সেই আদর্শ, যাঁহার একান্ত যত্নে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, সেই ভক্তিভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহিত্যানুরাগ ও পাণ্ডিত্য এবং সর্ব্বোপরি তাহার চরিত্র রেণুকাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ ও মুগ্ধ করে। এই পাঠ্যাবস্থায়েই, ডাক্তার ব্রজেন্দ্রশীল মহাশয়ের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ ঘটে এবং তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, তাহাকে অভিভূত করে। কলিকাতায় অবস্থানকালে, এই মহাত্মা প্রায়ই আমাদের বাটীতে আসিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করিতেন। ডাক্তার শীলের অনুরোধে ও উৎসাহে এবং শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে বাটীতে গোপনে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু অকালে পরলোক গমনে সে আশা বিফল হয়।

এখন রেণুকার কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কিছু বলিব। M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর, বর্ত্তমান Uuited Mission বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষমহাশয়া তাহাকে গণিত ও সাহিত্য শিক্ষকতার পদে নিয়োজিত করেন। তাহার বাল্যকালের শিক্ষক Miss Shome, Miss De দিগের সহিত একসঙ্গে শিক্ষকতা করিতে সে প্রথম প্রথম বড়ই সঙ্কোচ ও নিজেকে অনুপযুক্ত মনে করিত। কিন্তু পরে ইঁহাদের অকৃত্রিম সৌজন্য ও ভালবাসায় সে ভয় দূর হ'য়ে গেল। ছাত্রীদের জীবনে কিরূপে সাহিত্য-কুসুম বিকশিত হইয়া ফলবতী হয়, রেণুকার শিক্ষক-জীবনে তাহাই সাধনা ছিল। এইজন্য কোন ছাত্রীর সাহিত্যে প্রতিভা দেখিলে, সে নিজে পারিতোষিক দিয়া তাহাকে উৎসাহ দিত। কর্ম্মজীবনে সে অতি কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিল। বাড়ীতে ছাত্রীদের exercise আনিয়া যতক্ষণ মনোযোগের সহিত সেগুলি সংশোধন না করিত, ততক্ষণ সে অন্য কোন কাজে লিপ্ত হ'তে পারত না। এজন্য অতিকষ্টে এক এক সময়ে তাহাকে আহার করাইতাম।

Diocesan Collegeএ অবস্থানকালে, এখানকার Sister ও অধ্যাপকগণ রেণুকার সাহিত্যানুরাগে সন্তুষ্ট হন। সেজন্য তাঁহারা তাহাকে 4th ও 2nd Yearএর ইংরাজী কাব্য-সাহিত্য পড়াইবার সুযোগ দেন। এতদিনে তার জীবনের একটী সাধ পূর্ণ হইল। সে অতিশয় উৎসাহে সাহিত্যের অধ্যাপনা আরম্ভ করিল। কলেজের ছাত্রীদিগের প্রতি সুবিচার করিবার নিমিত্ত সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, অম্লানবদনে দুর্ম্মূল্য পুস্তক ক্রয় করিয়া ও কখন কখন জয়গোপাল বাবুর সহিত আলোচনা করিয়া পাঠ প্রস্তুত করত। কয়েক সপ্তাহ পরে, তাহার অধ্যবসায় যখন কিঞ্চিৎ পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তখন তাহার আনন্দের সীমা ছিল না।

পরে রেণুকা, প্রবেশিকা পরীক্ষার ইংরাজী-সাহিত্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে, যাঁহারা রেণুকাকে ইংরাজী-সাহিত্য পড়াইয়াছিলেন অথবা তাহার কোন ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই রেণুকার আবেদন গ্রাহ্য করিয়া, এ বিষয়ে তাহাকে উৎসাহ দেন।

এখন তার ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কিছু বলিব। বাল্যকাল হইতেই সে মন্দিরে প্রত্যেক রবিবারের উপাসনায় নিয়মিতরূপে যোগ দিত। বিদেশে বাস অথবা নিতান্ত অসুস্থ হ'য়ে না পড়লে, মন্দিরের উপাসনায় যোগদান করা, তাহার দ্বিতীয় প্রকৃতি হ'য়ে উঠেছিল। সমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণ রেণুকাকে রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এ কার্য্যে সে নিজেকে নিতান্ত অযোগ্য মনে করিলেও, অল্প-বয়স্ক বালক-বালিকাগণের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিত। পুস্তক যোগাড় ও ক্রয় করিয়া এবং নিজেকে সাধ্যমত প্রস্তুত করিয়া তবে বিদ্যালয়ে যাইতে সাহস করিত। বলিতে কি ছোট ছেলেমেয়েদের যাহাতে ধর্ম্মশিক্ষা হয় এবং তজ্জন্য কোন ব্যাঘাত না ঘটে, ইহাই তাহার জীবনে সে কর্ত্তব্য মনে করিত। প্রাতে উপাসনা না করিয়া রেণুকা শয্যাত্যাগ করিত না। এই অভ্যাস, সে দাদামহাশয় ও মাতৃদেবীর নিকট হ'তে অর্জ্জন করে। পুস্তকাগার হইতে পুস্তক যোগাড় করিয়া সে রাজর্ষি রামমোহন রায়ের জীবনীসংক্রান্ত প্রায় সকল পুস্তকই পাঠ করে। Miss Rirettএর অনুরোধে Australiaএর এক মাসিক পত্রিকায় রাজর্ষি রামমোহন সম্বন্ধে একটী সংক্ষিপ্ত চিন্তাপূর্ণ জীবনী ও তাহার সমালোচনা লিখিয়াছিল।

সত্যের প্রতি রেণুকার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কথায় অথবা কার্য্যে যাহাতে সত্যের অপলাপ না হয় তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত। বড় বড় লোকের autographs সংরক্ষণ করা তার একটী অভ্যাস ছিল; ইহার জন্য পরিশ্রম করিতে সে কিছুতেই বিমুখ হইত না। একদিন রেণুকা দেশপূজ্য মহাত্মা গান্ধীর সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহার autograph ভিক্ষা করিল। কিন্তু মহাত্মা তাহার অনুরোধ কিছুতেই রক্ষা করিতে সম্মত হলেন না। কিন্তু সেও নাছোড়বান্দা। তখন মহাত্মা তাকে দুইটী বিষয়ে প্রতিশ্রুত করাইয়া autograph লিখে দেন। রেণুকা, এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করেছিল। বাড়ীর লোকেরা ও এমন কি ভৃত্যেরা যাহাতে খদ্দরের পরিচ্ছদ ব্যবহার করে তজ্জন্য, সে সর্ব্বদাই উৎসাহ দিত। এ বিষয়ে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গের কাহারও অনুরোধ সে মানিত না।

এখন রেণুকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া শেষ করিব। বাড়ীর জ্যেষ্ঠা কন্যা বলিয়া তাহাকে, কনিষ্ঠা ভগ্নী ও ভ্রাতার অনেক আবদার ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। প্রত্যহ ভাঁড়ার দেওয়া, ধোপাকে কাপড় দেওয়া, বাড়ীর দৈনিক হিসাব রাখা, বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন অথবা অতিথি আসিলে তাহাদের পরিচর্য্যা করিবার ভার তাহাকেই লইতে হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তাহার কনিষ্ঠ ভাই ভগ্নীকে নিয়মিতরূপে পড়াইতে হইত। এইজন্য বহুসময়ে, তাহার নিজের পাঠের ব্যাঘাত ঘটিত বলিয়া, কখন কখন কাঁদিয়া ফেলিত এবং গভীররাত্রে সে অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করত।

অন্তিমকাল—গত ১১ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত মা আমার অতি উৎসাহে কার্য্য করেছিল। ১২ই মার্চ্চে, সন্ধ্যাকালে হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ায়, সামান্য জ্বর ও কাশি দেখা দিল। পারিবারিক বন্ধু ও চিকিৎসক সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় influenza মনে করিয়া চিকিৎসা করেন। পনের দিনের পরও জ্বর না ছাড়ায়, Tropical School of Medicineএর অধ্যক্ষ Col. Acton দয়া করিয়া রেণুকাকে Charmichael Hospitalএ রেখে dry pluresy মনে ক'রে চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু পীড়ার কোনরূপ উপশম না হওয়ায় Medical Collegeএর অধ্যক্ষ Col Sir Frank Connerএর হাতে চিকিৎসার ভার দিলেন। তিনি দুইমাস পর্য্যন্ত রেণুকাকে Prince of Wales hospital এ রেখেছিলেন এবং ৩।৪ বার X' rayর সাহায্যে photo নিয়ে suspected tumourএর case মনে ক'রে, অস্ত্রপ্রয়োগ করিবার আয়োজন করতে লাগলেন, কিন্তু পরে অনেক ভেবে বল্লেন, এ dry pluresyর case এবং অবিলম্বে রাঁচির dry climateএ নিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন ও অর্থের অনাটন সত্ত্বেও, আমি পরামর্শমত কাজ করিতে বাধ্য হলাম। রাঁচিতে দুইমাস কাল ছিলাম। কিন্তু ২।১ সপ্তাহ পরে, গলার irritation ও কাশি এতই বেড়ে গেল যে, সেখানকার civil surgeon, st. Barnabas hospitalএর সুযোগ্য Missionary ডাক্তার Dr. Douncey ও প্রবীণ ডাক্তার বাবু নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরামর্শমত কলিকাতায় ফিরে আস্তে বাধ্য হলাম। কলিকাতায়, Sir Nilratan Sarkar, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, ডাক্তার মৃগেন্দ্র গাঙ্গুলী, Sir Frank Conner ও সর্ব্বশেষে কবিরাজ ফণিভূষণ ঘোষ ও throat specialist Dr. S. B. Roy চিকিৎসা করেন। কিন্তু পীড়া দিন দিন বাড়তেই লাগল। শেষে একদিন প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ও এসেছিলেন, কিন্তু তিনি চিকিৎসা করিবার সুযোগ পান পান নাই। প্রায় ৫।৬ সপ্তাহ, মা আমার যে একটু দুধ খেতে পারত, তা কেবল Throat specialist Dr. S. B, Royএর যত্নে ও চিকিৎসার গুণে। ইহা ব্যতীত, Dr D. N. Maitra এবং Dr Dwaraka nath mitter এসে রেণুর পীড়ার কথঞ্চিৎ উপশমের জন্য চেষ্টা করেন। ইঁহাদের সকলের নিকট আমি ও আমার আত্মীয়েরা কৃতজ্ঞ থাকব। রাঁচি প্রবাস-কালে, Sister Superior ও বিশেষভাবে Miss Westem, Miss Morgan প্রত্যহ এসে খোঁজ খবর নিতেন এবং তাহার পীড়ার উপশমের জন্য যথাসাধ্য কর্ত্তেন। সেজন্য আমরা তাঁদের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ থাকব। এখানে রায় বাহাদুর শশিভূষণ মজুমদার মহাশয় ও তাঁহার পরিবারবর্গ, রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ বসু ও শ্রীসুধাংশুরঞ্জন নন্দীদের সাহায্য না পাইলে, আমাদের কষ্টের সীমা থাকত না। সে জন্য ইঁহাদের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। মায়ের অভাবেও রেণুকার শেষ-জীবনে যে কোনপ্রকার সেবার ত্রুটী হয় নাই, সে কেবল তাহার ছোট ভগিনী কণিকার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে। সে নিজের অসুস্থতা ভুলে ৪।৫ মাস রাত জেগে রেণুর সেবা করেছে। Sponge করবার, আহার করাবার, রাত জাগবার ভার, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে কাহাকেও দিতে চায় নাই।

প্রায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, রেণুকার জ্ঞান ছিল। ১৫ই অক্টোবর বেলা ১টার সময় শ্রদ্ধাস্পদ বিজয়বাবুর প্রার্থনা ও ভাইভগ্নী ও মাসীর ব্রহ্মসঙ্গীতের গান শুনতে শুনতে এবং ছোট বোনের দিকে তাকাতে তাকাতে, মা নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমরলোকের অনন্ত-শান্তিধামে প্রয়াণ করে।

## ব্রাহ্মসমাজ

**দীক্ষা**—বিগত ১৯শে মার্চ্চ গারো পর্ব্বতের সীমান্তে নল-বাড়ী গ্রামে শ্রীযুক্ত শ্যামদাস কাছারী ও শ্রীযুক্ত পতিরাম রাভা পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র দাস দীক্ষার্থীগণকে আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত করেন। গ্রামস্থ গারো নরনারী ও ভিন্নগ্রামস্থ রাভাগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিগত ৩১শে মার্চ্চ গারো পর্ব্বতের সীমান্তে রাজাসিমলা গ্রামে শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র দাসের পত্নী শ্রীমতী বিদিন সিরা পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। স্থানীয় অনেক নারী উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

আমরা নব দীক্ষিতদিগকে আমাদিগের মধ্যে সাদরে গ্রহণ করিতেছি। করুণাময় পিতা ইঁহাদিগকে তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন।

---

**বর্ষশেষ ও নববর্ষোৎসব**—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বর্ষশেষ ও নববর্ষোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—

২৯শে চৈত্র (১২ই এপ্রিল) শনিবার—সায়ংকালে শ্রী রজনীকান্ত গুহ "মধ্য পথ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

৩০শে চৈত্র (১৩ই এপ্রিল) রবিবার—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে উপাসনা; পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১লা বৈশাখ (১৪ই এপ্রিল) সোমবার—প্রাতে উপাসনা। শ্রীমতী অবন্তী ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে উপাসনা। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

---

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে,—

বিগত ১৫ই এপ্রিল মসুরী নগরীতে বাবু মুকুন্দানন্দ আচার্য্য পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন এবং পরিচিত সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। বিগত ২০শে এপ্রিল ডেরাডুন নগরীতে তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল আচার্য্যের কার্য্য, সুরেন্দ্রবাবু জীবনীপাঠ ও শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী প্রার্থনা করেন। কলিকাতা সাধনা-শ্রমেও ২৮শে এপ্রিল তারিখে তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস শাস্ত্র পাঠ করেন।

বিগত ১৮ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে রায় শশিভূষণ মজুমদার বাহাদুরের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান পুত্র কন্যাগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ মিত্র কন্যা কর্ত্তৃক লিখিত জীবনী পাঠ এবং পুত্র প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে বিবিধ প্রতিষ্ঠানে পুত্র ৫০০৲ টাকা ও কন্যাগণ ৬০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ২৪শে এপ্রিল ভবানীপুর ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে

শ্রীযুক্ত হরদৎ সিংহের কন্যা সরলার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৭শে এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেনের ভ্রাতৃবধূর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সতীশচন্দ্র প্রার্থনা করেন।

বিগত ২৮শে এপ্রিল ধুবড়ী নগরীতে বরিশাল নিবাসী পরলোকগত হরলাল সরকারের পত্নী বামাসুন্দরী সরকার তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকারের গৃহে দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

**প্রচার**—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত বর্ষশেষ ও নব বৎসরের উৎসব উপলক্ষে ময়মনসিংহ গমন করিয়াছিলেন। সেখানে ২৯শে চৈত্র ব্রহ্মমন্দিরে অমৃত বাবু একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয়—"ধর্ম্মপথে মহা বিঘ্ন।" উক্ত দিবস ব্রাহ্মপল্লিতে পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দের পারিবারিক উপাসনালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়, অমৃত বাবু উপাসনা এবং শ্রীনাথ বাবু প্রার্থনা করেন। ৩০ চৈত্র সকালে ও সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হয়। অমৃত বাবুকে দুবেলাই উপাসনা করিতে হইয়াছিল। ১লা বৈশাখ সকালে ও রাত্রে মন্দিরে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন ও অমৃত বাবু উপাসনা করেন।

**শুভ-বিবাহ**—গত ২০শে এপ্রিল ঢাকায় শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী ঘোষের কন্যা কমলাক্ষীর সহিত ভাগলপুরের অন্তর্গত মাধিপুরার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দাসের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

গত ৫ই বৈশাখ কাঁথি নগরীতে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রফুল্ল কুমারীর সহিত বরিশালের শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান জিতেন্দ্রকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কন্যার পিতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা, সাধনাশ্রমে ২৲ দাতব্য বিভাগে ২৲, কাঁথি ব্রাহ্মসমাজ ২৲, ও কাঁথি ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

**পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ**—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব সম্পন্ন করেন :—

২৯শে চৈত্র শনিবার সায়ংকালে শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত "প্রাচীন ও নবীন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৩০শে চৈত্র রবিবার প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু ও শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত যথাক্রমে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১লা বৈশাখ সোমবার প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম" বিষয়ে উপদেশ দেন; সায়ংকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "আদর্শে আত্মসমর্পণ" বিষয়ে উপদেশ দেন।

---

**প্রাপ্তি স্বীকার**—শিবনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারের সম্পাদকগণ কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন :—শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত ১৬০৲, শ্রীযুক্ত এস্ কে মজুমদার ১২০৲, রায় বাহাদুর প্রমদারঞ্জন রায় ১২০৲, মিঃ ভি রামকৃষ্ণ রাও ১১০৲, মিসেস কাজী আবদুল গফুর ১০২৲, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র প্রসাদ বসু ১০০৲, শ্রীযুক্ত লালমোহন চাটার্জ্জি ১০০৲, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ দাস ১০০৲, পরলোকগত ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ১০০৲, শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ দে ১০০৲, শ্রীযুক্ত পি দেব ১০০৲, শ্রীযুক্ত এন্ ডি ভেলিয়ালিক ১০০৲, পরলোকগত গগনচন্দ্র হোম ১০০৲, ডাঃ জীবন লাল ১০০৲, মিঃ ভি ভি কৃষ্ণায়া ১০০৲, মিঃ কে কল্যাণ স্বামী ১০০৲, ডাঃ বালমুকুন্দ ১০০৲, মিঃ এ কেনান ১০০, শ্রীযুক্ত এইচ এন্ খাস্তগীর ১০০৲, পরলোকগতা মিসেস আর সি নাগ ১০০৲, মিঃ বি পি নায়ার ১০০৲, মিঃ কে সদাশিব রাও ১০০৲, শ্রীযুক্ত জয়ন্ত রাও ১০০ , মিঃ আর এন্ রায় ১০০৲, মিঃ কে ভি সুব্বা রাও ১০০৲, মিঃ শিওরাম সেবী ১০০৲, পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০০৲, ডাক্তার হেমচন্দ্র সরকার ১০০৲, শ্রীমতী গিরিবালা বিশ্বাস ১০০৲, শ্রীযুক্ত পি সি সরকার ১০০৲ শ্রীযুক্ত পি কে বসু ১০০৲, ডাঃ এস এন্ চৌধুরী ১০০৲, পরলোকগত শরদিন্দু বিশ্বাস ১০০৲, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ১০০৲, শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ বসু ১০০৲, শ্রীযুক্ত অতুল ভূষণ সরকার ১০০৲, শ্রীমতী পূর্ণিমা বসাক ১০০৲, শ্রীযুক্ত এইচ সি দাস (রেঙ্গুন) ১০০৲, জনৈক মহিলা (মাঃ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস) ১০০৲, জনৈক বন্ধু (মাঃ ঐ) ১০০৲, পরলোকগত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার ৭৪৲ কুমারী চারুলতা সেন ৭০৲, পরলোকগত মুকুন্দানন্দ আচার্য্য ৫০৲, শ্রীযুক্ত রামলাল বানার্জ্জি ৫০৲, মিঃ সুন্দর দাস ভল্লা ৫০৲, শ্রীযুক্ত হরিমোহন চাটার্জ্জি ৫০৲, শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই চন্দ ৫০৲, কুমারী ভক্তিলতা চন্দ ৫০৲ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস ৫০৲, পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ দে ৫০৲ শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে ৫০৲, কুমারী সুরবালা ঘোষ ৫০৲, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ গুপ্ত ৫০৲, শ্রীযুক্ত এম্ এল গুপ্ত ৫০৲, মিঃ এস্ পি কমলকার ৫০৲ শ্রীমতী ক্ষীরোদবাসিনী মিত্র ৫০৲ শ্রীযুক্ত এন্ সি নাগ ৫০৲ মিঃ এম্ সিং ফিলিপ্স্ ৫০৲, পরলোকগত প্রশান্ত রাও ৫০৲, রায় বাহাদুর পি গোপাল রাও ৫০৲, মিঃ নলম্ রাম লিঙ্গ ৫০৲, মিঃ আর ভেঙ্কট শিবাড়ু ৫০৲, মিঃ ভেঙ্কাপ্পা ৫০৲, রেভাঃ ডাক্তার জে টি সাণ্ডারল্যাণ্ড ৭৫৸৶৫ পাই মোট—৫৩৮১৸৶৫ পাই, পূর্ব্ব স্বীকৃত ২৬,২০১৲ টাকা, সর্ব্ব মোট—৩১,৫৮২৸৶৫ পাই।



ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় দ্বারা ৮ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৩ম ভাগ | ১লা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹
৩য় সংখ্যা। | 15th May, 1930. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা।

হে ধর্ম্মাবহ বিশ্ববিধাতা, তুমি ধর্ম্মের চিরন্তন প্রস্রবণ হইয়া জগতে তোমার পবিত্র ধর্ম্মকে চিরদিন প্রকাশ ও রক্ষা করিয়া আসিয়াছ। অল্পজ্ঞান মানুষ তোমাকে জানিতে ও বুঝিতে, তোমার নির্দ্দেশ অনুসারে পথ চলিতে, কত ভুলভ্রান্তি করে! কিন্তু তুমি নিয়ত মানব-অন্তরে তোমার বিশুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চার করিয়া, সে সকল ভুল ভ্রান্তি দূর কর, এবং তাহাকে ক্রমে উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর কর। তুমি অন্তরে প্রকাশিত হইয়া তোমাকে জানিতে না দিলে মানুষ কখনও তোমাকে জানিতে পারিত না, এবং তোমার নির্দ্দেশ না মানিয়া নীচ প্রবৃত্তির অনুসরণদ্বারা আপনার ও অপরের সর্ব্বনাশই সাধন করিত। তুমি যে শুধু বিশেষ বিশেষ সাধু মহাত্মাদেরই নিকট আপনাকে প্রকাশ কর তাহা নহে, চিরদিন সকলের মধ্যে থাকিয়াই কার্য্য কর, কখনও কাহাকে পরিত্যাগ কর না। মোহগ্রস্ত হইয়াই, বাহিরের অসার বিষয়ে মত্ত থাকিয়াই, সকলে তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি তোমার কার্য্য করিতে কখনও ক্ষান্ত হও না। বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়াই মানুষকে অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। কেহই চিরদিন অন্ধকার ও অবনতির মধ্যে পড়িয়া থাকিতে পারে না। হে প্রেমময় পিতা, তোমার এই জীবন্ত করুণাতেই আমাদের আশা। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার পবিত্র ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিয়াছ, তুমিই আমাদিগকে তাহার পথে অগ্রসর করিবে। আমাদের উপর যে গুরুতর দায়িত্ব প্রদান করিয়াছ, তাহা ত আমরা অনেক সময়ই অনুভব করি না! উদাসীনতা ও অবহেলার মধ্যেই ত জীবনের অধিকাংশ সময় চলিয়া যায়! তুমি এবার আমাদের এই দুর্গতি দূর করিয়া তোমার পবিত্র ধর্ম্মকে জীবনে জয়যুক্ত কর—আমরা তোমার অনুগত সন্তান হইয়া, তোমার নির্দ্দেশানুযায়ী জীবন-যাপন করিয়া, ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার ধর্ম্মকে জীবনে ও জগতে জয়যুক্ত করি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

## নিবেদন।

**অন্তরের সাধন**—আমি ত ধর্ম্মের সব অনুষ্ঠানই করি—তিন বার সন্ধ্যা বন্দনা করি, পাঁচ বার নেমাজ করি, সকালে সন্ধ্যায় নির্জ্জনে উপাসনা করি, সামাজিক উপাসনাতে যাই, প্রত্যেক অনুষ্ঠানে উপাসনার বন্দোবস্ত করি, সৎ আলোচনাতে যোগ দেই, সকল শুভ কর্ম্মে সহানুভূতি করি, অর্থ দান করি; কত প্রতিষ্ঠানের সভা সমিতিতে উপস্থিত থেকে কর্ম্মের ব্যবস্থা করি! এত নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান করি, তবু ত প্রাণে তৃপ্তি পাই না, শান্তি পাই না। এ সকল ত বাহিরের অনুষ্ঠান। এ সকল করতে হবে বৈ কি? কিন্তু আরও ভিতরে প্রবেশ কর, অন্তরের ধর্ম্ম সাধন কর। দিন রাত ঈশ্বরের চরণে আত্মা প'ড়ে থাকুক; সব সময়ে তাঁর নাম সাধন কর—কেবল মুখে নাম উচ্চারণ নয়, তাঁর নামরসে ডোব, তাঁতে সম্পূর্ণ রূপে আত্মসমর্পণ কর। তাঁর করুণার স্রোতে আপনাকে ছেড়ে দাও, নিজের কোনও সুখ-আকাঙ্ক্ষা রেখো না, নিজের একটুও ইচ্ছা রেখো না; তাঁর ইচ্ছায় আপনার ইচ্ছা মিলিয়ে দাও। অন্তরের ধর্ম্ম সাধন হ'লে বাহিরের অনুষ্ঠান, বাহিরের কর্ম্ম, আপনিই আস্‌বে। অন্তর শুদ্ধ কর, অন্তরে প্রেম জাগুক, অন্তরে আত্মনিবেদন আসুক, তখন বাহিরের সাধন আপনিই চল্‌তে থাক্‌বে।

---

**একাকিত্ব**—যখন আমি অন্তরে একাকী থাকি, যখন প্রাণের মধ্যে নির্জ্জনতা অনুভব করি, কে তখন আমার সঙ্গে থাকে, আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় সায় দেয়? আমি যে গভীর অরণ্যে কিম্বা বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে অথবা নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহাতে আছি, তা ত নয়। চারি দিকে লোকপ্রবাহ চলিতেছে; পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব ঘেরিয়া রহিয়াছেন—কত লোক আসে, কত লোক যায়! কত আমোদ প্রমোদ চল্‌ছে, কত হাসি গল্প, কত উৎসব অনুষ্ঠান! কিন্তু আমি একা, আমার

প্রাণে গভীর নির্জ্জনতা। আমার প্রাণে কত ভাব জাগে, কত আশা আসে, আবার নিরাশাও আসে; আমার প্রাণের ক্রন্দন কেহ শোনে না, প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় কেহ সায় দেয় না, কাহাকেও প্রাণ খু'লে আমার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা জানাতে পারি না; কারও নিকট হৃদয় খু'লে দিয়ে দুঃখ নিরাশার কথা বল্‌তে পারি না।—আমি জনপ্রবাহের মধ্যে থেকেও নির্জ্জনে আছি, বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত থেকেও একাকী আছি। আমার এই ঘোর দৈন্যের ভিতরে, ভীষণ একাকিত্বের অন্ধকারে, একটি আলোক জল্‌ছে—সেই আলোক সর্ব্বদা আমার সঙ্গে আছে—প্রাণের দেবতা যিনি, হৃদয়স্বামী যিনি, তিনি সব জান্‌ছেন, তিনি আমার দুঃখ বেদনা বুঝ্‌ছেন; আমার আশা আকাঙ্ক্ষাতে সায় দিচ্ছেন। তিনিই একমাত্র সঙ্গী, আমার আঁধারে আলোকে, নির্জ্জনতায় সজনতায়, চির দিনের সাথী।

---

**পাপের শাস্তি**—পাপ কর্‌লে তার শাস্তি আছে। ভগবান্ মার্জ্জনা করেন, তাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু পাপ হ'তে ক্ষত দিয়া যার জন্য যে দণ্ডের প্রয়োজন, তাও তিনি দেন। পাপের শারীরিক শাস্তিও আছে—লোকে সব সময় ধর্‌তে পারে না, কোন্ পাপে কোন্ দণ্ড পেল, তা বুঝ্‌তে পারে না। আত্ম-দৃষ্টির অভাবে মানুষ আপনার অপরাধের দণ্ড দেখ্‌তে পায় না। পাপের ফলে ঐহিক অনিষ্ট হয়; মনঃক্লেশও হয়, তবুও সব সময়ে বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু পাপের দণ্ড শারীরিক ও ঐহিক যতই হউক, মানসিক ক্লেশ ও বেদনা যতই আসুক, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শাস্তি এই যে, ঈশ্বরের মুখ লুক্কায়িত হয়। পাপ কর্‌লে, সাধু চিন্তায় মন বসে না, ঈশ্বরের চরণে মন স্থির রাখা যায় না,—তুমি বার বার তাঁর চরণে বস, বার বার মন কোথায় চ'লে যায়। নাম কীর্ত্তন কর, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। ধ্যানে রত হ'তে চাও, তাঁকে অন্তরে খুঁজে পাও না, এই যে তাঁর অদর্শনজনিত যন্ত্রণা, তাঁতে মন বসে না, এই যে কঠোর দণ্ড, ইহা বড়ই তীব্র; ইহাই পাপের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শাস্তি।

## সম্পাদকীয়

**সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ**—মানুষ যাহার মধ্যে সর্ব্বদা বাস করে এবং যাহা অতি সহজে লাভ করে, অনেক সময়ই তাহার মূল্যটা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এমন কি, যাহা এক সময়ে অনেক দুঃখ কষ্ট সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়া পাইয়াছে, তাহার মূল্যও কালে তাহার নিকট অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়—মনে হয়, অতি সহজেই যেন তাহা পাওয়া যায়, তাহার জন্য কোনও প্রকার ত্যাগ ও কষ্টস্বীকার যেন আর দরকার নাই। তাই বিশেষ বিশেষ সময়ে তাহার বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া তাহার মূল্যটাকে নিজের নিকট একটু উজ্জ্বলভাবে ধরা, এবং তাহার মধ্যে কোনওরূপ মলিনতা ও আবিলতা দেখা গেলে তাহাকে একটু বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল করিয়া লওয়া, একান্ত আবশ্যক হয়। বাতাস আমাদের জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য্য হইলেও, উহাকে আমরা বিনা আয়াসে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পাই বলিয়া তাহার মূল্যটা অনেক সময়ই বুঝি না, সময় সময় যে তাহার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়াও নিজেকে একটু মুক্ত স্থানে লইয়া যাওয়া একান্ত আবশ্যক হয়, নতুবা বদ্ধ স্থানের বাতাস কলুষিত হইয়া যে অনেক সময় অনিষ্টই সাধন করে, অন্ততঃ স্বাস্থ্যবর্দ্ধনের পক্ষে ব্যাঘাত উৎপন্ন করে, তাহা আমরা অনেক সময়ই ভুলিয়া যাই; এবং সেই অবহেলা ও উদাসীনতার ফলও ভোগ করি। তাই বাতাসটা নিতান্ত অনায়াসলভ্য হইলেও উহার জন্য অন্ততঃ মাঝে মাঝে—নিয়মিত হইলেই ভাল—একটু আয়াস স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক হয়। এতদ্ব্যতীত, মানুষ অনেক সময় আপনার দোষেই প্রাণপ্রদ বিশুদ্ধ বাতাসকেও সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া ও অন্য প্রকারে, বিষাক্ত ও প্রাণনাশক করিয়া ফেলে; তখন ত তাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে মুক্ত এবং বিশুদ্ধ না করিলে চলেই না—তাহার জন্য অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করিতেই হয়, উদাসীন নিশ্চেষ্ট ভাবে তাহার মধ্যে বসিয়া থাকিলে প্রাণই হারাইতে হয়। প্রকৃতিরাজ্যে এই এক অদ্ভুত রহস্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহা জীবনদান করে, যাহার অভাবে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব, তাহাই আবার কালে জীবনবিনাশের কারণ হয়, তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া কিছুতেই বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হয় না।

ধর্ম্মও, মানবজীবন ও সমাজের পক্ষে বাতাসের ন্যায়ই অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক, এবং তাহার তুল্য সুলভও। ধর্ম্ম ব্যতীত মানুষ বাঁচে না, মানুষই থাকে না, একবারে পশুই হইয়া যায়—সমাজও দাঁড়ায় না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যেক মানবহৃদয়ে ধর্ম্ম রহিয়াছে, ধর্ম্ম হইতে কেহই কখনও সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয় না,—মানুষকে তাহা অনেক চেষ্টা যত্ন করিয়া, অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া, দূরদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিতে হয় না। মানুষ ইচ্ছা করুক আর না করুক, অন্তরনিহিত ধর্ম্মের অস্তিত্ব ও প্রভাব স্বীকার করুক আর না করুক, প্রত্যেকের হৃদয়ে উহা অজ্ঞাতসারে আপনার কার্য্য করিবেই, মানবজীবন ও সমাজের রক্ষণ এবং পোষণ করিবেই। বাতাসের ন্যায় উহা এত সুলভ বলিয়াই, মানুষকে এমনি ওতপ্রোত ভাবে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে বলিয়াই, মানুষ সাধারণতঃ উহার প্রতি উদাসীন হইয়া উহাকে অবহেলা করিয়া চলে। বাহিরের যে সকল বস্তু অনেকটা কষ্টস্বীকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় তাহার জন্যই অধিকতর ব্যস্ত হয়, তাহা পাইতেই চেষ্টা যত্ন করে, কঠোর শ্রমও করে। এই হেতু ধর্ম্মের প্রকৃত মূল্যটাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। মানবহৃদয়স্থিত স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবটা বিশুদ্ধ ও প্রাণপ্রদ হইলেও, উহা অনেক সময়ই যে তাহার অজ্ঞতা, চিন্তাহীনতা, সংকীর্ণতা ও নীচ শারীরিক প্রবৃত্তির অধীনতা বশতঃ বিকৃত কলুষিত ও বিষাক্ত হইয়াই উঠে, সকল সময় তাহা দেখিতে পায় না বলিয়াই, সে এ বিষয়ে এত উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট থাকে। মানুষ যে চিরদিনই এরূপ উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট ছিল বা থাকে, তাহা নহে। অতি আদিকাল হইতেই মানুষ এই স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবকে বর্দ্ধন ও পরিপোষণ করিবার জন্য

আপনার জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছে। কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা যথেষ্ট কল্যাণও সাধিত হইয়াছে। কিন্তু কালবশে তাহা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ এবং নানা প্রকার কুসংস্কার ও মানবীয় পাপ মলিনতার দ্বারা কলুষিত হইয়া, নিতান্ত বিষাক্ত ও প্রাণনাশক আকার ধারণ করিয়াছে। তথাপি, অধিকাংশ মানুষ তাহাকে পরিত্যাগ বা সংশোধন করিয়া বিশুদ্ধ করিবার ক্লেশটুকু স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয় নাই। কিন্তু সকলে কখনও চিন্তাবিহীন ভাবে তাহার মধ্যে থাকিয়া মৃত্যুকে বরণ করা বাঞ্ছনীয় মনে করে নাই। তাই কেহ কেহ বহু ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াও মুক্ততর ও বিশুদ্ধতর পথ অবলম্বন করিয়াছে। এইরূপে নানা বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই ধর্ম্ম চিরদিন উদার ও বিশুদ্ধ হইয়া, বিকাশ ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, এবং এই গতি ও উন্নতিশীলতাবশতঃই উহা চিরকল্যাণময় ও জীবনপ্রদ থাকিতে সমর্থ হইতেছে।

বিশুদ্ধতম বায়ু ব্যবহার করিয়াও যেমন মানুষ অপরিহার্য্য-রূপেই তাহাকে আপনার বিষে কিছু বিষাক্ত করে, তেমনি অতি উচ্চতম উদারতম ধর্ম্মকেও, আপনার মলিন মানবীয় ভাবের দ্বারা এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ ও কর্ত্তৃত্বের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা হেতু, সে সংকীর্ণ ও কলুষিত, নিতান্ত অনিষ্টকর, করিয়া ফেলে। মানুষ যে সকল সময় জানিয়া বুঝিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনও ক্ষুদ্রভাব বা নীচ স্বার্থের দ্বারা চালিত হইয়াই এরূপ করে তাহা নহে। জগতে সেরূপ দৃষ্টান্তের একান্ত অভাব না থাকিলেও, অধিকাংশ স্থলেই প্রকৃত পক্ষে উহা অজ্ঞাতসারে অলক্ষিত ভাবেই সাধিত হয়। এই জন্যই, তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে অনেক সময়ই প্রথমে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পরে যখন অনেকটা স্পষ্টভাবেই তাহা বুঝিতে পারা যায়, তখনও অভ্যাসবশতঃ অনেকে উহার সঙ্গে এমন জড়িত হইয়া পড়ে যে, সহজেই সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইতে পারে না। সমগ্র ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসই ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। দূরের দৃষ্টান্ত আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। উদারতম ও বিশুদ্ধতম ব্রাহ্মধর্ম্মের ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সেখানেও ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। বাহিরের দুই চারিটা ঘটনার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই যাঁহারা উহার ইতিহাস আলোচনা করিবেন তাঁহারা কখনও প্রকৃত সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন না—প্রথমে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ও পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব, একান্ত প্রয়োজনীয়তা ও পরম কল্যাণকারিতা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন না। উভয়ত্র যে একই মৌলিক ভাব কার্য্য করিয়াছে, যে কারণে আদি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই যে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য হইয়াছিল, তাহা ব্যতীত যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিকাশের পথ সকলের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে উন্মুক্ত হইত না, ধর্ম্মের পূর্ণ বিশুদ্ধতা ও কল্যাণময় জীবনপ্রদ রূপ অবিকৃত ভাবে রক্ষিত হইত না, তাহা সূক্ষ্ম বিচার ও গভীর চিন্তা ব্যতীত ভাসা ভাসা ভাবে শুধু বাহিরের কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করিয়া নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ, আমরা উহার বিশুদ্ধ উদার মুক্ত হাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া ও বাস করিয়া, বিকৃতিটা যে কত প্রাণঘাতী তাহা অনুভব করিতে পারি না, তাহার অনুসন্ধানও করি না। এই জন্যই উহার মূল্যটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

যদিও সাধারণতন্ত্রপ্রণালী অনুসারে সমাজের কার্য্যপরিচালন করা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটা অতি কল্যাণকর বিশেষ প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য বটে, তথাপি উহাই তাহার সর্ব্বপ্রধান কথা নয়, তাহার প্রতিষ্ঠার মৌলিক কারণ নহে—উহা একটা অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক অঙ্গ মাত্র। শুধু তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই যদি আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাই, তবে কখনও আমরা উহার প্রকৃত মূল্যনির্ণয়ে সমর্থ হইব না, তাহার জন্য যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতাও অনুভব করিতে পারিব না। অনেকে এই কথাটা ভাবিয়া দেখে না। উহাকে একটা বাহিরের অবান্তর বিষয় মনে করিয়া, উহার সামান্য একটা মূল্য স্বীকার করে মাত্র। এই জন্যও দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ও উহার প্রতিষ্ঠার দিনকে, যেরূপ গৌরবের চক্ষে দর্শন করা উচিত, আমরা তাহার কিছুই করি না। আমরা উহার জন্মদিন উপলক্ষে দুই তিন দিনব্যাপী একটা উৎসবের আয়োজন করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করি। আমরা বলি, অনেকে এই সময় সহরের বাহিরে চলিয়া যাওয়াতে দীর্ঘকালব্যাপী উৎসব করা সম্ভবপর হয় না। উৎসব দীর্ঘকালব্যাপী কি অল্পকালস্থায়ী হওয়ার উপর যে বেশী কিছু নির্ভর করে, তাহা নহে,—প্রধান কথা, উহা হৃদয়স্পর্শী ও জীবন-প্রদ হওয়া চাই। সকলে প্রাণের সত্য আকুলতা ও কৃতজ্ঞতা লইয়া উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে তাহা সম্ভবপর হয় না। আমরা কয়জনই বা সেখানে উপস্থিত হই এবং তাহার মধ্যে কয়জনই বা সেরূপ অনুভূতি ও হৃদয়ের ভাব লইয়া যাই! প্রকৃত কথা, আমরা অনেকেই আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিষয়ে একান্ত উদাসীন বলিয়াই, উহার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব যে কত বেশী, আমরা যে কি অমূল্য আধ্যাত্মিক সম্পদ লাভ করিয়াছি, উহা যে ধর্ম্মকে কি প্রকার গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়া বিশুদ্ধ ও প্রাণপ্রদ করিয়াছে, তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করি না।

উহার সাধারণ তন্ত্রানুযায়ী গঠনপ্রণালী আমাদিগকে যে অধিকার প্রদান করিয়াছে তাহার মূল্যটা আমরা এক ভাবে কিছু পরিমাণে বুঝিয়াছি দেখিতে পাওয়া যায়—আমরা আমাদের অধিকার ও কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে অনেকেই বেশ ব্যস্ত। কিন্তু উহা আমাদিগকে যে গুরুতর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব প্রদান করিয়াছে, নিজের ও অপরের প্রকৃত কল্যাণ-সাধনের যে উচ্চ অধিকার দিয়াছে, তৎপ্রতি যে আমাদের সকলের সম্যক্ দৃষ্টি আছে, তাহার প্রকৃত মূল্য যে আমরা সত্যরূপে হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকি এবং তাহার জন্য ইহার নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী বোধ করি, তাহারও বিশেষ কোনও প্রমান আমাদের কার্য্যাদিতে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। এই ৫২ বৎসর সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ যে সামান্য কার্য্যসাধন করিয়াছেন, তাহা আমরা সময় সময় গৌরবের সহিত স্মরণ করি বটে, কিন্তু যাহা করা উচিত ছিল এবং যে ভাবে করা উচিত ছিল,তাহার কতটা যে করা হয় নাই ও

যথোচিতভাবে সম্পন্ন করা হয় নাই, তাহা দুঃখ ও লজ্জার সহিত অতি অল্পই স্মরণ করি। ইহার জন্য যথোপযুক্ত চিন্তা ভাবনা, আকাঙ্ক্ষা উদ্যম, চেষ্টা যত্ন, ত্যাগ ও আত্মদান আমাদের মধ্যে কোথায় দেখা যায়? সামান্য একটু আলোচনায় দুই একটা বিষয়ে একটু ক্ষীণ চেষ্টা করিয়াই আমরা যথেষ্ট করা হইল মনে করি এবং নিশ্চিন্তপ্রাণে নিদ্রা যাই। এই সময় এদিকে আমাদের দৃষ্টি ও চিন্তা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। এ সকল ভাবিয়া আমাদের দুঃখ ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হওয়াই উচিত, যিনি দুর্ব্বলের বল, করুণাময় মঙ্গল-বিধাতা আকুল প্রাণে তাঁহারই শরণাপন্ন হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহার করুণা ভিন্ন আমাদের অপর কোনও সম্বল নাই; ব্যাকুল প্রার্থনা ব্যতীত দ্বিতীয় পথ নাই। তিনি কৃপা করিয়া আমাদের গুরুতর দায়িত্ব আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে সমর্থ করুন, এবং আমাদের দ্বারা তাঁহার কার্য্য করাইয়া লউন। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। এখানে তাঁহারই পূর্ণ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক। আমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যাই। তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হউক।

## অন্বেষণ

Seek and ye shall find, ask and it shall be given you; knock and it shall be opened unto you.

অন্বেষণ কর, প্রাপ্ত হইবে; চাও, তা হ'লেই পা'বে; দ্বারে আঘাত কর, দ্বার উন্মুক্ত হ'বে।

মহর্ষি ঈশা পাপতাপগ্রস্ত নরনারী, মুক্তিভিখারী মানুষকে এই আশার বাণী শুনিয়েছেন—অন্বেষণ কর, প্রাপ্ত হইবে; চাও তাহ'লেই পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তাহ'লেই ভগবানের দ্বার তোমার নিকট উন্মুক্ত হ'বে। খুঁজিলেই পাইবে, চাহিলেই পাইবে। তবে খোঁজার মত খোঁজা চাই, চাওয়ার মত চাওয়া চাই, দ্বারে প'ড়ে থেকে দ্বারে দিন রাত আঘাত করা চাই। তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

> যদি ডাকের মতন পারিতাম ডাকতে,
> তবে কি মা অমনি ক'রে তুমি লুকিয়ে থাকতে পারতে?

অন্বেষণ ক'রেছিলেন—সীতার অন্বেষণ করেছিলেন—রামচন্দ্র; রামায়ণে তাঁর যে বিশদ বর্ণনা পাই, তাহাতে ইহাও অনুভূত হয় যে তিনি প্রাণ মন সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'রে সীতার অন্বেষণ করেছিলেন, প্রতি বৃক্ষলতা, বন জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত, নদী তড়াগ, তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজিয়াছিলেন। সীতাকে না পেলে চলে না। কোথায় দণ্ডকারণ্য আর কোথায় কুমারিকা অন্তরীপ! পায়ে হেঁটে হেঁটে সব খুঁজিলেন—যাকে পান, পশু পক্ষী যাকে পান, মানুষ বানর যাকে পান, ঐ সীতাগতপ্রাণ রামচন্দ্র সবাকে জিজ্ঞাসা করেন; যে একটু সংবাদ দেয়, তাহাকেই হৃদয়ে ধারণ করেন। বানরের সঙ্গে সৌহৃদ্য করলেন; সাগর বন্ধন করলেন; যুদ্ধে কত বার প্রাণের ভাই লক্ষ্মণকে হারাইতে ছিলেন; ইষ্ট দেবতার তুষ্টির জন্য নিজের চক্ষু উৎপাটন করতে উদ্যত হ'য়েছিলেন। আমার সব যাক, প্রাণ যাক, তবুও সীতাকে চাই; তার উদ্ধার চাই—ইহাই অন্বেষণ।

> কালের প্রবাহে, ভাসিতে ভাসিতে, কোথায় আসিনু হায়।
> সীমান্ত-রেখা, নাহি যায় দেখা, সিন্ধুতে বিন্দু মিশায়,
> অনন্তের টানে, অনন্তের পানে, ধায় প্রাণনদী বাধা নাহি মানে,
> বাঁধা আছি যাঁর সনে প্রাণে প্রাণে, তাঁহারেই প্রাণ চায়।
> সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার, নিস্তব্ধ নিবিড় আঁধার,
> তার মাঝে জ্যোতির্ম্ময় নিরাকার চমকে চপলাপ্রায়,
> কেহ নাহি হেতা, তুমি আর আমি, অনন্ত বিজনে হে অনন্তস্বামী,
> কোথায় রাখিব, বল কি করিব, লইয়া আমি তোমায়।
> কাঁপাইয়া মহা নাদে বিশ্বধাম, "আমি আছি" রব উঠে অবিরাম,
> "তুমি আছ, তুমি আছ, প্রাণারাম", আত্মারাম দেয় সায়।

ইহা ত গেল কাব্যের কথা। প্রভু পরমেশ্বরকে চাও? তবে প্রাণ মন দিয়ে, একনিষ্ঠ হ'য়ে, তাঁর অন্বেষণ কর। কত সুখের আশা তোমার সম্মুখে উপস্থিত হবে, কত আরামস্পৃহা প্রাণে জাগ্‌বে, দশ জনে কত প্রলোভন দেখাবে, কিন্তু সব ছেড়ে দিয়ে, ঐ এক লক্ষ্য নিয়েই তোমাকে চল্‌তে হবে। যীশু যখন জন দি ব্যাপ্‌টিষ্টের নিকট দীক্ষিত হলেন, জলাভিষিক্ত হলেন, তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল—স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হলো—ভগবান যেন বল্‌লেন—This is my beloved son, in whom I am well pleased. এই-ই আমার প্রিয়তম সন্তান, এর প্রতিই আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। যীশুর নবজীবনলাভ হলো—ঈশ্বর তাহাকে আপনার ক'রে লইলেন। কিন্তু এ ত ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ, এখনও সংগ্রাম আছে, পাপ প্রলোভন আছে—সাধনা করতে হবে। চল্লিশ দিন নির্জ্জনে থেকে অনাহারে সাধন করলেন,—ক্ষুধায় পীড়িত, এই সুযোগ পেয়ে পাপ তাহাকে প্রলুব্ধ করতে এল। সয়তান বলিল, তুমি ত ক্ষুধার্ত্ত; ঈশ্বরপুত্র তুমি; তুমি হুকুম করলেই ত এই প্রস্তরগুলি সুখাদ্য পরিণত হ'তে পারে। যীশু বুঝ্‌লেন তার পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে—তিনি বলিলেন,—Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God—মানুষ ত কেবল অন্ন দ্বারাই জীবন ধারণ করে না; ঈশ্বরমুখনিঃসৃত বাণীই তাঁহার জীবনের অন্ন। সয়তান পরাস্ত হইল; তবুও সে ছাড়ে না; সয়তান আবার বলিল, এই গিরিশৃঙ্গ হইতে তুমি ঝম্প দিয়া পড়; তুমি ত ঈশ্বরের সন্তান, তিনি তোমাকে বাহু প্রসারিত করিয়া রক্ষা করবেন। যীশু সয়তানের প্রলোভন বুঝ্‌লেন; তিনি বলিলেন,—Thou shalt not tempt the Lord thy God,—প্রভু পরমেশ্বরকে পরীক্ষা করো না। তিনি তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন, কিন্তু তিনি রক্ষা করবেন ব'লে তাহাকে ত পরীক্ষা করা ভক্তের লক্ষণ নহে। সয়তান এবারও পরাজিত হইল, তবুও সে ছাড়ে না—পাপকামনা সহজে ত নির্ব্বাণ হয় না। সয়তান যীশুকে উচ্চ পর্ব্বতে নিয়ে চারি দিকে কত রাজ্য কত ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে বল্‌ল, তুমি যদি আমার সেবা কর, এই সকল রাজ্য ঐশ্বর্য্য

১৪ই এপ্রিল সায়ংকালীন উপাসনায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক বিবৃত।

তোমাকে আমি দিব। যীশু তার ছলনা বুঝ্লেন ;—তিনি অন্য রাজ্যে বাস করেন, এসব রাজ্য ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ। তিনি তেজের সঙ্গে বল্লেন,—Get thee hence Satan ; Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve.—সয়তান্ দূর হও ; একমাত্র প্রভু পরমেশ্বরকেই পূজা কর্বে, একমাত্র তাঁহারই সেবা কর্বে। পরীক্ষা পূর্ণ হলো, যীশু সম্পূর্ণ রূপে জয়লাভ কর্লেন—সয়তান অন্তর্হত হইল।

যিনি ধর্ম্মজীবনলাভ কর্তে চান্, তাঁহাকে একমাত্র ঈশ্বরেরই সন্ধান কর্তে হবে। ঈশ্বরভক্ত যে তাঁর আরও অনেক লাভ হ'তে পারে—লোকের উপর প্রভাব বিস্তৃত হ'তে পারে ; নানা প্রকার বিভূতি লাভ হ'তে পারে। কিন্তু সেদিকে তিনি লক্ষ্য রাখ্বেন না ; তাই যীশু বলেছেন—Seek ye first the kingdom of Heaven and every thing else shall be added unto you—সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য অনুসন্ধান কর, আর যাহা প্রয়োজন, তাহা আপনি আস্বে ; ধন জন মান প্রতিপত্তি আস্তেও পারে, নাও আস্তে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বৃত্তিসকল ফুটে উঠবে, প্রেম আস্বে, পুণ্য আস্বে, সত্যনিষ্ঠা আস্বে, আদর্শ আস্বে, বীর্য্য আস্বে, ত্যাগ আস্বে, প্রীতি আস্বে। এ সকল আস্বেই। কিন্তু এ সকলও লক্ষ্য নয়। এই সকল সাধনদ্বারা ঈশ্বরলাভ হয় বটে ; কিন্তু ইহাও চরম লক্ষ্য নয় ; চরম লক্ষ্য, একমাত্র লক্ষ্য, প্রাণে ঈশ্বরলাভ।

ভক্তিমতী মহিলা ম্যাডাম গেঁয়ো এক স্থানে বলেছেন—

Our Lord brought her to me, in order that she might understand the difference between that religion which consists in the possession of the spiritual endowments and gifts, and that which consists in the possession of the Giver.—আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের ধর্ম্ম, আর ঈশ্বরলাভের ধর্ম্ম পৃথক—ঈশ্বরকে যিনি প্রাণে পেয়েছেন, তাঁর দুঃখ শোকের মধ্যেও অনেক আধ্যাত্মিক শক্তি আস্বে ; কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তিলাভই তাঁর সাধনের লক্ষ্য নহে, লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ। তোমাকে চাই প্রভু, তুমি না হ'লে আমার চলে না। আর কিছু আমার আসুক আর না আসুক, তুমি এস প্রভু, আমার হৃদয়-আসনে তুমি এসে বস ; তোমাকে প্রাণের দেবতা, হৃদয়ের নাথ রূপে আমি দেখিতে চাই। তাই এদেশের শাস্ত্রকারগণও বলেছেন, ধর্ম্ম-সাধকের অনেক বিভূতিলাভ হ'তে পারে ; কিন্তু সেই বিভূতি-লাভ ক'রেই যে তৃপ্ত থাকিতে চায়, তার ঈশ্বরলাভ হলো না। ঐ খানেই তার গতিরোধ হলো। চাই ঈশ্বরকে, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, প্রাণারাম। এই ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হ'তে হবে ; তাঁর সন্ধান কর্তে হবে—আর যে সকল কর্ম্ম তাহা ঈশ্বরলাভের সহায় হ'তে পারে, সাধনপথে তাহার প্রয়োজন থাক্তে পারে, সাধন কর্তে কর্তে অনেক আধ্যাত্মিক বৃত্তি খুলে যেতে পারে, কিন্তু দৃষ্টি ঈশ্বরে, সন্ধান ঈশ্বরলাভের। তাঁকে না পেলে আমার অনুসন্ধানের বিরাম নাই ; কিছুতেই সোয়াস্তি নাই। এই লক্ষ্য স্থির রেখে চল্তে হবে—সাধনপথে, অনু-সন্ধানের পথে, চল্তে হবে।

এই অনুসন্ধান কর্তে হলে তাঁহার কৃপাই সম্বল ; "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" এই মহামন্ত্র যে আমরা সাধনের মূল সূত্র ক'রে রেখেছি —যতই দিন যায়, ততই ইহার ভিতরে কি গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে তাহা বুঝ্তে পারি। তুমি তাঁহাকে চাও, তিনিও তোমাকে চান। তিনি তোমাকে পাইবার জন্য ব্যগ্র,—তিনি যে তোমাকে ভালবাসেন, তিনি যে তোমাকে বরণ কর্বার জন্য বাহু প্রসারণ ক'রে আছেন ; অযাচিত ভাবেও কতবার এসে তোমার প্রাণ স্পর্শ করেন। তুমি হয়ত তাঁহার সে স্পর্শ বুঝ্তে পার না। তাঁহার আলিঙ্গনপাশ ছিন্ন কর্তে চাও ; তাঁহাকে চিন্তে পার না। তবুও তিনি আসেন। তুমি আমি যতই মলিন হই, তোমাকে আমাকেও তিনি চান, না হ'লে তাঁর প্রেম যে চলে না। আর, তোমাকে আমাকে কি কর্তে হবে—তাঁর হাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ কর্তে হবে।

ম্যাডাম গেঁয়ো বলেছেন—When self dies in the soul, God lives ; when self is annihilated God is enthroned যখন আমিত্বের বিলোপ হয়, তখনই ঈশ্বর হৃদয়-সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

He who gives himself to God, to experience under His hand the transformations of sanctifying grace, must be willing to give up all objects, however dear they may be, which he does not hold in strict subordination to the claims of Divine Love, and which he does not love in and for God alone. The sanctification of the heart in the strict and full sense of the term, is inconsistent with a divided and wandering affection.

যিনি ঈশ্বরের হাতে আপনাকে দিতে চান, তাঁর চিত্ত-পবিত্রকারী করুণায় হৃদয়ের যে পরিবর্ত্তন হয় তাহা অনুভব করিতে চান, তাঁহাকে ঈশ্বরের চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ কর্তে হইবে। তোমার যত ভালবাসার জিনিষই হউক, তাহা যদি তাঁহার ইচ্ছার অনুগত না হয়, তাঁহাতে এবং তাঁহারই প্রীতির জন্য তোমার প্রীতিকর না হয়, [illegible] তাহা ত্যাগ [illegible] হবে। যে প্রেম বিক্ষিপ্ত, যা[illegible] অন্যে এসে ভাগ বসিয়েছে, তাহাতে প্রকৃত ভা[illegible] জীবনের পরিবর্ত্তন, পবিত্রীকরণ, হয় না।

The searching question was—Were they willing to be nothing—nothing in themselves in order that the Lord might be all in all.

আসল প্রশ্ন এই—তোমরা কি আপনাকে শূন্য ক'রে ছেড়ে দিতে পার, তোমরা কিছুই নও এই বোধ জাগ্রত কর্তে পার, যাতে প্রভু পরমেশ্বরই তোমাদের সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পারেন ?

The doctrines of sanctification or of inward holy living, may be reduced for the most part to the two great principles of self-renunciation on the one hand, and of perfect union with the

Divine will on the other. He who has nothing in himself, has all in God.

এই অন্তরের পবিত্রতার ধর্ম্ম দেখিতে গেলে দুইটি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত—আত্মবিলোপ ও ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সম্পূর্ণ একীকরণ; যে নিজের কিছুই রাখে নাই, সে ঈশ্বরেতে সমস্ত প্রাপ্ত হয়।

অন্তঃ-দেবতা বলেন, ভয় নাই, আমার হাতে সমগ্র অর্পণ কর; আমিই তোমার সমস্ত বিধান করব।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

সকল অনুষ্ঠানের ধর্ম্ম, মতের ধর্ম্ম, ভাবুকতার ধর্ম্ম, বাহিরের ধর্ম্ম, পরিত্যাগ করিয়া একমনে আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করব, শোক করিও না।

কিন্তু মানুষের সাহস হয় না—একবার সে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করতে চায়, আবার ভয় পায়, নিজের উপর, ধন জনের উপর, বন্ধু বান্ধবের উপর, নির্ভর করে।

Generally speaking men have too little faith, too little courage, to leave the shore which is something tangible and solid and has the support of sense and to go out upon the sea which has the supports of faith only. They advance perhaps some little distance; and when the wind blows and the cloud lowers, and the sea is tossed to and fro, then they are dejected, they cast anchor and often wholly desist from the prosecution of the voyage.

সাধারণতঃ মানুষের নির্ভরের ভাব অতি কম, সাহস অতি ক্ষীণ; তারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আশ্রয় ছাড়িয়া, দৃঢ় স্পর্শযোগ্য তীর-ভূমি ছাড়িয়া, একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া সমুদ্রে যাইতে পারে না। হয়ত অল্প কতদূর তারা অগ্রসর হলো। কিন্তু যখন ঝড় উঠিল, বৃষ্টি পড়িল, সমুদ্র তরঙ্গায়িত হইল, তখন তারা হতাশ হ'য়ে পড়ে, নঙ্গর ফেলে অথবা সমুদ্রযাত্রা হতে—একেবারে বিরত হয়।

কিন্তু ঈশ্বরের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়া প্রতীক্ষা করতে হয়; তাহ'লে তিনিই পথ ব'লে দেন—God will not fail to indicate to me what course I should take, when on the one hand, he finds me ready to do His commands and when on the other hand He is ready to make His commands known. I leave, therefore, everything with Him and with his provindences. Thy will be done.

আমার কোন্ পথ গ্রহণ করা উচিত, তাহা পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আমাকে ব'লে দিবেন—যখন তিনি দেখবেন যে আমি তাঁর আদেশপালনের জন্ত প্রস্তুত আছি এবং যখন তিনিও আমাকে আদেশ জানাবার জন্ত প্রস্তুত। আমি সবই তাঁর বিধানের উপর রাখিয়া দিই। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

তাই বলি, ঈশ্বরকে যিনি পেতে চান, তাঁর অনুসন্ধান করতে চান, তাঁকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর হাতে আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। ঋষি বলেছেন—

এষাস্য পরমাগতিঃ এষাস্য পরমা সম্পদ
এষোঽস্য পরম লোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ

ইনিই আমাদের পরম গম্যস্থান, আবার সেই স্থানে যাবার ইনিই পরম সম্পদ, এই নামই আমাদের পথের সম্বল, সেখানে গেলে তিনিই পরম আশ্রয় এবং তিনিই পরম আনন্দ।

যে প্রার্থনাসহকারে তাঁর উপর নির্ভর করিয়া তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায় থাকে—প্রভু, আমি সুখ জানি না, দুঃখ জানি না, আমার গোপনে কোনও আসক্তি রাখতে চাই না, তোমাকে সব দিয়াছি, তোমার হাতের যন্ত্র হব, তুমি যাহা দিবে, সুখই হউক আর দুঃখই হউক, তাহাই মাথায় পাতিয়া ল'ব, তুমি যে আদেশ করবে তাহাই পালন করব—যে এই ভাবে বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় দ্বারে প্রতীক্ষা করে, তাহাকে নানা উপায়ে তিনি পথ ব'লে দেন; কোন্ পথে তাকে চলতে হবে, কি ভাবে অন্বেষণ করতে হবে, তাহা তিনিই ব'লে দেন। তাঁর নাম ত করতেই হবে। সজনে ও নির্জ্জনে তাঁর নাম করতে হবে। বিশ্বছবিতে তাঁর মধুর মুরতি দেখতে হবে—অন্তরে সুখ দুঃখের ভিতরে তাঁর প্রেমের লীলা দেখতে হবে। তাঁর ধ্যান, তাঁর নামকীর্ত্তন করতে হবে। তাঁর চরণে ব'সে কাতর প্রার্থনা জানাতে হবে। চলতে ফিরতে, সর্ব্বত্র সর্ব্বস্থানে, সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব অবস্থাতে, সর্ব্ব কর্ম্মে তাঁকে স্মরণে রাখতে হবে।

আর, জীবনের সমস্ত তাঁর হাতে দিতে হবে; তিনি যাহা হুকুম জানাবেন তদনুসারে চলতে হ'বে। তিনি কত ভাবে তাঁর আদেশ জানান; কত অবস্থার ভিতরে, কত উচ্চ আকাঙ্ক্ষার ভিতরে,—সময় সময় সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ আদেশ দিয়াও—তাঁর অভিপ্রায় জানান। আমরা অনেক সময় তাহা কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দিই। তাই আপনার শক্তির উপর দাঁড়াতে চাই; তাঁর উপর নির্ভর করতে পারি না। তাই ধর্ম্মপথে, সাধনপথে অগ্রসর হ'তেও পারি না। একটু তাঁর চরণে বসি, একটু আনন্দ পাই, প্রাণটা একটু সরস হয়, আর ভাবি, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ধার্ম্মিক মহাজন যাঁরা, তাঁরা তাঁর জন্ত পাগল হ'য়েছেন—চৈতন্ত পাগল হ'য়ে, কৃষ্ণরে বাপরে ব'লে চীৎকার করতেন, বিরহে অস্থির হতেন। মহম্মদ তাঁর বিরহে উন্মত্ত হ'য়ে হেরা পর্ব্বত হ'তে প'ড়ে জীবনত্যাগ করতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর জন্ত দেশে দেশে, পর্ব্বতে সমুদ্রে, নদীবক্ষে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর হাতে সমগ্র সম্পত্তি সত্যের জন্ত অর্পণ করেছিলেন। রাজার পুত্র, অতুল ঐশ্বর্য্য, তাহা ত্যাগ ক'রে ফকীর হ'তে যাচ্ছিলেন। তাঁকে চাই, তাঁর আদেশ অনুসারে চলতে চাই, তাঁর হাতে সমগ্র অর্পণ করতে চাই, ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল, সাধনার মূলমন্ত্র ছিল।

তাঁহার পথে যিনি চলেন, তাঁহাকে পাবার জন্ত যিনি ব্যস্ত হন, তাঁহার হাতে যিনি আত্মসমর্পণ করেন, তাঁর জীবনে আনন্দও আসে, আবার দুঃখও আসে; তাঁর জীবনে অনেক সংগ্রাম ও পরীক্ষা আসে; তখন ভয় পেলে চলবে না, তখন তাঁকে

বিশ্বাস ও নির্ভর ছেড়ে দিয়ে, আবার সুখের দিকে ফিরলে চলবে না। তাঁকে বলতে হবে—

Thy choice and mine shall be same,
Inspirer of that holy flame
Which must for ever blaze!
To take the cross and follow thee
Where love and duty lead, shall be
My portion and my praise.

যে পবিত্র অগ্নি সর্ব্বক্ষণ জলে, তাহা তুমিই প্রজ্জ্বলিত কর; তোমার ইচ্ছা এবং আমার ইচ্ছা একই হউক। তোমার প্রতি প্রীতি ও কর্ত্তব্য যেখানে আমাকে নিয়ে যাবে, সেই পথেই যাওয়া এবং তার ক্রুশ স্বরূপ কষ্ট ও বেদনার বোঝা বহন করা, ইহাই আমার জীবনের কার্য্য এবং ইহাতেই আমার প্রশংসা।

যিনি তাঁহার সন্ধান করতে চান, তাঁকে সরল চিত্তে, অভিসন্ধি-বিরহিত হ'য়ে, নিষ্কাম ভাবে তাঁর চরণে আসিতে হইবে—তাঁর নাম গান করতে হবে, তাঁর আদেশ প্রতীক্ষা করতে হবে। ঈশ্বরের জন্যই ধর্ম্মসাধন—অন্য কোনও অভিসন্ধি থাকবে না, ধন জন পদ মান লাভ, কোনও বিভুতিলাভ, এমন কি ধর্ম্ম-সমাজেও উচ্চ আসনলাভ, লক্ষ্য হবে না; লক্ষ্য হবেন তিনি। আমি মরিয়া যাই, তুমি জীবনের অধিপতি হইয়া থাক। জীবনের দুই জন স্বামী থাকবে না—এক ঈশ্বর, আর সংসার, নিজের সুখ সুবিধা।—তাঁহাকে যখন জীবনের স্বামীরূপে বরণ ক'রে সর্ব্বস্ব তাঁকে অর্পন করেছ, তখন তোমার সমস্ত ভার তাঁতে দিবে, তোমার নিজের কিছু রাখবে না; তোমার সুবিধা অসুবিধার চিন্তা করতে পারবে না। তুমি বলবে, এই আমার ধন, এই আমার সম্পদ, এই আমার সুখলালসা—সবই দিলাম তোমার চরণে, তুমি যা কর। আমরা অনেক সময় পাটোয়ারি বুদ্ধি দ্বারা চলি; তাঁর চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করার কথা বলি, অথচ আপনার উপরও নির্ভর করি, আপনার কতকগুলি আকাঙ্ক্ষা গুপ্ত ভাবে রাখি, বলি, প্রভু, ওখানে হাত দিও না। তা ত হবে না,—তিনি সেইখানেই হাত দেন; তোমার লুকান গুপ্ত ধনের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে। তোমার প্রিয়তম যে তাকেই হয়ত তিনি নিয়ে যান, অথবা তোমা হইতে দূরে রাখেন। তোমার অর্থ আছে, তুমি ভাব, এই ত ধর্ম্মকার্য্যে অনেক অর্থ দিলাম, আর অন্য কাজের জন্য কিছু রাখলাম। তা হবে না। তোমার প্রতি তাঁর আদেশ সর্ব্বস্ব আমার হাতে দাও; আমি তোমাকে যাহা দিব, তাহাই তুমি লইবে—হয়ত তোমাকে দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়াই কষ্ট পেতে হবে। আমরা অনেক সময়ে বলি, মানবের এত দুঃখ দৈন্য, কে তার প্রতীকার করে? এত মঙ্গল প্রতিষ্ঠান কে তাহার সাহায্য করে? কত প্রার্থনা কর, লোক আসে না, অর্থ আসে না। কিন্তু তুমি কি ভগবানের বাণী শোন নাই? তোমার প্রাণে যে ঐ প্রার্থনা জাগিয়েছেন, তাতেই তিনি আদেশ কচ্ছেন, আমি তোমাকেই চাই, আমি তোমারই সর্ব্বস্ব চাই। তুমি কি আমার বাণী শোন না? ঐ ভয় পাও কেন? আমার হাতে দাও—আমিই তোমাকে চালাব। অনেক সময় আমরা প্রার্থনা করি, ভগবান্ আমাকে প্রেম দাও, ক্ষমা দাও, অক্রোধ কর। প্রার্থনা ক'রে উঠলাম—অমনি এমন ঘটনা ঘটিল, যাতে মন তিক্ত হ'য়ে উঠতে চায়; কেহ এসে অনর্থক বিরক্ত করতে লাগল, কেহ এসে অযথা কটু কথা বলতে লাগল। ভগবান্ এ কি করলে! প্রেম, ধৈর্য্য, ক্ষমা যে রক্ষা করা যায় না! ভগবান্ বলছেন, ঐত তোমারই প্রার্থনা পূর্ণ কচ্ছি—তুমি চেয়েছ প্রেম, চেয়েছ ক্ষমা, চেয়েছ অক্রোধ—যদি অপ্রেমের কারণ না ঘটে, যদি ধৈর্য্য হারাবার সম্ভাবনা না ঘটে, যদি ক্রোধের কারণ না আসে, তবে প্রেম, ক্ষমা, অক্রোধ তোমার লাভ হবে কিরূপে? These are crosses of life—জীবনের এই সব পরীক্ষা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া, এই সব দুঃখ বেদনার ভিতর দিয়াই ঈশ্বরে নির্ভর শিখতে হবে—তাঁর আদেশপালন করতে হবে—তাঁর সঙ্গ উপভোগ করতে হবে। আমরা অপরাধ করি, পায়ে পড়ি, আমরা ক্ষমা চাই—প্রভু ক্ষমা কর, এই প্রার্থনা করি; আমরা দণ্ডের ভয় পাই, কিন্তু সে ত প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসুর ভাব নয়। ধর্ম্মপিপাসু বলিলেন,

দাও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা হয়,
খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ-হৃদয়;
তোমার হাতে ম'লে এ মহা পাতকী
নব জীবন পাবে।

প্রভু, আমি অপরাধ করেছি—
অপরাধ যত করেছি ও পদে
না কর যদি ক্ষমা,
তবে পরাণ প্রিয়, দিও হে দিব
বেদনা নব নব।
তবু ফেল না দূরে, দিবসশেষে
ডেকে নিও চরণে,
তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার
মৃত্যু-আঁধার ভব।

আমাকে দণ্ড দিয়ে, দুঃখের অনলে দগ্ধ ক'রে, শুদ্ধ ক'রে, তোমার চরণে স্থানলাভ করবার উপযুক্ত কর। তুমি আমার প্রভু, "তোমার হাতের বেদনার দান এড়া'য়ে চাহি না মুকতি।"

প্রকৃত ভাবে যিনি ঈশ্বরকে [illegible] করেন, তাঁকে ধর্ম্মের শাঁস ও খোসার মধ্যে [illegible] জেনে, ধর্ম্মের [illegible], মূল সূত্র যা, শাঁস যা [illegible] নিয়েই প'ড়ে থাকতে হবে। ধর্ম্মে অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে, প্রক্রিয়ার প্রয়োজন আছে—কিন্তু তাহা বাহিরের জিনিষ, অবান্তর বিষয়—আসল জিনিষ ঈশ্বরে প্রীতি ও সেই প্রীতি-অনুপ্রাণিত প্রিয়কার্য্যসাধন। তুমি তাঁর চরণে ব্যাকুল ভাবে, বিনা অভিসন্ধিতে, আপনার প্রাণের কথা জানাবে—সকল সময়ে তাঁর চিন্তা করবে, সর্ব্বত্র তাঁকে দেখবে—এই সোজা পথ, তাঁর নাম করবে, ব্যাকুল ভাবে তার নাম-কীর্ত্তন করবে। অন্তরদেবতাকে অন্তরে দেখবে। তোমার প্রচলিত বিধি অনুষ্ঠানের বাঁধা বাঁধি নিয়ম না মানতে পার ক্ষতি নাই, ঐ অনুষ্ঠানে জোর দিলেই ধর্ম্মে সংকীর্ণতা আসে, বিরোধ আসে, অপ্রেম আসে। ধর্ম্ম—প্রকৃত ধর্ম্ম—অন্তরের। খোলা প্রাণে তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করবে, তাঁর নাম গান করবে,

তাঁর ধ্যান করবে, তাঁর আদেশ প্রতীক্ষা করবে। শাস্ত্র, গুরু, অনুষ্ঠান সহায় হবে—কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্র ঈশ্বরের সাক্ষাৎ বাণী, প্রকৃত গুরু স্বয়ং ঈশ্বর, প্রকৃত অনুষ্ঠান ব্যাকুল প্রার্থনা, কাতর আত্মনিবেদন।

তাই বলি, তাঁর হাতে সম্পূর্ণ রূপে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে, তাঁর দেওয়া সুখ দুঃখ আনন্দে বহন করতে প্রস্তুত হ'য়ে, তাঁর আদেশ পালন করবার জন্ম ব্যগ্র হ'য়ে, তাঁর অন্বেষণ করতে হবে। যে টুকু আলোক তিনি দেখাবেন, সেই টুকু আলোক দেখেই চল্‌তে হবে—যে কাজ হাতে নিতে তিনি আদেশ অথবা ইঙ্গিত করবেন্ সেই কাজেই অগ্রসর হ'তে হবে। তাতে নিন্দা হ'তে পারে, অপমান হ'তে পারে, নির্য্যাতন আস্‌তে পারে, আপনার প্রিয়জনও পরিত্যাগ করতে পারে—কিন্তু তোমাকে সেই পথেই চল্‌তে হবে,—তুমি যে তার কাছে আত্মবিক্রয় করেছ। কিন্তু এই যে সকলের অমতেও তোমাকে চল্‌তে হবে, সকলের কোপ-দৃষ্টির ভিতরেও তোমাকে চল্‌তে হবে, সকলের নির্য্যাতন সহ্য ক'রেও তোমাকে চল্‌তে হবে, তাতে তোমাকে যেন কঠোর না করে—কারও প্রতি যেন তোমার ক্রোধ না হয়, প্রাণে যেন অপ্রেম না আসে। সকলের প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি, সকলের প্রতি প্রেম রেখে, হাসি মুখে ঈশ্বরের আদেশ পালন ক'রে যাবে।

Seek and ye shall find—তাঁর সন্ধান কর—একমাত্র তাঁকেই চাই, তাঁহার দেওয়া সুখ সম্পদ, মান প্রতিপত্তি, বিভূতি আমার লক্ষ্য নয়—আমার লক্ষ্য তিনি, তাঁকে আমি চাই, সেই জন্ম এই জীবন মন, এই সময় শক্তি, সমস্ত তাঁকেই দিয়েছি, তাঁরই হাতে জীবনের ভার দিয়েছি, তাঁরই নাম দিন রাত জপ করিতেছি, তাঁরই দেওয়া সুখ দুঃখ মাথায় পেতে নিতেছি, তাঁরই আদেশ, অকুণ্ঠচিত্তে পালন করিতেছি—এই ভাবে তাঁতে প্রীতি ও নির্ভর রেখে তাঁর সন্ধানে অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়। ভয় নাই, তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না,—তাঁর প্রকাশ দেখে, তাঁর স্পর্শ পেয়ে, আনন্দময়ের আনন্দ রূপ দেখে কৃতার্থ হবে, জীবন ধন্য হবে।

## অমর কথা (১৯)

### The thought of Etornity.

### অমর চিন্তা

রূপের পারে অমৃত ধাম—
তোমার বুকেই র'ব,
চুপে চুপেই মন গোপনে
প্রাণের কথা ক'ব।
শুদ্ধ হব কেমন ক'রে
দেখাও বিমল বিভা,
আকুল আমি, অন্ধ আমি,
দেখাও মরণ-নিভা।
দিলে যদি তোমার হ'তে
নিত্য নব নব,
বাজাও সখা মাভৈঃ বাণী,
তবেই সকল স'ব।
বুকের মাঝে বিপুল ব্যথা,
আকুল কর মোরে,
এস হে প্রিয় পরাণসখা,
হৃদয় আলো ক'রে।
কবে আমার ফুটবে আঁখি,
দেখ্‌ব তোমার আলো,
কবে আমি চিন্‌ব সখা,
কোন্‌টা আমার ভালো!
ভু'লে যাব ভবের চিন্তা
করুণ মধুপানে;
দেখ্‌ব শুধু স্বরগ-লীলা,
ছুটব তোমার পানে।
সব কুহেলী যাবে স'রে,
দেখায় যারা ভয়,
সফল হবে সকল খেলা—
জয় তোমারি জয়।
যবনিকা স'রে যাবে,
নিবিড় যত কালো,
এক নিমেষে উঠবে জলে
সত্য পথের আলো।

ভক্তপ্রাণের আনন্দসাধনার সঙ্গে সঙ্গেই অমরজীবনের আশা। প্রেমের বিচিত্র মহিমার ভিতরই মানবের বুকে অমৃতের পিপাসা। এই ঐহিক বেদনা সংগ্রামের মাঝখানেই মানুষ অথচ চিরদিন বাস ক'রতে চায়,—যতই কেন দুঃখ কষ্ট পাক্ না, যতই কেন চোখের জল পড়ুক না, তবু এখানেই তার সাধের কুঞ্জ রচনা ক'রতে চায়! তাইত মৃত্যুভয়! একদিন মানবের সকল বেদনার সকল যাতনার অবসান হবে, তবুও শেষ শ্বাসটী ফেলে যখন মানুষ, তখনও কি তার বাঁচবার আশা!

প্রত্যেকের প্রাণখানির উপর কি নিবিড় মমতা! তাই যেই মরণ-সুরে চম্‌কে উঠি, সঙ্গে সঙ্গেই অমৃতের আশা জেগে ওঠে। প্রেমই এই ঐহিক বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত বন্ধন আশা করে। কে এ মঙ্গল প্রেম জাগাল? প্রেমসখার মঙ্গল রহস্যেই মানবের হৃদয়কাননে এ প্রেমকুসুম বিকসিত। তাই সকল দৈহিকতার পরপারেও এ প্রেম ছুটতে চায়। সকল জাতিতে—যাকে অসভ্য বলি, অশিক্ষিত বলি, সেখানেও—সেই অমরজীবন-আশা। আবার ভক্তগাথার আনন্দ গানেও সেই অমৃতের আলো উজ্জ্বলতর হোয়ে ওঠে, অমৃতের বাণী বরাভয় গান শুনিয়ে যায়।

অতি বড় চঞ্চল চপল মানুষও এ কথা কই উপেক্ষা কোরতে পারে? যতই কেন উপেক্ষা করা হউক না, যতই কেন মানুষ রিপুর শত উত্তেজনার ক্ষুদ্র জড়তার মোহে বিধাতার মঙ্গল অস্তিত্বে সন্দিহান হউক, যতই কেন মৃত্যুকে অগ্রাহ্য ক'রতে চা'ক্, তবুও মঙ্গল মুহূর্তে সময় সময় অজ্ঞাতসারেই কেমন-

অমরত্বের আভাস তার প্রাণে জেগে ওঠে তখন সেই অবিশ্বাসী প্রাণই ভয়ভাবনায় আকুল হ'য়ে ওঠে।

এই জগৎ ত চিরদিনের লীলাঘর নয়,—দুদিনের জন্ত খেল্‌তে আসা। অনন্ত উন্নত আনন্দধামে যাত্রা ক'রতে হবেই, তাই ঐহিক জীবনের এ আনন্দবিকাশ। তাইত যুগে যুগে, সকল দেশে, সকল কালে, সকল জাতিতে, একই বাণী—ভগবদ্বিশ্বাস, বিবেকের আনন্দজাগরণ আর সত্য অনুভূতি, অনন্ত জীবনের পিপাসা। এই স্বতঃসিদ্ধ আকাঙ্ক্ষাই মানবজাতির পরম কল্যাণ-আদর্শ বিকসিত কোরছে।

ভগবদ্বিশ্বাস, বিবেকের আনন্দজাগরণ, সত্য বিচার আর অমরত্ব—এ যদি মানব ইতিহাসে বাদ দেওয়া যায়, তবে আর তার মনুষ্যত্বের মহিমা কোথায়? কে তবে তাকে ঐহিকতা দৈহিকতার উর্দ্ধে নিয়মিত করে? ভাবুক ত মানুষ এক বার সেই মানবসমাজ যেখানে ধর্ম্ম নেই, সত্যনিষ্ঠা নেই, ভগবানে বিশ্বাস নেই, ভালমন্দের বিচার নেই, অমর জীবনের আশা নেই, আছে কেবল বাসনা, বিকার, মোহমুগ্ধ চঞ্চল স্বার্থসেবিত বিশৃঙ্খলিত জীবন। কে রক্ষা কোরবে? কার চোখের জল সান্ত্বনার বাণী শোনাবে? কে কাকে মমতার বুকে টেনে নেবে? কেবলই নির্ম্মম বিশৃঙ্খল নিষ্পীড়ন। কি মহা শ্মশানের তাণ্ডব প্রলয়!

জীবনের অনন্ত আশার বিশ্ববিজয়ী ঐন্দ্রজালিক প্রভাবেই অশিক্ষিত দীন জীবনেও কত আশার আলো উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে! অমর —অনন্তকাল এক মঙ্গলময় দেবতার বুকেই আছে সবাই—তাইত দুর্ব্বল মানুষেরও এই বিচিত্র অধিকার!

হয়ত অমরজীবনে বিশ্বাস করি বলি, কিন্তু সে আনন্দ প্রস্তুতি কই দৈনিক জীবনে? তাই ত মৃত্যুর নামে বিষাদ-বেদনার সৃষ্টি! কেন এমন হয়? এ কেমনতর অমরত্বে বিশ্বাস, যদি তার বুকে আশার আলো জ্ব'লে না ওঠে? আসুক্ না যে কোন মুহূর্ত্তে আমার মৃত্যু, দুঃখ কেন?

সত্যি কি অমৃতে আনন্দ-আশা জাগে? সত্যি কি আনন্দে অমৃতধামে যাত্রা করেছ? সত্যি কি আনন্দে ভবপারাবারে চ'লে যেতে চাই? তবে কি হবে অমরত্বের কথায়? প্রতিদিনই ত মরণ-গান বেজে যাচ্ছে সংসারে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, একদিন ত মরণসখার সত্য স্বরূপখানি প্রকাশিত হবেই হবে। বন্ধুরূপে মরণসখা এসেছেন কি? চলেছে ত অগণ্যযাত্রী সে পথে, কে মৃত্যু-যবনিকা তুলে অমৃতের আলো দেখাবে? কে এ বিচিত্র রহস্য ভেদ কোরবে? তবু অমৃতের আশা বুকে নিয়েই আত্মমন্দিরে জীবাত্মা অমরসভায় বোস্‌তে চায়। কে সে তত্ত্ব প্রচার কোরবে? ক্ষুদ্র জ্ঞান এ দৃশ্য জগতেরই বা কি বুঝ্‌ল? কি জানি, কি বুঝি? কেন এ ঘন যবনিকা? কেন এ সমাধি-পরিচয়? কে সে ব্যাখ্যা দান কোর্‌বে?

তবুও ত অমৃতের আশাই অমৃতময়ের বুকে নিয়ে যেতে চায়। অমৃত আমায় সৃষ্টি করেছে। যুগ যুগান্তর ধ'রে সকল সুখ দুঃখে অমৃতের বাণী মানবের তপ্তবুকে সান্ত্বনার আনন্দসুধা ঢেলে দিচ্ছে। তাইতো প্রস্তুতির কথা। তাই ত জ্ঞান ও ধর্ম্মসাধন, তাই ত অমৃতসুধাপান, তাই ত যোগানন্দ, তাই ত সত্যসাধনতৎপরতা। কি হবে ঐহিকতার ব্যর্থ ধনসম্পদ-লাভে? সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এই বীজমন্ত্র। সকল ধর্ম্মোপদেশের এই মর্ম্মকথা। আত্মা-পরমাত্মার মিলনসাধনা—সকল কর্ম্মে সকল অনুষ্ঠানে ভূমানন্দযোগ। প্রতিদিন মহাযাত্রারই উদ্বোধন। শান্ত সাধনা, অমৃতসুধাপান! এ কি অধিকার! এ কি আনন্দ! এ কি শুভ্র সুবিমল সত্তা!

তাই বোলে কি আমার প্রিয়ধনের মহাযাত্রা আমায় আকুল কোর্‌বে না? প্রেম যে চায় প্রেমাস্পদের দিকে ছুটতে—প্রেমনদী যে মিল্‌তে চায় মিলনানন্দসাগরে। কেন তবে এ বুক-ফাটা ক্রন্দন? কেন তবে এ বিরহগান? জানি কি সকল বিফলতার পরম সার্থকতা কেমন ক'রে হবে?

জানি অমরচিন্তা মানবের জন্ত দেবলোকের আনন্দ-আভাস নিয়ে আস্‌ছে—এ কখনও বিনাশের পূর্ব্ব সূচনা নয়। দুদিনের ন্যস্ত ধন ভোগ করি, তবু যে তাও চিরসত্যে প্রতিষ্ঠিত, পূর্ণানন্দ দেবতার দান, দীনাত্মারও সে অব্যক্ত অধিকার!

অমরচিন্তা কি তবে সংসারবিমুখীন কোরবে মানুষকে? তাঁর আনন্দবাজারে বিষাদকালিমা ঢেলে দেবে? তা কেন হবে? আনন্দে আনন্দনিলয়ে বাস করি। আবার আনন্দ-বুকেই আনন্দ-প্রয়াণ। সেদিন কেন ভয়ের কথা? প্রাণসখা যুগ যুগান্তর ধ'রে ধরণীর বুকে এ কি মঙ্গলমাধুরী—আনন্দ-সুষমা ফুটিয়ে তুল্‌লেন, আর মৃত্যুমাঝে কি সব ধূলিসাৎ? কখনই না! জানি কি অসীমের অসীম তত্ত্ব? ইচ্ছামঙ্গলেই প্রাণ সমর্পণ করি।

ক্ষুদ্র মানুষ কেমন কোরে ফুটে উঠ্‌বে কে জানে? ক্ষুদ্র অঙ্কুরদল হোতেই বিরাট বৃক্ষের পরম পরিণতি। কে জানে এই নশ্বর লোকেই শাশ্বত জীবনের কি মঙ্গলসূচনা? মৃত্যু যাকে বোলতে গেলাম, সেই ত অমৃতসোপান হোয়ে এল! আমি অমৃতে বাস করি, তবে সত্য দান সম্ভোগ করি, অমৃতের ফলাকাঙ্ক্ষী হই। এ ত শুধু সম্ভোগ নয়। এ কথাও সত্য, আছে দুঃখ, আছে বেদনা, আছে কণ্টকাকীর্ণ পথ, শুধু ফল নয় তার মাঝখানেই; কেমন অনন্ত পথের যাত্রী অনন্তের গান গেয়ে গেয়ে চলেছে! যখনই অবিশ্বাস তখনই আত্মবিনাশ। আসি নি ধরার বুকে স্ব-ইচ্ছায়, যাবও না নিজের ইচ্ছায়। বেদনা আসে, দুঃখ আসে, ব্যথা যে আর সইতে পারি নে, ব্যর্থ বোঝা যে আর বইতে পারি নে! ওগো বেদননাশন জীবনদেবতা, তোমারই ইচ্ছায় সব দুরপরাহত। আমি ত কিছু বুঝি না, তোমার ইচ্ছারই জয় হউক।

তবে আসুক্ সে অনন্ত বিশ্বাস, পরিপূর্ণ নির্ভরতা। সকল সুখ দুঃখ পরীক্ষা দেবতার চরণে নিবেদন করি। যখন তাঁর ইচ্ছা হবে শেষ হবে। আসুক অনন্ত বিশ্বাস। ওগো মৃত্যুঞ্জয়, তোমার আনন্দ অভয়বুকে সকল ভয়ের অবসান হউক।

আমারই পরাণ-পাখী
গাহিল ও কোন্ সুরে,
মুক্ত আজি কোন্ বরে
চলেছে অমরপুরে ?
অই পাখী ওড়ে বুঝি
মেলে দিয়ে পাখাখানি,
সখার মহিমামাঝে
শোনরে তাঁহারি বাণী।
বসুধাজননীবুকে
চেতন-মহিমা মোর,
ধূলি মাঝে ধূলি মেশে
খুলে গেল সব ডোর।
কোথা তবে জাগি আমি—
অক্ষয় মহিমাময়
জ্যোতির সাগরমাঝে
ছুটে চলি দয়াময়।
বল আমি, আছি কেন,
কোথা যাব কোন্ দেশে,
কে নেবে সমাধিপুরে
চেতন মোহন বেশে।
দেবজ্যোতি ওঠে ফুটে
আমারই ধূলিরূপে,
অঙ্গে অঙ্গে ভ'রে গেল
স্বরগ-মধুর ধূপে।
ক্ষুদ্র আজি প্রাণপাখী
অনন্ত জীবন পায়,
ব্রহ্মকৃপা নেয় বুকে,
আন মনে গান গায়।
রাজসিংহাসন তব
চরণ-দেউলে আনে,
ঢেলে দিই দীন অর্ঘ্য
তোমার মহিমাগানে।
সত্য তুমি, সত্য আমি,
সত্য-লোকে উঠি ফুটে,
হেসে গাই গানখানি
সকল বাঁধন টুটে।
শত্রু মিত্র সব দেখি
তোমারি ঘরেতে জাগে,
সে কোন্ পুলক-সুরে
সে সুধা-অমিয় মাগে ?
মৃত্যু-সুরে জয়ধ্বনি
বাজিল স্বপের পারে,
ভস্মমুঠি নিয়ে এল
ত্রিদিব-মন্দিরদ্বারে।
আসা যাওয়া সব খেলা
তোমাতেই জেগে রাখা,
আনন্দসঙ্গীতলোকে
প্রেমানন্দে মাখা মাখা।
দেবলোকে দেবগানে
ভরেছে পূজার ঘর,
তারই মাঝে ব'সে আছি
প্রেমময় হে সুন্দর।

## ব্রাহ্মসমাজ

া—বিগত ৮ই মে কলিকাতা সাধনাশ্রমে নজিলপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ অতুলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য বি এ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে সাধনাশ্রমে ৩৲ ও প্রচার বিভাগে ২৲ প্রদত্ত হইয়াছে। আমরা নবদীক্ষিতকে সাদরে গ্রহণ করিতেছি। করুণাময় পিতা তাহাকে পবিত্র ধর্ম্মজীবনে দিন দিন অগ্রসর করুন।

**প্রচার**—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী গত ৫ই মার্চ্চ কলিকাতা হইতে গোয়ালপাড়ায় যাত্রা করেন। ৮ই ও ৯ই মার্চ্চ গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত রামপুর গ্রামে রাভা জাতীয় সম্মিলনীর সভাপতিরূপে কার্য্য করেন। আসামী ভাষায় লিখিত যে অভিভাষণ তিনি পাঠ করেন, তাহাতে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, জাতির উন্নতি ধর্ম্ম জ্ঞানানুশীলন প্রেম ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং ঈশ্বরকে না জানিলে ও তাঁহার উপাসনা না করিলে কোন জাতি বা মানব উন্নত হইতে পারে না। রাভা জাতির উন্নতিমূলক কয়েকটি প্রস্তাবও তিনি উপস্থিত করেন। তথা হইতে একজন দীক্ষার্থীকে সঙ্গে লইয়া আলিয়ায় দুইদিন অবস্থান করিয়া তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। তৎপর ভীমাজুলি নামক গ্রামে সম্মিলিত গারোগণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করেন ও নিকটবর্ত্তী রাভাগ্রামের গ্রামবৃদ্ধকে আহ্বান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন। তৎপর নিশানগ্রাম ও দশমাস নামক গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়া গারোপর্ব্বতের সীমান্তে নলবাড়ী গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীযুক্ত শ্যামদাস কাছারী ও শ্রীযুক্ত পতিরাম রাভা উভয়কে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। শ্রীযুক্ত শ্যামদাসের গৃহে ৬।৭ দিন অবস্থিতি করিয়া দীক্ষার্থীগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন এবং ৫ মাইলের মধ্যস্থিত কয়েকটি রাভাগ্রামের অধিবাসীদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। শ্রীযুক্ত শ্যামদাস স্বগ্রামে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। অবিনাশ বাবু নলবাড়ী হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী রিবুনামক গ্রামে গমন করিয়া একজন শিক্ষিত গারোর

সহিত ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করেন ও তাহার গৃহে উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র দাস নিসানগ্রাম হইতে রিবু পর্য্যন্ত অবিনাশবাবুর সঙ্গে থাকিয়া প্রচারকার্য্যে সহায়তা করেন। তাহার পরে নলবাড়ী হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী রাজা সিমলা গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র দাসের গৃহে ৯ দিন বাস করিয়া উপাসনা, গ্রামবাসীদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা ও একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র দাসের গৃহে তদীয় পত্নী শ্রীমতী বিদিনি সিরা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হয়েন। গ্রামবাসী গারোগণ খৃষ্টানধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, বহু নরনারী উপাসনা ও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন। রাজা সিমলাকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্রের সহিত তিনি মেলোগ্রাম, থাবকুটা প্রভৃতি গারোগ্রামে গিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন এবং উক্ত তিনটি গ্রামে মাণিকচন্দ্রের দ্বারা নিয়মিত উপাসনা যথাসম্ভব রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শান্তিপুর গ্রামে গত বৎসর হইতে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে স্থানীয় স্কুলের রাভা শিক্ষক ও ছাত্রগণ যোগদান করিয়া থাকেন। অবিনাশবাবু এক রবিবার তথায় উপাসনা করেন ও আর একদিন শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ রাভার গৃহে উপাসনা করেন। তথা হইতে ঠেকাসু গ্রামে গিয়া সম্মিলিত রাভা যুবক ও বয়োবৃদ্ধগণের নিকট ধর্ম্মপ্রচার করেন এবং ঠেকাসু হইতে ২ মাইল দূরবর্ত্তী থারাগ্রামে গিয়া বোরো বা কাছারি সমাজের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত নরপতি বসুমাতারির সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করেন। তৎপর গোয়ালপাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একদিন স্থানীয় ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী হলে "ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞান" সম্বন্ধে বক্তৃতা, একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের গৃহে কয়েকদিন উপাসনা করেন। নববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়।

গোয়ালপাড়া হইতে অবিনাশবাবু গৌহাটী গমন করিয়া কতিপয় ব্রাহ্ম ও সহানুভূতিকারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং একটি জিজ্ঞাসু যুবকের সহিত দুইদিন ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন। তথা হইতে আসাম নওগাঁ গমন করিয়া স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে দুইদিন উপাসনা করেন, হাইস্কুল গৃহে এক প্রকাশ্য সভায় "ব্রহ্মজ্ঞান ও পৌরাণিক ধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা করেন ও সবডেপুটি কালেক্টার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্তের গৃহে কয়েকদিন উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের গৃহে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করেন। মিকির জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করাই অবিনাশ বাবুর নওগাঁ গমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া নিজে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহার সহযোগী ও বন্ধুগণকে অনুরোধ করিয়া অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। মিকির জাতির মধ্যে প্রচারার্থে অবিনাশবাবু নওগাঁ হইতে যমুনামুখ গমন করেন। ৩৪ মাইলের মধ্যে ৭টি গ্রামের বয়স্ক মিকিরগণ ব্রাহ্মধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য রহধলা গ্রামে একটি বৃক্ষতলে সমবেত হইয়াছিল। অবিনাশবাবু তাহাদিগের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যা করেন ও তাহাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরদান করেন। ইহা ব্যতীত তিনি চারিটি মিকির গ্রামে গিয়া বয়োবৃদ্ধগণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করেন। যমুনামুখ হইতে হোজাই নামক স্থানে গমন করিয়া অনতিদূরবর্ত্তী একটি মণিপুরীদিগের গ্রামে ও একটি পাহাড়িয়া মিকিরদিগের গ্রামে গিয়া গ্রামবাসীদিগের সহিত তাহাদের কল্যাণকর বিষয়ে আলাপ করেন।

তথা হইতে তিনসুকিয়া গমন করিয়া শ্রীযুক্ত হরেশ্বর বড়-পুজারির গৃহে কয়েকদিন উপাসনা করেন, কতিপয় জিজ্ঞাসু যুবকের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন (তাহার মধ্যে দুইজন আহোম যুবক ছিলেন), একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং তিনসুকিয়ায় সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনসুকিয়া হইতে ডিগবয় গমন করিয়া ইণ্ডিয়ান ক্লাবগৃহে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র নাথের গৃহে একদিন উপাসনা করেন, স্থানীয় ব্রাহ্ম ও অপর ভদ্রলোকদিগের সহিত ধর্ম্ম ও অপরাপর বিষয়ে প্রসঙ্গ করেন এবং সাপ্তাহিক উপাসনা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার ব্যবস্থা করেন।

মে মাসের প্রথমভাগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি রংপুর গমন করিয়া একদিন সমাজমন্দিরে রবিবাসরিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং অন্যদিন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন।

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৫ই মে গিরিধি নগরীতে রায় সুরেশচন্দ্র সরকার বাহাদুরের পত্নী সরোজিনী সরকার বহুমূত্র রোগের অবস্থায় হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৬ই মে ময়মনসিংহ নগরীতে পরলোকগত ডাক্তার জে এন মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী শরৎকুমারী মিত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি অনুরাগের জন্য তিনি পরিচিত সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন।

বিগত ১১ই মে কলিকাতানগরীতে রায় প্রসন্নকুমার দাশগুপ্ত বাহাদুর দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নানাপ্রকারে নানাস্থানে ব্রাহ্মসমাজের অনেক সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোক-গমনে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

---

**শুভ বিবাহ**—গত ৯ই মে ঢাকার পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্যাণীয়া কুমারী লাবণ্যের সহিত, বরিশাল প্রবাসী শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাসের

জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ জীবনানন্দের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

---

**নামকরণ**—তিনসুকিয়া নগরীতে গত ৪ঠা মে শ্রীযুক্ত হরেশ্বর বড়পূজারীর পঞ্চমকন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যার পিতা এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ দান প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মঙ্গলবিধাতা কন্যাকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

---

**দান**—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দে পরলোকগত পিতা রজনীকান্ত দের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পিতার নামীয় স্মৃতিভাণ্ডারে এক শত টাকার একখানা কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস পরলোকগতা ভগিনী ইন্দুপ্রভা চাটার্জ্জির বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ভগিনীর নামীয় স্মৃতি ভাণ্ডারে ৫০ টাকা দান করিয়াছেন। এ সমস্ত দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

**পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ**—বিগত ১০ই মে, সমাজমন্দিরে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রার্থনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করেন—"মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য দেশসেবকগণ কারারুদ্ধ হওয়ায় এই সভা দুঃখিত"। কেহ কেহ এই প্রস্তাবে আপত্তি করিলে পর, প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং অধিকাংশের মতে গৃহীত হয়। অতঃপর সমাজের বার্ষিক রিপোর্ট ও পরীক্ষিত আয় ব্যয়ের হিসাব গৃহীত হইলে পর, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অধিকাংশ ভোট প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন:—(১) শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ, (২) শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু, (৩) শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (৪) শ্রীযুক্ত বঙ্ক বিহারী কর (৫) রায় [illegible] পি এম্ দাস, , (৬) শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল, (৭) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন;—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন—সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার বসু ও রণেন্দ্রকুমার দাস—সহকারী সম্পাদক, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—রামমোহন রায় লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন দাস—অডিটার।

---

**ছাত্রীগণের কৃতিত্ব**—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ পরীক্ষাতে নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম:—

বি এ—বাসন্তী দাস গুপ্ত (দর্শন শাস্ত্রে অনার্স—২য় বিভাগে), অনিলা বসু—(অর্থনীতি শাস্ত্রে অনার্স—২য় বিভাগে), বীণা গুপ্ত (পাশ)।

হাইস্কুল—প্রথম বিভাগে—নীলিমারেখা ঘোষ (প্রথম স্থান অধিকার করিয়া), সুচন্দ্রিমা বসু, চারু নন্দী, পারুল বালা সেন, রেণুকা মিত্র, সুধারাণী রায়, শান্তি দাস গুপ্ত, বীণাপাণি গুপ্ত, পারুল দাস গুপ্ত, সন্তোষ সেন, রেণুকা রুদ্র, প্রীতিময়ী সেন, কমলা বসু, সরযুবালা বিশ্বাস, অশোকা গুপ্ত, আল্‌তাফুন্নেসা কাজী, সুনীলা বানার্জ্জী, তরুলতা বসু, ক্যাথলীন এণ্টনী, প্রীতিলতা গুপ্ত, ননীবালা রায়, রেণুকা সেন, আশালতা শীল, সুষমা বসু। ২য় বিভাগে—চারুলতা দে, পারুলবালা দে, শেফালিকা ঘোষ, প্রীতিকুসুম গুপ্ত, লীনা মিত্র। তৃতীয় বিভাগে—বাসনা সেন।

ইণ্টার মিডিয়েট—প্রথম বিভাগে—প্রীতিলতা ওয়াদ্দার (৫ম স্থান অধিকার করিয়া), প্রতিভাময়ী গুপ্ত, ঊষাবালা সেন গুপ্ত, আভা ঘোষ, শান্তিকুসুম সেন গুপ্ত। ২য় বিভাগে—সুনীতি বিশ্বাস, সুরমা দাস, বীণাপাণি দাস গুপ্ত, পারুলবালা দাস গুপ্ত, পুণ্যপ্রভা দাস গুপ্ত, ঊষারাণী দাস গুপ্ত, বকুলপ্রভা দত্ত, রেণু দত্ত মজুমদার, আভাময়ী গুপ্ত, পারুলবালা নন্দী, সুধারাণী রায়, মাত্রী সেন গুপ্ত, শৈলবালা সেন গুপ্ত।



ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ১৫ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৩ম ভাগ — ৪র্থ সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১
30th May, 1930.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পিতা, তুমি যে তোমার অসীম প্রেমে ও স্নেহে শুধু আমাদিগকে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছ এবং আমাদের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক সকল ব্যবস্থা করিতেছ তাহা নহে, আমাদিগকেও তোমার বিশুদ্ধ প্রেমের এক কণা দিয়া গড়িয়াছ, আমাদের হৃদয়েও তোমার সে-প্রেম সঞ্চার করিয়াছ। কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময়ই তোমার প্রেমের নানা দান ভোগে এত মত্ত থাকি যে, তাহার মধ্যে তোমার প্রেম ও স্নেহ আর দেখিতে পাই না, দেখিবার জন্য কোনও চেষ্টাও করি না। তাই অনেক পাইয়াও মোহবশতঃ তোমার নিকট কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা অনুভব করি না, হৃদয়ে তোমার জন্য একটু সত্য প্রেমও জাগে না। পাওয়া অপেক্ষা দেওয়াতেই যে প্রেমের সার্থকতা, তাহাতেই যে অধিকতর আনন্দ ও তৃপ্তি, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতেই পারি না। তোমার সত্য প্রেম যদি আমাদের হৃদয়ে একটু জাগিত, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই শুধু আপনাকে লইয়া এই সংসারে ব্যস্ত থাকিতে পারিতাম না—তোমার কাজে আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দান না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা আমাদের পক্ষে কোনও ক্রমেই সম্ভবপর হইত না। আমাদের প্রকৃতিকে আমরা নিতান্ত বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই আমাদের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। হে করুণাময় পিতা, তুমি আমাদের হৃদয়ে একটু বিশুদ্ধ প্রেমের সঞ্চার কর, আমাদের সকল ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতা বিদূরিত কর। আমরা তোমার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিয়া, তোমার কাজে আপনাদিগকে নিঃশেষে ব্যয় করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার প্রেমই আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

## নিবেদন।

**চল**—ঐ নূতন আদর্শের আলোক দেখ্‌ছ না? মুক্তির বার্ত্তা এসেছে; ঐ আলোক দেখে চল্‌লে সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি, পাপ তাপের শান্তি, সত্য প্রেম পবিত্রতা, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। এ স্বাধীনতা সর্ব্বাঙ্গীণ, এ স্বাধীনতা ঈশ্বর-প্রীতির উপর স্থাপিত। নব যুগের আরম্ভে নূতন আলোক দেখে তোমরা এসেছ; আজ ফিরে যেয়ো না। ছু'টে চল ঐ আলোক দে'খে। পাহাড় পর্ব্বত, নদী সমুদ্র, বন জঙ্গল, অতিক্রম ক'রে ছু'টে চল। পাটোয়ারীবুদ্ধি ছেড়ে দাও; কি খাব, কি পর্‌ব, এ চিন্তা দূর কর। ঈশ্বরের নামে, তোমার যা আছে সব দাও;—দাও তোমার জীবন যৌবন, দাও তোমার ধন সম্পদ, বলি দাও তোমার যশো মান খ্যাতি প্রতিপত্তি। ঈশ্বরের নামে আপনাকে দিতে পার না? রাজনীতির জন্য মানুষ ত্যাগ কর্‌তে পারে, সর্ব্বস্ব অর্পণ কর্‌তে পারে, কারাবরণ কর্‌তে পারে; আর, ঈশ্বরের ডাকে তুমি কিছুই ছাড়্‌তে পার না? কেবল অগ্র পশ্চাৎ ভেবে চল্‌বে? পুত্র পৌত্র দশ পুরুষের জন্য জমাবে—আর তারা এক ফুৎকারেই সব উড়িয়ে দিবে? জড়বুদ্ধি খাটাবে, বিজ্ঞতা নিয়ে থাক্‌বে, পাটোয়ারী বুদ্ধিতে চল্‌বে? তা নয়, তা নয়; সব বন্ধন ছিন্ন ক'রে আদর্শের পশ্চাতে ছোট, আলোক দেখে ছু'টে চল; ঈশ্বরের ডাক শু'নে দৌড়িয়ে চল।

---

**প্রীতির মূল্য কি?**—তুমি প্রিয়জনকে ভালবাস, সর্ব্বদা তার কাছে থাক্‌তে চাও—তার সঙ্গে আহার বিহার, তার সঙ্গে বেড়ান, তাতে তুমি সুখ পাও। কিন্তু তার অসুখ হ'লো, তার সেবার জন্য রাত জাগ্‌তে পার না। তাকে বাঁচাবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় কর্‌তে পার না। সে বিপদে পড়েছে; তাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য সময় শক্তি ও অর্থ ঢেলে

দিতে পার না! তবে তোমার ঐ ভালবাসার মূল্য কি? ভালবাসার মধুটুকু চাও, কিন্তু ত্যাগের বেদনাটুকু চাও না। ঐ ভালবাসা ত ভালবাসা নয়। উহা বিলাস। তুমি ধর্ম্মের আদর্শ পেয়েছ, পরিত্রাণের মন্ত্র পেয়েছ; যাতে লোকের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি, সেই আদর্শ দেখে ছুটে এসেছ; ঈশ্বরের নাম ক'রে আনন্দ পাও, সেই আনন্দ সকলকে দিতে চাও; কিন্তু তুমি এ আদর্শের জন্য, ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি রক্ষার জন্য ত্যাগস্বীকার করতে চাও না। তোমার শক্তি আছে, সে শক্তি দিতে পার না; তোমার অর্থ আছে, সে অর্থ নিজের সুখের জন্য রেখে দিলে—বাড়ী করলে, গাড়ী করলে, ব্যাঙ্কে জমালে, সেয়ার কিনলে, কিন্তু ঈশ্বরের কাজে দিলে না! তবে তোমার ধর্ম্মের প্রতি, আদর্শের প্রতি, ভালবাসার মূল্য কি? ঈশ্বরের নাম ক'রে আনন্দ পাও, কিন্তু ঈশ্বরের নামে রিক্ত ক'রে আপনাকে দিতে পার না; তবে ঐ যে নামের আনন্দ, উহা ত একপ্রকার বিলাস! প্রেমে যদি ত্যাগ না আনে, তাঁর নামে, তাঁর ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠায় যদি সর্ব্বস্ব দিতে না পার, তবে তোমার প্রেমের মূল্য কি?

**তোমাকেই ডাকছেন**—ঘরের ভিতর থেকে প্রভু ডাকছেন—দশজন ভৃত্য বাহিরে আছে, ডাক শুনছে; কিন্তু কেহই সাড়া দিচ্ছে না; পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে; একে ভাবছে অন্যে কেন সাড়া দেয় না। প্রত্যেকেই চালাক, কাজ এড়িয়ে যেতে চায়। এই ভৃত্যের দলকে কি বলবে? এরা ত প্রভুর বিশ্বস্ত ভৃত্য নয়। নানাদিক দিয়া ডাক আসছে,—দেশের ডাক, সমাজের ডাক, আদর্শ-প্রতিষ্ঠার ডাক, দুঃখী পাপীর ক্রন্দনের ডাক, অত্যাচরিত উৎপীড়িতের ডাক—সকল দুঃখ কষ্ট, পাপ তাপ, অত্যাচার উৎপীড়নের বেদনার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের ডাক আসছে। আয়, আয়, আয়—সুখ শান্তির আশা ছেড়ে আয়, ধন প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে আয়; দেশের কাজে, দশের কাজে, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার কাজে, ছুটে আয়। আপনাকে সমর্পণ করতে আয়। লোক চাই, অর্থ চাই, আত্মত্যাগী প্রীতি চাই। কৈ, কেউ ত সাড়া দেয় না! তোমরা ভাবছ, প্রত্যেকেই ভাবছে, এ ডাক অন্যের জন্য, তোমার জন্য নয়। তোমরা সমালোচনা ক'চ্ছো, হতভাগ্য দেশ, হতভাগ্য সমাজ, ঈশ্বরের ডাকে কেউ এল না! ডাক যে তোমার জন্য। অপরের মুখের দিকে তাকাও কেন? অপরের জন্য অপেক্ষা কর কেন? প্রভু যে তোমাকেই ডাকছেন; তোমার শক্তি অর্থ নিয়ে আসতে তোমাকেই বলছেন। তুমি এস, সব ছেড়ে প্রভুর কাজে এস।

---

## সম্পাদকীয়

**কয়েকটি সমস্যা**—ডাক্তার রায় মহাশয়ের পত্র আলোচনার জন্য যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে, উক্ত কমিটির সম্পাদক কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সাধারণের একটি আলোচনাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই পত্রে তিনি সাধারণ ভাবে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির আলোচনার জন্যও সকলকে অনুরোধ করেন। তাই, উক্ত আলোচনাসভার যে দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে অন্যান্য সমস্যাগুলি সম্বন্ধেও অনেক কথা হয়। বিষয়গুলি কিছুই নূতন নয়, সবই পুরাতন। কিন্তু তাহাদের কার্য্যগত মীমাংসা এখনও এতই সুদূরে পড়িয়া রহিয়াছে যে, একটু বিরক্তিকর হইলেও, সে সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ আলোচনা করা একান্তই আবশ্যক বলিয়া অনুমিত হইবে। বাস্তবিক, একটু অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, এ সকল বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট উদাসীনতা ও অবহেলাই রহিয়াছে—দুইচারি জন ব্যতীত আমরা কেহ যে ইহার জন্য বিশেষ কিছু ভাবি বা চিন্তা করি, তাহার কিছুমাত্র প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আলোচনার সময় উপস্থিতমতে যাহার মনে যাহা উদয় হয় তাহা বলিয়াই আমরা অনেকে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করি—তাহার পরও যে অনেক কিছু করিবার বাকী থাকে, সে-কথা মনেও করি না। আমাদের আলোচনাগুলি একটু বিশেষ করিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আমরা অধিকাংশই সমস্ত দোষ ত্রুটিগুলি অপরের সম্বন্ধে চাপাইয়া বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করি, আমাদের নিজেরও যে কিছু ত্রুটি আছে, নিজেরও যে সে সম্বন্ধে কিছু করিবার রহিয়াছে, তাহা মোটেই ভাবি না—কার্য্যতঃ কিছু করিবার সঙ্কল্প ত করিই না। এমতাবস্থায় আমাদের আলোচনাগুলি যে একপ্রকার নিষ্ফলই হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? তাই বলিয়া আলোচনা একবারে পরিত্যাগ করিলেও চলিবে না,—তাহাতে ত কোনও লাভই হইবে না। বরং বার বার আলোচনা করিতে করিতে বা শুনিতে শুনিতে দুই এক জনের মধ্যেও উহা একটু ফলপ্রদান করিতে পারে।

আমাদের সমস্যাগুলির মধ্যে অর্থাভাবই সর্ব্বপ্রথমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আমাদের সমাজের অধিকাংশ নিত্য-নৈমিত্তিক কাজই যে ঋণ করিয়া চালাইতে হইতেছে, সে-ঋণের ভার যে দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছে, ব্যয় অনিবার্য্যরূপে যে পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে আয় সেই অনুপাতে যে বাড়িতেছে না, বরং অনেক স্থলে যে হ্রাসই পাইতেছে, তাহা বোধ হয় আর আমাদের কাহারও অবিদিত নাই। সমাজের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহারা কিছুমাত্র সংবাদ রাখেন, তাঁহারা সকলেই ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। তাহার উপর, অর্থাভাবে যে আমাদের সকল কাজই পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে, কোনও কাজই যে উপযুক্তরূপে চলিতে পারিতেছে না,—উন্নতি বিস্তার সম্প্রসারণ ত অনেক দূরের কথা—তাহা বলা বাহুল্যমাত্র, অতি সহজেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ব্যয় স্বাভাবিকরূপেই বাড়িয়াছে—উহা অনিবার্য্য। কিন্তু আয় সেই অনুপাতে বাড়ে নাই কেন? আমাদের ব্যক্তি-গত আয় নিশ্চয়ই অনেক বাড়িয়াছে। আমাদের অন্যান্য ব্যয়ও—আবশ্যকীয় সাংসারিক ব্যয়ও—বৃদ্ধি পাইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা কি বলিতে পারি, সেই পরিমাণে আমাদের সমাজের জন্য ব্যয়ও বাড়িয়াছে? অথবা, আমাদের আয়ে ও অত্যাবশ্যকীয় ব্যয়ে কি এমনই অসমতা ঘটিয়াছে যে, সমাজের

জন্য ব্যয়বৃদ্ধি করা কোনও ক্রমে সম্ভবপর হইতেছে না? আমরা কেহ যে এরূপ কথা বলিতে পারিব, তাহা ত মনে হয় না। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইব যে, আমরা অনেক প্রকার অনাবশ্যকীয় ব্যয়ই বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছি,— আমরা যাহাকে আবশ্যকীয় বলিয়া মনে করি তাহার মধ্যেও অনাবশ্যকীয় অনেক রহিয়াছে। ইচ্ছা থাকিলে অনায়াসেই সে-সকল সঙ্কুচিত করিয়া সমাজের কাজে অধিক অর্থ দেওয়া যায় এবং আয় ব্যয়ের সমতাসাধন করা কিছুমাত্র কঠিন হয় না। আবার, অনেক স্থলে সেরূপ সমতাসাধনেরও কোনও প্রয়োজন হয় না—ব্যয়সঙ্কোচ না করিয়াও সমাজের কাজে অধিক অর্থ-প্রদান সম্ভবপর হয়। কাজেই সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে উদাসীনতাই এই অর্থদানপ্রবৃত্তির অভাবের মূল কারণ বলিয়া অনুমিত হইবে। আর, এই উদাসীনতার কারণ যে অনুরাগেরই অভাব, তাহা না বলিলেও চলিবে।

পূর্ব্বে যে-অবস্থায় যে-হারে একজন সমাজের কাজে অর্থপ্রদান করিতেন, আমরা এখন আমাদের অবস্থা অনুসারে সেই অনুপাতে দিতেছি বলিতে পারি না। অনেকে ছাত্রাবস্থায় যে চাঁদা দিতেন এখনও তাহাই দিতেছেন। একবার শতকরা ১৲ টাকা হারে চাঁদা দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছিল, অতি অল্প কয়েক জনই সেই হারে চাঁদা দিয়া থাকেন। আর একবার শতকরা ।০ আনা হারে অতিরিক্ত চাঁদা দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। তাহাতেও অল্প সংখ্যকই সম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহাদেরও সকলে এখন তাহা দিতেছেন না। তদুপরি, অনেকের দেয় চাঁদা বহু বৎসর বাকী পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, পত্রিকার মূল্যও বহু বৎসর যাবতই দেওয়া হয় নাই। চাঁদা আদায় বিষয়ে সমাজের কর্ত্তৃপক্ষদের নানা ত্রুটির কথা সময় সময় শুনিতে পাওয়া যায় বটে। তাহার মধ্যে কিছু সত্যও থাকিতে পারে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই হেতু আমরা কেহ যে নিজের ত্রুটি হইতে মুক্ত হইতে পারি তাহা ত মনে হয় না। দেয় চাঁদা যে আমাদের ঋণের মধ্যেই গণ্য করিতে হইবে, আমাদের দেয় যে আপনা হইতেই শোধ করিয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, এই ব্রাহ্মোচিত নীতিটা আমরা অনেকে বর্ত্তমানে হারাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই এরূপ ঘটে। অন্যের ত্রুটি হেতু আমার নিজ দোষ আমার নিকট ক্ষমার্হ হইতে পারে না। সমাজের কাজে উৎসাহ ও অনুরাগের অভাবই অবশ্য ইহার একটা প্রধান কারণ। তাহাও যে আমাদের নিজেরই দোষ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

সমাজের কাজ উপযুক্তভাবে চলে না, আবশ্যক মত প্রচারকাদির সাহায্য পাওয়া যায় না, পত্রিকাদি ভাল করিয়া পরিচালিত হয় না, ইত্যাদি নানা প্রকার অভিযোগের কথাও এই প্রসঙ্গে শুনিতে পাওয়া যায়। অভিযোগ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে স্বীকার করিয়াও, আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, অর্থাভাবই তাহাদের মূল কারণ—উপযুক্ত অর্থ পাইলে উহার অধিকাংশই দূর করা যায়। আর, সকল ত্রুটি দূর করিয়া উন্নতিসাধন করিতে হইলে, আমাদের প্রত্যেকেরই অর্থদান ব্যতীতও আরও অনেক করণীয় আছে। আমরা প্রত্যেকে যদি এ বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য করি, তবে নিশ্চয়ই সকল বিষয়ে সহজে উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইবে। এতদ্ব্যতীত, মনে রাখিতে হইবে, সকল বিষয়ে নিজের লাভের দিকে প্রধান ভাবে দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না—এমনও হইতে পারে যে, আমার নিজের কাজের সময় প্রচারক না পাইলেও, তাঁহার দ্বারা সে সময় অন্যত্র অধিকতর কল্যাণকর কার্য্য সাধিত হইতে পারে; তখন তাহাই নিশ্চয় শ্রেষ্ঠতর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা প্রচারকদিগকে যে সামান্য বৃত্তি প্রদান করি তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তথাপি সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত অর্থও আমরা সংগ্রহ করিতে পারি না। এরূপও অনেক সময় হয় যে, অর্থাভাবে আমরা প্রচারকদিগকে পাথেয় দিয়া প্রচারার্থে পাঠাইতে পারি না।

উপযুক্ত লোকাভাব বশতঃ যে আমাদের অনেক কার্য্য অসম্পন্ন থাকিয়া যায় বা সুসম্পন্ন হইতে পারে না, তাহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। কোনও প্রকার অর্থ গ্রহণ না করিয়া যাঁহারা সমাজের সেবায় আপনাদের অবসর নিয়োগ করিতেছেন, এরূপ লোকের দ্বারা আমরা সমাজের অনেক কাজ নির্ব্বাহ করাইয়া থাকি। তাঁহারা এই কাজে আপনাদের অনেক শক্তি অকাতরে ব্যয় করিলেও, ইহার জন্য যে প্রয়োজনানুরূপ যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সমাজের কাজেই সমস্ত সময় দিতে পারেন, অর্থপ্রদান করিয়া এমন একাধিক উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিতে পারিলে যে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ হইতে পারিত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর আরও বহুসংখ্যক লোক সমাজের নানা বিভাগে কার্য্য করিতে আসিলেও, ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ও অধিকতর ভাল কাজ হইতে পারিত বটে; তথাপি, যাহারা সমস্ত সময় দিতে পারে এরূপ লোকের তখন কোনও প্রয়োজন থাকিত না, এমন কথা কেহই বলিবে না—তখনও অর্থ দিয়া উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবার যথেষ্ট আবশ্যকতাই থাকিত। যেখানে উক্ত প্রকার বহু সংখ্যক লোক পাওয়া যায় না, সেখানে এরূপ উপায়ে লোকসংগ্রহের প্রয়োজন কত বেশী, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। এখানেও দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাভাবে সমাজের কাজের কত ক্ষতি হইতেছে। কাজেই যদি আমরা সমাজকে ভালবাসি, সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ চাই, তবে আমাদিগকে অন্য ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াও, আমাদের সমস্ত দেয় নিয়মিতরূপে আপনা হইতে দিতে ত হবেই, তাহা ছাড়া সমাজের কাজে সাধ্যানুসারে অধিকতর অর্থও দিতে হইবে—ত্যাগস্বীকার করিয়াও দিতে হইবে।

দ্বিতীয় সমস্যা, যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত প্রচারকের অভাব। আমাদের প্রচারকের সংখ্যা যে নিতান্তই অপ্রচুর এবং যে দুই চারিজন আছেন তাঁহাদেরও অনেকেই যে রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য বা বার্দ্ধক্যে উপনীত, অপর দিকে নূতন লোক বড় বেশী কেহ যে এই ব্রতে ব্রতী হইতেছেন না, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত

তাহাতে এরূপ অবস্থায় অধিকাংশ কার্য্যই যে অসম্পন্ন থাকিয়া যাইবে, এবং যাহা কিছু করা হইবে তাহাও যে অতি অসম্পূর্ণ ভাবেই সম্পন্ন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কোনও একটা কাজে একজন দীর্ঘ সময় দিতে না পারিলে, তাহা কোনও প্রকারেই প্রকৃষ্টরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে না, সুসম্পন্ন হইতে পারে না। দুই একদিনের সাময়িক উপাসনা বক্তৃতা আলাপ আলোচনা হইতে কখনও স্থায়ী ফল লাভের আশা করা যায় না। আমাদের প্রচারকের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হওয়া যে, এই মণ্ডলীর রক্ষা ও বিস্তারের জন্য, এই পতিত দেশের উদ্ধার ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের জন্য, একান্তই আবশ্যক তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে তাহা হইতেছে না কেন? অনেকে হয়ত অর্থাভাবকেই ইহার প্রধান কারণ মনে করিবেন। আমরা তাহা মনে করিতে পারি না। শুধু অর্থের অভাবেই যে কখনও কোনও প্রচারার্থী প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। এই অর্থাভাবের মধ্যেও যাঁহারা আসিয়াছেন, যেরূপেই হউক, তাঁহাদের জন্য নিশ্চয়ই একটা বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অবশ্য, বেশ সন্তোষকর বন্দোবস্ত হইয়াছে, এরূপ কথা আমরা বলিতেছি না,—বলিতে পারি না। অর্থের ভাল বন্দোবস্ত নাই দেখিয়া লোকে এ পথে আসিতে সাহস করে না, ভয়ে পশ্চাৎপদ হয়, এরূপ একটা কথা এই প্রসঙ্গে উঠিতে পারে। কিন্তু এ কথার বিশেষ কোনও মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কেহ করিয়াছেন বলিয়া কখনও শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। আর, যদি সত্যই কেহ তাহা করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার মধ্যে প্রচারব্রত অবলম্বন করিবার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ জন্মিয়াছে বলিয়া আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারি না। নিশ্চয়ই, এই প্রকার লোক কিছুতেই প্রচারক হইবার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারেন না—এই শ্রেণীর লোক কর্ম্মী হইতে পারে, বক্তা হইতে পারে, কিন্তু কোনও রূপেই প্রচারক হইতে পারে না। যিনি জীবন-বিধাতার নিকট হইতে উহাকে জীবনের ব্রতরূপে না পাইয়াছেন, যিনি তাঁহার দাসত্ব ও সেবা ভিন্ন অপর কিছুকে জীবনের লক্ষ্য-স্থানে পরোক্ষভাবেও রাখিয়াছেন, তিনি কখনও প্রচারক হইতে পারেন না, তাঁহার দ্বারা কোনও মতেই প্রচারকের কার্য্য যথার্থ ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না।

কথা উঠিতে পারে যে, প্রচারব্রতগ্রহণ যদি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির উপরই এইরূপ নির্ভর করে, তবে এ বিষয়ে আর সমাজের বিশেষ কিছু করণীয় থাকিতে পারে না। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। বর্ত্তমানে সমাজমধ্যে উপযুক্ত সংখ্যক প্রচারক যদি না জন্মে, প্রচারকার্য্যে—জীবনদেবতার সেবায়—আপনাকে নিঃশেষে ব্যয় করাতেই যে জীবনের পরম সার্থকতা ও শ্রেষ্ঠতম গৌরব, এই ভাবটা যদি সকলের মধ্যে উজ্জ্বলভাবে জাগিয়া না উঠে, তবে তাহার জন্য সমাজও অনেক পরিমাণে দায়ী। পূর্ব্বে বহুলোক এ পথে আসিতেন, আর এখন তেমন আসেন না কেন, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে যে, তখন সমাজের অবস্থা এ বিষয়ে যেরূপ অনুকূল ছিল এখন আর সেরূপ নাই, বরং এখন বহু পরিমাণে প্রতিকূলই। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বের এক সংখ্যায় যাহা আলোচিত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে। মোট কথা, যদিও এই সেবা ও ত্যাগের ভাব প্রধানতঃ ব্যক্তিগত জীবনের সারবত্তা ও গভীরতা, প্রেম ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার উপরই নির্ভর করে, তথাপি সমাজস্থ তদনুকূল হাওয়াও উহাকে বহুল পরিমাণেই জাগরিত করে,—প্রতিকূল হাওয়ার মধ্যে উহা যে শুধু বর্দ্ধিত হইতে পারে না তাহা নহে, অঙ্কুরে বিনষ্টও হইয়া যায়। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইব, সমাজের বর্ত্তমান হাওয়া প্রচারস্পৃহা জাগিবার পক্ষে অনেক বাধাই উৎপন্ন করিয়া থাকে। সুতরাং ইহার জন্য আমরা সমাজস্থ প্রত্যেকেই যে বহুপরিমাণে দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মধ্যে সরস সারবান্ ধর্ম্মজীবন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, প্রচার-স্পৃহাও সেই পরিমাণে নিশ্চয়ই বর্দ্ধিত হইবে। যত অধিক-সংখ্যক লোকের মধ্যে সেই আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ফুটিবে, তত বেশী জীবনে উহা মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। তাহা না হইলে, অন্য কোনও উপায়েই প্রকৃত প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইবে না।

তৃতীয় সমস্যা, সমাজের অন্যাবিধ নানা কাজ এবং জনসেবার জন্যও যথেষ্ট সংখ্যক কর্ম্মী পাওয়া যাইতেছে না। লোকসংখ্যা ত বৃদ্ধিই পাইয়াছে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনেকে কার্য্য করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়; তবে এরূপ হয় কেন? অনেকে মনে করেন, আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সমাজের বিক্ষিপ্ত শক্তি-গুলি সংহত করিতে ( organise ) পারিতেছেন না বলিয়াই এরূপ হইতেছে। আমাদের মধ্যে যে সংহত করিবার শক্তি ( organising power ) যথেষ্ট পরিমাণে নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা থাকিলে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্য সাধন করা সম্ভবপর হইত, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তথাপি উহাকে কোনও প্রকারেই ইহার মূল কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। একমাত্র কেশবচন্দ্র ব্যতীত আর কাহারও সে-শক্তি ছিল বলিয়া জানা নাই। অথচ, শুধু ভারতবর্ষীয় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীনে নয়, নানা ক্ষুদ্র স্থানেও একসময়ে উক্ত প্রকার বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের দ্বারা যথেষ্ট কার্য্যও সাধিত হইয়াছিল। অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও, দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন প্রভৃতি উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে প্রকার জনসেবার কার্য্য সাধন করিয়াছেন, আর কেহই তাহা তেমন ভাবে সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। তখন ত মোটেই লোকাভাব ঘটে নাই। তবে এখন কেন হয়? শক্তিশালী নেতা বিভিন্ন শক্তিগুলি সংহত করিয়া সহজে কার্য্যসাধন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাই যে সংহতির একমাত্র অথবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়, তাহা কিছুতেই বলা যায় না। বরং উহার কার্য্যকারিতার একটা সীমা আছে, কিছু অনিষ্টকারিতাও আছে—উহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব পূর্ণ ভাবে বিকশিত হইবার পক্ষে কিছু বাধাই উপস্থিত হয়। একই লক্ষ্যের দ্বারা চালিত হইয়া সমভাবাপন্ন বিক্ষিপ্ত শক্তি-

সমূহ আপনা হইতেও সংহত হয়, দেখিতে পাওয়া যায়। আর তাহাই যে স্বাভাবিক এবং সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর ও অধিকতর ফলপ্রদ পথ, তাহাও একটু অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব অবাধে পূর্ণভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ পাওয়াতে, সমগ্রও যেমন শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে, তাহা আর কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি গুরুতর প্রতিবন্ধকও আছে—যাহাদের মধ্যে একই লক্ষ্য ও আদর্শ জাগে নাই, যাহারা তাঁহার হাতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ না করাতে একই ভাবের দ্বারা চালিত নহে, তাহারা ত কোনও প্রকারেই আপনা হইতে সংহত হইতে পারে না। প্রত্যেক অঙ্গ প্রাণবন্ত না হইলে জীবন্ত সংহতি সম্ভবপর হয় না। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আমাদের মধ্যে সেই প্রাণেরই একান্ত অভাব—আদর্শ ও লক্ষ্যের একতাই নাই, তাঁহার হাতে আত্মসমর্পণ মোটেই দেখা যায় না। কাজ করিবার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, অন্যের আহ্বানের অপেক্ষায় কেহ বসিয়া থাকিতে পারে না,—কোনও বাধাই তাহার গতিরোধ করিতে পারে না।

এই আলোচনা হইতে আমরা সহজেই দেখিতে পাইতেছি যে, একই কারণ সমস্ত সমস্যাগুলির মূলে কার্য্য করিতেছে—একমাত্র গভীর সারবান ধর্ম্মজীবনের অভাব হইতেই সমস্ত সমস্যা উদ্ভূত হইয়াছে। যদি আমরা সত্য ভাবে ভগবদ্‌প্রেমানুগত জীবন, ব্রহ্মার্পিত জীবন, লাভ করিতে পারিতাম, তবে আপনা হইতেই অপরের জন্য, সমাজ ও জগতের জন্য, প্রেম ও আত্মত্যাগ অপরিহার্য্যরূপে আসিত—আমরা কিছুতেই আপনার ক্ষুদ্র সুখ সুবিধা আরাম লইয়া, অর্থ বিত্ত মান প্রতিপত্তি, অহঙ্কার ও কর্ত্তৃত্বস্পৃহার মোহে মুগ্ধ হইয়া, সাংসারিকতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারিতাম না। আমাদের আপনার কল্যাণের জন্যই, আমাদের অর্থ শক্তি সময় যাহা কিছু আছে সমস্তই এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতাম। তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টিও সর্ব্বদা আপনার দোষ ত্রুটির উপরই নিবদ্ধ থাকিত, অন্যের ত্রুটি লক্ষ্য করিবার, অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার, অবসর বা প্রবৃত্তি মোটেই আমাদের মধ্যে দেখা যাইত না। আশা করি, আমরা সকলে এই ভাবেই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করিব এবং তাহার সমাধান বিষয়ে যে যতটুকু করিতে পারি, তাহাতে কোনও প্রকারেই ক্ষান্ত হইব না। করুণাময় পিতা আমাদিগকে সেই বুদ্ধি ও বল, সেই প্রেম ও শক্তি, প্রদান করুন। তাঁহার শুভ ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেক জীবনে ও সমগ্র সমাজে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হউক।

# গীতার ধর্ম্ম

( ১ )

গীতা পুস্তকখানি উপনিষদ্ অপেক্ষাও এ দেশে জনপ্রিয়। ইহার মত ও অর্থ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু গীতার ধর্ম্মমত কি ভাবে উত্থিত হইল এবং অবতারবাদ ছাড়িয়া দিলেও, গীতার ধর্ম্ম ও সাধনা কতদূর গ্রহণ করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে অধিক আলোচনা হয় নাই। যে ভাবে গীতার মতাদি নানাস্থানে উদ্ধৃত হয়, তাহাতে মনে হয় যে এখনও আলোচনার অবসর আছে।

কিন্তু গীতার সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই শ্লোকের অর্থ লইয়া স্থানে স্থানে মতদ্বৈধ শ্রবণ করিতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত যথা, গীতায় "সাংখ্য" ও "ব্রহ্মসূত্রের" অর্থ কি, "যজ্ঞ" অর্থ যজ্ঞ না বিষ্ণু, "পরং" বলিতে পরমাত্মা বুঝাইবে না জীবাত্মা বুঝাইবে, ইত্যাদি কঠিন কঠিন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে। এই সকল বিসম্বাদী স্থানের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে, গীতারচনার কাল ও গীতার মতবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এখানে নাই, সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করিয়া আমরা প্রকৃত বিষয়ে উপস্থিত হইব।

হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের পর রচিত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ডাক্তার ভাণ্ডারকারের মতে হরিবংশের মধ্যে "দীনার" শব্দটি তাহার কাল নির্দ্দেশ করিতেছে, কারণ "দীনার" নামক রোমীয় মুদ্রা যখন ভারতে বাণিজ্য-ব্যপদেশে বহুল পরিমাণে আসিয়াছিল, তখন স্বর্ণমুদ্রার উল্লেখ করিতে গেলে "দীনার" শব্দ উল্লেখ করা সহজ হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হরিবংশ খৃষ্টজন্মের দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে রচিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ গুপ্তবংশের রাজত্বের প্রথম ভাগে অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে, ইহা তন্মধ্যে প্রদত্ত রাজবংশাবলীর সর্ব্বশেষে গুপ্তবংশের উল্লেখ হইতেই প্রমাণ পাওয়া যায়। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণের জীবনচরিত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু কোনও গ্রন্থে গীতার উল্লেখ-মাত্র নাই। কৃষ্ণের জীবনচরিত লিখিতে গিয়া যদি কেহ তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপদেশ গীতার কোন উল্লেখ না করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি গীতার কথা জানিতেন না। উভয় লেখকই মহাভারত সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু গীতার কথা জানিতেন না; ইহা হইতে বুঝা যায়, গীতা তখনও মহাভারতের সহিত যুক্ত হয় নাই।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রতিপাদক আদিগ্রন্থ। ইহার আরম্ভও গীতোক্ত উপদেশের অধিকতর অনুকূল; কারণ, যুধিষ্ঠির আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুশোকে ও আপনাকে তাহাদের হত্যার পাপভাগী মনে করিয়া, রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনগমনে উদ্যোগী। বেদব্যাস, কৃষ্ণ, ভ্রাতাগণ, দ্রৌপদী তাঁহাকে এ সংকল্প হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু কেহই গীতোক্ত উপদেশের বা গীতার নামমাত্র উল্লেখ করিলেন না। নারায়ণীখণ্ডে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু প্রসঙ্গতঃ গীতার কোন উল্লেখ নাই। অবশেষে অপ্রাসঙ্গিকভাবে জন্মেজয় বলিলেন, আমার পূর্ব্বপুরুষ অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন না? বৈশম্পায়ন বলিলেন, হাঁ। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, কোন পরবর্ত্তী বৈষ্ণব নারায়ণীখণ্ডে গীতার কোন উল্লেখ না দেখিয়া তাহার মধ্যে দুইটি প্রক্ষিপ্ত শ্লোক রচনা করিয়া ঢুকাইয়া দিয়াছে।

অতএব অনুমান হয় যে, শান্তিপর্ব্বরচনার সময়েও মহাভারতের মধ্যে গীতা বা যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের ধর্ম্মোপদেশ ছিল না।

গীতায় "সাংখ্য," "যোগ" ও "ব্রহ্মসূত্রের" উল্লেখ আছে। গীতাকার কি সাংখ্যদর্শন, যোগদর্শন ও ব্রহ্মসূত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অথবা এই শব্দগুলি তিনি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন? প্রথমে দেখা যাউক, সাংখ্যদর্শনের প্রামাণ্য গ্রন্থ কোন্‌টী এবং তাহার মতবাদই বা কি? বর্ত্তমান কালে কপিলপ্রণীত সাংখ্য-প্রবচনসূত্র নামে যে বইখানি প্রচলিত আছে, তাহা অত্যন্ত আধুনিক, কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইহা উদ্ধৃত হয় নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু কোথা হইতে এ বইখানি বাহির করিয়া তাহার এক টীকা করিলেন, তাহা কেহ জানে না। সম্ভবতঃ তিনিই ইহা রচনা করিয়াছিলেন। ঈশ্বরকৃষ্ণপ্রণীত সাংখ্যকরিকা বর্ত্তমান কালে সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার পূর্ব্বে পঞ্চশিখাচার্য্য প্রণীত একখানি, তৎপূর্ব্বে আসুরি প্রণীত একখানি এবং তাহারও পূর্ব্বে কপিল প্রণীত আদি গ্রন্থ ছিল। কিন্তু এই শেষোক্ত গ্রন্থ তিনখানি বর্ত্তমান কালে লুপ্ত হইয়াছে। এখন গীতাকার যদি সাংখ্য দর্শন পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন্‌ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন? আত্মার স্বরূপ, সাধন-প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে সাংখ্যদর্শনের সহিত সামঞ্জস্য থাকিলেও, দুইটি প্রধান বিষয়ে সাংখ্যের সহিত গীতার পার্থক্য আছে। সাংখ্যকারিকার মতে প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন, বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহঙ্কার হইতে মন, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূল ভূত উৎপন্ন। কিন্তু গীতায় উৎপত্তির কোন ধারাবাহিক প্রণালী দেওয়া হয় নাই, বরং এ সকলই ঈশ্বরের জড়রূপা প্রকৃতি বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই, তিনি আছেন বা নাই, এ বিষয়ে কোন যুক্তিপ্রমাণও নাই; কিন্তু গীতায় ঈশ্বরই মূলভিত্তি।

কিন্তু এ অসামঞ্জস্যে সাংখ্যের সহায়তা গ্রহণের পক্ষে বাধা হয় না। গীতাকার সাধনার প্রণালী দিতেছেন, তিনি দর্শন লিখিতে বসেন নাই। এজন্য যাহা সাধনার প্রণালীর মধ্যে পড়ে, তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তিনি কঠোপনিষদের অনুসরণ করিয়াছেন; কারণ, কঠোপনিষদেও সৃষ্টির উৎপত্তিপরম্পরা নির্দ্দেশ না করিয়া, কেবল ক্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, গীতাকার সাংখ্যবাদী নহেন, বরং সাংখ্যদর্শনের সংস্কারক। সাংখ্যতত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া তিনি তাঁহার ধর্ম্মনীতি গড়িয়াছেন, গড়িতে গিয়া তত্ত্বকে সংস্কৃত ও নূতন আকার দিতে হইয়াছে।

ঈশ্বর সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকায় কোন উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু প্রাচীন সাংখ্যদর্শনে ছিল না, ইহা বলিতে পারা যায় না। বরং ঈশ্বরতত্ত্ব যে প্রাচীন সাংখ্যদর্শনে ছিল তাহার কতকগুলি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, উপনিষদের ভূরি ভূরি ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ যদি সাংখ্যদর্শন অস্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তাহা হিন্দু দর্শনের মধ্যে এত উচ্চস্থান পাইত না। দ্বিতীয়তঃ, পতঞ্জলি প্রণীত যোগদর্শন সাংখ্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেখানে আমরা ঈশ্বরের উল্লেখ পাই। তৃতীয়তঃ, সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে আত্মা বা পুরুষ পড়ে না। আত্মা যেমন চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত, সেইরূপ পরমাত্মাও চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ব্রহ্মকে সাংখ্যতত্ত্বের পঞ্চবিংশতি বা ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব বলা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, গীতায় সাংখ্য-উদ্ভাবয়িতা কপিলকে ঈশ্বরের বিভূতি, সিদ্ধগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বলা হইয়াছে। তিনি নিরীশ্বর হইলে গীতাকার কপিলকে এ উচ্চস্থান দিতেন না। প্রকৃতপক্ষে অনুমিত হয় প্রাচীন সাংখ্য সেশ্বর; কিন্তু ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব বিশেষ কিছু স্বীকার করা হয় নাই। সে জন্য ক্রমে কারিকায় আসিয়া দেখা যায় যে কারিকাকার ঈশ্বর সম্বন্ধে নিরব। এবং অতি আধুনিক সাংখ্য-প্রবচনসূত্রে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কপিল বা আসুরি প্রণীত কোন্‌ গ্রন্থখানি গীতাকার দেখিয়াছিলেন, তাহা এখন নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু গীতাকার যে পরবর্ত্তীকালে রচিত পতঞ্জলি প্রণীত যোগদর্শন দেখিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। গীতার ২।৫৯ শ্লোক "দেহীর বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকল নিবৃত্ত হইলে স্থূল বিষয়সকল নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহার বিষয়াভিলাষ আসক্তিহীন (রসবর্জ্জং) আত্মাকে দেখিয়া নিবৃত্ত হয়"। ইহা যোগদর্শনের "তৎপরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্" স।১৬—"তাহাই শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য যাহাতে পুরুষকে দর্শন করিয়া জড়বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মে"—ইহার প্রতিধ্বনি। যোগদর্শনের এই সূত্রের আভাস আমরা গীতার ৩।৪৩ শ্লোকে পুনরায় প্রাপ্ত হই। কামকে জয় করিবার উপায় সম্বন্ধে গীতাকার বলিতেছেন, "এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আত্মাকে বুঝিয়া আপনাকে আপনার দ্বারা নিরোধ করিয়া কামরূপ দুরাসদ শত্রুকে, হে মহাবাহু বিনাশ কর।" গীতার ৬।৩৫ শ্লোক, "হে মহাবাহু! মন চঞ্চল ও তাহাকে নিগ্রহ করা কঠিন, এ বিষয়ে সংশয় নাই, কিন্তু, হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা তাহাকে নিগ্রহ করা যায়," ইহা পাতঞ্জল দর্শনের স।১২ সূত্র, "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ"—"অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা যায়,"—ইহার প্রতিধ্বনি। তাহার পর, গীতা ২।৬১ শ্লোক "যোগী সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া আমাতে অর্থাৎ ঈশ্বরে আসক্ত হইয়া অবস্থান করেন, যাহার ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে"—এই শ্লোকের ভাবার্থযুক্ত সূত্র আমরা পাই পাতঞ্জল দর্শনের স।২৩ সূত্রে, "ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা" 'ঈশ্বরের ভক্তিসহকারে উপাসনা করিলে সমাধি ও সমাধিফল লাভ হয়।' ইহা হইতেই দেখা যায় যে, গীতাকার পতঞ্জলি প্রণীত যোগদর্শনের সহিত পরিচিত ছিলেন। এই গ্রন্থখানি খৃঃ পূঃ ১৫০ অব্দে রচিত হইয়াছিল। অতএব গীতা তাহারও পরের রচনা।

এখন যদিও গীতায় "ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব" শব্দের উল্লেখ আছে, তথাপি বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন, গীতা আগে না ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন আগে। সমগ্র গীতাখানি যাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে পাঠ করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায়

একটু জ্ঞান আছে, তাহারা বুঝিতে পরিবেন যে, গীতার প্রথম দ্বাদশ অধ্যায় একজনের লেখা ও শেষোক্ত ছয় অধ্যায় দ্বিতীয় ব্যক্তির লেখা। শেষ অধ্যায়ের শেষের কুড়িটী শ্লোক, দ্বাদশ অধ্যায়ের সহিত পূর্ব্বে যুক্ত থাকিয়া তাহার বর্ত্তমান বিংশতি-শ্লোকব্যাপী ক্ষীণ কলেবর পুষ্ট করিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে, শেষ ছয় অধ্যায়ে বিশেষ কোন নূতন তত্ত্ব নাই, পূর্ব্ব ভাগের বিষয়গুলি বিশদ, সংশোধিত ও বিস্তৃত করিয়া লেখা হইয়াছে। প্রথম ভাগের লেখক প্রতিভাশালী, সাধক; কিন্তু পরিষ্কাররূপে ভাবপ্রকাশে তেমন সিদ্ধহস্ত নহেন। দ্বিতীয় ভাগের লেখক পূর্ব্ব লেখকের ন্যায় সেরূপ প্রতিভাশালী নহেন; কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং ভাষার উপর তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল বলিয়া, পরিষ্কাররূপে অল্পের মধ্যে আপনার ভাব প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। পূর্ব্বভাগের ন্যায় দ্বিতীয় ভাগের লেখা তেমন অস্পষ্ট নহে।

এই আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথম ভাগে অর্থাৎ দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত "বেদান্ত দর্শন" বা "ব্রহ্ম-সূত্রের" কোন আভাস নাই, এবং পূর্ব্ব গীতাকার যে ব্রহ্মসূত্র জানিতেন তাহারও কোন আভাস পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় ভাগের লেখক ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রের সহিত গীতার পূর্ব্বমত সামঞ্জস্য করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন না; কারণ, তিনি জীবাত্মায় পরমাত্মার অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিতি স্বীকার করিয়াছেন।

ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, গীতার প্রথম দ্বাদশ অধ্যায় ব্রহ্ম-সূত্র রচনার পূর্ব্বে এবং শেষোক্ত ছয় অধ্যায় ব্রহ্মসূত্র রচনার পরে লিখিত। বেদান্ত দর্শনে যদি কিছু গীতার উল্লেখ থাকে তবে তাহা প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ের মধ্য হইতে। ইহা ব্যতীত সকাম যাগযজ্ঞের প্রতি দোষারোপ হইতে গীতাকারের জৈমিনি দর্শনের সহিত পরিচয় অনুমান করা যায় এবং এই সকল দর্শনের সহিত পরিচয় থাকিলে কোন কোন বৌদ্ধ দর্শনের সহিত যে তাঁহার পরিচয় ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এখন স্থূলভাবে গীতারচনার কাল নির্ণয় করিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৩য় ৪র্থ শতাব্দীতে, যে যুগে হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ রচিত হইয়াছিল সেই যুগেই, গীতা রচিত হইয়াছিল। ইহা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ নহে, মহাভারতকার বেদব্যাসেরও রচিত নহে। দুইজন অজ্ঞাতনামা লেখক বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রধান যুগে ইহা রচনা করিয়া মহাভারতের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী।

---

# পরলোকগত মুকুন্দানন্দ আচার্য্য *

জন্ম—১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৫ সন।

দেহমুক্তি—১৫ই এপ্রিল, ১৯৩০ সাল।

আজ এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া যাঁহার দেহমুক্ত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার জন্য আমরা সমবেত হইয়াছি, তিনি শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত খরিয়া নামক গ্রামে পরম ভাগবত স্বর্গীয় পরমানন্দ আচার্য্য মহাশয়ের একমাত্র পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি ইঁহার বাল্য-জীবনী সম্বন্ধে কিছুই জানি না বলিলেও হয়। একমাত্র জানি, ইনি তাঁহার পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। ইঁহার জননীদেবী ইঁহার অতি শৈশব অবস্থায় পরলোকগমন করেন। ইনি ইঁহার পিতৃদেব কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতৃদেব পরে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। ইঁহার বিমাতা কাত্যায়নী দেবী ইঁহার অপেক্ষা বয়সে দুই এক বৎসরের বড় ছিলেন। মুকুন্দানন্দ এই বিমাতাকেই আপন গর্ভধারিণী জননী মনে করিতেন। তাঁহার, আপন মাতার কোন স্মৃতিই মনে ছিল না। এই পরিবার পরম ভক্ত বৈষ্ণব পরিবার বলিয়া পরিচিত। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত মুকুন্দানন্দের জীবনেও এই বৈষ্ণব ভাব অল্পাধিক পরিমাণে প্রকটিত ছিল।

মুকুন্দানন্দ বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। ছাত্রবৃত্তি, প্রবেশিকা ও এফ এ পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজ হইতে এফ এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া ইনি কলিকাতার রিপণ কলেজে বি এ পড়িতে আসেন। রিপণ কলেজের ইনি একজন প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়গণের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ক্লাশে কোন দুরূহ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইঁহাকে বোর্ডে যাইয়া প্রশ্ন-সমাধান করিতে বলিতেন।

অনুমান ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার সহিত আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। তখন শ্রীহট্ট জেলার জলসুকা গ্রাম নিবাসী স্বনামধন্য প্রখ্যাতনামা স্বদেশপ্রেমিক পরলোকগত বন্ধু রমাকান্ত রায় মহাশয় কলিকাতার কলেজের ছাত্র। রমাকান্ত প্রথম হইতেই ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। আমি তখন ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম। বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের বক্তৃতাদিতে যোগ দিতাম। প্রথম আলাপেই, চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, রমাকান্ত সেইরূপ আমাকে আকর্ষণ করিয়া লন। রমাকান্তের সহিত আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব হয়।

তখনকার দিনে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ছাত্রদিগের মধ্যে অত্যন্ত দলাদলি ও রেষারেষী ভাব ছিল। পশ্চিম বঙ্গের ছাত্রেরা পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রদিগকে 'বাঙ্গাল' বলিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। এই দুইদলের মধ্যে কোন দিন সখ্য স্থাপন হইবে বলিয়া মনে হইত না। তখন স্বদেশপ্রাণ জননায়ক, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রিপণ কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ক্লাশে ক্লাশে এই বিরোধের বিরুদ্ধে কতই না বক্তৃতা দিতেন! ক্লাশে কোন্ বঙ্গের ছাত্রেরা প্রথম কয়েকটী বেঞ্চে বসিবে তাহা লইয়া তুমুল দ্বন্দ্ব চলিত। সিটী কলেজের ভক্তিভাজন অধ্যক্ষ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় প্রফেসরের সম্মুখে দুইটী বেঞ্চে পশ্চিম ও অপর আরেকটী বেঞ্চে পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রদিগের বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। এই

---

* ২৭শে এপ্রিল ১৯৩০, শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক পঠিত।

সব লইয়া ছাত্রাবাসে বিস্তর আন্দোলন তর্ক বিতর্ক হইত। মুকুন্দানন্দ বলিতেন, যেরূপ দেখিতেছি পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ছাত্রদিগের মধ্যে মিলনের আশা নাই।

এই সময় পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীহট্ট জেলার রমাকান্তের সহিত পশ্চিম-বঙ্গ হাওড়া জেলার আমার সহিত বন্ধুত্ব হয়। তখন মুকুন্দানন্দ Harrison Roadএর Elysian Boardingএ বাস করিতেন। একদিন রমাকান্ত আমাকে লইয়া মুকুন্দানন্দের বাসায় যাইলেন এবং বলিলেন, দেখুন পূর্ব্ববঙ্গের সহিত পশ্চিমবঙ্গের মিলন সম্ভব কি না। সেইদিন মুকুন্দানন্দের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এই পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া আজ এই তেত্রিশ বৎসর কাল তিনি আমার পরম হিতৈষী বন্ধু, সুহৃদ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

এই সময় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত আমার মিলন হয়। সেই সময় আমরা কয়েকটী বন্ধু মিলিয়া একটী বান্ধব সমিতি স্থাপন করি। বন্ধুবর অমরচন্দ্র এই সমিতির নাম রাখিয়াছিলেন "হুটপাটের দল"। এই "হুটপাটের দলের" একখানা ডায়েরী আমার নিকট আছে। এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মসাধন, কুসংস্কার পরিত্যাগ, বাল্যবিবাহ নিবারণ, স্ত্রী-শিক্ষাপ্রচলন প্রভৃতি সমাজসংস্কার, নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য্য ও স্বদেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ।

মুকুন্দানন্দ শান্ত শিষ্ট ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, আমাদের সংস্কারের হুটপাটে তেমন ধরা দিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার তেমন আকর্ষণ ছিল না। তবে বন্ধুবর রমাকান্তের খাতিরে মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। ক্রমে তিনি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন, যোগ দেন নাই। যোগ না দিলেও আমাদের সহিত বেশ বন্ধুত্ব জন্মিল।

তিনি বি এ পরীক্ষা দিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না বলিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটী শিক্ষকতা পাইয়াছিলেন; কিন্তু তখনকার রীতি অনুযায়ী অল্প বেতন লইয়া অধিক লিখিতে বলায়, অর্থাভাবে কষ্ট পাইলেও বিবেকের তাড়নায় সে পদ গ্রহণ করেন নাই।

এমন সময় দেরাদুন হইতে স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কলিকাতায় বদলী হইয়া যান। নবীনবাবুর শূন্যপদে মুকুন্দানন্দকে দেরাদুনে আনাইবার বন্দোবস্ত করা হয়। নবীনবাবু ২১।১নং পটুয়াটোলা লেনের মেসে উঠেন ও বন্ধুবর অমরচন্দ্রের সহিত মুকুন্দানন্দকে আনাইবার নিমিত্ত পরামর্শ করেন। আমাকে জানিতে দেওয়া হয় নাই। তাহার পর মুকুন্দানন্দ যখন সেই মেসে আসিলেন ও আমার সহিত একই বিছানায় রাত্রি যাপন করিলেন, তখন নবীনবাবু আমার সহিত মুকুন্দানন্দের বন্ধুত্ব আছে জানিয়া, আমাকে না জানানের দরুণ একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মুকুন্দানন্দ ১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেরাদুন চাকুরী লইয়া আসেন ও স্বর্গীয় রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র দেব মহাশয়ের বাসায় উঠেন। এখানে আসিয়াই মুকুন্দানন্দ বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। তিনি এখানকার ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হইয়াছেন জানিতে পারিয়া আমি বন্ধুবর অমরচন্দ্রকে এই আনন্দ সংবাদ জ্ঞাপন করি।

তিনি এখানে আসিয়া অনেকবার আমাকে এখানে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন বারই কৃতকার্য্য হন নাই। ১৯০৩ সালে ডিসেম্বর মাসে অমরচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে আমি বাঁকিপুর গমন করি। সেই সময় মুকুন্দানন্দও সেই বিবাহে যোগ দিবার জন্য বাঁকিপুরে আসেন। সেইখানে তাঁহার সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি আমাকে যোগী ঋষি মুণিগণের সাধনভূমি হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া এদেশে আসিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। সেই সময় আমার জীবনের অতীব সঙ্কট সময়। সেই সময় আমি সবে মাত্র বিশেষ ভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছি। আমার পূজ্যপাদ পিতামহ পিতামহী, ভক্তিভাজন জনক জননী আমাকে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে-ছিলেন। তাঁহাদের প্রথম সন্তান, বংশের অষ্টম কুলীন, যদি ব্রাহ্ম হইয়া যায় তাহা হইলে তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে, এই চিন্তায় তাঁহারা একেবারে ম্রিয়মাণ।

আমার পিতৃদেব হিন্দুসমাজের একজন অধিপতি ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রাহ্ম হইয়া যাইতেছে প্রচার হইবা মাত্র দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। এই অবস্থায় যখন আমি নানা প্রকার মানসিক অশান্তিতে দিন যাপন করিতেছি, তখন মুকুন্দানন্দ আমার জন্য এখানে একটী চাকুরী যোগাড় করিয়া আমাকে তার করিলেন। তাঁহার তারকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ রূপে গ্রহণ করিয়া আমি এখানে চলিয়া আসি। তাহার পর দুইজনে একত্রে একই বাসাতে সন ১৯০৪ সাল হইতে ১৯০৯ সাল পর্য্যন্ত বাস করি। পরে বিবাহিত হইয়া পৃথক বাসা করিলেও আমরা প্রায় সর্ব্বদাই একত্রে সময় যাপন করিতাম। সে কি সুখের অবস্থা ছিল তাহা বলিতে পারি না!! দিবারাত্র ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, সদালোচনা, উপাসনা ও প্রার্থনায় দিন কাটিয়া যাইত। ধর্ম্মশাস্ত্রে মুকুন্দানন্দ সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব বংশের সন্তান ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী অতি যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল, নরোত্তম দাসের প্রার্থনা, গোবিন্দ দাসের করচা এবং ভক্তি রসামৃতসার, উজ্জ্বল নীলমণি, ষট্ সন্দর্ভ, আচার্য্য রামানুজের শ্রীভাষ্য প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী তিনি সুচারু রূপে পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি একনিষ্ঠ পবিত্র একেশ্বর-বাদী ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার রক্তমাংসের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষ ভাবে অনুপ্রবিষ্ট থাকা সত্ত্বেও তিনি অবতারবাদ, গুরুবাদ প্রতিপাদিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে শান্তি পান নাই।

মাঘোৎসবে পিতৃতর্পণে চৈতন্যদেবের নাম শুনিলে, তিনি বলিতেন এখানে আবার চৈতন্যদেবের নাম কেন? তিনি ত অবতারবাদী পৌত্তলিক ছিলেন। গত বৎসর, এই সময় যখন সাধনাশ্রমে চৈতন্য-উৎসব হয়, তখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন। তিনি ইহাতে অত্যন্ত মনব্যথা পাইয়াছিলেন। আমাকে পুনঃ

পুনঃ বলিতেন, ব্রাহ্মসমাজ কোথায় চলিয়াছেন? আমাকে নিয়মিত রূপে ভাগবত পড়িতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে অনেক অমূল্য ধর্ম্ম উপদেশ ও সাধনতত্ত্বের কথা আছে। তবে অতি সাবধানে চলিতে হইবে, পদে পদে পদস্খলনের যথেষ্ট ভয় আছে।

অবতারবাদ, গুরুবাদ, মধ্যবর্ত্তীবাদ তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করিত। সেই জন্য তিনি গুরুমুখী শিক্ষা করিয়া নানকের পবিত্র ব্রহ্মোপাসনামূলক গ্রন্থ জপজী সুখমণি, মুসলমান সুফি সম্প্রদায়ের সাধুদিগের জীবনী তাপসমালা অতি শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠ তাঁহার জীবনের একটী প্রধান ব্রত ছিল। ঋগ্বেদ, সামবেদ, উপনিষদ, বেদান্তদর্শন, পুরাণ উপপুরাণসকল তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। James Allan, Ralph Waldo Trine ও Count Tolstoi এর বই তাঁহার অতিপ্রিয় ছিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সকল গ্রন্থই পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকাবলী দৃষ্টে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিনি জীবনে কোনও দিন উপন্যাস পাঠ করেন নাই। উপন্যাস হইতে সদ্‌-চিন্তার ও সদুপদেশের কথা পাঠ করিলে তিনি মন দিয়া শুনিতেন না। জীবনে কোনও দিন থিয়েটারে গিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

তিনি নিত্য উপাসনাশীল ছিলেন। কোনও কাজ করিতে হইলে ভগবানের নাম স্মরণ না করিয়া করিতেন না। ঈশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ না করিয়া কিছুতেই কিছু গ্রহণ করিতেন না। প্রতিদিন রাত্রি তিনটার সময় উঠিয়া আপন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন। পাঠ সঙ্কীর্ত্তন আরাধনা প্রার্থনা ও স্তোত্রপাঠ করিয়া উপাসনা শেষ করিতেন। একবার কোনও উদ্ধত যুবক পার্শ্ববর্ত্তী বাসার স্বনিযুক্ত প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার নিকট অভিযোগ করিয়া পাঠায় যে, তাঁহার রাত্রি তিনটা হইতে গান আরম্ভ করিলে পাশের ঘরের লোকের নিদ্রা নষ্ট হয়,—যদিও তিনি আপন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া সঙ্গীত করিতেন ও তাহাতে বাহিরে তাহার শব্দ অল্পই আসিত। তিনি এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হন এবং আমাকে কি করিতে হইবে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। আমি তাঁহার প্রতিবেশীদিগের নিকট এই কথা উত্থাপন করিলে তাঁহারা বলিলেন, ভগবানের নামে যদি নিদ্রা ভঙ্গ হয়, তবে ত সেদিন সুদিন হইল গণ্য করা উচিত। এই কথা শুনিয়া তিনি শান্ত হন।

এই গভীর ঈশ্বরপ্রীতি হইতে তাঁহাতে অসাধারণ বন্ধু-প্রীতি সঞ্চিত হইয়াছিল। তিনি আমাকে এবং আমার পরিবারকে কিরূপ স্নেহ করিতেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। মাতা বিহঙ্গী যেমন পক্ষপুটে আপন সন্তানদিগকে আবৃত করিয়া তাহাদিগকে সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করে, তিনি সেই ভাবেই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। আজ আমি কেবল বন্ধুহীন হই নাই, পিতৃহীন হইয়াছি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একবার তাঁহার কোনও বন্ধু অর্থাভাবে আমেরিকায় কষ্টে পতিত হন। তিনি সেই সংবাদে যে কিরূপ অস্থির হইয়াছিলেন তাহা বলিবার নয়। উচ্চহার সুদে ঋণ করিয়া, নিজের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া ও বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়া, তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন।

তাঁহার বন্ধুপ্রীতির আরও একটি কথা উল্লেখ করিতেছি। সুহৃদ্বর রমাকান্ত রায় যখন কাশ্মীরে, তখন আমি দেরাদূনে আসি। তিনি কলিকাতা যাইবার পথে দেরাদূনে আমাদের সহিত দেখা করিয়া যাইবেন বলিয়া আমাদিগকে পত্র দেন। মুকুন্দানন্দ রমাকান্তের উদ্দেশ্যে কয়েকটী সুমিষ্ট আম ও অন্যান্য ফল কিনিয়াছিলেন। কোনও কারণে রমাকান্তের দেরাদূনে আসা হইল না। মুকুন্দানন্দ সেই ফল যেখানে রাখিয়াছিলেন সেইখানে রাখিয়া দিলেন। তাহা নিজেও খাইলেন না, কাহাকেও খাইতে দিলেন না। আম পচিয়া শুকাইয়া আঁটি হইয়া গেলেও তাহা তিনি ফেলিয়া দেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতেন, রমাকান্তের জন্য কিনিয়াছিলাম।

বন্ধুবান্ধবদিগকে খাওয়াইতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। দেরাদূনে কোনও ব্রাহ্ম আসিলে তিনি তাঁহাকে আপন বাসায় লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার সকল প্রকার সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তাঁহার যত্নে সেবায় ও আতিথ্যের আতিশয্যে লোকে অস্থির হইয়া উঠিতেন।

তিনি অকাতরে দান করিতেন। দানের তাঁহার পাত্রাপাত্র জ্ঞান ছিল না। তিনি অতি গোপনে দান করিতেন, যেন কেহ জানিতে না পারেন। তাঁহার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও তাঁহার দানের কথা জানিতে পারিতেন না।

যে কোনও হিতকর কার্য্যের জন্য সাহায্য চাহিলে তিনি বঞ্চিত করিতেন না। কেহ ঋণ চাহিলে ফেরৎ পাইবার আশা না থাকিলেও তিনি "না" বলিতেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "আহা, বেচারা কষ্টে পড়িয়াছে, তাহা না হইলে কি ধার চাহিতেছে? আমি এক সময় দারিদ্র্যে পড়িয়া রক্তে রক্তে অনুভব করিয়াছি অর্থাভাব হইলে কি কষ্ট পাইতে হয়!" ঋণ-পরিশোধ করিবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "হাতে অর্থ আসিলেই পরিশোধ করিয়া দিবে, কেহ ইচ্ছা করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া থাকিতে চাহে না।" আমি জানি এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়াছেন যাহার কোনও প্রকার লেখা পড়া নাই। তিনি কখন কাহাকে কত দিতেন তাহার হিসাব রাখিতেন বলিয়া মনে হয় না।

তাঁহার হৃদয় অতি উদার ছিল। আপন পর জ্ঞান অতি কম ছিল। একবার তাঁহার দেশের সাহা জাতীয় কোনও বালক উচ্চ প্রাইমারী পাশ করিয়া আরও অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হয়। সেই পত্রখানা পাইয়া আমাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিতে হইবে বলুন?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি ইহার বরাবর পড়িবার খরচ দিতে চান?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখুন, আমি আমার খুড়তোত ভাইদিগকে পড়িবার খরচ দিই, কিন্তু তাহারা পাশ করিতে পারে না, তবুও খরচ বন্ধ করি নাই। আর এই বালকটী পাশ করিয়া খরচ চাহিতেছে, ইহাকে দিব না? ইহার

যে দাবী করিবার অধিকার আছে।" ইঁহার দেহত্যাগের কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার অনৈক বন্ধু তাঁহার পিতার অসুখের কথা জানাইয়া পত্র দিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, বোধ হয় পিতার অসুখের জন্য অসুবিধায় পড়িয়াছেন, এ সময়ে কিছু সাহায্য করিতে পারিলে ভাল হয়।

ইনি ইঁহার বিমাতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, কাহাকেও ইঁহার বিমাতা বলিয়া কিছুতেই জানিতে দিতেন না। তাঁহার খরচ পত্রের জন্য নিয়মিত রূপে যথেষ্ট অর্থ পাঠাইতেন। মাতার তীর্থপর্য্যটনের সকল ব্যয় অকাতরে বহন করিতেন। বিমাতাও এই একমাত্র সপত্নীপুত্রকে আপন গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন।

মুকুন্দানন্দ ব্রাহ্ম হইয়া একবার দেশে গিয়াছিলেন। বিমাতা তাঁহাকে পাইয়া যেমন একদিকে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, তেমনি আবার পুত্র ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাতে তাঁহার হৃদয় শোকে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পুত্রকে নিকটে পাইয়াও একসঙ্গে একত্রে বসিয়া আহার করাইতে পারিবেন না, এ কথা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ যেন ফাটিয়া যাইত। যখন মুকুন্দানন্দ তাঁহাকে রান্নাঘরের ভিতর আহার না দিয়া বাহিরের দ্বারে দিতে বলিয়াছিলেন, তখন তিনি আহারের থালি হাতে লইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন।

নারী জাতির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। আমি বিবাহিত হইয়া আসিয়া যখন আমার পত্নীর সহিত তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিলাম, তখন তিনি আমার পত্নীকে বলিয়াছিলেন, আমার মা নাই, ভগ্নী নাই, তাঁহাদের পবিত্র প্রভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত হইবার আমার অবসর ছিল না। সেই জন্য আমার কথাবার্ত্তায় আচারব্যবহারে কোনপ্রকার দোষ ত্রুটী দেখিলে ক্ষমা করিবেন। শ্রদ্ধায় তিনি নারীদিগের সহিত মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিতেন না।

আমি পূর্ব্বেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কিছু আভাস দিয়াছি। তিনি যে কতটা ধর্ম্মপ্রাণ সত্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন তাহা লেখনীতে প্রকাশ করা যায় না। যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিয়াছিলেন তাঁহারাই জানেন। বাঁকিপুরনিবাসী স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় যখন দেরাদুনে আসিতেন, তখন তিনি আমাদের সহিত বাস করিতেন। কত রাত্রি যে ধর্ম্মালোচনায় ও প্রার্থনায় কাটিয়া যাইত তাহা বলিবার নয়। মুকুন্দানন্দের ধর্ম্মপ্রাণতা ও ধর্ম্মশীলতার জন্য প্রকাশচন্দ্র তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

মুকুন্দানন্দ কেবলমাত্র দুইবার সামাজিক উপাসনা করিয়াছিলেন। প্রথমবার ১৯২৯ সালে মাঘোৎসবের দিন। তখন আমি এখানে ছিলাম না। আমার সহধর্ম্মিণী বলিয়াছেন, "সে কি আকুলতাপূর্ণ প্রার্থনা, এইরূপ প্রার্থনা ত শুনি নাই।" দ্বিতীয়বার আমার পূজনীয়া স্নেহশীলা মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে। সে উপাসনা অতীব গম্ভীর ও মধুর হইয়াছিল। তিনি আমার পূজনীয়া মাতৃদেবীকে স্বীয় জননীসম জ্ঞান করিতেন। এখনো আমার সহোদরগণ তাঁহাকে আপনাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিয়া ভক্তি করেন।

তিনি বেদী গ্রহণ না করিলেও, যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার সহিত আলোচনাই উপাসনার অধিক।

ব্রাহ্মসমাজ মুকুন্দানন্দের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। Indian Messenger বা তত্ত্বকৌমুদী পাইলেই সর্ব্বপ্রথমে দেখিতেন কে কত ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের জন্য দান করিয়াছেন। তিনি অনেক সময় বলিতেন, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিতেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারের জন্য কিছু করিতেছেন না। মাঘোৎসব ও ভাদ্রোৎসব তাঁহার প্রাণের জিনিষ ছিল। সুন্দর সুচারু রূপে উৎসবগুলি সুসম্পন্ন করিতে তাঁহার কত না উৎসাহ! প্রচারক আনাইয়া, লোকের বাড়ী বাড়ী গাড়ী পাঠাইয়া, কত করিয়া উপাসকদিগকে একত্রিত করিতেন, এবং অধিকাংশ খরচ নিজেই বহন করিতেন। ১১ই মাঘ ও ৬ই ভাদ্র প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি দ্বারে দ্বারে ব্রহ্মনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। সুর তাল মান না থাকিলেও, এমন ভাবের সহিত গান করিতেন যে, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। ঐ দুইদিন তিনি উপবাসী থাকিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন।

সাপ্তাহিক উপাসনা তাঁহার গৃহে হইত। উপাসনার পরে তিনি প্রায়ই জলযোগের ব্যবস্থা করিতেন। জলযোগের কথা বলিলে বলিতেন, "কি আনন্দ, ভগবানের নামে এতগুলি একত্রিত হইয়াছেন, তাঁহারা কি শুধু মুখে ঘরে ফিরিয়া যাইবেন? তাহা কি হয়?" দেরাদুন ব্রাহ্মসমাজের উপাসকগণ সকলেই নিয়মিত ভাবে প্রতি সপ্তাহে উপাসনায় আসিতেন না। এমন অনেক সপ্তাহ গিয়াছে যে তাঁহাতে আমাতে উপাসনা করিয়াছি। দুইজন বলিয়া সংক্ষিপ্ত উপাসনা হইতে দিতেন না। পূর্ণাঙ্গ উপাসনা না হইলে তাঁহার মনঃপূত হইত না।

১৯২৮ সনে তিনি মুসুরীতে প্রার্থনাসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মাত্রেই উপাসনায় যোগ দিতেন এবং উপাসনান্তে প্রতি সপ্তাহেই তিনি জলযোগ করাইতেন। তখন তিনি Himalayan Clubএ থাকিতেন। সেই Clubএ মথুরায় Civil Surgeonও ছিলেন। মুসুরী হইতে নামিয়া আসিবার সময় ডাক্তার সাহেব তাঁহার একটী Photo তুলিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। সেই Photoর পশ্চাৎ দিকে "Saint of the Himalayan Club" লিখিয়া দিয়া নিজ নাম সই করিয়াছিলেন।

তিনি আদি, নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—এই তিন সমাজকেই এক অখণ্ড ব্রাহ্মসমাজ মনে করিতেন। যদিও তিনি ব্রাহ্মসমাজ বলিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকেই বুঝিতেন এবং যদিও তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত ওতপ্রোত ভাবে সংসৃষ্ট ছিলেন, তবুও তিনি কখনও এই তিন সমাজের তুলনামূলক সমালোচনা করিতেন না। তাঁহার এই প্রকার উদার ভাব দেখিয়া, অনৈক নববিধানী ভদ্রলোক তাঁহাকে নববিধানে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত বলেন, তাঁহাকে নববিধানের গ্রন্থাবলী উপহার দিলে তিনি যদি মনযোগ সহকারে পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এক সেট গ্রন্থাবলী উপহার দিবেন। তিনিও স্বীকৃত

হইয়াছিলেন। নববিধানী ভদ্রলোকটী উৎসাহিত হইয়া, পরদিন আমার সাক্ষাতে নববিধানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া, ভক্তিভাজন ঋষিকল্প আচার্য্য শিবনাথের নামে নানাপ্রকার অকথ্য ও অশ্রাব্য কথা বলিতে আরম্ভ করিলে, শান্তপ্রকৃতি মুকুন্দানন্দ আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় তীব্র ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাসনা প্রার্থনা উপদেশ বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া শিখিয়াছি কোন্‌টা ধর্ম্ম, কোন্‌টা অধর্ম্ম কুধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম, শিখিয়াছি কোন্‌টা নীতি, কোন্‌টা অনীতি কুনীতি দুর্নীতি, কোন্‌টায় আত্মার ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণ হয়—আর আপনাদের কথাবার্ত্তা ও পুস্তক পাঠ করিলে (মনে করিবেন না আপনাদের কিছুই পড়ি নাই) সর্ব্বদা মনে যেন সব গোলে হরিবোল, কোনটারই সুস্পষ্ট (Clear Cut) জ্ঞান নাই, রহস্য ও জটিলতায় পূর্ণ।" ইহার পর এই ভদ্রলোকটী তাঁহাকে কোন বই পড়িতে দেন নাই।

ভক্তিভাজন আচার্য্য শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। তিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্মদিনে ও পরলোক-গমনের দিনে উপবাসী থাকিয়া উপাসনা প্রার্থনায়, এবং তাঁহার আত্মচরিত ও উপদেশাদি পাঠে অতিবাহিত করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয়কে আমি আমার ধর্ম্মপিতা বলিয়া মান্য করিয়া থাকি। তাঁহার উপদেশ, তাঁহার বক্তৃতা, আত্মচরিত আমার গৃহে "হরিকথার" ন্যায় পঠিত হইয়া থাকে। এইখানে একটী কথা না বলিয়া থাকিতে পরিতেছি না। আমার দ্বিতীয়া কন্যা যূথিকা যখন বাঙ্গলা পড়িতে শিখে, তখন সে শাস্ত্রীমহাশয়ের আত্মচরিত (প্রথম সংস্করণ) পড়িতে আরম্ভ করে। আমি একদিন যখন অফিস হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছি, তখন যূথিকা আমাকে দেখিতে পাইয়াই দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোধ ভরে বলিতে লাগিল, "বাবা, হরানন্দ ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত দুষ্ট লোক, অত্যন্ত খারাপ লোক"। আমি কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, "তাঁহার এত বড় আস্পর্দ্ধা যে আমাদের শাস্ত্রী মহাশয়কে চেলা কাঠ দিয়া মারিয়াছেন!" আমি বলিলাম, "শাস্ত্রী মহাশয় যে তাঁহার ছেলে!" সে সে-কথায় কান না দিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, "আমাদের শাস্ত্রী মহাশয়কে তার মারবার কি অধিকার আছে?" এই কথা শুনিয়া মুকুন্দানন্দ বলিয়াছিলেন, এখন বুঝিলাম শাস্ত্রীমহাশয় যথার্থই আপনাদের।

গত আগষ্ট মাসে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরিকা "Teachings from the life of Pandit Sivanath Sastri" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া আনন্দমোহন বসু পুরস্কার পায়। সে কথা সে আমাদিগকে জানায় নাই। মুকুন্দানন্দ Indian Messenger এই সংবাদ পড়িয়া দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, "বাপের মেয়ে বটে, মিনুরাণী শাস্ত্রী মহাশয়ের নামের পুরস্কারটী পাইয়াছে" এবং এতটা আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি তাহাকে মূল্যবান উপহার দিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিস্তৃত জীবন চরিত প্রকাশিত হইতেছে না দেখিয়া তিনি বড়ই দুঃখ করিতেন।

তাঁহার বড় সাধ ছিল, ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের প্রতিকৃতি দিয়া একটী দিন-পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া বিতরণ করিবেন। ইহার জন্য অনেক Photoও যোগাড় করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তিনি অমরধামে চলিয়া গেলেন।

আমি এমন সংযতেন্দ্রিয় ধর্ম্মাত্মা, পূতচরিত্র ভক্তিমান ব্যক্তি অল্পই দেখিয়াছি। শেষ জীবনে তাঁহার ভক্তিভাব বিশেষ ভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। ব্রহ্মনাম গান করিতে করিতে বিভোর হইয়া যাইতেন এবং অবিরতধারে নয়নাশ্রু প্রবাহিত হইত।

আমার নিকট তিনি একাধারে সখা সুহৃদ ও গুরু ছিলেন। আমার পুত্রকন্যারা তাঁহাকে আপন জ্যেঠামহাশয় বলিয়া শ্রদ্ধা করিত। তিনি সর্ব্বদাই তাহাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেন। তাহারা আমার নিকট যে আব্দার করিতে সাহস করে না, তাঁহার নিকট সেই আব্দার করিত।

জ্যেঠামহাশয় অফিস যাইবার সময় ও অফিস হইতে ফিরিবার সময় তাহাদিগকে না ডাকিলে তাহারা অধীর হইয়া পড়িত এবং পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিত, "কই, জ্যেঠামহাশয় ত আজ ডাকেন না, আজ অফিস যাবেন না? তাঁর কি কোন অসুখ হয়েছে?"

আমার গৃহে এমন কোনও অনুষ্ঠান হইতে পারিত না যাহাতে মুকুন্দানন্দ উপস্থিত হইতে পারিতেন না। জ্যেঠামহাশয় না থাকিলে শুধু যে কিছুতেই আমার সন্তানদিগের মনঃপুত হইত না তাহা নহে, তাহাদের অর্দ্ধেক আনন্দ অন্তর্হিত হইয়া যাইত। এমন কি, তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে তিনি আসিবেন কি না, সে-কথা আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এখনো আমার ছোট ছেলেরা বিশ্বাস করে যে, তাহাদের জ্যেঠামহাশয় মুসুরীতে আছেন। কেহ কোন প্রকার দুষ্টামী করিলে অন্যেরা এখনো বলিয়া থাকে, জ্যেঠামহাশয় আসিলে বলিয়া দিব, তিনি তোমাদিগকে ভালবাসিবেন না।

তিনি আমাদের এতটা আপনার ছিলেন যে, অন্যত্র কোথাও যাইতে হইলে, তিনি নিকটে আছেন এই ভরসায় নির্ভর করিয়া, নিশ্চিন্তমনে বাহির হইতে পারিতাম।

আমি এমন সুহৃদকে হারাইয়া যে কতটা হীনবল হইয়া পড়িয়াছি তাহা বিধাতাই জানেন। বড় আশা ছিল, শেষ জীবনে দুইজনে একত্রে থাকিব ও আমি তাঁহার সেবা করিব। তাঁহারও একটা চিন্তা ছিল, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার মত রুগ্ন ব্যক্তির কে তত্ত্বাবধান করিবে। কত স্থানে তাঁহার বাড়ী করিবার কথা হইয়াছে, কোথাও নাকি তাঁহার জন্য বাড়ী নির্ম্মিতও হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার আমাদের উপর নির্ভর ও একান্ত বিশ্বাস ছিল বলিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিতেন না। আমরা জানিতাম না মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার জন্য অন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। ভক্ত আত্মা নিজে না ভুগিয়া, অন্যকে না ভোগাইয়া, আনন্দময়ী জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দেরাদুন ব্রাহ্মসমাজের হিরণ্ময় স্তম্ভ খসিয়া পড়িল। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। অমর আত্মা অমরধামে চলিয়া গেলেন!

যাও, যাও, দেব, সেই সকল পথ দিয়া যাও, যে-সকল পথে পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গমন করিয়াছেন। যে পথে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ গমন করিয়াছেন এবং যে পথে জন্মপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে গমন করেন।

যাও দেব, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত মিলিত হও, পরলোকের দেবতাদিগের সহিত মিলিত হও। উন্নত স্বর্গলোকে গিয়া তোমার সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার সহিত মিলিত হও। যাহা কিছু মলিন অপবিত্র ও অশোভন তাহা পরিহার করিয়া, নূতন তেজোময় পবিত্র ও শোভন দেহের সহিত মিলিত হও।

স্বর্গের দেবতাগণ তোমাকে রক্ষা করুন। তোমার নূতনতর আয়ু নিত্য বর্দ্ধিত হউক, বিশাল হউক। এ জীবন হইতে চ্যুত হইয়া, ঈপ্সিত জীবন আরও অধিকরূপে লাভ কর, বিনাশ দূরে পলায়ন করুক। ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

## ব্রাহ্মসমাজ

**জন্মোৎসব**—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিপঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—

২রা জ্যৈষ্ঠ (১৬ই মে) শুক্রবার—সমাজপ্রতিষ্ঠার দিন—প্রাতে উপাসনা; পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে উপাসনা; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৭ই মে) শনিবার—প্রাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে বক্তৃতা; পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ বক্তৃতা করেন ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির কার্য্য করেন।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ (১৮ই মে) রবিবার—প্রাতে উপাসনা; শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে বালক বালিকা সম্মিলন—Goodwill day celebration. শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু প্রার্থনা এবং Good-will day celebration এর অর্থ সংক্ষেপে বিবৃত করিলে পর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, ও শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী বালক বালিকাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। জলযোগান্তে কার্য্য শেষ হয়। সায়ংকালে উপাসনা; শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

**শুভবিবাহ**—বিগত ৯ই মে কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ভূদেব চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় কন্যা কল্যাণীয়া অমলা ও কানপুর-নিবাসী পরলোকগত রমণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সিদ্ধেশ্বরের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৪শে মে কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া প্রিয়ম্বদা ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নিরঞ্জনের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৫শে মে বগুড়া নগরীতে বারাকপুর নিবাসী পরলোকগত অতুলচন্দ্র ঘোষের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া ইন্দুপ্রভা ও পরলোকগত বঙ্কবিহারী বসুর তৃতীয় পুত্র শ্রীমান ভক্তসখার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে মাতা শ্রীমতী লীলাবতী বসু সাধারণ বিভাগে ১০৲ দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ১০৲ ও দাতব্য বিভাগে ৫৲ মোট ২৫৲ দান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

---

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৬ই মে কলিকাতা নগরীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন সভ্য রায় বাহাদুর অন্নদাচরণ সেন ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ও অমিয় প্রকৃতির লোক এবং ব্রাহ্মসমাজের কাজে উৎসাহী ছিলেন।

বিগত ২২শে মে কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হীরালাল সরকারের পত্নী (শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাসের কন্যা) সরোজিনী সরকার অল্প কয়েকদিনের অসুখে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ২৫শে মে বেজগাঁ গ্রামে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু শ্রীনাথ দত্ত দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২৫শে কলিকাতা নগরীতে রায় প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত বাহাদুরের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ শাস্ত্রপাঠ, জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার দাসগুপ্ত জীবনীপাঠ ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সেন প্রার্থনা করেন। শেষে এই উপলক্ষে বিবিধ প্রতিষ্ঠানে দান বিজ্ঞাপিত হয়।

বিগত ১৭ই মে গিরিধি নগরীতে পরলোকগতা সরোজিনী সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস শাস্ত্র-পাঠ, জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী আশাবতী মজুমদার জীবনীপাঠ ও শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রার্থনা করেন

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

---

**নামকরণ**—বিগত ৫ই মে মুঙ্গের নগরীতে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বসু মল্লিকের প্রথম সন্তানের নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাসগুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যার নাম নমিতা রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রচার ফণ্ডে ১৲ দান প্রদত্ত হইয়াছে। মঙ্গলময় বিধাতা শিশুকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

**দান**—শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিবিধ প্রতিষ্ঠানে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত পত্নী শরৎসুন্দরীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী বসু মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ ও দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ১৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্তের পুত্র নলিনীভূষণের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ৫৲ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমতী সুপ্রভা বসু পিতা পরলোকগত সাতকড়ি দেবের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৩৲ ও দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। এ সমস্ত দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল চির শান্তি লাভ করুন।

**পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ**—রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিগত ১৪ই মে অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছেন:—

"রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যুতে এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। প্রসন্ন বাবু দীর্ঘকাল পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন এবং ১৯২৮সনে সমাজের অন্যতম ট্রাষ্টি মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে একান্ত অনুরাগী এবং সমাজের একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজের গৌরববৃদ্ধির জন্য তিনি অকাতরে অর্থদান করিয়াছেন এবং আপনার সময় ও শক্তি ব্যবহার করিয়াছেন। গত শতবার্ষিক মহোৎসবে তিনি নিতান্ত ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও যেরূপ উৎসাহের সহিত ঢাকা জিলার গ্রামে গ্রামে গিয়া ব্রহ্ম নাম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন তাহা চিরদিন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। ভগবান তাঁহার মুক্ত আত্মার কল্যাণ করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারে শান্তি বিধান করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৫২ম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে গত ২রা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যায় উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু এবং শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত যথাক্রমে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

কলিকাতা সাধারণ সমাজের অনুরোধ ক্রমে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে গত ১৮ই মে রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় "Good Will Day" উপলক্ষে বালক বালিকাদের একটি সম্মিলন হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রার্থনান্তে বালক-বালিকা-দিগকে উপদেশ দেন। শ্রীযুক্ত অময়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য "Good Will Day" কথাটির তাৎপর্য্য বালক-বালিকাদিগকে বুঝাইয়া দেন। তৎপর তাহাদিগকে জলযোগ করান হয়।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ২২শে জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি এ।

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৩ম ভাগ
৫ম সংখ্যা।

১লা আষাঢ়, সোমবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১
16th June, 1930.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ⁄০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা।

হে জ্ঞানস্বরূপ, তুমি অনন্ত জ্ঞানের চির প্রস্রবণ হইয়া আমাদিগকে নিয়ত জ্ঞানশিক্ষা দিতেছ, তোমার অসীম জ্ঞানের পথে একটু একটু করিয়া অগ্রসর করিতেছ। চারিদিকে তোমার জ্ঞানের রহস্যময় অসংখ্য নিদর্শন রাখিয়া তুমিই প্রাণে জ্ঞানতৃষ্ণা জাগাইতেছ, সকল রহস্য ভেদ করিয়া তোমাকে জানিবার বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা উদয় করিতেছ। আমরা নানা সংশয়-অন্ধকারের মধ্যে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলে, কোনও আলোক বা পথ দেখিতে না পাইলে, তুমিই হৃদয়ে আকুল প্রার্থনা জাগাইতেছ, অনন্যগতি হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে শিক্ষা দিতেছ। আবার, তুমিই কৃপা করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া, আমাদের নিকট আপনাকে প্রকাশিত করিয়া, সকল সন্দেহ সংশয় বিদূরিত কর,—তোমাকে সত্যরূপে জানিতে ও বুঝিতে সমর্থ কর। তুমি যেমন সাক্ষাৎভাবে প্রতি অন্তরে, তেমনি পরোক্ষভাবে বাহিরের নানা উপায়েও, নানা লোকের মধ্য দিয়াও, বিবিধ প্রকারে তোমাকে প্রকাশ করিয়া থাক। তুমি এইরূপে জীবন্তভাবে প্রতিনিয়ত কার্য্য না করিলে, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে কিছুতেই তোমাকে জানিতে পারিতাম না, তোমার পথে চলিতে সমর্থ হইতাম না। তোমার এত করুণা পাইয়াও কেন যে আমরা অসারের মোহে মুগ্ধ হইয়া অধিকাংশ সময় তোমাকে ভুলিয়াই থাকি, অসারের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াই, বুঝিতে পারি না। হে হৃদয়দর্শী করুণাময় পিতা, তুমি ত সকলই দেখিতেছ। তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের মোহ অন্ধকার দূর করিবে? দুর্ব্বল অবসন্ন হৃদয়ে বলসঞ্চার করিবে? তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে হাত ধরিয়া তোমার পথে লইয়া চল। আমরা সর্ব্বদা সকল বিষয়ে তোমাকে অনুসরণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক।

## নিবেদন।

**স্রোতে ভেসে যাই**—আমি তোমার প্রেমের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি, আমার নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর কিছু আর রাখ্ছি না—কোথায় যাব, কি আমার লক্ষ্য, কিছু জানি না। তুমি ডেকেছ, তাই ঝাঁপ দিয়ে প’ড়েছি; এতে ভাল হবে কি মন্দ হবে, সুখ হবে, কি দুঃখ হবে, জানি না। আজ এখানে আছি, কাল কোথায় থাক্‌ব, তা জানি না; আজ সুখে আছি, কাল যে দুঃখে পড়্‌ব না, কে জানে? আমি আর ভাব্‌তে পারি না। তোমার আহ্বানে, তোমারই প্রেমস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি; ঐ স্রোত আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, তাতেই আমার কল্যাণ। তোমরা আমাকে নিন্দা কর, আর প্রশংসা কর, তোমরা আমাকে সাহসী বল, আর কাপুরুষ বল, তাতে কিছুই আসে যায় না; তোমাদের কথা শুন্‌ব, একটু হাস্‌ব, কিন্তু প্রতিবাদ কর্‌ব না, আত্ম-সমর্থন কর্‌ব না। আমার কাজ অকাজ আমি ত জানি না; তোমার আদেশে এসেছি, তোমার আদেশে স্রোতে ভেসে যাচ্ছি। কোথায় যেতে হবে, কোথায় যেয়ে থাম্‌তে হবে, কোথায় এ গতির শেষ হবে, আমি তা জানি না। আমি আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি; স্রোতে যেখানে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তাতেই কল্যাণ।

**তোমার বোঝা আমি বই**—তোমার দাসত্ব নিয়েছি, তখন তুমি যে বোঝা দিবে তাহাই বইব। আমার শক্তিতে কতটা কুলাবে, না কুলাবে, তা আমি জানি না; কিসে আমার সুবিধা হবে, কিসে অসুবিধা হবে, তাও জানি না। আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রভু; আমার কাজই তোমার আদেশ পালন করা; আমার কাজই তোমার বোঝা বহন করা। আমি করজোড়ে তোমার আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি; তুমি যে ভার দিবে, তাহাই গ্রহণ করব। কখনও আদেশ-পালনে অসম্মতি প্রকাশ করব না। যদি বোঝা এত গুরু হয় যে আর বইতে পারি না, তবুও 'না' করব না,—তোমার দেওয়া বোঝা মাথায় ক'রে ব'সে পড়্ব, বোঝার ভারে পিষে মরব। তোমার কাজ করতে করতে, তোমার বোঝা বইতে বইতে যদি মরণ আসে, সে-মরণই যে আমার জীবন; সে-মরণে যে আমার অমৃতত্বলাভ! মরতে হ'লে তোমার কাজ ক'রেই মরি, তোমার বোঝা ব'য়েই মরি। তাতেই আমার শান্তি, আমার সৌভাগ্য।

---

**আমার বোঝা তুমি বও**—তুমি বোঝা মাথায় চাপিয়ে দাও; যে বোঝার ভার আমি বইতে চাহি না, সে বোঝাও তুমি আমার অমতে আমার মাথায় চাপিয়ে দাও—আমি ক্রন্দন করি, আমি অসম্মতিপ্রকাশ করি, তবুও তুমি ছাড় না। কিন্তু তবুও যখন আর পারি না, তখন তুমিই ত এসে সে বোঝা ধর; আমার বোঝা এসে তুমিই বহন কর। কত বার দেখেছি, অযাচিত ভাবে কত কর্ত্তব্য এসেছে, কত দায়িত্ব এসে পড়েছে—গ্রহণ করতে চাই নাই, আমি পারব না ব'লে সে কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব নিতে চাই নাই, বোঝা বইতে অস্বীকার করেছি; তথাপি সে বোঝা এসে চেপেছে, সে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য এসে ঘাড়ে পড়েছে। আহা! যখন তাহা গ্রহণ ক'রে তোমার দিকে চেয়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েছি, তখন দেখি বোঝা লঘু হ'য়ে গেছে—তখন দেখি, তুমি এসে বোঝা নিজে নিয়েছ, তুমি এসে আমার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য গ্রহণ করেছ; তুমি এসে আমার পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়েছ। তোমার করুণা আমাকে টেনে নিয়েছে; আমার কাজ লঘু ক'রে দিয়েছে।

## সম্পাদকীয়

**উপাসনা শিক্ষা দিবার প্রণালী**—আমরা ১৬ই বৈশাখ তারিখের "ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষা" শীর্ষক আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, "উপাসনাসাধনেরও একটা স্বাভাবিক প্রণালী আছে, উহা শিক্ষা দেওয়ারও একটা স্বাভাবিক পথ আছে। বর্ত্তমানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার বেশী প্রয়োজন নাই। যাহারা সে বিষয়ে যথার্থই আগ্রহান্বিত তাহারা সহজেই তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবে, তাহার জন্য যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না।" যাহাতে সমাজমধ্যে সর্ব্বাগ্রে উপাসনার জন্য আগ্রহ ও ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিতে পারে, বিশেষভাবে তাহার উপায় নির্দ্দেশ ও অবলম্বন করিবার জন্যই সকলকে অনুরোধ জানাইয়াছিলাম। আমাদের আশা ছিল, বিজ্ঞতর ব্যক্তিগণ এই আলোচনাতে যোগ দিবেন, এবং আপনাদের গভীরতর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফল প্রকাশ করিয়া, বর্ত্তমান সঙ্কটের সময়ে সমাজের কল্যাণসাধনে যথোচিত সাহায্য করিবেন। কেহ কমিটির নিকট আপনাদের বক্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছেন কি না জানি না। তাহা করিয়া থাকিলেও, তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশের জন্য তাহা পাঠাইলে অপরের চিন্তা বিষয়ে অনেকটা সাহায্য হইবে এবং সুমীমাংসায় উপনীত হইবার পথ সুগম হইবে। ডাক্তার রায় মহাশয় মনে করেন, এই সঙ্গে প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাহা না করিলে বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইবে না। কাজেই, আলোচনার সুবিধার জন্য, এ বিষয়ে আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাতে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহা, তাঁহার আদেশ অনুসারে, সকলের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিতেছি।

সর্ব্ব প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে, আমাদের উপাসনা যখন দেশপ্রচলিত বাহিরের অনুষ্ঠান ও মন্ত্রজপাদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের, তখন উহার শিক্ষাদানপ্রণালীও পৃথক রকমেরই হইবে। ব্যাহ্যিক বিধি ব্যবস্থা নিয়মের একটা প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও, উহা সে-সকলের এত উপরে যে, মোটেই তাহাদের উপর নির্ভর করে না বলিলে বেশী দোষের হইবে না। উহা সম্পূর্ণরূপেই প্রাণের জিনিষ, আধ্যাত্মিক ব্যাপার। সুতরাং সেই প্রকৃতিটি হারাইয়া ফেলিলে, আর কিছু থাকুক বা না থাকুক তাহাতে কিছু আসে যায় না। এই জন্যই ইহার শিক্ষাদানে বিশেষ কাঠিন্য আছে। শুধু উপদেশ প্রদান করিয়া, অথবা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও, ইহা শিক্ষা দেওয়া যায় না। অবশ্য, তাহা হইতে শিক্ষার্থী যে কোনও সাহায্য পায় না বা পাইতে পারে না, এমন কথা কেহই বলিবে না। অন্য শিক্ষা-ক্ষেত্রে যেমন তাহার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, এখানেও তাহার আবশ্যকতা রহিয়াছে। সেখানেও শিক্ষাসম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারণা কত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। শুধু কতকগুলি তত্ত্ব জানাইয়া, কণ্ঠস্থ করাইয়া, বা বুঝাইয়া এবং কতকগুলি প্রক্রিয়া অভ্যস্ত করাইয়া দিলেই আর এখন শিক্ষা দেওয়া হইল বলিয়া কেহ বলিবে না। অন্তরনিহিত শক্তিগুলির স্বাভাবিক বিকাশসাধন না হইলে, চিন্তা ভাব ও ইচ্ছা স্ফূর্ত্ত হইয়া আপনার শক্তি বলে নিজ নিজ কার্য্যসাধনে সমর্থ না হইলে, উহা জীবনকে উন্নত হইতে উন্নততর স্তরে লইয়া না গেলে, প্রকৃত শিক্ষা কিছুই হইল না। শুধু জড়ীয় যন্ত্রের ন্যায় সংসারের কাজ করিয়া যাইতে পারিলেই, অর্থ বিত্ত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেই, হইল না। সুতরাং তাহা আর কোনও বাহিরের কৃত্রিম উপায় দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। এক মাত্র স্বাভাবিক নিয়মে, স্বাভাবিক পথেই, তাহা সাধিত হইতে পারে। স্বভাবকে অবাধে কার্য্য করিবার সুযোগ-

প্রদান করাই শিক্ষার এক মাত্র উদ্দেশ্য। মানুষ বিনা চেষ্টায় চারিদিকের আবেষ্টন হইতেও অনেক শিক্ষা করে। তাহা সত্য মিথ্যা ভুল ভ্রান্তির সহিত জড়িত ও অপূর্ণ থাকাতে, কল্যাণকর ও অকল্যাণকর দুই-ই হয়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজ চেষ্টায় যখন সে বিশেষ বিশেষ দিকে নিজের চিন্তা ভাব ও কার্য্যকে নিযুক্ত করে, তখন সে-শিক্ষা পূর্ণতর ও দৃঢ়তর হয়—তাহা না করিলে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে উহা অপূর্ণ ও একপেশে থাকিয়া যায়, দ্রুত উন্নতিপথে অগ্রসর হইবার শক্তিও লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মজীবনসম্বন্ধেও এই কথাই সত্য। উহা এই সাধারণ জীবন অপেক্ষা উন্নততর ও প্রশস্ততর জীবন মাত্র, কোনওরূপে ভিন্ন প্রকৃতির নহে। ইহা বিশেষ ভাবে জ্ঞান প্রেম ইচ্ছার মূল প্রস্রবণ জ্ঞানময় প্রেমময় পুণ্যময় জীবনদেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগে যুক্ত হইয়া, সকল বিষয়ে তাঁহার অনুগত জীবনযাপন করাই বুঝায়, প্রকৃষ্ট অর্থে উহা সমগ্র জীবনই বুঝায়। এ ক্ষেত্রেও আমরা শিশুকাল হইতেই অলক্ষিতে অজ্ঞাতে বিনা চেষ্টায় গৃহ পরিবার সমাজ প্রভৃতি আবেষ্টন হইতে অনেক শিক্ষা গ্রহণ করি। পরে তাহার কোন কোনটা সংশোধন পরিবর্জ্জন পরিবর্দ্ধন করিতে হয়। নতুবা, জীবন অপূর্ণ ও মলিন থাকিয়া যায়, কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণের দিকেও গতিপ্রাপ্ত হইতে পারে। এখানেই শিক্ষা ও সাধনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা।

এই শিক্ষা ও সাধনের পথ খুঁজিতে যাইয়া দেখিতে পাওয়া যায়, ভাব ও ইচ্ছা, প্রেম ও কর্ম্মের, ভিত্তি জ্ঞান—জ্ঞানের উপরই তাহারা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে সত্য জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। এই জ্ঞান সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভেদে দুই প্রকারের। পরোক্ষ জ্ঞানও সত্য হইতে পারে। তাহার দ্বারাও সংসারের অনেক কাজ চলিতে পারে। তথাপি, তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞানের স্থান অধিকার করিতে পারে না—ধর্ম্মজীবনে ত সাক্ষাৎ জ্ঞান ভিন্ন চলেই না, পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা বিশেষ কোনও কার্য্যই সাধিত হইতে পারে না। কেন না, সাক্ষাৎ যোগ ভিন্ন ধর্ম্মজীবন দাঁড়াইতেই পারে না, উহার কোনও অর্থই থাকে না। সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, কোনও বস্তু সম্বন্ধে সকল তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভুলরূপে জানিলেও, তাহাতে সে বস্তুকে সাক্ষাৎভাবে জানা হয় না; তেমনি ব্রহ্মসম্বন্ধীয় সকল তত্ত্ব সত্য রূপে জানিলেও, তাহাতে কোনও ভুল ভ্রান্তি না থাকিলেও, ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে জানা হয় না, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎযোগ স্থাপিত হয় না। এই পার্থক্যটা সুস্পষ্ট রূপে স্মরণ না রাখিলে, আমরা কখনও প্রকৃত ধর্ম্মজীবনলাভে সমর্থ হইব না। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সাক্ষাৎ জ্ঞানের সঙ্গেও, পূর্ব্ব সংস্কার প্রভৃতি নানা কারণে, অনেক ভুলভ্রান্তি মিশ্রিত থাকিতে পারে—অনেক সময় নিশ্চয়ই থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। যুক্তি বিচার পাঠ আলোচনা পরীক্ষা প্রভৃতির দ্বারা সে ভুল ভ্রান্তি সংশোধন করিতে হয়। তাহাতে কিন্তু সাক্ষাৎ লব্ধ জ্ঞানটা একটুও বিচলিত হয় না, শুধু উজ্জ্বল ও বিশুদ্ধই হয়। এই হেতু, সাক্ষাৎ জ্ঞানের একান্ত আবশ্যকতা কিছুতেই খর্ব্ব হয় না, আর যুক্তি বিচার পাঠ আলোচনা প্রভৃতিও তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞান, সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভূতি সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য। সাধারণ জ্ঞান যে নিয়মের অধীন, ব্রহ্মজ্ঞানও সেই একই নিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জ্ঞানলাভের জন্য যুক্তি বিচার, পাঠ আলোচনা চিন্তা, অনুমান পরীক্ষা পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি সকলেরই প্রয়োজন আছে, কিন্তু একমাত্র চিন্তা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করা যায়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের একমাত্র কার্য্য আমাদের ইন্দ্রিয়কে এরূপ অবস্থায় রাখা, যাহাতে উক্ত বস্তু উহার উপর অবাধে কার্য্য করিতে পারে। তাহার পর আমাদের আর কিছু করিবার থাকে না। অর্থাৎ আমাদিগকে গ্রহণ করিবার অবস্থায় ( receptive moodএ ) স্থাপন করা পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্য বা কর্তৃত্ব ( activity ), তাহার পরই আমাদের নিষ্ক্রিয় (passive) হইতে হয়। পরের কার্য্য উক্ত বস্তুর, অথবা উহার অন্তরালবর্ত্তী চৈতন্যময় পরব্রহ্মের। অন্যপ্রকার সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ সম্বন্ধেও ইহাই সত্য। শুধু কল্পনার রাজ্যেই আমি একমাত্র কর্ত্তা। সেখানে আমিই একমাত্র স্রষ্টা, সেখানে দ্বিতীয় আর কোনও শক্তির কার্য্য নাই, পাইবার নিষ্ক্রিয় অবস্থা ( passive mood ) নাই—সমস্তই নিজের কার্য্য ( activity )। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহাই সত্য। সুতরাং শুধু আমাদের শক্তি ও কার্য্য দ্বারা, আমাদের চিন্তা যুক্তি বিচার প্রভৃতির দ্বারা, আমরা কাল্পনিক ব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে পারিলেও, কিছুতেই সত্য ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ-ভাবে জানিতে, সত্যরূপে লাভ করিতে, পারি না। এই জন্যই বলা হইয়াছে, তিনি স্বপ্রকাশ, স্বয়ং কৃপা করিয়া প্রকাশিত না হইলে, তাঁহাকে কেহই অন্য কোনও উপায়েই প্রকাশ করিতে পারে না। তবে এখন উপায় কি? তিনি স্বপ্রকাশ বলিয়া যে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিবার জন্যই ব্যস্ত, এমন কথা ত কিছুতেই বলা যায় না। তিনি করুণাময় প্রেমস্বরূপ পিতা, আপনাকে দিবার ও প্রকাশ করিবার জন্যই সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছেন, অথবা সর্ব্বত্র প্রকাশিত করিয়াই রাখিয়াছেন। আমরা আপনাদিগকে দেখিবার ও পাইবার অবস্থায় রাখি না বলিয়াই, অন্য বিষয়ে অন্য চিন্তায় মগ্ন থাকি বলিয়াই, তাঁহাকে দেখি না, পাই না—সে-সমস্ত আবরণস্বরূপ হইয়া আমাদের হৃদয়ে তাঁহার সাক্ষাৎ কার্য্য বিষয়ে বাধা উৎপন্ন করে। তাহা না হইলে অতি সহজেই স্বাভাবিক নিয়মে তিনি আমাদের নিকট সর্ব্বদা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। সুতরাং আপনাদিগকে সেই দেখিবার বা পাইবার অবস্থায় রাখাই আমাদের একমাত্র কাজ, একমাত্র সাধন,—তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিবার বা পাইবার একমাত্র স্বাভাবিক পথ বা প্রণালী।

সেই অবস্থা পথ বা প্রণালী কি? তাহা যে অপর সকল লক্ষ্য ও দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র তাঁহার উন্মুখীন হইয়া থাকা, হৃদয় তাঁহার নিকট পাতিয়া দেওয়া, অন্য সকল আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া একমাত্র তাঁহাকেই আকুল প্রাণে চাওয়া, অনন্যগতি হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ইহা যে প্রার্থনার অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাও বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আর, ইহাই যে আমাদের উপাসনাপ্রণালীর উদ্বোধন-অঙ্গ, সে-কথাও আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বলা বাহুল্য যে, এই অবস্থার মধ্যে নিম্নতম হইতে উচ্চতম পর্য্যন্ত অনেক স্তরভেদ আছে, গভীরতার অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। কিন্তু গভীরতার যত নিম্ন স্তরই অধিকার করুক না কেন, উহা সত্য হওয়া একান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে কিছুতেই চলিবে না। এরূপ সত্য উদ্বোধন বা প্রার্থনার অবস্থা হইলে, যত ভাবেই হউক না কেন, তাঁহার সাক্ষাৎ প্রকাশ লাভ বা অনুভূতি ঘটিবেই। কেননা, তখন তাঁহার প্রকাশ না দেখিবার একমাত্র আবরণ বা বাধা অপসারিত হইয়া যাইবে। আত্মা পরমাত্মার মধ্যে কোনও ব্যবধানই থাকিবে না। আত্মা ঠিক পাওয়ার অবস্থায় ( receptive moodএ ) স্থাপিত হইবে। পরমাত্মার করুণা বা শক্তি অব্যাহতভাবে আমাদের অন্তরে কর্ম্ম করিতে পারিবে। অনন্তর যে স্বাভাবিক ভাবেই আরাধনা প্রভৃতির দ্বারা সে অনুভূতি উজ্জ্বলতর ও গভীরতর হইবে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কিছুতেই আরাধনা সত্য ও স্বাভাবিক হইবে না—উহা কৃত্রিম মন্ত্রের ব্যাখ্যা বা অর্থচিন্তনেই পর্য্যবসিত হইবে। উদ্বোধনটা যে আমাদের উপাসনাপ্রণালীর অপরিহার্য্য প্রথম অঙ্গ, ইহা ভুলিলে কিছুতেই চলিবে না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় অঙ্গে গেলে তাহা মিথ্যা ও অস্বাভাবিক না হইয়া পারে না। এ বিষয়ে আমরা আজ অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আরাধনা প্রভৃতি একটু অগ্রবর্ত্তী সাধকের অথবা প্রার্থনার পরে সাধনীয়। প্রার্থনাই প্রথম সাধনার্থীর প্রধান সাধনের বিষয় বা সর্ব্বাগ্রে সাধনীয়। কাজেই এই প্রার্থনা কি প্রকারে সত্য ও স্বাভাবিক হইতে পারে, সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। প্রয়োজন হইলে, আরাধনা প্রভৃতি অপর অঙ্গ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

হৃদয়ে অভাববোধ ও সেই অভাবপূরণে নিজ অক্ষমতার অনুভূতি জাগিলে, আপনা হইতেই স্বাভাবিকরূপে প্রার্থনা উত্থিত না হইয়া পারে না। বাস্তবিক, তখন হৃদয়ের যে অবস্থা হয় তাহাকেই প্রার্থনা বা প্রার্থনার অবস্থা বলে। ঈশ্বরের শক্তি ও ও দয়া সম্বন্ধীয় ধারণার দ্বারা এই প্রার্থনা অনুরঞ্জিত হয় বটে। কিন্তু সেরূপ কোনও স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা না থাকিলেও যে প্রার্থনা হইতে পারে না, তাহা বলা যায় না। কোনও অজ্ঞাত শক্তির সহায়তার জন্যও সত্য স্বাভাবিক প্রার্থনা উত্থিত হইতে পারে। তাহাও একবারে বৃথা যায় না। তাহা অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে। ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহার কিছু না কিছু ধারণা জন্মিয়াছে, ঈশ্বরের নিকটই যাহারা প্রার্থনা করিতে যাইতেছে, তাহাদের কথাই আমরা আলোচনা করিতেছি। তথাপি ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রার্থনার জন্য উজ্জ্বল তত্ত্বজ্ঞান অপরিহার্য্য নহে। ব্রহ্মজ্ঞানের অপূর্ণতার মধ্যেও সরল সত্য প্রার্থনা প্রাণে জাগিতে পারে এবং তাহার ফলে পূর্ণতর ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হইতে পারে। সে যাহা হউক, তাহা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষার উপর, সাধারণ জ্ঞানের উপর, নির্ভর করিবে। কাজেই সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সাধারণ জ্ঞানে শিক্ষায় যে যতটা উন্নত হইতে পারে হইবেই এবং তাহার জন্য সকলকেই যথাসাধ্য চেষ্টা আয়োজন নিশ্চয়ই করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্যও সেরূপ চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, তাহাই যথেষ্ট নয়, তত্ত্বজ্ঞান ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভূতি এক নয়। সুতরাং বিশেষ ভাবে প্রার্থনা শিক্ষার জন্য উক্ত দুইটি বিষয়েই প্রধানতঃ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইহার জন্য বিশেষ সাধন কি তাহাই দেখিবার বিষয়।

অভাববোধ জাগ্রত করিতে হইলে নিজের প্রকৃত অবস্থাটা কি, জীবনের লক্ষ্য বা আদর্শ কি, আকাঙ্ক্ষণীয় কি এবং বর্ত্তমানে তাহা হইতে কত দূরে আছি, তাহার জন্য কতটা চেষ্টা যত্ন করিতেছি, নিজের দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহা অনুভব করিতে হইবে। আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষাই যে ইহার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায় তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা ব্যতীত অপর কোনও উপায়েই সত্যরূপে এই অনুভূতি জাগিতে পারে না, আকুল আকাঙ্ক্ষাও জন্মে না। সাধু-সঙ্গ সৎগ্রন্থপাঠ, আলোচনা অপরের প্রার্থনাদিতে যোগপ্রদান প্রভৃতি হইতে যে এ বিষয়ে আনুষঙ্গিক সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহাদের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও, আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষা ব্যতীত শুধু তাহাদের দ্বারা কিছুতেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধিত হইতে পারে না। অভাবটা অনুভূত হইলে স্বভাবতঃই তাহা দূর করিবার জন্য আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা যত্ন না জাগিয়া পারিবে না। লক্ষ্যপথে পৌঁছিবার জন্য, আদর্শকে আয়ত্ত করিবার জন্য, আগ্রহের সহিত চেষ্টা যত্ন করিতে গেলেই সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, এবং নানা বাধা বিঘ্নের সংঘাতে আসিয়া অনেক সময় পরাজিতও হইতে হইবে; তখন আপনার দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা স্পষ্টরূপে অনুভূত না হইয়া যাইবে না। নিজের অবলম্বিত সকল উপায় ব্যর্থ দেখিয়া আপনাকে যখন নিতান্ত অসহায় বোধ করা যায়, তখন প্রার্থনা ভিন্ন আর গত্যন্তর থাকে না। এবং এইরূপ প্রার্থনা করিয়া যখন সত্যই নূতন বল পাওয়া যায়, অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়া জয় লাভ করা যায়, সংশয় ও অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার সত্য প্রকাশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তখন প্রার্থনার সফলতা একটা পরীক্ষিত সত্য হইয়া দাঁড়ায়, কিছুতেই তাহাতে আর সন্দেহ সংশয় থাকে না। তখন আপনা হইতেই প্রার্থনা স্বাভাবিক ও সাধনের একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া যায়। সকল সময়েই অন্তরে প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণ চলিতে থাকে। এইরূপ প্রার্থনা করিয়াই প্রার্থনার উপকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা ভালরূপে বুঝা যায়, উহাকে সত্য সরল ও স্বাভাবিক করা যায়, সাক্ষাৎ ব্রহ্মানুভূতি লব্ধ হয়। সুতরাং যাহারা অসার যুক্তি তর্কে বিভ্রান্ত হইয়া, প্রার্থনার সফলতাতে সন্দেহ করে, তাহাদিগকে আমরা বলিব, এইভাবে প্রার্থনা করিয়াই দেখ ফল হয় কি না। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার প্রমাণ অপেক্ষা

শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আর কিছু নাই। শিখিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই এইরূপ সহজে স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়। অবশ্য ইহার সঙ্গে অন্যান্য সাধারণ শিক্ষাও চলিবে তাহা পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

আমরা আমাদের শক্তি অনুসারে সামান্য ভাবে বিষয়টা আলোচনা করিলাম। আশা করি, বিজ্ঞতর ব্যক্তিগণ আপনাদের গভীরতর অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করিয়া মীমাংসা বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিবেন।

# সেবার বিধান।

উৎসব শেষ হ'লো। যাঁরা দূরদেশ হ'তে কত আশা ল'য়ে উৎসবে এসেছিলেন, তাঁরা চ'লে গিয়েছেন; এখানে স্থানীয় লোক যাঁরা, তাঁরাও আবার নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'তেছেন। এখন—এই দিনে—কত কথা, কত প্রকার প্রশ্ন মনে উদয় হ'তেছে! উৎসবে যে প্রেমের নদী ধরায় নেমে এল, তাতে কি আমাদের প্রাণে কিছু জমাট ভাব, কিছু নবজীবনের আকাঙ্ক্ষা, কিছু ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধনের ইচ্ছা বর্দ্ধিত ক'রে গিয়েছে? আমরা কি সব দড়াদড়ি ছিঁড়ে, স্বখ স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন ক'রে, প্রেমময়ের প্রেমের স্রোতে অঙ্গ ভাসিয়ে দিতে পেরেছি? আমরা কি তাঁর প্রীতিসাধনে, ধ্যান ধারণায় অধিকতর সময় দিতে ও মনসংযোগ কর্‌তে পাচ্ছি? আমরা কি ভাই বোনদিগকে, ব্রহ্মের পুত্র কন্যাদিগকে, নিকটে টেনে এনে আপনার হৃদয়ে স্থান দিতে পেরেছি? আমরা কি নম্র হৃদয়ে, শুদ্ধ চিত্তে, বিনীত অন্তরে, দীন ভাবে, প্রভুর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হ'তে পাচ্ছি? আমাদের মনে কি প্রভুর প্রীতিপ্রেরণায়, মানবের সেবায়, ব্রাহ্মসমাজের সেবায়, অধিকতর আগ্রহ জন্মেছে? আমরা কি অনন্যভাক্ হ'য়ে বিনা সর্ত্তে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিবার সঙ্কল্প প্রাণে লাভ করেছি? আজ উৎসবের শেষে এই সকল কথা আমাদিগকে চিন্তা ক'রে, নূতন উৎসাহে, নব প্রেমে, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর্‌তে হবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে আদর্শ-প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চেয়েছেন, তাহাতেই মানবের ইহ পরলোকের কল্যাণ। আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক, দেশের ও মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ ঐ একটি মন্ত্রসাধনে—ঐ উপাসনাসাধনে। ঈশ্বরে প্রীতি ও সেই প্রীতিদ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে, তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধন—লোকশ্রেয়ঃসাধন—ইহাই ত ধর্ম্ম। সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—ইহাই ত সাধনমন্ত্র! ইহাতেই আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মঙ্গল, ইহাতেই পরিবারের কল্যাণ, ইহাতেই দেশের উন্নতি, ইহাতেই মানবের উন্নতি। এই অন্তরের ধর্ম্ম, এই আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম, বিনা সর্ত্তে একমাত্র ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া, অনন্যভাক্ হইয়া, তাঁ'তে সমগ্র হৃদয় মন দিয়ে, প্রীতি করা ও তাঁহারই প্রীতিপ্রেরণায় মানবের কল্যাণসাধন করা—ইহাই সকল সমস্যার সমাধান করিবে। এই ধর্ম্ম যদি ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজে, পরিবারে ও দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ আসিবে, —স্বরাজ আসিবে, হিন্দু-মুসলমানসমস্যা, অস্পৃশ্যতার সমস্যা, নারীদের লাঞ্ছনার সমস্যা, জাতিতে জাতিতে যে বৈরভাব, শ্বেত কৃষ্ণে যে বিদ্বেষ, সব সমস্যার মীমাংসা হবে। তাই আজ মাঘোৎসবের অন্তে সকলকে বিনয় সহকারে নিবেদন করিতেছি, ব্রহ্মে প্রীতি রেখে ধর্ম্মের নূতন আধ্যাত্মিক মুক্তিপ্রদ আদর্শ নিজ জীবনে ও মানবজীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সকলে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত—ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সর্ব্বাঙ্গীণ ও সর্ব্বতোমুখীন্! কেবল যে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক পূজাপ্রতিষ্ঠাই ইহার একমাত্র কার্য্য তা' ত নয়;—মানবের, দেশের, দশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধন, দুঃখীর দুঃখমোচন, আর্ত্তের সেবা, শোকে সান্ত্বনা, নির্য্যাতিতকে সাহায্য, পতিতের উদ্ধার, জাতিভেদ দূর করা, অসাম্য দূর করা, নারীজাতির উন্নতিসাধন, শিক্ষাবিস্তার, দুর্নীতি কুসংস্কার দূর করা, দেশের স্বাধীনতা, মানবের সর্ব্ব বিষয়ে স্বাধীনতাপ্রতিষ্ঠা,—সকলই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য! এই বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রে সেবার জন্য ভগবান্ সকলকে আহ্বান কর্চ্ছেন। প্রাচীন ঋষি যেমন উদাত্ত স্বরে বলিলেন—বিশ্ববাসী সকলে শোন, অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে আমি জেনেছি, তাঁহাকে জেনেই মানুষ মৃত্যুকে অতিক্রম কর্‌তে পারে, আর পথ নাই—আর পথ নাই—সেইরূপ যেন আমাদের নিকট বাণী আসিতেছে, আকাশ ভেদ ক'রে ভগবানের আহ্বান আসিতেছে, আচার্য্যগণের কণ্ঠধ্বনির ভিতর দিয়া, দেশের আর্ত্তনাদের মধ্য দিয়া, অন্তর-দেবতার বাণী আসিতেছে। বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র—ঈশ্বরে ঐকান্তিক প্রীতি রেখে, তাঁতে আত্মনিবেদন ক'রে, তাঁরই প্রেমপ্রেরণায় তোমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। এই যে বাণী—এ বাণী কে শুনিবে? কে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হবে? কে ব্রাহ্মসমাজের সেবায়, মানবের সেবায় আপনাকে অর্পণ করিবে?

যখন ব্রাহ্মসমাজের কাজের কথা উঠে, তখনই আমাদের দৃষ্টি ধনী জ্ঞানী পদস্থ লোকের দিকে পড়ে। যাঁরা সমাজে প্রতিষ্ঠাবান্, জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, পদে মানে শ্রেষ্ঠ, ধনে শ্রেষ্ঠ, যাঁরা বয়সে প্রবীণ, যাঁদের নানা ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা আছে, প্রতিপত্তি আছে, তাঁরা এসে কাজ করুন, সমাজের সেবায়, দেশের ও দশের সেবায় নিযুক্ত হউন,—ইহাই সকলের ইচ্ছা। এই ইচ্ছা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তাঁরা যদি না আসেন, তাঁরা যদি কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাদের স্থান এসে গ্রহণ না করেন, তাঁরা যদি ঈশ্বরের আহ্বান না শোনেন, ঈশ্বরের কাজ কি প'ড়ে থাক্‌বে? ব্রাহ্মসমাজের কাজ কি হবে না? দেশে মুক্তির বার্ত্তা কি ঘোষিত হবে না? প্রেমের ধর্ম্ম কি প্রচারিত হবে না? যাঁরা নগণ্য, দীন হীন, যাঁদের ধন নাই, পদ নাই, মান নাই, প্রতিপত্তি নাই, বিদ্যা বুদ্ধি নাই, যাঁরা বয়সে কনিষ্ঠ, তাঁরা যদি ঈশ্বরের আহ্বান শুনে আসে,

(মাঘোৎসবের পরে, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস কর্ত্তৃক বিবৃত।)

তাঁরা যদি মানবের—দুঃখী তাপী, পাপী, উৎপীড়িত মানবের—ক্রন্দন শুনে আসে, তবে তাঁরাই দেবতার কাজ করবে, ব্রাহ্মসমাজের সেবা করবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে। ভগবান্ ধূলিমুষ্টি হাতে লবেন, তাহা সোণা হ'য়ে যাবে; এই নগণ্য লোকদ্বারাই তাঁর কাজ হবে। মহর্ষি ঈশার একটা আখ্যায়িকা আছে—অনেকবার তাহা বলিয়াছি, আজও তাহা বলব—এক ধনীর বাড়ীতে ভোজ হবে; গণ্যমান্য ধনীপদস্থ লোকদের নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছে; রান্না প্রস্তুত, বসবার আয়োজন হয়েছে; নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসেন না; তাদের ডাকতে লোক পাঠান হলো, আবার পাঠান হলো, তবুও তাঁরা এলেন না। তখন সেই ধনী লোক তাদের আশা ছেড়ে দিলেন। তিনি বলিলেন, যাও, রাস্তায় যাদের পাও,—ঐ গরীব, দুঃখী, ভিখারী, ঐ হাড়ি, ডোম যাদের পাও,—তাদের নিয়ে এস; তাদেরই যত্ন ক'রে আহার করাব। তাই তারা এসে ভোজে বসিল। ভগবান্ তাঁর প্রেম বিলাবার জন্য সকলকে ডাকছেন, সকলকে তাঁর নিমন্ত্রণসভায় আহ্বান করেছেন; জ্ঞানী যাঁরা, ধনী যাঁরা, প্রবীণ যাঁরা, পদস্থ যাঁরা, প্রতিপত্তি যাঁদের আছে, লোকে সম্মান করে যাঁদের, তাঁরা যদি সে আহ্বান না শোনেন, ঈশ্বরের কাজ করতে না আসেন, ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে গৌরব অনুভব না করেন, তবে কনিষ্ঠ যাঁরা, নগণ্য যাঁরা, মান প্রতিপত্তি যাঁদের নাই, তাঁরাই আসবেন, তাঁরাই এসে ঈশ্বরের নিশান ধরবেন, তাঁরাই ব্রহ্মের কাজে লেগে যাবেন। আজ সর্ব্বত্র দেখি ব্রাহ্মসমাজে কর্ম্মীর অভাব। মন্দির আছে, উপাসনা করবার লোক নাই; প্রতিষ্ঠান আছে, কাজ করবার লোক নাই। কর্ম্মক্ষেত্র কত বিস্তৃত! যাঁরা প্রচারক ছিলেন, আচার্য্য ছিলেন, সেবক ছিলেন, কর্ম্মী ছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায়, দেশের ও দশের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা অনেকেই পরপারে গিয়াছেন,—এপারে যাঁরা আছেন, তাঁরাও অনেকে পীড়িত, কর্ম্মে অক্ষম। এখনও জ্ঞানে চরিত্রে বিদ্যাবুদ্ধিতে, পদে মানে শ্রেষ্ঠ অনেক ব্রাহ্ম আছেন; তাঁরা নানাস্থানে থাকেন, কিন্তু অনেকে ব্রাহ্মসমাজের কাজে আসেন না। তাঁরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শপ্রতিষ্ঠাতে সুবিধা হতো। তাঁরা এলেন না; অনেকে হয়ত ব্যবহারদ্বারা, কার্য্যদ্বারা, ব্রাহ্মসমাজের গৌরবের হানিও করেন। তাই ব'লে কি ঈশ্বরের কাজ প'ড়ে থাকবে? তাঁরা না আসুন, নগণ্য যাঁরা ধনে জ্ঞানে মানে প্রতিপত্তিতে বয়সে ছোট যাঁরা, তাঁরাই আসুন। শক্তি নাই? শক্তি তোমার আমার ত নয়! যদি ব্রহ্মে স্থিত হ'য়ে, তাঁতে প্রীতি রেখে কাজে লাগতে পার, তবে শক্তি যে তিনি দিবেন; তিনি যে সকল শক্তির উৎস, সকল জ্ঞান ও প্রেমের প্রস্রবণ।

কাজ কত রকমের আছে। সকলেই আচার্য্য হবেন, সকলেই প্রচারক হবেন, সকলেই বক্তা হবেন, গ্রন্থ লিখবেন, তা নাও হ'তে পারে। আর একথাও বলি, তাঁর নামে যদি একান্তমনে প'ড়ে থাক, তবে অলৌকিক শক্তি লাভ করবে। আমরা ত গান ক'রে থাকি—

অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়,
বোবায় গীত গায়, বধিরে শোনে।

ইহা কি কল্পনার কথা? ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পড়, এই ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস পড়, দেখবে, কত সামান্য লোক ভগবানের কৃপায় নূতন দৃষ্টি লাভ করেছেন, নূতন বাক্‌শক্তি, নূতন জ্ঞান লাভ করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক, আচার্য্য, কর্ম্মীদের জীবন দেখ, তাঁরা অনেকে কি ছিলেন, কি হয়েছেন; ধূলিমুষ্টি স্বর্ণরেণুতে পরিণত হয়েছে; লৌহময় প্রাণ স্বর্ণময় হ'য়ে গেছে। পাপী নবজীবন লাভ করেছে; মূর্খ যে ছিল সে পণ্ডিত হয়েছে। ভগবানের এই ভেল্কীবাজির লীলা দেখ, দেখে প্রাণে আশা ল'য়ে, হৃদয়ে দৃঢ়সংকল্প ল'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। কাজ ত এক রকমের নয়। কেহ আচার্য্য হবেন, কেহ প্রচারক হবেন; কেহ বক্তৃতা করবেন, কেহ পুস্তক লিখবেন। কেহ অর্থ দিবেন, কেহ অর্থ সংগ্রহ করবেন; কেহ সঙ্গীত করবেন, কেহ সঙ্গীত শিক্ষা দিবেন। কেহ মন্দির পরিষ্কার করবেন, কেহ আফিসের কাজকর্ম্ম করবেন, কেহ রাজনীতিক উন্নতির চেষ্টা করবেন, কেহ সমাজসংস্কারের জন্য অগ্রসর হবেন; কেহ আর্ত্তের সেবা করবেন, কেহ দুর্ভিক্ষে জলপ্লাবনে কাজ করবেন, কেহ শিক্ষা বিস্তার করবেন, কেহ পতিতকে হাত ধ'রে তুলবেন। কোনও কাজই ত ছোট নয়, ঈশ্বরের কাছে সব কাজই সমান। কত দুঃখ, কত পাপ, কত তাপ, কত অত্যাচার, কত দুর্নীতি, কত কুরীতি, কত অশিক্ষা, কত কুশিক্ষা ও কুসংস্কার, কত স্থানে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, পুণ্যের নামে পাপ, ন্যায়ের নামে অন্যায়, কত অপ্রেম, কত বিদ্বেষ! আবার, কত স্থানে অপ্রেম কর্ত্তব্যের বেশ ধ'রে আসে, পাপ সাম্যের ধ'রে আসে! দেশের মানবের কি দুর্দ্দশা! প্রাণে কত ব্যথা পাই, হৃদয়ে কত আঘাত লাগে, চক্ষে জল আসে, শান্তি পাই না; সোয়াস্তি আসে না। এর ভিতরে ঈশ্বরের আহ্বান আসে; তোমরা কি তা শোন না? ঈশ্বরের ডাকে কি সাড়া দিবার লোক নাই? কেবলই আপনার সুখ স্বার্থ নিয়ে থাকবে, বিলাস বিভ্রমে ডুববে, দুঃখ পাপ অত্যাচার চোখের সামনে দেখবে? তা নয়। এস ভাই, এস বোন, ঈশ্বরের আহ্বান শুনে এস। তুমি ক্ষুদ্র, তুমি নগণ্য, তোমার বিদ্যাবুদ্ধি নাই, তোমার ধন নাই, পদমান নাই, তা ব'লে ভয় করো না। তিনি যখন ডাকেন, তিনিই তোমাকে শক্তি দিবেন, তিনিই তোমাকে সোণার মানুষ ক'রে দিবেন।

যাঁদের প্রাণে কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা, সেবার ইচ্ছা জেগেছে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার বিশ্বজনীন মুক্তিপ্রদ আদর্শপ্রতিষ্ঠাতে যাঁদের নিজের দেশের ও মানবের কল্যাণ ব'লে মনে হ'তেছে—তাঁরা আসুন, একত্র হ'য়ে, একপ্রাণে, সংযতচিত্তে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। কিন্তু এই কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করতে হ'লে, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ পেতে হ'লে, কি ভাবে সেবাকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে হবে, তা আগে বুঝে নিতে হবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের কর্ম্মী যাঁরা, সেবক যাঁরা, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের চরণে হৃদয়ের প্রীতি অর্পণ করতে হবে; তাঁর নামগানে, তাঁর ধ্যান ধারণাতে নিযুক্ত হ'তে হবে। তিনিই যে

আমাদের একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রয়; তাঁকেই যদি না জানিলাম, তাঁতেই যদি প্রীতি অর্পণ না করলাম, তাঁর ধ্যানেই যদি মগ্ন না রহিলাম, তবে যে জীবন বৃথা গেল! Seek ye first the kingdom of God.—সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর। তিনি পিতা মাতা সখা বন্ধু, তিনিই হৃদয়নাথ, তাঁর প্রেমে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হ'তে হবে। তুমি যে কর্ম্ম করতে যাবে, বল পাবে কোথায়? আশা পাবে কোথায়? কত সময় বিপদে পড়িবে, কত ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা আসিবে, লোকে নিন্দা করিবে, অপমান করিবে, নির্য্যাতন করিবে; কত দুঃখ সহিতে হবে, কত অনাহারে অনিদ্রায় দিন রাত কাটাতে হবে! তখন—তখন কে তোমাকে প্রাণে আশা দিবে, শক্তি দিবে, আনন্দ দিবে? কে তোমাকে বলিবে—ভয় নাই, সকলে ত্যাগ করলেও আমি সঙ্গে আছি? তাঁর প্রেমে দুঃখও সুখের হয়, সংগ্রাম ও পরীক্ষা আনন্দের হয়। সকলে যখন ত্যাগ করবে, তখন তাঁকে পেয়েই নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হবে। তাই বলি, তাঁতে প্রীতি অর্পণ ক'রে, তাঁর প্রিয়কার্য্যবোধে কর্ম্মে অগ্রসর হও। কেবল কাজ করিলেই হয় না, কাজ তাঁর প্রিয়কার্য্য হওয়া চাই, তাঁর উপাসনাতে পরিণত হওয়া চাই। সেই জন্যই নির্জ্জনে তাঁর চরণে বসতে হবে—এই মন্দিরে সমবেত উপাসনাতে আসতে হবে। ঈশ্বরচরণে যদি সমবেত না হও, তবে ভাইকে বোনকে চিনবে কিরূপে? একপ্রাণ হ'য়ে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবে কি ক'রে? যাহাকে পর মনে কর, ঈশ্বরচরণে এসে দেখবে, সে তোমার আপনার জন, তোমার ভাই; সেও কর্ম্মক্ষেত্রে তোমার সহায়—সহকর্ম্মী। সজন উপাসনা, নির্জ্জন উপাসনা,—কেবল তা নয়; সব সময়ে তাঁর স্মরণ করতে হ'বে, সময় সময় প্রার্থনা—কাতর প্রার্থনা—জানাতে হবে, তাঁর নাম উচ্চারণ করতে হ'বে, তাঁর নামগান করতে হবে, তাঁর প্রসঙ্গ করতে হ'বে। ঈশ্বরে চিত্ত অর্পিত ক'রে, তাঁর প্রেমে নিমগ্ন হ'য়ে, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে হবে। তাই বলি, যারা কর্ম্মক্ষেত্রে আসতে চাও, ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনের সম্বল কর—তবেই শক্তি আসিবে, জ্ঞান আসিবে, আশা আসিবে, আনন্দ আসিবে।

যাঁরা সমাজের সেবা করবেন, দেশের ও দশের সেবা করবেন, তাঁদের সংযম ও ত্যাগ সাধন একান্ত প্রয়োজন। তাঁকে যেমন এক দিকে সংযতচরিত্র হ'তে হবে, শুদ্ধচিত্ত হ'তে হবে, বিলাসিতা বর্জ্জন করতে হবে, সুখের লালসা সংযত করতে হবে, তেমনি অপর দিকে সময় শক্তি অর্থ মানবের সেবায়, সমাজের কাযে, নিয়োগ করতে হবে। প্রাচীন ঋষিগণ বলেছেন—ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ—একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়। তুমি যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যে কাজ করতে চাও, তাকে যে ভালবাস তার পরিচয় কোথায়? কি মূল্যে তাহা অর্জ্জন করতে প্রস্তুত আছ? সুখশয্যায় শুয়ে, আরামকেদারায় ব'সে, ব্রহ্মের কাজ করা যায় না। ব্রহ্ম চান তাঁর সেবকগণ তাঁর জন্য বিনা সর্ত্তে সর্ব্বস্ব পণ করবেন। কিছু দিন আগে একটী গল্প করলেন এক আচার্য্য। গল্পটি এই—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ বাস করেন, তাঁর কিছুই সংস্থান নাই, অতি কষ্টে সারা দিনে ভিক্ষা ক'রে যা পান তাহাতে কোনও রকমে নিজেদের একবেলা অন্ন সংস্থান হয়, আর গৃহপালিত পশুপক্ষীগুলি ভুক্তাবশিষ্ট আহার করে। একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের পর তারা আহারে বসেছেন, এমন সময় এক নিরন্ন ভিক্ষুক এসে উপস্থিত। কতদিন সে আহার করে নাই। অতিথি দেবতা; তাই তাকে যত্নে বসিয়ে নিজেদের অন্ন হইতে ভাগ দিলেন; কিন্তু কিছুতে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। ক্রমে ক্রমে সকলের সকল অন্ন তাঁকে দিলেন—নিজেরা উপবাসী রহিলেন। সে খেয়ে চ'লে গেল। গৃহপালিত পশু পক্ষীর জন্যও কিছু রইল না। একটা পাখী অতিকষ্টে দুই একটা ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন সংগ্রহ ক'রে আহার করিল। আহার করতে করতে দেখে যে তার একখানা ডানা স্বর্ণময় হ'য়ে গেছে; সে অবাক্ হলো। তার সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণময় করবার ইচ্ছা হলো। তাই সে যেখানে দানের কথা শোনে সেখানেই যেয়ে ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করে। এই জন্যে একবার সে মহারাজ চক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপস্থিত হলো,—সেখানে কোটি কোটি টাকা দান করা হয়েছে; মনে করল, এখানের ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন খেলে নিশ্চয়ই সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণময় হবে। কিন্তু তা হলো না; তার ঐ একাঙ্গই স্বর্ণময় রহিল। এই যে গল্পটি ইহার অর্থ কি। ঐ যে ব্রাহ্মণ সে তার যা ছিল দয়াপরবশ হ'য়ে সমস্তই অতিথিকে দিয়াছে; তার হৃদয়ে দয়া এমন ছিল; তার জন্য নিজে অনাহারে থেকে সব দিয়াছে; আর, যুধিষ্ঠিরের অতুল সম্পদ, তিনি যশের জন্য, রাজ চক্রবর্ত্তী হবার জন্য, কোটি কোটি টাকা দান করিলেও সমগ্র ত দান করেন নাই—মনের ভাবও রাজচক্রবর্ত্তী হওয়া; সুতরাং তাঁহার এই দানের ফলে ঐ পাখার পাখা স্বর্ণময় হলো না। ত্যাগ চাই—দানের সঙ্গে প্রাণ চাই, সমগ্র দান চাই। লোকে বলে widow's mite—দুর্ভিক্ষে গরীবের দুঃখমোচনে যার অর্থ আছে সে ত কত হাজার হাজার টাকা দেয়, তাতে তার আপনার সুখ সংযত করতে হয় না। কিন্তু গরীব বিধবা যে তার সমগ্র দিনের ভিক্ষালব্ধ এক মুষ্টি তণ্ডুল সমস্তই দিল, তাঁর দানই প্রকৃত দান হলো। জলপ্লাবনের সময় আমার হস্তে অনেকে অনেক অর্থ পাঠাইয়াছেন, কিন্তু একবার কোনও বালিকা স্কুলের বোর্ডিংএর মেয়েরা যে প্রায় একমাস চিনি না খেয়ে সামান্য অর্থ দিয়াছিলেন, আপনাদের সুখ সংযত ক'রে দান করেছিলেন, তার পরিমাণ সামান্য হ'লেও তার মূল্য অনেক; ঈশ্বর এই দানই প্রকৃত দান ব'লে গ্রহণ করেন। তোমরা যদি সেবার কাজ করতে চাও, ব্রাহ্মসমাজের কাজ, মানবের কাজ, দেশের কাজ করতে চাও, তবে তোমাদিগকে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে হবে; আপনার সুখলালসা, আরামস্পৃহা সংযত করতে হবে। তোমরা যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়ে দিন দিন অনাবশ্যক অভাব বৃদ্ধি কর্চ্ছো; তোমাদের বিলাস বিভ্রমের সীমা যে কোথায় কে জানে? সামান্য আহারে বিহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে আর তুষ্ট নও; সামান্য আয় যার, সেও চায় বড় লোকের চালে চলবে; দোতলা তেতলা বাড়ী করবে, মোটর করবে,—যত আয় বাড়ে কিছুতেই তোমার কুলায় না! কি এক কর্ত্তব্যজ্ঞান শিখেছ! যখনই সাধারণের

কাজে অর্থ চাওয়া হয়, কত যুক্তি তর্কের জাল বিস্তার কর; নিজের প্রতি কর্ত্তব্য, পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য, ছেলেমেয়েকে পড়াতে হবে, ছেলেকে বিলাত পাঠাতে হবে, কত রকম কর্ত্তব্যের দোহাই দিতেছ! দর্শন বিজ্ঞান অর্থনীতি শাস্ত্র তোমাদিগকে ক্ষুদ্রচিত্ততাকে, হৃদয়হীনতাকে সুন্দর আবরণে প্রকাশ করিতে শিখাইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ অন্তরদেবতা, তিনি অন্তরের কথা জানেন। সেবার কাজ কর্‌তে চাইলে ত্যাগ চাই, সংযম চাই, আপনাকে ঈশ্বরের নামে তাঁর কাজে ছেড়ে দেওয়া চাই। অনেক সময় তিলে তিলে আত্মবিসর্জ্জন কর্‌তে হবে; এক সময়ে হঠাৎ প্রাণ পর্য্যন্ত দেওয়াও অনেক সময় সহজ; কিন্তু দেশের জন্য, দশের জন্য, ঈশ্বরের নামে তিল তিল ক'রে জীবন আহুতি দেওয়া খুবই কঠিন—এই কঠিন কাজই তোমাকে কর্‌তে হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত সুখ, কত আরাম, বর্জ্জন কর্‌তে হবে, কত আমোদ প্রমোদ বন্ধ কর্‌তে হবে! অনেক অনুষ্ঠান আছে, আমোদ আছে, যাতে তুমি গেলে তোমার কোনও অনিষ্ট নাই; কিন্তু দশের মুখের দিকে তাকিয়ে তাহা হ'তেও তোমাকে বিরত হ'তে হবে। তোমাকে যে দশজনে দেখে, তোমার আচার আচরণ, তোমার ব্যবহার, সবই যে লোকে লক্ষ্য করে! ক্ষুদ্রতা, নীচতা ত্যাগ ক'রে প্রাণটাকে উদার কর্‌তে হবে। যদি আর কেহ না আসে তবে একলাই তোমাকে কাজ কর্‌তে হবে। যদি ঈশ্বরে তোমার প্রীতি থাকে, তাঁর প্রেমে যদি কর্ম্মে অগ্রসর হ'তে পার, তবে এই ত্যাগেই সুখ পাবে, এই সংযমেই আনন্দ পাবে, একাকী চ'লেই শান্তি পাবে। তাঁর জন্য দুঃখ কষ্ট অপমান নির্য্যাতন বরণ ক'রে নিতেও কত আনন্দ! হয়ত তোমাকে কেহ আদর করবে না, হয়ত আপনার জনও পর হ'য়ে যাবে, হয়ত সংবাদপত্রে তোমার নাম উঠ্‌বে না, হয়ত নীরবে নির্জ্জনে কত দুঃখ ক্লেশের ভিতরে তোমাকে কাজ কর্‌তে হবে, হয়ত সমাজ ত্যাগ করিবে, পিতা মাতা ত্যাগ করবেন। হয়ত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হবে; হয়ত রাজদ্বারেও দণ্ডিত হ'তে হবে, তবুও প্রভুর জন্য তোমাকে সেবার নিশান নিয়ে চল্‌তে হবে। আপনাকে তাঁর সেবায় উৎসর্গ কর্‌তে হবে। যদি তাঁতে চিত্ত অর্পণ কর্‌তে পার, তবে তাতেই সুখ শান্তি বল ও আনন্দ পাবে।

আর একটি কথা এই, যেমন এক দিকে ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁর প্রীতিপ্রেরণায় তাঁর কাজ কর্‌তে যেয়ে ত্যাগ ও সংযম—প্রেমের জন্য ত্যাগ—সেইরূপ আবার, মানুষের প্রতি, ভাই বোনদের প্রতিও প্রেম ল'য়ে কর্ম্মে অগ্রসর হ'তে হবে। যে ঈশ্বর-প্রীতি মানবের প্রতি ভালবাসা না জন্মায় তার মূল্য কি? আমি অনেক বার বলেছি, আজও আবার বলি, বাষ্পজীবনের সার্থকতা তখনই যখন সে ঊর্দ্ধে উঠে এবং ঊর্দ্ধদেশ হ'তে কল্যাণরূপিণী বৃষ্টিধারা রূপে ধরাতে পতিত হইয়া মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন করে। মানবহৃদয়নিহিত প্রেম যখন ঊর্দ্ধ দিকে ঈশ্বরের চরণে উত্থিত হয়, আবার সেই প্রেম করুণা-ধারারূপে মানবমণ্ডলীতে ছড়াইয়া পড়ে, তখনই প্রেমের সার্থকতা। তুমি যদি ভাইকে ভালবাস্‌তে না পার্‌লে, বোনকে ভালবাস্‌তে না পার্‌লে, তোমার প্রেমের মূল্য কি? প্রত্যেক মানবের মধ্যে তোমার প্রাণের দেবতা রয়েছেন; প্রত্যেক মানবই যে আমাদের ভাই। তুমি কি কেবল রক্তের সম্পর্ক যাদের সঙ্গে আছে, বিবাহবন্ধন দ্বারা যাদের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে অথবা স্বার্থের সম্পর্ক যাদের সঙ্গে ঘটেছে, তাদেরই ভালবাস্‌বে? তাদের ত সকলেই ভালবাসে,—যারা ঈশ্বরের নাম করে না, যারা দুষ্ক্রিয়াসক্ত, তারাও আপনার জনকে ভালবাসে; যারা লেখা পড়া শিখে নাই, সভ্যতার আলোক পায় নাই, তারাও আত্মীয় জনকে ভালবাসে। তুমি যদি আত্মীয়ের গণ্ডী অতিক্রম কর্‌তে না পার, এক সমাজে যারা আছে তাদের ভালবাস্‌তে না পার, মানুষ ব'লে মানুষকে ভালবাস্‌তে না পার, তবে তোমার প্রেমের মূল্য কি? যে দোষ করে, যে দুর্ব্বল, যে অপরাধী তাকেও যে ভালবাস্‌তে হবে। তোমার আপনার ভাই, আপনার বোন যদি অপরাধ করে, তবে তাকে কি পরিত্যাগ কর? তার কুৎসা কি চারি দিকে রটনা কর? তাকে চেপে পিষে মার্‌তে কি চাও? তা ত কর না। তোমার প্রাণ ভেঙ্গে পড়ে, চক্ষে জল আসে, হৃদয় বেদনায় কাতর হয়। তাকে আরও নিকটে এনে বল, ও ভাই, ও বোন, তুমি ওরূপ করো না, ওপথে যেও না; ফিরে এস, ও পথ পাপের পথ, ও পথ মৃত্যুর পথ। ঐ মৃত্যুময় জীবন, আর এই অমৃতময় জীবন। ও ভাই, ও বোন, এই অমৃতময় জীবন লাভ কর। আর, আজ ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে তোমার পরিবার যে কত বিস্তৃত হয়েছে, তা দেখ না? আজ যদি তোমার সমাজের লোক, মানবসমাজের কেহ, অপরাধ করে, তাকে কি ঠেলে ফেলে দিবে? তাকে কি প্রেম দিবে না? প্রেমে আলিঙ্গন ক'রে বল্‌বে না, ও ভাই ও বোন, ও পথ নয়, এই অমৃতের সন্ধানে এস? নিত্যানন্দ ত ও প্রেম দিয়েই জগাই মাধাইকে সুপথে এনে ছিলেন; তিনি ত রক্তাক্ত কলেবরে বলেছিলেন,—

> মেরেছিস্ কলসীর কাণা
> তাই ব'লে কি প্রেম দিব না?
> একবার মার খেয়েছি, না হয় আবার খাব,
> তবু এ নাম বিলাইব।
> এ জগতে দেখাইব
> নামে পাষাণ গ'লে যায়।

যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন—ঐ পতিতা রমণীর প্রতি লক্ষ্য ক'রে ব'লেছিলেন,—যে নিষ্পাপ আছ, সে আগে উহাকে প্রস্তর নিক্ষেপ কর। আর সেই রমণীকে ব'লে ছিলেন go thy way woman and sin no more—নারী, গৃহে ফিরে যাও, আর পাপ করো না। দণ্ড দ্বারা মানুষকে বাঁচান যায় না। প্রেমে মানুষ নব জীবন পায়। যে তোমাকে আঘাত করে, তাকেও তুমি প্রেমে আলিঙ্গন কর্‌বে। যাকে তুমি ভালবাস, সে যদি তোমাকে উপেক্ষা করে, বেদনা দেয়, অপমান করে, তবুও তাকে ভালবাস্‌বে, তার কল্যাণচিন্তা কর্‌বে, কল্যাণসাধন কর্‌বে। প্রেম অনেক সহ্য করে; প্রেম অনেক বেদনা বহন করে। প্রেমে অনেক ধৈর্য্য, অনেক সহিষ্ণুতা। যারা ব্রাহ্মসমাজের

দেশের কাজ করতে এসেছ, তাহাদিগকে বলি, তোমাদের হৃদয়ে যেন প্রেম থাকে; যে তোমাকে বেদনা দেয়, তাকেও প্রেমে আলিঙ্গন কর। যারা সেবক, তারা পরস্পর প্রেমে এক প্রাণ হ'য়ে কাজ করবে। এই প্রেমের অভাবেই সমাজে কলহ হয়, বিদ্বেষ জাগে, গরল উৎপন্ন হয়। সেবার কাজ করতে যেয়েও মানুষ ঝগড়া করে; একে অন্যের কুৎসা করে, একে অন্যকে চেপে রাখ্‌তে চেষ্টা করে। তোমরা সেবক, তোমরা নিজেকে সকলের পশ্চাতে রাখ্‌বে; নীরবে, ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে সেবা ক'রে যাবে। হয় ত কেহ তোমার কাজ দেখ্‌বে না, কেহ একটী উৎসাহের বাণী বল্‌বে না, কেহ একটু প্রাণে আশার আলোক জ্বাল্‌বে না—তবুও শত নিন্দা অপমান লাঞ্ছনা উৎপীড়নের মধ্যে, ঈশ্বরের নামে, তাঁর কাজ ক'রে যাবে।

আজ উৎসবের অন্তে ভাই বোনসকল, তোমাদের বলি, ঈশ্বর সেবার জন্য আহ্বান কর্চ্ছেন, তাঁর ডাক এসেছে। সে বাণী কি শোন না? গুণী, জ্ঞানী, ধনী, পদস্থ যাঁরা, ক্ষমতাশালী যাঁরা, তাঁরা যদি ঐ ডাক না-ই শোনেন। তুমি আমি, সামান্য নগণ্য যারা, দুটা কথা বল্‌তে জানি না, দু'খানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পড়ি নাই, একটু প্রভাব প্রতিপত্তি নাই, তবুও যদি তুমি আমি তাঁর কাজে প্রাণ মন ঢেলে দেই, তাঁর প্রীতিসাধন করি, তাঁর চরণে প্রাণ মন অর্পণ করি, আপনার স্বার্থ সুখ ত্যাগ ক'রে, প্রেমের সহিত পরস্পর হাত ধ'রে, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই, মানুষকে প্রেমে আলিঙ্গন করি,—যে দুঃখী তাকে একটু সহানুভূতি জানাই, যে শোকার্ত্ত তাকে একটু সান্ত্বনা দেই, যে বিপথে গেছে তাকে হাত ধ'রে ডাকি, যে উৎপীড়িত তাকে একটু সাহায্য করি, যে আর্ত্ত পীড়িত তার একটু সেবা করি,—তবেই যে আমাদের দ্বারাও দেশের কাজ হবে, ব্রাহ্মসমাজের কাজ হবে। তুমি আমিই ত সমাজ। কা'র দোষ দাও? কা'র ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাও? তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্য কর, আমি যদি আমার কর্ত্তব্য করি, তুমি যদি ঈশ্বরপ্রীতি ত্যাগ সংযম ও ভালবাসা ল'য়ে কর্ম্মে অগ্রসর হও, আমিও যদি ঈশ্বরে প্রীতি ত্যাগ সংযম ও ভালবাসা ল'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে যাই, তবেই যে সমাজের মুখ উজ্জ্বল হবে, দেশের মুখ ফিরবে—ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে, ঘরে ঘরে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তিত হবে, হৃদয়ে হৃদয়ে ব্রহ্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। ধরাতে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হবে। অপ্রেম বিদ্বেষ চ'লে যাবে, অবিচার অত্যাচার, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কলহ, পাপ কুসংস্কার দুঃখ দৈন্য দূর হবে। তবে ভাইসকল, তবে বোনসকল, ঈশ্বরে প্রীতি অর্পণ ক'রে, তাঁর ধ্যানে, তাঁর নামকীর্ত্তনে হৃদয় সরস ক'রে, তাঁর প্রেমপ্রেরণায় ত্যাগ ও সংযমের মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে, মানবে প্রেম ও হৃদয়ে আশা ল'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই।

# গীতার ধর্ম্ম (২)

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার অমরত্ব, ব্রাহ্মীস্থিতি ও যজ্ঞের অসারতা।

গীতার আখ্যায়িকা এই, অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌কালে উভয় পক্ষের সমবেত সেনা ও সেনাপতিগণকে দেখিয়া চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আত্মীয় বন্ধু সকলেই উভয়পক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য সমাগত, যুদ্ধে অনেকেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এবং সেই হত্যার জন্য তাঁহাকে পাপভাগী হইতে হইবে। এই সকল চিন্তা করিয়া শোকে ও দুঃখে মুহ্যমান হইয়া, "যুদ্ধ করিব না" বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। কৃষ্ণ তাঁহার ঐ সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া তাঁহাকে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিলেন। এই প্রসঙ্গে গীতার বিস্তৃত উপদেশ; কিন্তু যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রধান বিষয় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ধর্ম্মযুদ্ধ করায় পাপ নাই, মূলে এই কথা স্বীকার করিয়া অর্জ্জুনের অন্য আপত্তি সকল দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোক হইতে এই উপদেশ আরম্ভ। প্রথম উপদেশ এই যে, (১) শরীরেরই মৃত্যু হইয়া থাকে, কিন্তু শরীরাশ্রিত আত্মার কখনও মৃত্যু হয় না। কারণ, আত্মার কোন জড়ীয় গুণ নাই, অতএব জড়ের ন্যায় ইহার কোন হ্রাস বৃদ্ধি, জন্ম মৃত্যু, হয় না। সাংখ্য মত অনুসারে গীতাকার আত্মতত্ত্ব আরও ব্যাখ্যা করিলেন, আত্মা ক্রিয়াহীন, জন্মরহিত, চিরকাল একই অবস্থায় থাকে, ইহার উন্নতি ও বিকাশ নাই এবং কোন ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয় না।

(২) আত্মার জন্ম মৃত্যু অথবা কোন পরিবর্ত্তন না হইলেও, তাহার শরীরপরিগ্রহ আছে। জীবের মৃত্যু হইলে আত্মা অন্য দেহ আশ্রয় করে মাত্র, যেমন জীর্ণবাস পরিত্যাগ করিয়া মানব অপর বাস গ্রহণ করে।

(৩) যদি বল আত্মার জন্মও আছে, মৃত্যুও আছে, তাহা হইলে যাহার জন্ম আছে, তাহার অবশ্যই মৃত্যু হইবে, এবং যাহার মৃত্যু আছে তাহার অবশ্যই জন্ম হইবে। এই অপরিহার্য্য বিষয়ের জন্য শোক করিয়া লাভ কি? আত্মতত্ত্ব অতিশয় আশ্চর্য্য, সকলে বুঝিতে পারে না।

(৪) দুঃখ শোক সকল সহ্য করিতে হইবে। কারণ, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, এ সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যবস্তুর সংযোগ হইলে উৎপন্ন হয়। অতএব এ সকল নিত্য নহে, সুতরাং অসৎ। এরূপ বিষয়ে অভিভূত না হইয়া তাহা সহ্য করা উচিৎ।

তৃতীয় বিষয়টি ব্যতীত এই আত্মতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে সাংখ্য-মতানুযায়ী। ইহার কোন যুক্তি প্রমাণ এখানে দেওয়া হয় নাই, সে-সকল সাংখ্যদর্শনের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে। সাংখ্য মত প্রমাণসহ হইলে এ আত্মতত্ত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারে, না হইলে অন্য যুক্তি দ্বারা দেখিতে হইবে, ইহা গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, অথবা ইহার কি পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সাংখ্যকারিকা অনুসারে প্রধান ও পুরুষ অনাদি, উভয়ে

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। জগতের যাহা কিছু কার্য্য তাহা প্রধান বা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, কেবল পুরুষের সংযোগ বা সান্নিধ্যবশতঃ হইয়া থাকে। কারিকার শ্লোক উদ্ধার না করিয়া প্রাসঙ্গিক স্থানসমূহের বাঙ্গালা অনুবাদ দিতেছি।

প্রথমে "প্রধানকে" না বুঝিলে পুরুষকে বুঝা যাইবে না, এজন্য প্রথমে "প্রধানের" কথা বলা হইতেছে। "প্রধান" জগতের মূলকারণ; কিন্তু ইহা উপলব্ধি হয় না কেন? "প্রধান সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না, তাহার অস্তিত্ব নাই বলিয়া নহে; কার্য্যের দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয়। মহদাদি ( বুদ্ধি হইতে পঞ্চভূত পর্য্যন্ত ) তাহার কার্য্য, এবং মহদাদি প্রধানের সদৃশ ও বিসদৃশ উভয়ই" (৮)। প্রধান বা প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা হইয়াছে, তাহার বিকার বা জাত বিশ্বকে ব্যক্ত বলা হইয়াছে। এ দুইএর অতীত পুরুষ! এখন প্রধান ও তাহার বিকারের স্বরূপ কি?

"ব্যক্ত ও প্রধান—ত্রিগুণ ( সত্ব, রজঃ, তমোময় ), অবিবেকী, জ্ঞানের বিষয়, অনেক পুরুষের ভোগ্য, অচেতন ও প্রসবধর্ম্মী। পুরুষ তদ্বিপরীত।" (১১)

পুরুষ ( আত্মা ) যে আছে তাহার প্রমাণ কি?

"পুরুষের যে অস্তিত্ব আছে তাহার প্রমাণ পাঁচটি—বস্তুসকল মিলিত হইয়া আপন প্রয়োজন সাধন করে না, পরপ্রয়োজন সাধন করে, প্রধানের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বহু বিচিত্র মিলন প্রধানের অতীত কোন বিষয়ের প্রয়োজন সাধন করিবে, তাহাই পুরুষ; ত্রিগুণ ত্রিগুণাতীত বিষয়ের জন্যই, তাহাই পুরুষ; অচেতন প্রধানের বিকার বুদ্ধি প্রভৃতি চেতনের ন্যায় কাজ করে, চেতন পুরুষের সান্নিধ্যে; সুখ দুঃখ যাহার অনুকূল ও প্রতিকূল হয়, এরূপ ব্যক্তির প্রয়োজন, তাহাই পুরুষ; শাস্ত্রে পুরুষের মুক্তির উপদেশ আছে, কিন্তু যাহার দুঃখ স্বাভাবিক নহে, তাহারই মুক্তি হইতে পারে।" (১৭)

এই পুরুষ এক নহে, বহু—"জন্মমৃত্যু ও ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দেখা যায়, যুগপৎ সকলের কার্য্যচেষ্টা হয় না, গুণও সকলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন, এই হেতু পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হইল।" (১৮)

এখন এই পুরুষের স্বরূপ বা ধর্ম্ম কি?

"ত্রিগুণ হইতে বৈপরিত্য হেতু এই পুরুষের সাক্ষীত্ব, দ্রষ্টৃত্ব, মুক্তত্ব, সুখ দুঃখে উদাসীনত্ব এবং অকর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে।" (১৯)

পুরুষকে জ্ঞানস্বরূপও বলা হইয়াছে, যথা "ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ বিজ্ঞানাৎ" (২)—ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং জ্ঞ বা জ্ঞানময় পুরুষের বোধ হইতে শ্রেয়োলাভ হয়। তবে প্রকৃতি পুরুষের যোগ হয় কেন?

"পুরুষকে দেখাইবার জন্য ( ভোগ করাইবার জন্য ) প্রধানের এবং মুক্তির জন্য পুরুষের, অন্ধ পঙ্গুবৎ উভয়ের সংযোগ হইয়া থাকে। এই সংযোগ হইতে সৃষ্টি।" (২১)

"বাস্তবিক নির্গুণ বলিয়া কোন পুরুষের মৃত্যু, মুক্তি ও শরীর হইতে শরীরে ভ্রমণ হয় না। নানা পুরুষে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতিই জন্মান্তর গ্রহণ, মৃত্যু ও মুক্তি লাভ করে।" (৬২)

এই সকল উদ্ধৃত বাক্য হইতেই বুঝা যাইবে, আত্মার সম্বন্ধে গীতাকার যে সকল স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহার কোন যুক্তি পাওয়া যায় কি না। এ যুক্তি মোটামুটি ভাবে নিম্নে বলা যাইতে পারে—এক প্রধান ও বহু পুরুষ অনাদি, জন্মরহিত ও অমর। পুরুষের ধর্ম্ম প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রধান ( পুরুষের অধিষ্ঠানে ) নানাপ্রকারে আপনাকে পরিবর্ত্তন করে, কিন্তু পুরুষের কোন পরিবর্ত্তন নাই, ক্রিয়া নাই, ইহা অনন্তকাল এক অবস্থায় অবস্থান করে। ইহার স্বরূপ জ্ঞান, সাক্ষীত্ব, দ্রষ্টৃত্ব ও সুখে দুঃখে উদাসীনত্ব এবং ইহা নিষ্ক্রিয় বলিয়া কাহাকে হত করে না, এবং অমর বলিয়া হতও হয় না। "পুরুষের সংযোগে অচেতন জড় চেতনের ন্যায় হয় এবং উদাসীন আত্মা গুণসকলের কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তার ন্যায় হয়।" (২০) এবং "চেতন পুরুষ সূক্ষ্ম শরীরের সহিত আপনাকে অভেদ মনে করে বলিয়া শরীরাদিতে জরামরণজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হয়।" (৫৫) কিন্তু তত্ত্বাভ্যাস হইতে 'আমার কোন ক্রিয়া নাই', 'আমার কিছু নাই', 'আমি কর্ত্তা নহি', এইরূপ সর্ব্ববিষয়ক সংশয়রহিত বিশুদ্ধ নিত্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়।" (৬৪)

এখন দেখা যাইক, এই সাংখ্যতত্ত্ব যুক্তিসহ কি না। প্রথমতঃ প্রধান ও বহুপুরুষ সৃষ্টির মূল তত্ত্ব এবং অনাদি, এ কথা গ্রহণ করা যাইতে পারে না। প্রকৃতি ও পুরুষ অনন্ত ও পূর্ণ অথবা ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ? ইহারা ক্ষুদ্র ও অপূর্ণ হইলে ইহাদের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ আপনাদের মধ্যে থাকিতে পারে না। এক অনন্ত ও পূর্ণ সত্তা ইহাদের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ। তিনিই ঈশ্বর। গীতাকার নিরীশ্বর সাংখ্যবাদী নহেন। তিনি ৭ম অধ্যায়ের ৪-১২ শ্লোকে প্রধান ও তাহার বিকারকে এবং জীবসমূহ বা পুরুষকে ঈশ্বরের দুই প্রকৃতি বলিয়াছেন। ১৩শ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে আরও উক্ত হইয়াছে যে, "প্রকৃতি ও পুরুষ এ উভয়কেই অনাদি বলিয়া মনে করিবে।" কিন্তু প্রধান ও পুরুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি বা কার্য্য না বলিয়া, তাঁহার 'প্রকৃতি' বলিলে, ঈশ্বরকে বদ্ধ ও ক্ষুদ্র মনে করা হয়। প্রকৃতি ও পুরুষ সৃষ্টি করিবার তাঁহার শক্তি আছে, এবং সে শক্তি অনাদি ঈশ্বরে অনাদি হইয়া রহিয়াছে, ইহা বলিলে কেহ কোন আপত্তি করিতে পারে না। কিন্তু তাহা না বলিয়া যখন শক্তি অতিক্রম করিয়া প্রধান ও তাহার বিকার এবং পুরুষকেই ঈশ্বরের 'প্রকৃতি' বলা হয়, তখন প্রকৃত বিষয় অর্থাৎ সৃষ্টিতত্ত্বই অমীমাংসিত থাকে। ব্যাখ্যাকারগণ, যথা শ্রীধর, "প্রকৃতির" অর্থ করিয়াছেন "মায়াখ্যা-শক্তি," শঙ্কর মায়া বা অবিদ্যা বলিবেন। কিন্তু শক্তি এক জিনিষ ও শক্তির পরিণামরূপী সৃষ্টি অন্য জিনিষ। এই জন্য প্রধান ও পুরুষকে ঈশ্বরের প্রকৃতি বলিয়াও সাংখ্যতত্ত্ব সংস্কৃত করিতে পারা যায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, আত্মা ( পুরুষ ) প্রধান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এ কথা বলিলে নানা যুক্তিবিরোধী কথা স্বীকার করিতে হয়। প্রকৃতি ক্রিয়াশীল, অতএব তাহার বিরুদ্ধধর্ম্মী আত্মা নিষ্ক্রিয়। কিন্তু আত্মাকে "জ্ঞঃ" বা জ্ঞানস্বরূপ বলা হইয়াছে, জ্ঞান নিষ্ক্রিয় নহে। ইহা বিষয়সকলের মধ্যে সম্বন্ধ বিচার করে, আত্মার সহিত বিষয়ের যোগস্থাপন করে, এবং বিষয় হইতে নিবৃত্ত আপনাকে দর্শন করে। এতদ্ব্যতীত, যদি পুরুষ ও প্রকৃতি

সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রকৃতির হইবে, তবে তাহাদের সংযোগ কি প্রকারে সম্ভব? অন্ধ পঙ্গুর কাঁধে চড়িতে পারে, উভয়ের শরীর আছে বলিয়া; কিন্তু যদি একজনের শরীর থাকিত, আর একজনের শরীর না থাকিত, তাহা হইলে একজন আর একজনের কাঁধে চড়িত কি প্রকারে? পাশ্চাত্য জগতে এই মহাপ্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া বুঝিলেন যে প্রকৃতিকে (ঈশ্বরের) জ্ঞানোদ্ভূত ও জ্ঞানমূলক না বলিলে অন্য কোন মীমাংসা হয় না। আমাদের দেশেও এই তত্ত্ব প্রাচীনগণ বুঝিয়াছিলেন; কারণ, উপনিষদে স্পষ্টই আছে ব্রহ্মের "সংকল্প" হইতে এই বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে। বৌদ্ধাচার্য্য অসঙ্গও পঞ্চম শতাব্দীতে মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন যে এই বিশ্ব জ্ঞানময়।

তৃতীয়তঃ, সাংখ্যমত অনুসারে বুদ্ধি, অহংকার, মন ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি সকলই প্রকৃতির বিকার,—জড়ধর্ম্মী ও জড়ীয়। এ সকল আত্মার সহিত সম্বন্ধহীন। আত্মার অধিষ্ঠানে ইহারা চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়, এবং আত্মা মোহাচ্ছন্ন হইয়া এ সকলকে আপনার মনে করিয়া সুখ দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু বুদ্ধি, অহংকার, মন প্রভৃতির প্রকৃত স্বরূপ কি? প্রকৃত স্বরূপ কি জ্ঞান—চৈতন্য—অথবা জড়ধর্ম্ম? চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, বুদ্ধি প্রভৃতির বিষয় অনেক সময়ে জড় হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের স্বরূপ জ্ঞান, এবং এ জ্ঞান বাহির হইতে আরোপিত নহে, কিন্তু মূল স্বরূপ। কিন্তু জ্ঞান জড়ের ধর্ম্ম নহে, ইহা আত্মার ধর্ম্ম। অতএব বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়ের শক্তি আত্মারই প্রকাশ, জড়ের নহে।

অতএব সাংখ্যতত্ত্ব যখন যুক্তিসহ নহে, তখন সাংখ্য অনুযায়ী গীতার আত্মতত্ত্বও যুক্তিসহ নহে। গীতোক্ত আত্মতত্ত্ব অদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এখন আমরা দেখি, আমাদের আত্মজ্ঞান অনুসন্ধান করিয়া গীতার আত্মতত্ত্ব কতদূর পর্য্যন্ত সমর্থন করিতে পারি। যখন আমরা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মদৃষ্টি লাভ করি, তখন বুঝিতে পারি আত্মা শরীর হইতে স্বতন্ত্র এবং আত্মার মধ্যে শারীরিক ও জড়ীয় ধর্ম্ম নাই। ইহা স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, স্থানে বিস্তৃত নহে, ইহা দগ্ধ হয় না, আর্দ্র হয় না, শুষ্ক হয় না। আরও বুঝা যায় যে, জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যে আত্মা পুষ্ট হয়, এবং অজ্ঞান, অপ্রেম ও পাপাচারে ইহা শীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু এ পুষ্টি ও শীর্ণতা জড়ীয় পুষ্টি ও শীর্ণতা নহে, ইহা আত্মিক। এই জন্য জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্য আত্মার স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হয়। যখন শরীর হইতে আত্মা ভিন্ন এবং শরীরের সহিত আত্মার ধর্ম্মগত সাদৃশ্য নাই, তখন শরীরের মৃত্যু হইলে আত্মার মৃত্যু হইতে পারে না। কিন্তু সাধারণে মনে করিয়া থাকে যে, আত্মার সহিত শরীরের ভিন্নতা সত্ত্বেও যখন গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন শরীর বিনষ্ট হইলে নিরাশ্রয় আত্মাও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আত্মদৃষ্টি আসিয়া এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করে। কারণ, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অনুভব করেন যে, শরীর অপেক্ষা আত্মা অধিকতর শক্তিশালী, আত্মাই শরীরকে পরিচালন করে, এবং শারীরিক দুঃখ কষ্ট রোগ শোক ইত্যাদি অগ্রাহ্য করিয়াও আত্মা আপন ইচ্ছামত কাজ করিতে পারে। অতএব আত্মা যদি শরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বলশালী হয়, তাহা হইলে শরীরের মৃত্যুতে আত্মার মৃত্যু হইতে পারে না। যাহারা আত্মজ্ঞানসম্পন্ন নহে, তাহারা আত্মাকে শারীরিক ধর্ম্মবিশিষ্ট মনে করিয়া শারীরিক অভাব ও আশঙ্কার দ্বারা পরিচালিত হয় এবং মনে করে যে শরীর বিনষ্ট হইলে আত্মার আর কিছু থাকে না।

এ পর্য্যন্ত বুঝা গেল যে, শরীরের বিনাশ হইলে আত্মার মৃত্যু হয় না। কিন্তু আত্মা যে স্বরূপতঃ অমর ইহা অনুভব করিতে হইলে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া চাই। মানব যখন আত্মস্বরূপের মধ্যে বাস করিতে পারে, তখন দেখে যে তাহার প্রেম, পুণ্য, জ্ঞান অনন্তপ্রসারী, তাহার গতি অনন্ত অভিমুখীন, তাহার পথের শেষ নাই এবং তাহার মৃত্যু নাই।

আত্মার জন্ম নাই, এ কথা প্রত্যক্ষ জ্ঞানসিদ্ধ নহে। মানব যখন ঈশ্বরের সঙ্গলাভ করে, তখন তাহার মনে হয় যে এমন কোন কাল ছিল না যেদিন সে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত ছিল না, কেবল আপন মোহবশতঃই সে ইহা অনুভব করে নাই। কিন্তু সে যে ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন ও ঈশ্বরে একান্ত আশ্রিত এ জ্ঞান তাহার দূর হয় না। প্রকাশ করিয়া বলিলে ইহা বিরুদ্ধবাদ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সাধক এ উভয় জ্ঞানকে বিরোধী বলিয়া অন্তরে অনুভব করেন না। ইহার কারণ এই, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার কালের অতীত একটী সম্বন্ধ আছে, যখন সে অনুভব করে সে চিরদিনই ঈশ্বরের সঙ্গে রহিয়াছে, তাহার জীবনের আদি নাই, অন্ত নাই। কিন্তু ঈশ্বরের সত্তা তাহার অস্তিত্বের মূল কারণ, তাঁহার আশ্রয়েই সে জীবনধারণ করিতেছে। এই অর্থে সে ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন। আবার যখন সে আপনাকে কালপ্রবাহে ভাসাইয়া দেয়, সে তখন মনে করে যে এক কালে ঈশ্বর তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু অন্তরের আদর্শ অনুভব করিয়া, বিশেষতঃ ঈশ্বরের উপাসনায় যখন অন্তরের সকল প্রচ্ছন্ন ভাব জাগ্রত হইয়া উঠে, তখন তাহার যে কোনকালে মৃত্যু আছে এ কথা কখনও সে অনুভব করে না। অতএব আত্মার অমরত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

গীতাকার আর একটি মতের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা আমরা (৩) সংখ্যায় দেখাইয়াছি। এই মত কোন হিন্দু শাস্ত্রে নাই; কারণ, আত্মার মৃত্যু হয় এ কথা বেদ হইতে অতি আধুনিক শাস্ত্র পর্য্যন্ত কেহ স্বীকার করেন নাই। আত্মার পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ, বৃক্ষাদিরূপে জন্ম হইতে পারে, অথবা স্বর্গে নিয়ত বাস করিতে পারে, এবং হয়ত পরিণামে যাহা হইতে উৎপন্ন সেই ব্রহ্মে অনুপ্রবেশ করিতে পারে, এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। আত্মার যে মৃত্যু হয়, ইহার মূল আমরা অন্যত্র দেখিতে পাই। তাহার পর জন্ম হইলেই মৃত্যু এবং মৃত্যু হইলেই জন্ম, এ বিধি স্বতঃসিদ্ধ নহে, যুক্তিমূলকও নহে। এ মত গীতাকার বৌদ্ধ অনাত্মবাদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। বৌদ্ধ মতে মানবের জন্ম ও মৃত্যু হয়, কিন্তু সংস্কার অবশিষ্ট থাকে, এই সংস্কারই বার বার জন্ম ও মৃত্যু ঘটন করে। আত্মা কেবল বিজ্ঞানসমষ্টি, তাহা শরীরের ন্যায় বিনষ্ট হয় এবং পুনঃরায় সংস্কারপ্রভাবে নূতন বিজ্ঞানসমষ্টিরূপ আত্মার জন্ম হয়। সাধনার দ্বারা যখন এই সংস্কার বিনষ্ট হয়, তখন আর জন্ম মৃত্যু হয় না এবং কিছুই থাকে না। সেই শূন্যাবস্থাকে এক মতাবলম্বী বৌদ্ধদল নির্ব্বাণ বলিয়া থাকেন। এ মত গীতাকার স্বীকার করেন না; সুতরাং এ বিষয়ে আর আমরা অধিক আলোচনা করিব না।

গীতাকার আত্মতত্ত্বের মধ্যে জন্মান্তরবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। সাংখ্য মত অনুসারে সূক্ষ্ম শরীর আশ্রয় করিয়া আত্মা অপর শরীর পরিগ্রহ করে, ইহা গীতাকার উহ্য রাখিয়াছেন। যাহা হউক, জন্মান্তর গ্রহণ করিলে মানব জীবন কি আকার ধারণ করে, তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি। মনে করা যাউক, কোন ব্যক্তি নিদ্রিত হইয়া স্বপ্নের উপর স্বপ্ন দেখিতেছে,—এক স্বপ্নে দেখিল সে রাজা হইয়াছে, দ্বিতীয় স্বপ্নে তাহার আর পূর্ব্ব কথা মনে নাই, সে দেখিল যে সে এক ফকীর হইয়াছে, সেইরূপ আর এক স্বপ্নে দেখিল তাহার পুত্র কন্যা সকল রোগে মারা যাইতেছে, এইরূপ সে স্বপ্নের উপর স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। স্বপ্নগুলির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, কিন্তু স্বপ্নদর্শী প্রত্যেক স্বপ্নেই দেখিতেছেন যে সে এক ভিন্ন পুরুষ তাঁহার আত্মজ্ঞানের অবিচ্ছিন্নতা নাই। অবশেষে সে জাগ্রত হইয়া উঠিলে, তাহার মনে হইতে লাগিল, কি ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্নই সে দেখিয়াছে। পরিশেষে স্বপ্নের স্মৃতি তাহার মন হইতে মুছিয়া যায়। জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিলে মানবজীবন এইরূপ একটা নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্নে পরিণত হয়। এক জন্মে যাহা করিয়াছে দ্বিতীয় জন্মে

তাহার কোন স্মৃতি থাকে না, কিন্তু নূতন আকারের সুখ দুঃখ নূতন মানুষ হইয়া ভোগ করিতে থাকে। অবশেষে যখন সে আত্মজ্ঞান লাভ করে, তখন তাহার সমগ্র জীবনটি স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কোন্ যুক্তি বলে মানবজীবনকে এরূপ স্বপ্ন বলিবার অধিকার আছে, তাহা বলা কঠিন। জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিলে কেবল যে জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না সকল স্বপ্নে পর্য্যবসিত হয়, তাহা নহে, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই স্বপ্ন হইয়া যায়। এই মতবাদের আরও যে-সকল ত্রুটি রহিয়াছে সে-সকল এখানে উঠাইয়া আর প্রবন্ধ দীর্ঘ করিবার ইচ্ছা নাই। কেবল একটি কথা স্মরণ করাইতে চাই যে, ঋগ্বেদে জন্মান্তরবাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু আত্মার অমরত্ব অস্বীকার করা হয় নাই। মৃত্যুতে মানব এ শরীর পরিত্যাগ করিয়া তেজোময় (দৈবী) তনু গ্রহণ করিয়া দেবলোকে বাস করে, এ বিশ্বাস সেখানে দেখা যায়। অতএব আত্মার অমরত্ব স্বীকার করিতে হইলে পুনরায় পার্থিব দেহ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে আসিতে হইবে, এমন কোন অবশ্যম্ভাবী বিধি নাই। অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী।

---

## ব্রাহ্মসমাজ

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৭ই জুন উটী নগরীতে শ্রীযুক্ত অতুলপ্রসাদ সেনের ভগ্নীপতি মিঃ শেষাদ্রি আয়াঙ্গার নিয়োমনিয়া রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১লা জুন কলিকাতা নগরীতে পরলোকগতা সরোজিনী সরকারের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস শাস্ত্রপাঠ, জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সরকার জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা এবং স্বামী শ্রীযুক্ত হীরালাল সরকার প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে বিবিধ প্রতিষ্ঠানে ১০০৲ টাকা দান প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

বিগত ৮ই জুন কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত শ্রীনাথ দত্তের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

---

**শুভবিবাহ**—বিগত ১লা জুন কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুকুমার বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শোভা ও পরলোকগত রায় মতিলাল মুখার্জ্জি বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিনয়েন্দ্রনাথের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা প্রচার বিভাগে ৩৲ শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারে ৩৲ দাতব্য বিভাগে ২৲ ও দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ২৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ৭ই জুন কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ সেনের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া কনকলতা ও কটক নিবাসী শ্রীমান কমলাকান্ত মহাপাত্রের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের করেন।

বিগত ১১ই জুন কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া সুলেখা ও পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীমান কৃপাবন্ধুর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

---

**দান**—পরলোকগত সাতকড়ি দেবের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পত্নী ৩৲, পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দেব ৫০৲, জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুবালা ঘোষ ৫৲ দৌহিত্রী শ্রীমতী সুকুমারী দে ৫৲ ও শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী সরকার ২৲ নিম্নলিখিত ভাবে দান করিয়াছেন—গিরিধি ব্রাহ্মসমাজ ৫৲ কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ৩৲ দেওঘর কুষ্ঠাশ্রম ৫৲ ঢাকা অনাথাশ্রম ৫৲ ঢাকা বিধবাশ্রম ৫৲ প্রচার বিভাগ ২৲ দাতব্য বিভাগ ৩৲ সাধনাশ্রম ৩৲ দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডার ৩৲ বাণীবন ব্রাহ্মসমাজ ৫৲ কালাবোবাদের স্কুল ৫৲ অনাথাশ্রম ৫৲ অন্ধদের স্কুল ৫৲ নারীরক্ষা সমিতি ৫৲ ও একটি গরীব পরিবার ৬৲। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু পত্নী সরলা বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারে ১৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দে পিতা যদুনাথ দের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজে ২৲ উল্টাডাঙ্গা সেবক সঙ্ঘে ১৲ দাতব্য বিভাগে ১৲ ও নববিধান সমাজে ১৲ দান করিয়াছেন।

এ সমস্ত দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

---

**ছাত্রীদের কৃতিত্ব**—নিম্ন লিখিত ছাত্রীগণ বিবিধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম :—
১ম এম বি—সুবর্ণা ঘোষ (ফিজিওলজিতে অনার্স) ও রজনীপ্রভা দাস। ২য় এম বি—যমুনা মল্লিক ও রেণুবালা এডেলীন বৃডা। তৃতীয় এম বি—সরলাবালা ঘোষ ও এ কার্ত্তী দেবী নায়ার।



ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্তৃক ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি এ।

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৩ম ভাগ | ১৬ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

৬ষ্ঠ সংখ্যা। | 1st July, 1930. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা।

হে প্রেমস্বরূপ, তোমার অসীম প্রেমে তুমি আমাদিগকে প্রেমের প্রকৃতি দিয়াই গড়িয়াছ, এবং পরস্পরের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত করিয়া, গৃহ পরিবার সমাজের মধ্যে রাখিয়া, নিয়ত প্রেমে বর্দ্ধিত করিতেছ। তুমি আমাদিগকে শুধু আপনাকে লইয়া, আপনার ক্ষুদ্র সুখ স্বার্থে মজিয়া থাকিবার জন্য সৃষ্টি কর নাই,—তাহাতে আমাদের উন্নতি ও কল্যাণও রাখ নাই। তোমার মঙ্গল বিধানে আমরা যেমন গৃহ পরিবার সমাজ হইতে অশেষ প্রকার সহায়তা পাইয়াই বর্দ্ধিত হইতেছি, তাহা ব্যতীত আমাদের বাঁচিয়া থাকাই সম্ভবপর হইত না, তেমনি আবার সে-সকল স্মরণ রাখিয়া নানা প্রকারে তাহাদের সেবা করিয়াই উন্নত সুন্দর ও মহৎ হইয়া উঠিতেছি—তাহা না হইলে আমরা নিতান্ত ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হইয়াই থাকিতাম, অনেক আনন্দ সুখ হইতেও বঞ্চিত হইতাম। কিন্তু হে অন্তরদর্শী দেবতা, তুমি জান, আমরা মোহবশতঃ অনেক সময় তাহা বুঝিতে না পারিয়া শুধু আপনাকে অথবা আপনার ক্ষুদ্র পরিবার বা পরিজনকে লইয়াই ব্যস্ত থাকি, সমাজের প্রতি উদাসীন হইয়া বা তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই জীবনপথে চলিতে যাই—ভাবিয়া দেখি না যে তাহাতে সমাজ অপেক্ষা আমরা নিজেই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হই, আমরাই প্রেম ও মহত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হই। হে প্রেমময় পিতা, তুমি আমাদের হৃদয়ে তোমার প্রেমের মহৎ প্রেরণা প্রদান কর, প্রাণে শুভবুদ্ধি জাগাও, আমরা তোমার প্রেমে মণ্ডিত হইয়া উন্নততর ও প্রশস্ততর জীবন যাপন করি—অপরের জন্য ভাবিতে শিখিয়া ও সমাজের সেবা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। তোমার প্রেমের রাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার শুভ ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক।

## নিবেদন।

**সেখানেও তুমি**—আমি এই যে সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস কচ্ছি, বন্ধু বান্ধবে পরিবেষ্টিত হ'য়ে আছি, এখানে তুমি সঙ্গে রয়েছ; আবার যখন জীর্ণ কুটিরে বাস করি, আত্মীয় বন্ধু কেহ কাছে থাকে না, অন্নাভাবে কষ্ট পেতে হয়, তখনও তুমি সঙ্গে থাক। আজ এই মুক্ত আকাশতলে বেড়াচ্ছি, কত কথা বল্‌ছি, কত কাজ কচ্ছি, কত জনের সঙ্গলাভের আনন্দ সম্ভোগ কচ্ছি, এখানে তুমিই সঙ্গে রয়েছ; আবার যদি স্বাধীন ভাবে চলা ফিরা বন্ধ হয়, নির্জ্জন কারাকক্ষে একাকী দিনের পর দিন কাটাতে হয়, একটি লোকের সঙ্গে প্রাণ খু'লে কথা বল্‌বার সুযোগও না মিলে, সেখানেও তুমিই সঙ্গে থাক্‌বে। আজ ইহ-লোকে আছি—কত আনন্দ, কত বন্ধুসমাগম, কত সুখসম্ভোগ—এখানে তুমিই সঙ্গে আছ। যখন শোক আস্‌বে, প্রিয়জন চ'লে যাবে, অথবা যখন আমারই কাছে মৃত্যুর দূত আস্‌বে, ঐ লোকে যাব, তখনও সেখানেও তুমিই সঙ্গে থাক্‌বে। আমার সুস্থতায় তুমি সঙ্গী, রোগশয্যায়ও তুমিই সঙ্গী। আমার সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই, তুমি সঙ্গে আছ—আমার দিকে স্নেহ-দৃষ্টিতে চেয়ে আছ, আমাকে ভালবাস্‌ছ। তাই আমার সর্ব্বত্রই স্বর্গধাম। তুমি যেখানে, সেই ত স্বর্গ। ইহাতেই আমার আশা, আনন্দ ও বল।

---

**প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ**—পরোক্ষ ভাবে আমরা ত কত জ্ঞানই লাভ করি, তাতে যে উপকার হয় না, তা নয়; কিন্তু তাতে প্রাণে তৃপ্তি আসে না। প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ না হ'লে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না। জল কিসে হয়—অম্লজান ও জলজানে জল হয়—ইহা জান্‌লেই কি পিপাসা দূর হয়? ইংলণ্ড আমেরিকার বিবরণ পাঠ কর্‌লেই কি ঐ সব স্থানে যাওয়ার

আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয়? [illegible] করা চাই; ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে যাওয়া চাই। ভগবানের স্বরূপব্যাখ্যা শুনলে, প্রেমের মহিমা শুনলে, ত্যাগের মহিমা শুনলে, তাতে, প্রাণের তৃপ্তি আসে না; ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করা চাই, প্রেম প্রাণে লাভ করা চাই, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া চাই। ভাল কথা শোনাতে উপকার আছে; কিন্তু তাহা উপলব্ধি করতে না পারলে প্রাণে শান্তি আসে না। পরোক্ষ জ্ঞানে তৃপ্ত থে'কো না, প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করবার জন্য সাধনে নিযুক্ত হও।

**আদরে ও উপেক্ষায়**—তিনি আমার প্রভু, আমার জীবনস্বামী; তিনি আমাকে যে ভাবে রাখেন, যে অবস্থায় ফেলেন, তাতেই আমার আনন্দ। তাঁরই নামে আমি প্রেম বিলিয়ে যাব, তাঁরই আদেশে কল্যাণ ক'রে যাব। তোমরা আমাকে যদি আদর কর, তোমাদের বক্ষে ধারণ করব, তোমাদের কল্যাণচিন্তা ও কল্যাণচেষ্টা করব। তোমরা যদি আমাকে ঠেলে ফেলে দাও, অনাদর ও উপেক্ষা দেখাও, তবুও তোমাদের হৃদয়ে টেনে নিব, চির দিন তোমাদের কল্যাণচিন্তা ও কল্যাণচেষ্টা করব। এ জীবন যে তাঁরই হাতে দিয়েছি—আমার সুখও নাই, দুঃখও নাই; আমি কেবল প্রেমই বিলাব, আমি কেবল কল্যাণই করব। আজ তুমি আমাকে উপেক্ষা দেখালে; তাতে কি? তবুও তুমি আমার প্রিয়—তুমি আজ আমার আরও নিকটে এলে। আজ তুমি আমাকে ব্যথা দিলে, তাতে কি? তবুও তুমি আমার প্রিয়, আমি তোমাকে বক্ষে ধারণ করব। প্রভু আমাকে ব'লে দিয়েছেন, সকলকেই ভালবাস, সকলেরই কল্যাণ কর, সকলের অবহেলা ও তাচ্ছিল্য আনন্দে গ্রহণ কর।

## সম্পাদকীয়

**সামাজিক জীবন**—কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মবন্ধুসভার একটি অধিবেশনে, শ্রীযুক্তা কামিনী রায় ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক-জীবন সম্বন্ধে একটি অতি চিন্তাপূর্ণ কল্যাণকর আলোচনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের কথা পরিত্যাগ করিয়া, বিশেষভাবে সামাজিকজীবনের কথাই উত্থাপন করিয়াছিলেন—যদিও প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে আধ্যাত্মিক জীবনের বা সামাজিক উপাসনার বিষয়ও একটু উল্লেখ করিতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় একটা ধর্ম্মমণ্ডলীর সামাজিক জীবন উহার আধ্যাত্মিক জীবনেরই অন্তর্গত—প্রকৃত পক্ষে উহার সর্ব্বগ্রাসী ধর্ম্মজীবনের বাহিরে কিছুই নাই, কিছুই থাকিতে পারে না। বিশেষ কতকগুলি কাজ ধর্ম্মজীবনের অন্তর্গত, আর সমস্ত উহার বাহিরে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কখনও এরূপ শিক্ষা প্রদান করে না—উহা সম্পূর্ণরূপেই উহার প্রকৃতির বিরোধী শিক্ষা। তথাপি ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার যোগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বিশেষভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ ও সম্বন্ধের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে, এবং তাহার একটা প্রয়োজনীয়তাও আছে। মিসেস্ রায় বিশেষভাবে তাহা অনুভব করিয়াছেন, এবং গভীররূপে সে বিষয়ে চিন্তাও করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের গৌরবময় কঠোর সংগ্রামপূর্ণ ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতাবশতঃই হউক, কিংবা অত্যধিক ব্যক্তিত্ব ও ভ্রান্ত [illegible]র বশবর্ত্তী হইয়াই হউক, অথবা অন্যান্য যে সকল কারণেই হউক, আজ কাল অধিকাংশ তরুণ তরুণীগণ যে সমাজের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধবিরহিত নিতান্ত উদাসীন হইয়াই বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া তিনি বিশেষ শঙ্কিত হইয়াছেন। ইহা যে অতীব সত্য এবং সমাজের ও তাহাদের নিজেদের পক্ষে নিতান্ত অকল্যাণকর, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সমাজের বর্ত্তমান সুখ সুবিধা ও মুক্ত হাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হওয়াতে, তাহাদের অনেকেই জানেও না, অনুভবও করিতে পারে না, কি প্রকার সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ তাহাদের জন্য এরূপ সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছেন,—তাহাদিগকে উন্নতি ও বিকাশের এই প্রকার সুযোগ আনিয়া দিয়াছেন। তাহা জানিলে ও বুঝিলে নিশ্চয়ই উহারা উঁহাদের জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব না করিয়া, এই সমাজকে বিশেষ প্রীতি ও গৌরবের চক্ষে না দেখিয়া, ইহার সেবাতে ও গৌরব-বর্দ্ধনে আপনাদিগকে নিযুক্ত না করিয়া, কিছুতেই উদাসীন থাকিতে পারিত না। এই হেতু তিনি মনে করেন, প্রত্যেক পিতা মাতার, বিশেষ ভাবে প্রত্যেক মাতার, একান্ত কর্ত্তব্য যে শিশুকাল হইতে সন্তানদিগের নিকট পরিবারের ও সমাজের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের কঠোর সংগ্রাম ও অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের ইতিহাস সর্ব্বদা বর্ণন করেন, এবং যে-সকল প্রবীণ ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে বিশেষভাবে শিক্ষা দেন, এবং যত অধিক সম্ভব তাঁহাদের সংস্পর্শে আনিতে সচেষ্ট থাকেন। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে ব্রাহ্মদের জীবনী এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস ও সাহিত্যাদি পাঠ করানও আবশ্যক। এরূপ জীবনের ইতিহাস-মূলক অনেক নূতন গ্রন্থও রচিত হওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অনেকের কথা লিপিবদ্ধই হয় নাই, যাঁহারা সে সকল খবর জানেন তাঁহারাও ক্রমে চলিয়া যাইতেছেন। অনেক অমূল্য ইতিহাস বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া যাইতেছে—কিছু কিছু হয়ত একবারে বিলুপ্তই হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পরনিন্দা পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা অপরের সদ্গুণেরই আলোচনা করিতে হইবে, বয়স্ক কেহ বাড়ী আসিলে শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম ও সমবয়স্ক হইলে প্রীতি ও আদরের সহিত গ্রহণ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে, আদর আপ্যায়নে আনন্দ দিতে ও পাইতে হইবে। এবং এই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে পরস্পর পরস্পরের গৃহে যাতায়াত করিতে হইবে—শুধু বিশেষ অনুষ্ঠান বা প্রয়োজন উপলক্ষে গেলেই যথেষ্ট হইবে না। রোগে শোকে দুঃখ বিপদে যাইয়া সাহায্য ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতে এবং আনন্দ সুখে যোগ প্রদান করিয়া তাহা বর্দ্ধিত ও করিতে হইবেই। ইহাতে যেমন পরস্পরের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, অনেক দুর্ব্বিসহ দুঃখ বিপদের ভার লাঘব হয়, বহু কঠিন কর্ম্মও পরস্পরের সহায়তায় সহজসাধ্য হইয়া যায়, তেমনি নিজের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি বর্দ্ধিত ও

বিকশিত হইয়া জীবনের মহত্ত্বও বহু পরিমাণে সংসাধিত হয়, অশেষ প্রকার আনন্দও লব্ধ হয়। ইহা শুধু সমশ্রেণীর সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না, সকল শ্রেণীর সঙ্গে সমভাবে মিশিতে হইবে। তাহা না হইলে হৃদয় যে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হইয়া যাইবে, উহার বহু শুভময় ফল হইতে যে বঞ্চিত থাকিতে হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মসমাজ সাম্য ও মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষকে মানুষ হইতে দূরে রাখিবার যতপ্রকার অসাম্যের প্রাচীর রচিত হইয়াছিল, যাহাতে তাহার সম্প্রসারণ ও বিকাশকে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, তাহার সমস্তই ব্রাহ্মসমাজ চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অসাম্য ও পার্থক্য এক কথা নয়। সাম্যপ্রতিষ্ঠার জন্য যে সমস্ত পার্থক্য দূর করিবার কোনও প্রয়োজন আছে, সকলকে অর্থে বিত্তে, পদে মানে, বিদ্যাতে বুদ্ধিতে, ধর্ম্মে ও চরিত্রে সম্পূর্ণরূপে এক বা সমান না হইলে চলিবে না, তাহা নহে—পার্থক্য প্রকৃতির নিয়ম, তাহা চিরদিনই থাকিবে, তাহা দূর করা সম্ভবপরও নহে। পার্থক্য ও ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিয়াই পরস্পরের মধ্যে সমভাবে প্রেমের আদান প্রদান চলিবে—সেখানে কোনও প্রকার বাধা থাকিবে না, কোনও ঘৃণা বিদ্বেষ অহঙ্কার অভিমান থাকিবে না, ইহাই সাম্যের মূল কথা। সে আদান প্রদানে বাধা উপস্থিত হইলেই বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়, হৃদয় সঙ্কুচিত হয়, মৃত্যু ঘটে। এক জনে শুধু দিয়া যাইবে অন্য জনে কেবলই পাইবে, এরূপ হইলে চলিবে না। যাহার বেশী আছে সে বেশী দিতে পারে, যাহার কম আছে সে কম দিতে পারে। তথাপি আদান প্রদান চলিতে পারে। জগতে যাবতীয় পদার্থ পরস্পরের মধ্যে তাপ বিকীরণ করে—উষ্ণ বস্তু বেশী তাপ ছাড়ে অল্প গ্রহণ করে, শীতল বস্তু অল্প ছাড়ে বেশী গ্রহণ করে। সর্ব্বত্র সকল বিষয়েই জগতের এই নিয়ম। শুধু জড় জগতে নয়, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতেও এই একই নিয়ম কার্য্য করিতেছে। পার্থক্য সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু তাহাতে আদান প্রদানের কোনও বাধা ঘটে না। ইহাতেই সাম্য পূর্ণভাবে সাধিত ও রক্ষিত হয়। হৃদয়ের রাজ্যে ও সামাজিক জীবনেও এই ভাবেই সাম্য সাধিত ও রক্ষিত হইয়া থাকে। হৃদয়ের শ্রদ্ধা প্রীতি ভালবাসা সকলেরই আছে, সকলকেই দিতে হইবে।

এই পার্থক্যহেতু একটা স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগ উৎপন্ন হয়,—তাহা অনিবার্য্য। তাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মেই অধিকতর আদান প্রদান চলিতে থাকে। তাহারা পরস্পর হইতে যতটা সাহায্য ও সহায়তা, প্রেম ও সহানুভূতি পাইতে পারে, অপরের নিকট হইতে ঠিক ততটা না-ও পাইতে পারে। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যতটা ঘনিষ্ঠতা জন্মে অপরের সঙ্গে ততটা নাও হইতে পারে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে একটা বিশেষ প্রীতির বন্ধন জন্মিতে পারে। বিশেষ হইলেই যে তাহা দূষণীয় ও অনিষ্টকর হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বাস্তবিক, সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, এই প্রীতির বিশেষত্বই পরিবার ও সমাজবন্ধনের মূলে কার্য্য করিতেছে। ইহা না থাকিলে পরিবার ও সমাজ গঠিতই হইতে পারিত না। কিন্তু এই বিশেষ প্রীতি থাকিলেই যে উহা উক্ত ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে, উহা বাহিরে সম্প্রসারিত হইবে না, এমন কোনও কথাই নাই; বরং এরূপ সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকাই অস্বাভাবিক, উহাই প্রেমের প্রকৃতিবিরুদ্ধ—উহা প্রেমের বিকৃতি বা মোহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিশুদ্ধ প্রেমের প্রকৃতিই সম্প্রসারণশীলতা,—যে আপনার পরিবার মণ্ডলী শ্রেণী বা সমাজকে যত অধিকরূপে সত্যভাবে ভালবাসিবে, সে বাহিরের বা দূরের অপর সকলকেও তত বেশী প্রীতি করিবে। যে হৃদয় বিশুদ্ধ প্রেমে পূর্ণ, তাহাতে অপ্রেম বিদ্বেষ ঘৃণার স্থান নাই। একজনকে ভালবাসিতে হইলে যে অপর কাহাকেও ভালবাসিতে হইবে না, বা ভালবাসা যায় না, এরূপ কোনও কথাই নাই। বরং একের প্রতি প্রেম যত গভীর হইবে, অপরের জন্য প্রেমও তত অধিক পরিমাণেই হৃদয়ে সঞ্চিত হইবে। যাহার আছে সেই দিতে পারে, যাহার নাই সে কিছুই দিতে পারে না।

যাহারা উদারতার বশবর্ত্তী হইয়া মনে করে, পরিবার বা সমাজের প্রতি প্রেম থাকিলে অপরের প্রতি, দেশ বা জগতের প্রতি, ভালবাসা লোপ পায় বা খর্ব্ব হয়, তাহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। যে আপনার জনকে—যাহারা নিকটে আছে, যাহাদের কাছ হইতে অশেষ প্রকারের সাহায্য ও সহায়তা পাইয়াছে ও পাইতেছে, যাহাদের নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী, তাহাদিগকে—হৃদয়ে ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে পারে না, ভালবাসিতে পারে না, সে যে দূরের বা বাহিরের লোককে,—যাহার নিকট হইতে সেরূপ বিশেষ কোনও উপকার পাইতেছে না, অথবা তৎপরিবর্ত্তে অপকার বা বিদ্বেষ পাইতেছে, তাহাকে—উদারতার নামে অধিকতররূপে বা তুল্যভাবে ভালবাসিতে পারিবে, এরূপ কোনও সম্ভাবনাই নাই। মূলে প্রেম থাকিলে ত তাহা উদারভাবে বিস্তার লাভ করিবে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, মতের উদারতা আর হৃদয়ের প্রেম এক জিনিষ নয়। অনেক স্থলে উদারতা উদাসীনতারই নামান্তরমাত্র, বাস্তব সত্তাহীন একটা কথার কথা মাত্র। সুতরাং তাহা কোনও ক্রমেই একটা বাঞ্ছনীয় পদার্থ বা অনুসরণের বিষয় নহে। চিন্তা-হীনতা বশতঃই এই শ্রেণীর উদারতাবাদিগণ এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারেন না,—উদারতার নামে নিজ পরিবার মণ্ডলী বা সমাজের সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন, অপরের জন্যও সত্য প্রেম অনুভব করিতে পারেন না। অপর দিকে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিশুদ্ধ প্রেমের সঙ্গে উদারতা অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত, প্রেমের মধ্যে উদারতা না থাকিলে প্রেমই মলিন ও শুষ্ক হইয়া যায়, বিকার-প্রাপ্ত হইয়া মোহে পরিণত হয়। এই হেতু প্রেমকে কোনও প্রকার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা নিতান্তই প্রাণঘাতী। যাহারা অপরের প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার জন্য নিজের বা নিজ ক্ষুদ্র দলের চারিদিকে প্রাচীর রচনা করে, তাহারা যে আপনাদিগকেই প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ করিয়া ফেলে, আপনাদের প্রসারের পথই চিরতরে বন্ধ করিয়া দেয়, আর, অপরের পক্ষে অন্যান্য দিকের পথ যে সম্পূর্ণরূপেই উন্মুক্ত থাকে, অপরের অপেক্ষা নিজেরাই যে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা ভাবিয়া দেখে না। তাই সমাজ-

মধ্যে বর্ত্তমানে এমন এক শ্রেণীর চিন্তাহীন লোক দেখা যাইতেছে, যাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখিতে যাইয়া, যেমন আপনাদের মহা অনিষ্টসাধন করিতেছেন, তেমন সমাজকেও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছেন। আমাদিগকে এই উভয় প্রকার বিপদ পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। শ্রদ্ধা প্রীতি ভালবাসা মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। তাহা হারাইয়া ফেলিলে নিজেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি। এ সম্পদে যাহারা দরিদ্র তাহাদের তুল্য দীন দরিদ্র কৃপার পাত্র আর কেহ নাই।

ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সামাজিক শাসন কখনও সমাজস্থিতির ভিত্তিরূপে এখানে স্বীকৃত বা গৃহীত হয় নাই। মানবহৃদয়ে যে স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেক রহিয়াছে তাহারই উপর ইহাকে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম অপক্ষপাতী বিচারক, অমোঘ শাস্তা, সাম্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা, চিরকল্যাণদাতা সর্ব্বময় কর্ত্তা ও প্রভু আর দ্বিতীয় নাই। কোনও মানবরচিত বিধিব্যবস্থা, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া ত দূরের কথা, ইহার তুল্যও হইতে পারে না। কিন্তু ইহার বিধি ব্যবস্থা শাসন সমস্তই অন্তরে। যদিও ইহাকে চিরকাল এড়াইয়া চলিবার শক্তি কাহারও নাই, তথাপি, বহির্ম্মুখীন মানুষ অনেক সময় অন্তরের দিকে না চাহিয়া, ইহাকে উপেক্ষা করিয়াও পথ চলিতে পারে। যদিও সে-পথ অধিকাংশ সময়ই সুগম ও কল্যাণকর হয় না,—নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া, অনেক ধাক্কা খাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়াই চলিতে হয়,—তথাপি সকল সময় তাহা লক্ষ্য না করিয়া, সে দিকে কোনও প্রকার মনোযোগ না দিয়াও, সে কিছুকাল চলিতে পারে। সে কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা চালিত না হইয়া, আপনাকে কিছু দিনের জন্য প্রবৃত্তির হাতে সম্পূর্ণ রূপে ছাড়িয়া দিতে পারে; এবং এই প্রকারে প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া, বিবেকের শাসন অগ্রাহ্য করিয়া, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের দ্বারা সমাজমধ্যে সাময়িক বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে এবং নিজের ও সমাজের মহা অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। কিন্তু তাহাকে যে এক দিন না এক দিন পরাজিত হইতেই হইবে, কঠোর হইতে কঠোরতর আঘাত পাইয়া, সকল প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ করিয়া, বিবেকের অধীনতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা স্বীকার করিতেই হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং এই ব্যবস্থাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ ও কল্যাণকর, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

মানবীয় বিধি ব্যবস্থার শাসনটা বাহিরে স্পষ্ট দেখা যায়, শরীরে তীব্র ভাবে অনুভব করা যায়, এবং অনেক সময় আশু প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু তাহা মূলে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতিকে সংশোধন করিতে পারে না, সকল সময় স্থায়ী ভাবে ফলপ্রদও হয় না। তথাপি চিন্তাহীন বহির্ম্মুখীন লোকের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার বহিঃপ্রকাশটা উহা অনেক সময় সহজে দমন করিতে পারে, স্বীকার করিতে হইবে। তবুও স্বাধীনতা ব্যতীত যখন মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশ হইতে পারে না—তাহাতে আর পশুতে বিশেষ কোনও পার্থক্য থাকে না,—তখন একটু সাময়িক লাভের জন্য স্বাধীনতাকে কিছুতেই বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। এই জন্য কল্যাণ ও উন্নতি-প্রয়াসী মানবসমাজকে স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিতেই হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে যে অতি গুরুতর মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে, সে কথা কিছুতেই ভুলিলে চলিবে না। এই পার্থক্যটা সকলের সম্মুখে সর্ব্বদা অতি উজ্জ্বল ভাবে ধরিতে হইবে, ইহা সকলকে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে। উচ্ছৃঙ্খলতা সাময়িক সুখের আশা দিয়া যে চিরস্থায়ী আনন্দ ও কল্যাণ হইতে বঞ্চিত করে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহা ভুলিলে যে শুধু সমাজেরই অনিষ্ট ঘটে তাহা নহে, নিজেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট সাধিত হয়, এই কথাটা প্রত্যেকের হৃদয়ে গভীর ভাবে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। সমাজমধ্যে এরূপ জ্ঞানের যে যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্বাধীনতার নামে অনেকে চিন্তাবিহীন ভাবে স্বেচ্ছাচারিতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার পথে যে চলিতেছে, চারি দিকে তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সময়ে সকলের সতর্ক হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক উপাসনাক্ষেত্র যে একটা উচ্চতর ও প্রশস্ততর মিলনের ক্ষেত্র, ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় ধর্ম্মসমাজের পক্ষে সেখানে মিলিত না হইলে, প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মসমাজের সামাজিকজীবন যে যাপন করা হয় না, মিসেস রায় সে সম্বন্ধেও কিছু বলিয়াছিলেন। আমরা সে বিষয়ে আজ আর বিশেষ কোনও আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। অনেকবার সে আলোচনা করা হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে আবার অন্য সময়ে তাহা করা যাইবে। ইহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আমরা বিশেষ ভাবেই অনুভব করিয়া থাকি।

মানবহৃদয়ে, বিশেষতঃ তরুণ তরুণীদের প্রাণে, যে স্বাভাবিক আনন্দস্পৃহা ও আমোদপ্রমোদের প্রতি অনুরাগ আছে, তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য যাহাতে তাহারা বাহিরে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে গৃহে ও সমাজে নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিষয়েও মিসেস রায় অনেক কথা বলেন। ইহার বিশেষ আবশ্যকতা লইয়া কোনও মতভেদ হইতে পারে না। তবে, তাহাই যে জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য নহে, মহত্তর লক্ষ্যকে উচ্চতর স্থান প্রদান করিয়া উহাকে যে অনেকটা সংযমের বাঁধে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, নতুবা জীবন লঘু হইয়া যাইতে পারে, নানা অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে, আলোচনার মধ্যে সে দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল। এ বিষয়েও কোনও মতভেদ থাকিতে পারে না। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার কোনও প্রয়োজন দেখিতেছি না। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের এই অভাবের জন্য উক্ত উদ্দেশ্যে বাহিরে যাওয়াতে এবং আমোদ প্রমোদের মধ্যে সম্যক্ সংযমের বাঁধ রক্ষিত না হওয়াতে যে গুরুতর অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই—সে-কথা সকলেই বিশেষ রূপে অবগত আছি। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের উপযুক্ত কার্য্যকর উপায় অবলম্বন করা একান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

এক দিকে নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করিতে হইবে, অপর দিকে যাহাতে উহা সীমার বাহিরে যাইয়া জীবনকে লঘু মলিন ও পরিণামে দুঃখময় না করিয়া ফেলে, তাহারও যথোচিত উপায় করিতে হইবে।

ধর্ম্ম ব্যতীত অপর উদ্দেশ্য লইয়া অনেকে সমাজমধ্যে প্রবেশ করাতে সামাজিক প্রশ্ন যে বিশেষ জটিল হইয়া পড়িয়াছে, সে কথারও উল্লেখ হইয়াছিল—বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় নাই। আমরাও অন্য সময় তাহার আলোচনা করিয়াছি বলিয়া আজ কিছু বলিলাম না। সামাজিকজীবন সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথাই চিন্তা করিবার আছে। সকলে এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করিলে এবং সে চিন্তার ফল সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিলে বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। আমরা সকলকে সে-অনুরোধ জানাইতেছি। এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবার আর সময় নাই, ইহার মধ্যেই অনেক গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে।

## ধ্যানের পথই একমাত্র পথ।

"There is," says Law, "but one salvation for all mankind, and that is the Life of God in the soul. God has but one design or intent towards all mankind, and that is to introduce or generate His own Life, Light and Spirit in them. There is but one possible way for Man to attain this salvation or Life of God in the soul. There is not one for the Jew, another for a Christian, and a third for the Heathen. No, God is one, human nature is one, salvation is one."

"Christian growth" (I should say all religious growth.*), says a writer on mysticism, "is a movement towards the attainment of this Life of Reality; this spiritual consciousness. It is a phase of the cosmic struggle of spirit with recalcitrant matter, of mind with the conditions that hem it in. More abundant life, said the great mystic of the Fourth Gospel, is its goal."

ভাবার্থ:—আচার্য্য "ল" বলিতেছেন, সকল মানবের জন্য একই মুক্তি বিহিত হইয়াছে—তাহা হচ্ছে মানবাত্মার মধ্যে ঐশ জীবনের স্ফূরণ। সকল মানবের সম্বন্ধেই ঈশ্বরের একটিমাত্র পরিণতি বা ইচ্ছাই রহিয়াছে—তাহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যে তিনি তাঁহার নিজের জীবন, আলোক ও আত্মভাব উৎপন্ন বা সঞ্চারিত করিবেন। আত্মায় ঐশজীবনপ্রকাশরূপ এই মুক্তি-লাভের একটিমাত্র পথই সম্ভব। ইহুদীর জন্য এক পথ, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর জন্য অন্য পথ এবং জড়োপাসকের জন্য একটা তৃতীয় পথ, এরূপ নহে। ঈশ্বর এক, মানবপ্রকৃতিও এক, মানবের মুক্তিও এক।

অন্তরঙ্গ সাধনের কোন প্রবক্তা বলিয়াছেন, খৃষ্ট-ধর্ম্ম সাধকের আন্তর বিকাশটি (আমি বলি, সকল ধর্ম্মপ্রাণ সাধকের আন্তর বিকাশই) আপনার মধ্যে উদ্ভিখিত সত্যস্বরূপ ঐশজীবনলাভের জন্য আত্মার অবিরাম গতি বই আর কিছু নয়। উহা সাধকের একটি অখণ্ড আত্মিক অনুভূতিধারায় পর্য্যবসিত। ধর্ম্মজীবনের বিকাশ সেই চিরন্তন সংগ্রামেরই অন্যতম দিক, যাহা সৃষ্টিমূলে আত্মার সহিত বিদ্রোহী জড়ের সংগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা যাহা মনের সঙ্গে তদীয় বহুবিধ উপাধির, যাহারা তাহার অপরিহার্য্য আবরণ রূপে, অবাধিত প্রসারণের বাধারূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। রহস্যপূর্ণ সত্যদ্রষ্টা ঋষি চতুর্থ গস্পেলের প্রবক্তা বলিয়াছেন, অধিক হইতে অধিকতর জীবনপ্রাচুর্য্যই আত্মার পরিণতি।

জাতি বর্ণ ও সম্প্রদায়নিরপেক্ষ যে ধর্ম্মজীবনের সংজ্ঞা উপরে দেওয়া হইল, উহাই ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত। এই যে আত্মার পরমাত্মাভিমুখীন গতি তাহা কিসে সম্ভব হয়? তাহা সম্ভবপর হয় তখনই বা সেই অবস্থায়ই, যখন বা যে অবস্থায় আত্মা পরমাত্মার সমপ্রতিষ্ঠালাভে সচেষ্ট হন, পরমাত্মার সঙ্গে এক দিক্‌বলয়ে আরোহণ করেন। আমরা জাগতিক ব্যাপারেও দেখি যে, যদি আমরা কোন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে একপ্রাণ বা সমদৃষ্টি হইতে ইচ্ছুক হই, তাহা হইলে আমাদিগকে তাহার সঙ্গে এক দিক্‌বলয়ে উঠ্‌তে হয়। দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমার ভাবটি ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করি। বহুদিন পূর্ব্বে লোকান্তরপ্রাপ্ত কবি নবীনচন্দ্রের সঙ্গে একদিন আমি দেখা করিতে যাই। আমার সঙ্গে আমার এক জন কবি ও সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় বন্ধুও যান। প্রকৃত প্রস্তাবে আমিই আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর অনুগমন করি, কেননা আমার বয়স তখন খুব কম, মাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়াছি এবং আমার কাব্য ও সাহিত্যচর্চ্চা কোন দিনই ছিল না। পক্ষান্তরে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর উভয়ই ছিল এবং তিনি আমার তুলনায় বয়সে ও জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমি কবির 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' এই গ্রন্থ তিনখানি পড়িয়াছিলাম ও বিশেষ করিয়া 'প্রভাস' বহুবার পাঠ করিয়াছিলাম। কারণ, ঐ গ্রন্থের শেষের অধ্যায়গুলি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল; জীবনের মহত্ত্বকে ভুলিয়া, ঈশ্বরবিমুখীন হইয়া ভোগবিলাসে রত ও ঈর্ষা ও আত্মকলহে ধ্বংসাভিমুখী যদুবংশের বর্ণনা, প্রলয়প্লাবনে প্রভাসতীর্থে লক্ষ লক্ষ নরনারীর আর্ত্তনাদ অনুতাপ ও মরণকালের কাতর প্রার্থনা, ইত্যাদি কবির ভাষায় সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির যে ভাবোচ্ছ্বাসমূলে সেই বর্ণনা বাহির হইয়াছিল তাহা যেন পড়িতে পড়িতে আমার মনেও উৎসারিত হইয়াছিল। সেই স্মৃতিটুকু লইয়া আমি কবির সমীপে উপস্থিত হইলাম। প্রারম্ভিক অভি-

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে, ১৮ই মে ১৯৩০ সায়ংকালীন উপাসনায়, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক বিবৃত।

*The expression within parenthesis is mine.

বাদনের পর, কবির সঙ্গে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুর সঙ্গে দুই একটি কথা মাঝে মাঝে হইতে লাগিল। আমি প্রারম্ভজীবনসুলভ লজ্জায় কিছু বলিতেছিলাম না; শুধু তাঁহাদের আলাপ শুনিতেছিলাম। অবশেষে কয়েকটি মামুলি কথা বলার পর আলাপ বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া, আমি কবির 'প্রভাসের' উক্ত বর্ণনার কথা উত্থাপন করিলাম। সেই প্রসঙ্গে উৎসের চাপা মুখ যেন খুলিয়া গেল। মৃত্যুকালে মানবের ভগবদেকশরণতার মুহূর্ত্তে যে সর্ব্ব গর্ব্ব ও কাঠিন্যহারী সন্তাপহর হরিনাম হৃদয় হইতে স্বভাবতঃ উত্থিত হয়, তাহা যদুবংশের ধ্বংসবর্ণনায় কেমন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা কিছু বলিলাম। কবির হৃদয়ের আবরণ খুলিয়া গেল—তিনি সেই বর্ণনার হয়ত কোন কোন অংশও তখন আবৃত্তি করিলেন। এবং তাঁহার সেই ভাবমূলের প্রেরণা কি ছিল, তাহাও কিছু কিছু উচ্ছ্বসিত ভাষায় বলিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, যে-হরিনাম ধ্বংসোন্মুখী যাদবগণের মরণসমুদ্রে একমাত্র তরণী হইয়া তাহাদিগকে তুলিয়া নিতে অবরোহণ করিয়াছিল, সেই হরিনামই অশিক্ষিত, ঘৃণিত, চির অত্যাচরিত অনার্য্যগণের মধ্যে বিতরিত হইবার জন্য, অকৃতী সন্তানের প্রতি মায়ের সমধিক করুণারূপে, পাণ্ডবকুললক্ষ্মী সুভদ্রার হৃদয়ে, প্রকাশিত হইলেন। আহা, যাহাদের কেহ নাই, যাহাদের মুখে তাকাইবার জন্য বেদ নাই, জ্ঞান নাই, গুরু নাই, দরদী নাই—তাহাদিগকে কোল দিবার জন্য বিশ্বজননীর কি বিগলিত করুণার অবতরণ সেই নারীহৃদয়ে! তখন দেশ কাল পাত্র ভুলিয়া কবি ও আমি উভয়েই সেই ভাবোচ্ছ্বাসমূলে কিছুকালের জন্য বিহার করিতে লাগিলাম, যাহা কবিহৃদয়ে সেই সুন্দর কাব্যের প্রেরণা দিয়াছিল। অনেকটা সময় এই ভাবে কাটিয়া গেল, তার পর আমি ও আমার বন্ধু কবির নিকট হ'তে বিদায় লইয়া আসিলাম আসিবার সময় কবি বলিলেন, "আপনি আমার কাব্যপ্রেরণার মূলে গিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম।" ফিরিবার পথে শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিলেন "ভাগ্যে তুমি ছিলে, নইলে ত কবির সঙ্গে কোন কথাই জমিত না"।

এখানে মূল কথাটা কি? মূল কথাটি এই যে, আমি কবির মনের সেই অবস্থাটিকে আমার মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে-অবস্থাটি তাঁহার কাব্যমূলে ছিল, এবং সেই অবস্থামূলে যে-ভাবটি জাগরিত হইয়াছিল তাহাকে পুনরাস্বাদন করিবার মত করিয়া তাহাকে ধরিয়াছিলাম। আমাদের আংশিক সহ-অনুভূতি হইয়াছিল,—আমরা এক দিক্‌বলয়ে আরোহণ করিয়াছিলাম।

আর একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। আপনারা Miss Slade বা মীরাবাইএর conversionএর কথা অনেকেই জানেন, কি আশ্চর্য্যরূপে এই বিলাসে প্রতিপালিতা মহিলা সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী হইয়া মহাত্মা গান্ধীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। ইনি ব্রিটিশ এড্‌মিরেল্ স্যার্ এড্‌মণ্ড জন্ ওয়ারে স্লেডের কন্যা। ইঁহার পিতা এককালে Anglo-Persian Oil Companyএর Vice-Chairman ছিলেন এবং তাহাতে প্রভূত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এই বালিকা অতুল ধনের অধিকারিণী হইয়া Paris নগরে ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। তথায় তিনি Fanco-Swiss লেখক M. Rollandএর নিকট মহাত্মা গান্ধীর কথা শ্রবণ করেন। বিগত মহাসমরের পর পাশ্চাত্য Industrial civilizationএর বিরুদ্ধে ইউরোপখণ্ডে অনেক চিন্তাশীল লোকের মনেই একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। ধন ও মুক্তিকাঙ্ক্ষা মানুষকে কত বিশ্বব্যাপী গভীর দুঃখে ও অধঃপতনে নিয়া যায়, মানুষ তাহা দেখিয়াছে। মানুষ আপনার স্বরূপকে, আত্মাকে, ভুলিয়াই এই দুঃখ পাইয়াছে। মনীষী Rolland সেই চিন্তাশীল লোকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি মহাত্মার একজন গুণগ্রাহী। বালিকা Sladeএর অন্তরাত্মা এই মানবাত্মার অপমানকারী Industrial civilization ও তার অবশ্যম্ভাবী ও বিশ্বব্যাপী দুঃখ-আনয়নকারী ভোগবিলাস-পরায়ণতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। এমন সময় M. Rollandএর সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। তাঁহার নিকট Miss Slade মহাত্মার আদর্শ ও তাঁহার আড়ম্বর-উপকরণহীন সন্ন্যাসজীবনের কথা শ্রবণ করেন। M. Rolland তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, গান্ধী তাঁহার সমস্ত ধনসম্পদ্ ত্যাগ করিয়া আহাম্মদাবাদ নগরপ্রান্তে তদীয় আশ্রমে আত্ম-স্বরূপ উপলব্ধির জন্য অথবা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন লাভের জন্য ধ্যানে দিন যাপন করিতেছেন—"His constant striving to attain 'self-realisation' or 'the seeing of God' face to face." এতচ্ছ্রবণে এই মহিলার সমগ্র চিত্ত এক নব জাগরণে জাগ্রত হইয়া উঠিল; তাঁহার প্রারম্ভজীবনের তীক্ষ্ণ কল্পনা সহজেই উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "that's a man I would like to meet", এবং আগ্রহের সঙ্গে গান্ধীর সম্বন্ধে যত লিখিত গ্রন্থ সমস্ত পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি অবশেষে মনস্থ করিলেন যে, তিনি মহাত্মার শিষ্য হইবেন—যদি তিনি তাঁহাকে শিষ্যরূপে আশ্রমে গ্রহণ করেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিলেন, তিনি যেন এইরূপ বাতুলতা না করেন। কিন্তু বালিকা দৃঢ়চিত্ত, তিনি মহাত্মাকে চিঠি লিখিয়া তাঁহার মনের ভাব জ্ঞাপন করিলেন। মহাত্মা উত্তর দিলেন, তিনি তাঁহাকে আশ্রমে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত বিলাস-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর আশ্রমবাসীদের মত থাকিতে হইবে। তাঁহাকে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া নগ্নপদে থাকিতে হইবে, নিজের আহার্য্য নিজে রন্ধন করিয়া লইতে হইবে, নিরামিষ ভোজন করিতে হইবে, চরকা-কাটা সুতায় তৈরী একবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতে হইবে, পর্ণকুটিরে কাঁচা মেজেয় চারপায়াতে শয়ন করিতে হইবে,—এক কথায় গান্ধী নিজে যেমন সমস্ত ভোগবিলাস ধন সম্পদ ত্যাগ করিয়া, যোগক্ষেমের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আছেন, তেমনি থাকিতে হইবে, এবং তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাপত্র দিতে হইবে যে, একবার সেই পথ অবলম্বন করিয়া আর কখনও তাহা হইতে বিচলিত হইবেন না। Miss Slade আনন্দের সঙ্গে রাজী হইলেন, এবং ভারতবর্ষে

আসিলেন। মহাত্মা ও আশ্রমবাসিগণ তাঁহাকে আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে এক বৎসরের জন্য শিক্ষানবিশ করিয়া রাখা হইবে স্থির হইল। যদি এক বৎসর পরেও এই জীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক থাকেন, তখন তাঁহাকে আশ্রমের অন্যতম রূপে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করা হইবে। এক বৎসর পর Miss Sladeকে আশ্রমের শিষ্যরূপে গ্রহণ করা হইল এবং তাঁহাকে মীরাবাই নাম দেওয়া হইল। মীরা যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা লাভ করিলেন—আত্মার শান্তি। "Despite the lack of everything to which she had hitherto beeu accustomed, the English girl found at the Ashram the peculiar solace she had sought." আবার প্রমাণ হইল, ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়—ভোগে নয়, উপকরণে নয়। শুধু পুরাকালেই মৈত্রেয়ীর আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তিনি বলিয়াছিলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্য্যাম্', তাহা নহে; এ যুগেও মৈত্রেয়ী—সেই বিশ্ব-মৈত্রেয়ী—নানা জীবনসঙ্ঘাতে জাগ্রত হ'য়ে, আপনার দাবী জানাইতেছেন, আজিও তাঁহার আকুল প্রার্থনায় প্রভাত ও সান্ধ্য গগনে বিশ্রব্ধ উপরতির কান্তি নামিয়া আসিতেছে।

গান্ধী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যদি গান্ধীর সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইতে যাইয়া, তাঁহার সঙ্গে সমভাবাপন্নতা লাভ করিতে যাইয়া, এই নারীর এতখানি গান্ধী-ধ্যানের প্রয়োজন হইল, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে ভগবজ্জীবনপ্রসারলাভের প্রয়াসে কি আমাদের আরো শতগুণ ভগবদ্ধ্যানের প্রয়োজন নাই? ঋষিগণ, ভক্ত জন, নানা ভাষায়, নানা ভাবে, নানা বিধি নিষেধের উপদেশে, নানা রস আনন্দ ও শাশ্বত শান্তির প্রলোভনে, স্নেহকরুণাপ্লাবিত কণ্ঠে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "হে মানব, যদি মুক্তি চাও, সর্ব্ব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি চাও, আপনার ভিতরে চিরনবীন নিখিল রসাত্মক অফুরন্ত জীবন-উৎস পাইতে চাও, তবে তোমার জীবন-ধারাকে ভগবজ্জীবনধারার সমান্তরাল, সমবাহী, করিয়া লও—ভগবানের শিষ্যত্ব লাভের জন্য উমেদার হও। সেই উমেদারিতে, সেই probationary periodএ তোমাকে নিঃসন্দেহরূপে একবারে চিরজীবনের জন্য জানিয়া লইতে হইবে—না, তোমাকে আপনার ভিতরে ডুব দিয়া সাক্ষাৎভাবে দেখিয়া লইতে হইবে—তোমার শাশ্বত চিরন্তন স্বরূপটি, যিনি পরমাত্মার সঙ্গে সহধর্ম্মী। তোমাতে কতকগুলি আকস্মিকতা, foreignness আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে; তুমি যা নও তা তুমি নিজকে ভাবিতেছ; তুমি সেই তোমার কাল্পনিক আমিকে পরিতৃপ্ত করিতে যাইয়া বহুপ্রকার উপকরণ সংগ্রহ ও রক্ষণের জন্য দিনযামিনী ক্ষেপণ করিতেছ, তাহাতে পরমাত্মার সহধর্ম্মী তোমার অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইতেছে না, পরন্তু চির-উপবাসকাতরই থাকিয়া যাইতেছেন।"

ওঁরা কি বলেন নাই?—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
না শান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

এই যে দুশ্চরিত হইতে বিরত হওয়া, শান্ত সমাহিত হওয়া, ইহা recalcitrant matter এর আক্রমণ হইতে আত্মাকে সেই স্তরে নিয়া যাওয়া, যেখানে তার দুঃখদ বাণ পৌছায় না; যে স্তরে আত্মা অন্যমুখনিরপেক্ষ আপনাতে আপনি আপ্তকাম—

"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।"

পাশ্চাত্য জ্ঞানানুশীলনপ্রকরণে একটা প্রকাণ্ড ভুল বা অভাব এই যে, উহাতে অবস্থাজন্যা প্রজ্ঞার প্রতি তেমন ঝোঁক নাই, যেমন এদেশীয় জ্ঞানসাধনপ্রণালীর মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে। অবস্থাজন্যা প্রজ্ঞা ও বৌদ্ধ জ্ঞান—এই দুইজন ভগিনী ও ভাই এর মত সমভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক সাধনে সহায়। একজনকে বাদ দিয়া অপরকে ধরিলে আমরা বঞ্চিত হইব—ঋষিদিগের এই পুনঃ পুনঃ উপদেশ।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
নচ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং-
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ—৩।২।৪)

আত্মনিষ্ঠাজনিত বীর্য্য যাহার নাই, সে এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। ঔদাস্য ও সন্ন্যাসরহিত জ্ঞান দ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। কিন্তু যে জ্ঞানী ব্যক্তি এই সমস্ত উপায়ে, অর্থাৎ বীর্য্য, অপ্রমাদ ও সন্ন্যাসযুক্ত জ্ঞানসহ যত্ন করেন, তাঁহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।

সাধনার মূলধন আমাদের কি? মূলধন পরমাত্মার সঙ্গে আমরা সহ-ধর্ম্মী। এই সহধর্ম্মিত্ব উপলব্ধিই সর্ব্বদেশের ও সর্ব্ব কালের জন্য—যুবক বৃদ্ধ, পুরুষ নারী, সকলের জন্যই সাধন-স্তরের প্রথম সোপান। সাধনার এই সোপান বাদ দিয়া সহজ পন্থা অন্বেষণ করা জীর্ণসংস্কারদ্বারা পতনোন্মুখ সৌধকে রক্ষা করার প্রয়াসতুল্য। ঋষি তাই বলেছেন—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ-
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

(কঠোপনিষৎ ৪।১।১)

ঈশ্বর ইন্দ্রিয়দ্বারসমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন; সেই জন্য মানুষ বিপরীত দিকে অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্তচক্ষু এবং অমৃতত্ব সম্বন্ধে ইচ্ছুক হইয়া প্রত্যক্ আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। প্রত্যকাত্মার levelএ যাওয়াই পরমাত্মার সঙ্গে সহধর্ম্মিত্ব উপলব্ধির সোপানে আরোহণ করা; কারণ, অত্যন্ত বিভিন্ন দুইটি বস্তুর মধ্যে কোন আদান প্রদান, কোন influx বা coalescence, সম্ভব নহে। প্রত্যকাত্মা কি বস্তু? যোগবাশিষ্টে বলা হইয়াছে, বিত্ত হইতে পৃথক্কৃত চেতনই প্রত্যক্ চেতন; ঐ প্রত্যক্ চেতন নির্ম্মলস্বভাব; উহাতে সংকল্প কল্পনা নাই। ঋষিবাক্য প্রমাণ দিতেছে, আবৃত্তচক্ষু হওয়া ভিন্ন অমৃতত্ব লাভের অন্য পথ নাই; কারণ, ধর্ম্মপথের বাধা, সেকালে কি একালে, একই—সেই চিরপুরাতন বাধা, অনাত্মবস্তুর সঙ্গে আত্মার সংগ্রাম, আত্মচৈতন্য সম্বন্ধে তৎপ্রকাশ-

যত্র অন্তঃকরণের বিবিধ মালিন্য—"It is a phase of the cosmic struggle of spirit with the recalcitrant matter, of mind with the conditions that hem it in."

আপনাদিগকে অনুরোধ করি, একবার ভিতরে আত্মপুরে প্রবেশ করিয়া দেখুন, আপনার নিজ নিজ স্বরূপটি কি? সেখানে প্রবেশ করিয়া আমরা কি দেখি? দেখি এই যে, ক্ষুধিত পিপাসিত আমি, সুখদুঃখাভিঘাতে চঞ্চল আমি, পশ্চাত্তাপ ও ভবিষ্যদ্ভাবনার তরঙ্গে উদ্বেলিত আমি, ভয়ে ভীত ও অপমানে অপমানিত আত্মপক্ষসমর্থনে চঞ্চল আমি—ষড়রিপুর প্রলোভনে অপহৃত-চিত্ত আমি—এই আমি আমার স্বরূপ নয়! আমার যে স্বরূপ তাহা এই সব দ্বন্দ্ব হইতে অনেক উপরত—স্বভাবতঃ মুক্ত। আর কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই—এই যে আন্তর স্বরূপাবস্থানজ অনুভূতিটি, ইনিই পরম করুণাময়ী ভগবানের দূতী, আমার পরম স্নেহশীলা জননী, যিনি সর্ব্বপাপ-তাপহর ও নিখিলরসাত্মক ভগবৎসান্নিধ্যপ্রাপক। ইনিই চিন্নদীর সাগরসঙ্গমমোহানা, যেথানে আমার আকুল জীবননদী জীবননাথের চিজ্জলধিতে মিশিয়া শান্ত হন, আপ্তকামতা লাভ করেন। নিরাশ্রয়কাতর মানবশিশু যখন একদৃষ্টিতে আপনার প্রতি আপনি তাকায়, এবং দেখে নিখিল বিশ্বে তাহার আপনার বলতে কেহ নাই, কিছু নাই, তখন কি জানি হয়ত বিশ্বাত্মার চিজ্জলধিতে স্বভাবকরুণার একটি হিল্লোল উত্থিত হয়—সেই তরঙ্গ পূর্ব্বকথিত মোহানার ক্ষীণ বাধাটুকু ভাসাইয়া, প্লাবিত করিয়া, মিলনাকাঙ্ক্ষী বিরহী আত্মাকে কখন চিজ্জলধি আপন বুকে করিয়া তাঁহার সংস্পর্শজনিত অক্ষয় আনন্দ আশ্বাস দিয়া যায়, তাহা প্রত্যক্ চেতন জানিতেও পারে না।

আর অধিক ঋষিবাক্য উদ্ধার করিবার প্রয়োজন নাই। মানুষের অন্তরাত্মার দিকে দৃষ্টিপাত করি। অন্তরাত্মার অসীমের প্রতি কাতর আকর্ষণ চিরন্তন। সেকালে একালে, পুরুষের নারীর, তরুণের বৃদ্ধের—সকলের প্রাণেই তাহা ধ্রুব ও অমোঘ। এই অমোঘ আকর্ষণটিই আমাদের পরম সম্বল ও আমাদিগের প্রত্যেকের ললাটে মুক্তির রাজতিলক দিয়া রাখিয়াছে। আমরা প্রত্যেকে অমৃতধামবাসী, অমৃতধামের যাত্রী—ইহা নিঃসংশয়িতরূপে বুঝিয়া লই। অমৃতধামযাত্রী আমাদের চিন্নদীর পূর্ব্বকথিত মোহানাটি যাহাতে অনাত্মবস্তুর জাল জঞ্জালের স্তূপে ভরিয়া না উঠে, জীবননাথের চিজ্জলধির সঙ্গে মিলনের দুরপণেয় বাধার সৃষ্টি না হয়, সেইজন্য ঋষিগণ পুরাকালে যৌবনপ্রারম্ভেই রিক্ত প্রত্যক্ চৈতন্যের নিভৃত গৃহে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গায়ত্রীমন্ত্রদ্বারা বালকের দ্বিজত্বদানের অনুষ্ঠানটি এইরূপ একটি ব্যবস্থা ছিল। তৎ-সবিতুর্বরেণ্যংভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—এই মহান্ ধ্যানমন্ত্রটি দ্বারা আত্মচৈতন্যের নিভৃতগৃহে লইয়া যাইবার—অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধ দিবার—একটি অতি স্বভাব-সুন্দর নিরাবিল সোপান রচনা করা হইয়াছিল। এযুগে আমাদের এমন কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা নাই। তাই প্রত্যাহার ও ধ্যান আমাদের পক্ষে বড় শক্ত ব্যাপার হইয়া গিয়াছে।

আমাদিগের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগরিত করিবার জন্য বা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমাদের মধ্যে আলোচনাদি চলিতেছে। আমরা চিন্তা করিতেছি, ধ্যান ভিন্ন অন্য পথ কিছু আছে কি না—যদি না থাকে, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ অতি অন্ধকারময়। কিন্তু আমার মনে হয়, এ রাজ্যে নান্যপন্থাঃ বিদ্যতে—আর কোন সহজ পথ, bridle path, নাই। একটি কথা স্মরণ করিতে বলি। যাঁহারা যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পিতৃসমাজ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,তাঁহারা কি দেখিয়া, ব্রাহ্মসমাজের কোন্ সত্যটিদ্বারা সমধিক আকৃষ্ট হইয়া, আসিয়াছেন? তাহা কি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা—worship in Truth and in Spirit—পূর্ব্বতন আচার্য্যদিগের প্রার্থনা ও ধ্যাননিষ্ঠা নয়? যদি তাহাই হয়, তবে আমাদিগের তরুণ-তরুণীদের অন্যরূপ হইবে কেন ভাবিব? মানবচরিত্র, মানবের স্বভাব, কি এই এক শত বৎসরের মধ্যে এমনি বদলাইয়া গিয়াছে? আর একটি কথা, আজকাল অনেকগুলি তরুণ-তরুণী—এমন কি অনেক বৃদ্ধও—ধ্যানের নামে ভয় পান, পাছে তাহাতে স্থবিরতা আনিয়া দেয়। যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজনৈতিক আন্দোলন, সমাজসংস্কার, দশের ও দেশের সেবা, এই সব আজকালকার দিনে প্রতিদিনের ব্যাপার ও চিন্তার বিষয়! এই সব ব্যাপারে তাঁহারা মনে করেন ধ্যানের স্থান নাই। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? জিজ্ঞাসা করি, রাজর্ষি রামমোহন অপেক্ষা কে অধিক সমাজসংস্কারক আছেন, দশের ও দেশের সেবা, রাজনৈতিক উৎকর্ষ অকুতোভয়ে ও বীরের মতন সাধন করিয়াছেন? ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের চেয়ে কে অধিক সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মময় জীবন যাপন করিয়াছেন? মহাত্মা গান্ধীকে কোন্ দেশসৈনিক বা জননায়ক পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন? ধ্যানের ঘরেই সেই ইস্পাতের মতন মন তৈরী হয় যাহা কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্যকে Bulldogএর মতন কামড় দিয়া ধরিতে পারে—যে কামড় হইতে ছিনাইয়া নিতে দুঃখ, নির্য্যাতন, দারিদ্র্য, রাজশক্তি বা কামানের গোলা কেহই সক্ষম হয় না। ধ্যানের গৃহেই সেই বিশ্বমানবের সঙ্গে একাত্মতা লাভ হয়, যাহা মানুষকে ক্ষুদ্র দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী হইতে উত্তোলন করিয়া উদার দৃষ্টি দেয়!

ঈশ্বর করুন, আমরা এই ঋষিগণজুষ্ট ধ্যানের পথ পরিত্যাগ করিয়া শুধু কর্ম্মারণ্যে পথহারা হইয়া আপনাদিগের বিনাশকে আনয়ন না করি। চারিদিকে যে মরণের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেছে, তাহা আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করিয়া দিউক।

## অমর কথা (২০)

Interpretation of Eternity.—অমৃতের ব্যাখ্যা
First meditation—প্রথম ধ্যান
Going into the Father—পিতার বুকেই আনন্দে প্রয়াণ

গড়লে আমায় কে গো তুমি
মাটির পুতুল ক'রে?

তারই মাঝে চিন্তামণি
হাস্‌ল বুকের ঘরে।
ওগো সখা, ধন্য তোমার
অবিনাশী দান,
ছলে ছলে ভবের নাটে
চল্‌ছি গেয়ে গান।
জানি তোমার সত্য পথেই
ছুট্‌ছি দিবা যামি,
তোমার দানে বুক ভ'রেছে,
তোমার মাঝেই আমি।
আত্মযোগে জাগিয়ে দেছ
অসীম মহাযোগ,
প্রেমপুলকে ভরিয়ে দেছ
পুণ্যসুধা-ভোগ।
মরণ কোথা, মৃত্যুমাঝে
অমৃতধাম হাসে,
দ্বন্দ্ব দ্বিধা চ'লে যায়,
আনন্দেতে ভাসে।
প্রেমগরবে উঠ্‌ছে জেগে
ধূলির বেশটী ছাড়ি',
প্রাণ-তুফানে যাচ্‌ছে ভেসে,
দিচ্‌ছে সবে পাড়ি।
মর্‌ব আমি কোথায় বল ?—
তোমার বুকে লীন্,
বুকের ঘরে জাগল্ সুরে,
উঠ্‌ল বেজে বীণ্।
জয়ের ভেরী ঐ রে বাজে,
পরাণ-পাখী ধায়
চিদানন্দ-আকাশেতে,
নামটী গেয়ে যায়।

চতুর্দ্দিকেই মরণধর্ম্মশীল যাত্রাগান। তার মাঝখানে কেমন ক'রে মানুষ তবে উদাসীন বধির হ'য়ে চ'লবে? আশৈশব কেবলই আসা যাওয়ার গান শু'নে চলেছি। চলেছেন প্রিয়ধনেরা বুক খালি ক'রে,—ঘরে ঘরে কেবলই মহাযাত্রার জয়রোল। ভস্মমুঠি বুকে ক'রে চলেছে প্রিয়জন বুকফাটা বিলাপ-গান গেয়ে। তবু এমনই জীবনের মায়া, মানুষ সব ভু'লেই এ সংসারে আনন্দে বাস ক'র্‌তে চায়। অথচ নিমেষে নিমেষে কত আশা-অট্টালিকা ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়, অকালে মৃত্যুমলিন অন্ধকার সমস্ত বিষাদে আচ্ছন্ন করে। কত বিচ্ছেদবেদনা!

কত জন তাই ভাবে, এই দুদিনের জীবন, তবে ঐহিক সুখই প্রাণভ'রে ভোগ ক'রে নিই। মরণসখার আনন্দ-আগমন কে আনন্দে বরণ কোরবে? অথচ এই আনন্দ-আহ্বানের ভিতরই জীবাত্মার তপস্তার বিচিত্র মহিমা। কোথায় পরম কল্যাণ—প্রেয়ে না শ্রেয়ে? চাই যে ধর্ম্মধন, চাই যে আনন্দ-তপস্যা। দুঃখ বেদনার হোমানলের ভিতরই মানুষ যোগাসন পেতেছে, সকল ক্ষতিপীড়িত লাঞ্ছিত মনও ভূমানন্দের সন্ধানে দেব-আশীর্ব্বাদে শান্ত-সমাধি লাভ ক'রতে চেয়েছে।

জীবনপথের আনন্দ-সহায় জনক জননী চ'লে গেলেন। আশা-আনন্দ-প্রতিম-প্রতিমা ভ্রাতা ভগিনী চ'লে গেছেন, দুঃখিনী জননীর একমাত্র বুকের ধন ফুটন্ত ফুল ঝ'রে গেল, সতীর জীবনসর্ব্বস্ব বরণীয় দেবতা চ'লে গেলেন, তবু মৃত্যুর কালস্বরূপের ভিতরই এখনও আনন্দ-স্মৃতিগন্ধ কেন পাগল করে? রক্তাক্ত বক্ষ, ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্ত। কে বলে কালে সব বেদনার উপশম হবে? কই শোকের আগুন নির্ব্বাণ হোল? কই তপ্তবুকে শীতল প্রলেপ? কোথায় শান্তি? ওগো, এ বুক জুড়োবে আর কিসে? তাই কি শান্তি-সুধা নেমে এল? ভগবৎ-প্রেমের এ কি আনন্দ-মহিমা! এ কি বুকজুড়োনো নামানন্দ দুঃখীর সকল দুঃখের অবসান ক'রে দিল!

আনন্দময় বিশ্ব, বেশ ত মানুষ তার আনন্দ-পসরা সাজিয়ে চলে! তবু ক্ষণে ক্ষণে ও কি হৃদয়াকাশ ঘন তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে? কবে অনন্ত সুপ্তির ভিতর নিত্য শান্তি অনুভূতি হবে? ভক্ত-কণ্ঠের মাভৈঃ বাণী কেবলই শুনিয়ে যায়, এস ভূমানন্দ-লোকে, এস প্রাণারাম আত্মারাম শিবলোকে, সকল দুঃখের অবসান হবে, অমৃতের আলো জ্বলে উঠ্‌বে। ভক্তপ্রাণের এ কেমনতর আনন্দ-উদ্বোধন, আনন্দ-তপস্তা, বৈরাগ্যে আনন্দ-প্রয়াণ? সকলই আনন্দময়, ভয় কোথায়? ওঁ নামে পিতার বরাভয়স্বরূপে আত্মনিবেদনেই মহা প্রয়াণ। কি আনন্দে অভয়পদ বুকে ক'রে চলেছেন অভয় যাত্রী। কোথায় মৃত্যু-বিভীষিকা? কল্পনার কুহকঘোরেই কালকরালরূপের ভীষণ স্বরূপ। কোথায় তার সত্য প্রতিষ্ঠা? আমার সাধের খেলা অকালে শেষ হবে? তাই হয়ত ভয়ে আকুল হ'য়ে উঠি; সত্যি কি এ আনন্দ-খেলা ফুরিয়ে যাবে? এই বিশ্বপুরই কি মৃত্যুময়? তবে বিশ্বসভার অন্তরালে কোথায় আমার গম্যস্থল? তবে কি ধ্বংসপথেই ছুটে যাব? অথচ ধরার বুকে ক্ষুদ্র ধূলিকণাও ত বিনাশের পথে ছোটে না—সবই এক থেকে আর একে, নব সত্তার ভিতর, নিত্য নব নব ভাবে ফুটে উঠ্‌ছে। কে জানে এ ধূলিময় দেহের অন্তরালে কি অমৃতময় দেবতনু লাভ হবে? কত কল্পনার ছবি—কখনও বা দেহমুক্ত আত্মার নবস্বরূপচিন্তায় ভয় ও আনন্দে স্তব্ধ হ'য়ে থাকি—কেবলই ভীত চকিত যাত্রী! কেন ভয়? কার বিচিত্র ইঙ্গিতে এ আনন্দবিকসিত ধরণীর বুকে জীবাত্মার আনন্দ-প্রতিষ্ঠা? কেন তবে বৃথা কল্পনা জল্পনায়, ভয় ভাবনায়, আপন দুঃখনিগড় রচনা করি?

কখনও পঞ্চভূতে লীন দেহের চরম পরিণতির কথা, তার গলিত স্খলিত রক্তমাংসল দেহের চরম দশা, মনে হ'য়ে শিহরিত হ'য়ে উঠি। কোথায় আমার জাগ্রত মহিমা? দেহের ঘরেই কি চৈতন্যের পরম সত্তা? তবে দেহের ঘরে থাক্‌তে থাক্‌তেই ত হয়ত আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিচ্যুতি ঘটে। কিন্তু কই সেই সঙ্গে সঙ্গেও আমার চেতনমহিমার সর্ব্বাঙ্গ স্বরূপ বিলোপ হয় না, তখনও পূর্ণ চৈতন্য 'আমি' জাগ্রত।

তবে এ পার্থিব রূপখানি কি? তবে কি ভগ্ন জীর্ণ দেহ

পুরাতন বস্ত্রের মতনই জীবাত্মা পরিত্যাগ ক'রে নবভাবে জেগে উঠ্‌বেন ? প্রতিদিনই ত দেহের ঘরে কত পরিবর্ত্তন—সেজন্য ত কই অভিযোগ করতে বা ভাব্‌তে বসি না ! বিজ্ঞানের বিচিত্র গবেষণায় বৈজ্ঞানিক যখন জীবদেহের অণুপরমাণুর নিত্য নব নব সমষ্টির কথা বলেন, তখন ত ভয়ে চম্‌কে উঠি না ! শৈশবের কোন কিছুই রক্ত মাংস ত আজ আমার যৌবনের রূপমহিমায় প্রতিষ্ঠিত নয়, আবার বার্দ্ধক্যের ভিতরও ত এই তরুণ রূপের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান থাক্‌বে না ! কেমন ক'রে ধীরে ধীরে জীবদেহে এ পরিবর্ত্তন আসে যায় বুঝ্‌তেও ত পারি না ! কোন্ অজানার গোপন খেলা আমার দেহমন্দিরে ? আর, আমিও অজানার বুকের ভিতর নব-নবরূপে ফুটে উঠ্‌ছি ; অথচ চৈতন্য নিত্য, আমি একই স্বরূপে দেহের ঘরে আশৈশব বাস ক'র্‌ছি ! আমরা কি বুঝ্‌তে পারি নিদ্রা জাগরণের সন্ধিক্ষণ ? কেমন ক'রে উন্মিলিত আঁখি নিদ্রার শান্ত অঞ্চলতলে নিমীলিত হ'য়ে যায়, অবাক হই। অমনি ক'রেই সজ্ঞানে কত যাত্রী চলেছেন ! মুহূর্ত্তে চকিতেও কি মৃত্যুর ভিতর নব স্বরূপ লাভ ক'র্‌লেন ! ধীরে ধীরে জীবাত্মা কেমন মুক্তলোকে যাত্রা করেন, কত ভাবে তার প্রকাশ ! আমার মরণবাসরে যে বেদনার প্রকাশ দেখে অধীর হ'য়ে উঠি, সে ত ঐহিক দৈহিক যাতনা। যেই মরণ-সখার কোমল পরশ, অমনি সকল জ্বালার অবসান। আকাশ কুসুমের মত ব্যর্থ কল্পনা জল্পনা মানুষের ! সত্যি ত এই দেহখানি আমার জাগ্রত স্বরূপ নয়,—আত্মচৈতন্য আমি, অমরত্ব তার প্রাণস্বরূপ। তাই জীবাত্মার অনন্তে গতি, অনন্তে স্থিতি। যদি আত্মার এই অনন্ত আশা আকাঙ্ক্ষা মিথ্যা হয়, তবে সকলই মিথ্যা, তবে এ জগৎ মিথ্যা, এ জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড সকলই ভৌতিক কাণ্ড ; হিতাহিত বিবেচনা, বিবেকের প্রাণময়ী বাণী, ধর্ম্ম কর্ম্ম ঈশ্বর সবই বুঝি মিথ্যা !

সেই আদিম যুগে মানবশিশু—জ্ঞান যখন উন্মেষিত হয় নি, যখন সভ্যতার আলোকে জগৎসভা আলোকিত হয় নি, যখন দেশ মহাদেশ বিপুল বাণিজ্যের পণ্যভারে নব নব আবিষ্কারের ভিতর সুসজ্জিত হ'য়ে ওঠে নি, তখনও—সে অপরিস্ফুট কোন দেবতার অস্তিত্ব আর জীবাত্মার অমরত্ব বিশ্বাস ক'রে এসেছে। যুগের ইতিহাসে কত পরিবর্ত্তন, কত রাজ্যের অভ্যুত্থান, কত পরাক্রমশালী নৃপতির প্রচণ্ড প্রতাপ, কত হাহাকার, ধ্বংসাবশেষ, কিন্তু সকল পরিবর্ত্তনের অন্তরালে মানব-ইতিহাসের অপরিবর্ত্তনীয় সত্য বিশ্বাস—জীবাত্মা পরমাত্মার অখণ্ড যোগ, সমগ্র সাধনার সামগ্রী। যখনই সে অস্তিত্বে অবিশ্বাস, যখনই মানুষ আত্মার নশ্বরতা প্রমাণ ক'র্‌তে চেয়েছে—তখনই তাকে সাধারণ মানব-পদবীর নিম্নে, বিকৃত মানব-গোষ্ঠীতে তার স্থান লাভ করতে হ'য়েছে।

কত দার্শনিক এলেন, কত কিছু ব্যাখ্যা দিলেন, তবু অমৃতে প্রাণসমর্পণ, এ কথা মানুষ ভুল্‌তে পার্‌ল না। ভাষা প্রকাশ করতে পার্‌ল না—তবু প্রাণমনে আত্মনিবেদন। আমি আছি, তুমি আছ, আমরা আছি,—আত্মচৈতন্যের ভিতর এই যে চির জাগরণ কে অস্বীকার করি ? এই আত্মচেতনা-মহিমালোকেই সকল জ্ঞানলীলার মর্ম্ম নিহিত, সত্য প্রতিষ্ঠিত। অমৃতের আশ্বাস মানবের মর্ম্মস্থলকে এমনই আশ্বস্ত ক'রেছে যে, দেহের পরপারেও সে কেবলই জেগে থাকৃতে চায়। এই আশ্বাসবাণীই তাকে স্থিরভূমি দান ক'রেছে। তাই ভবিষ্যতের গোপন রহস্যদ্বার খোল্‌বার জন্য মানবপ্রকৃতির অনন্ত অনুসন্ধিৎসা। অমৃতে ভালবাসার ভিতরই পারলৌকিক তত্ত্বের মর্ম্মকথা।

যতই কেন মানুষ বিশ্বজ্ঞানের অধিকারী হউক না, তবু মনে রাখ্‌তে হয়, তার ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জ্ঞান কতটুকুই বা বিশ্বজ্ঞান উপলব্ধি করবে ! বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে কে আমি অণু পরমাণু ? কেমন ক'রে মুক্ত আত্মস্বরূপরহস্য উপলব্ধি করি ? জন্মান্ধ জন যদি আশার বাণী শোনে তার দৃষ্টিশক্তি লাভ হবে, কত কিছু সে আনন্দে কল্পনা করে ! তেমনি জীবাত্মা দেহমুক্ত হ'য়ে নবসত্তা লাভ কোরবে এই আশ্বাসবাণীর ভিতরই, দেহের ঘরে ব'সেই, দেহাতীত শুদ্ধ স্বরূপমহিমা উপলব্ধি করে, আর মরণযবনিকা উধাও হ'য়ে যায় !

দেহমুক্তির অন্তরালে আমার স্বরূপকথা জানেন সৃষ্টি-কর্ত্তা বিধাতা। অমৃতময় দেবতা অমৃতের বাণী ঘোষণা ক'রেছেন—শুদ্ধ নির্ম্মল আত্মা কি অব্যক্ত মঙ্গল আশীষালোকে জেগে উঠ্‌বে, কে জানে ? আবার, পাপীর ক্লান্ত আত্মার কি অনুতাপের অসহ্য বেদন বহন ক'র্‌তে হবে, তাই বা কে জানে ?

তবে এই ত পরম সান্ত্বনা যে, দেহের ঘরে বাস ক'রেই আনন্দের আভাস, দেবতার বরণীয় স্বরূপপ্রকাশ হ'য়েছে। যে প্রেম দিন রজনী রক্ষা করে, যে প্রেম প্রকৃতির বুকে অক্ষয় আনন্দধারা প্রবাহিত ক'রেছে, যে প্রেম আমার রক্তছন্দে বিশ্বের আনন্দের ছন্দ রণিত ক'রেছে, সে প্রেম কি আমায় পরিত্যাগ ক'র্‌বে ? এ কি ক্ষণকালের জন্য ? অনন্ত পূর্ণ মঙ্গল দেবতার ঘরেই আছি, এ ত দুদিনের জন্য নয়, এ অনন্ত কালের আয়োজন।

কেমন ক'রে অমৃতলোকে যাত্রা হবে ? কেমন ক'রে অমৃতের উপলব্ধি হবে ? সীমার ঘরে বাস ক'রে কতটুকু ধারণা করতে পারি ? একমেবাদ্বিতীয়ম্ শিবসুন্দরলোকে জাগ্রত আমি, সে মহিমালোকেই এ জীবনপদ্ম হেসে উঠবে। সীমার ঘরে কালের বিচিত্র প্রবাহের ভিতরই অনন্তের ছবি সতত উদ্ভাসিত। যতই শান্ত হ'য়ে, তন্ময় হ'য়ে, রূপসভার মানুষ রূপের ইতিহাস পাঠ করে, ততই তার জ্ঞানে অমৃতের আশ্বাস-বাণী শুনতে পায়।

বিশ্বাস করি, এ ধরণীর বুকে প্রেমময়ের বুকেই বাস করি। তবে কেন ঐহিক বিদায়ের বেলায় চোখের জল ? তবু চোখের জলেই, অবিনশ্বর প্রেমের আনন্দ-আভাসেই, আমার সকল দুঃখের শান্তি ; অমৃতের জয়ানন্দগানেই আমার সকল আকাঙ্ক্ষার পরম সার্থকতা।

বিশ্বপুরে এ কি অনন্ত পরিচয় ! কোটী কোটী জগৎ ছুটেছে, গ্রহ উপগ্রহ কোটী চন্দ্রতারার নৃত্যলীলা কে সীমা করে, শেষ

করে? অথচ সমস্তই কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত, সমস্ত এক কল্যাণভাবে উদ্বোধিত।

অনন্তবুকে এ জগৎরহস্যই বা কত সামান্য! অসীমের মঙ্গল-সঙ্গীত মানববক্ষবীণায় ঝঙ্কৃত, তাইত দেবতার মহিমা! ফুলটী ফু'ট উঠে, ঝরে যায়; কিন্তু যে প্রাণশক্তি তার মর্ম্মদল বিকসিত করে তুল্‌ল, কোথায় তার বিনষ্টি? বিশ্ববুকে প্রাণময়ে সমস্ত প্রাণসাগরে ভেসে যাচ্ছে। কেমন ক'রে বাষ্প মেঘে পরিণত হলো, আবার মেঘমালা ঘনীভূত হ'য়ে ঝরঝর বারিধারায় নব প্রাণ ধরণীর বুকে জাগিয়ে দিয়ে, যেথানে উৎপত্তি সেথানেই আবার জলবিন্দুতেই পরিণত হলো? জগৎবুকে জীবদেহ অণু-পরমাণুর ভিতর গ'ড়ে ওঠে, আবার অণুপরমাণুতেই গতি!

একি অজানা শক্তির বিচিত্র রহস্যের অন্তরালে সব গ'ড়ে ওঠে, আবার তাতেই পরিণতি! তেমনই জীবাত্মা আত্মচেতনার ভিতর জন্মলাভ করেছে, আত্মসুন্দরেই তার পরমগতি। এ অখণ্ড নিয়ম কে খণ্ডন করে? ধূলির দেহ ধূলিতেই লয়, আর' চির-চৈতন্যময়ী আত্মজ্যোতি জ্যোতির্ম্ময়ের আনন্দ-আলোকেই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে। সত্যি সত্যি কি বুঝি এ কথা? যুগে যুগে ভক্তবুকে এ কথাই সকল কথার ভিতর সার সত্য হ'য়ে প্রকাশিত হোচ্ছে।

অমৃতের আশ্বাসবাণী যখন শুনেছি, তখন প্রিয়জনেরা কেমন ক'রে মরণপথে ছুট্‌বেন? আমিও যাব সে অমৃতনিকেতনে, নিত্য গৃহে। না জানি সে কি আনন্দ—না জানি সে কি আনন্দ-সম্মিলন। তবে কেন আর নিরাশার ক্রন্দন বিলাপ? ওগো, পিতা পরিত্রাতা, যে করুণা এনেছে, রেখেছে, সেই করুণাই একমাত্র ভরসা। শান্ত হও মন, প্রতীক্ষা কর, অভয়পদ বুকে ক'রে ভবসাগর পার হ'য়ে যাব। কোথায়? কত দূর? তবু অমৃতের আশ্বাস আমার সকল কুহেলী মোচন ক'রে অনন্তের পথে আহ্বান ক'রেছে। ধন্য প্রেমময়, তুমি ধন্য! কোথায় মৃত্যু? কোথায় বিরহ?

# ব্রাহ্মসমাজ

**দীক্ষা**—বিগত ১৫ই জুন রাউলপিণ্ডি নগরীতে শ্রীমান দেওয়ানচাঁদ পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ভাই সীতারাম আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে নব দীক্ষিত ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিতেছি। করুণাময় পিতা তাঁহাকে নিত্য বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন

---

**নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা**—রাউলপিণ্ডি নগরীতে একটি নূতন উপাসক-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে এবং লালা ঈশ্বর দাস সমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৩১শে মে কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চাটার্জ্জির পত্নী পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ১০ই জুন তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য ও স্বামী প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সমাজের কাজে ৪৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ১২ই জুন ধুবড়ী নগরীতে পরলোকগতা বামাসুন্দরী সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য এবং পুত্র শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সাধনাশ্রমে ২৲ ও ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ১২ই জুন হাজারীবাগ নগরীতে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ভুগিয়া ৬২ বৎসর বয়সে অতি শান্তভাবে পরলোক-গমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিশুদ্ধ ধর্ম্মজীবন ও গভীর পাণ্ডিত্যের দ্বারা নানারূপে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিশ সহস্র টাকার পুস্তকালয় তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বিগত ২২শে জুন তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী শাস্ত্র পাঠ ও শ্রীমতী বিনোদিনী চৌধুরী জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে মিসেস চৌধুরী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২৫৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ১৫ই জুন কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মিত্রের পুত্রবধূ (শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র মিত্রের পত্নী) বিমলা মিত্র ৬টী সন্তান রাখিয়া হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ১৯শে জুন কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ দত্তের মাতা বসন্তকুমারী দত্ত ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ২৯শে জুন তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ শাস্ত্র পাঠ এবং জ্যেষ্ঠপুত্র জীবনীপাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে পিতামাতার স্মৃতি রক্ষার্থে সন্তানগণ "রামলাল-বসন্তকুমারী ফণ্ড" নামে একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য ৮০০৲ আট শত টাকা এবং নানা স্থানের বিবিধ প্রতিষ্ঠানে ১১৫৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ২০শে জুন বরিশাল নগরীতে পরলোকগত সর্ব্বানন্দ দাস মহাশয়ের পত্নী (শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস প্রভৃতির মাতা) প্রসন্নময়ী দাস ৬৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

---

**দান**—পরলোকগত শ্রীনাথ দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত ১০৲ টাকা ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন। পরলোকগত ললিতমোহন বসুর প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে পত্নী শ্রীমতী সুশীলা বসু প্রচার বিভাগে ১৲, ও দাতব্য বিভাগে ১৲ এবং ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ১৲ ও দাতব্য বিভাগে ১৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রিয় দেব পিতা সত্যপ্রিয় দেবের ৭ম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ৫৲ সাধারণ বিভাগে

৩৲ ও সাধনাশ্রমে ২৲ দান করিয়াছেন। এ সমস্ত দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

**আরোগ্যলাভ**—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সনৎকুমার কঠিন টাইফয়েড রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করাতে বিগত ২২শে জুন বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

**ছাত্রীদের কৃতিত্ব**—বিগত ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম :—

**আই, এ**—প্রথম বিভাগে—মাইরীয়াম ষ্টিফেন, ডরোথী ফেল, কল্যাণী চক্রবর্ত্তী, লালিয়া ষ্টিফেন, এগ্নিস্ রবার্টসন, তারা মজুমদার, ফুলরাণী গুহ, অপরাজিতা ঘোষ, পূর্ণিমা বসাক, ভেরা ক্লার্ক, গ্রেস কার্কপেট্রীক, উষা দাসগুপ্ত, সুপ্রভা দত্ত, পারুলবালা গুপ্ত, শান্তি মিত্র, সরলা ঘোষাল, নলিনীবালা পাল, মেভিস বফোর্ড, বিভা গুপ্ত, কাননবালা বিশ্বাস, মেরী ম্যাক্‌কুলাগ, ইলা রায়চৌধুরী, উষা দাসগুপ্ত, আইরীন খাঁ, কল্যাণী দত্তগুপ্ত, মোয়ায়িদজাদা রোকেয়া কোমার সুলতান, ছায়া বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা দাসগুপ্ত, ইন্দিরা সেনাপতি, প্রমীলাবালা সরকার, অমিয়া চাটার্জ্জি, রমলা পালিত, জগৎশোভা ভট্টাচার্য্য, ছেলী জেকব, প্রফুল্ল সেন, প্রতিভা ব্যানার্জ্জি, ফুলরাণী সেনগুপ্ত, এলা ফোর্টাম, সুধীরা চাটার্জ্জি, স্নেহলতা সাহা, গৌরী নিউগী, সিবিল লেপিজ, রেণু মিত্র, ইলাকণা গুপ্ত। দ্বিতীয় বিভাগে—উমারাণী বর্ম্মণ, অনুপমা বসু, বিমলা বসু, বীণা বিশ্বাস, বনিলী টীমাজ, সুরুচি চট্টোপাধ্যায়, এইচ ভাবু, তাপসী দাস, কালীতারা দাসগুপ্ত, প্রিয়বালা দাসগুপ্ত, সলিলা দাসগুপ্ত, অমিয়া দত্ত মজুমদার, সুষমা দত্ত রায়, শৈলজা দেব, অনিলা দেব সরকার, বীণা ঘোষ, নীহারকণা ঘোষ, প্রেমলতা ঘোষ, সুশমালতা ঘোষ, ইন্দুলেখা গুপ্ত, জ্যোতির্ম্ময়ী গুপ্ত, মেহেরিন্না কনস্টেন্স লক্রা, মার্জ্জরী ম্যাক্‌ডোনেলড, অমিয়া মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, সুলতা মুখোপাধ্যায়, ললিতা পাইন, সুনীতি পাকড়াশী, বেলা রায়, কিরণ রায়, লতিকা রায়, পারুল রায়, সুবর্ণকুমারী রায়, নীরা সরকার, অপর্ণা সেন, অরুণা সেন, অরুন্ধতী সেন, ইন্দুমতি সেন, অমিয়া সেন গুপ্ত, শান্তিলতা সেন গুপ্ত, কুন্দরাণী সিংহ, রেণু সিংহ, সিলভারীন্ সোয়ার। তৃতীয় বিভাগে—এ মার্গারেট পায়ী, নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, সরযূ ফেইথফুল, ভক্তিসুধা ঘোষ।

**আই-এস সি**—প্রথম বিভাগে—ডেফ্‌ণী স্পীচলী, শান্তি রায়, সুধাংশু গুপ্ত, সফী রাজ, র‍্যাকেল ও এম্ ওবেদিয়া।

দ্বিতীয় বিভাগে—লাবণ্যকণা বসু, ফিলিস্ ললিতা বোস, প্রতিভা দাসগুপ্ত, বীণাপাণি গুপ্ত, সরযূ মিত্র, সিরীল ষ্ট।

**টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজ**—নিম্নলিখিত প্রণালীতে টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—

২২শে জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যায় উদ্বোধনসূচক উপাসনা হয়। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা ; সন্ধ্যায় স্থানীয় রমেশ হলে সঙ্গীত ও "ধর্ম্মবিপ্লব" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্ণে বালকবালিকা সম্মিলন। বালকবালিকা সম্মিলনে শ্রীমতী করুণাকুমারী বসু, সুলেখা ও গোপী রায় সঙ্গীত করেন, শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী আমোদজনক গল্প করেন। তৎপরে কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে কার্য্য শেষ হয়। সন্ধ্যায়, স্থানীয় রমেশ হলে সঙ্গীত এবং "সুখ ও শান্তি" বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা ; অপরাহ্ণে সম্পাদকের গৃহে পরিবারের মঙ্গলার্থে প্রার্থনা করা হয়। উপাসনা, বক্তৃতা, প্রার্থনা সকলই শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র করিয়াছেন এবং প্রায় সমস্ত সঙ্গীতই শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী ও কুমারী করুণাকুমারী বসু করিয়াছেন।

**পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ**—বিগত ২৫শে মে, সমাজমন্দিরে রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাস গুপ্তের পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন।



ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ১৫ই আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি এ

Registered No. 65

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৩ম ভাগ
৯ম সংখ্যা।

১লা ভাদ্র, সোমবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১
18th August, 1930.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা।

### পথ চাহি।

কত দিন আর র'ব পথ চাহি'?
দেখার মতন দেখা আজো নাহি!
গৃহ ছাড়ি' পথ-মাঝে
দাঁড়াই প্রভাতে সাঁঝে,
নিশীথে জাগিয়া শুধু নাম গাহি,
সঙ্গিনী প্রতীক্ষা—অশ্রুধারা-বাহী।
কত আঁধার, কত আলো,
হাসায়ে কাঁদায়ে গেলো,
কভু শঙ্ক ভয়ে—বলি "ত্রাহি ত্রাহি"
তবু নাহি সাড়া—কে রাখে উৎসাহী?
দুরন্ত দর্শন-পিয়াসা,
ক্ষীণ ধৈর্য্য, ক্ষুন্ন আশা,
বল কি করিয়া কি লইয়া রহি,—
আমি যে একাকী, কাহারে কি কহি?

হে ধর্ম্মাবহ চিরকল্যাণময় বিশ্ববিধাতা, তুমি তোমার অসীম প্রেমে মানবের নিকট তোমার প্রাণপ্রদ ধর্ম্মের বার্ত্তা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রকাশ করিয়া আসিতেছ। মানুষ তাহাকে বিকৃত ও প্রাণনাশক করিয়া তুলিলে, আবার বিশুদ্ধতর তত্ত্ব প্রকাশ করিতেও কখন ক্লান্ত হও না। তোমার জীবন্ত মঙ্গলবিধাতৃত্ব নিয়তই মানুষকে সকল মোহান্ধকারের মধ্যে পথ দেখাইতেছে, সকল পতনের মধ্যে হাত ধরিয়া তুলিতেছ। আমাদের এই দেশ অতি উন্নত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম পাইয়াও তাহাকে কতই না বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল! তথাপি হে করুণাময় পিতা, তুমি তোমার অপার করুণাতে আমাদের নিকট কি মহান্ ধর্ম্মই না আবার উপস্থিত করিয়াছ! যদিও এই উপলক্ষে আমরা উৎসব করিয়া থাকি, তথাপি আমরা এখনও ইহার মহত্ত্ব, আমাদিগকে যে উচ্চ অধিকার দিয়াছ তাহার সম্যক্ মর্য্যাদা, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহা পারিলে কখনও আমরা তোমার প্রাণপ্রদ উপাসনাবিষয়ে এত উদাসীন থাকিতে পারিতাম না। আমাদের শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও যে তুমি আমাদিগকে সাক্ষাৎ ভাবে তোমার উপাসনা করিবার অধিকার দিয়াছ, তোমার এই দয়ার তুলনা নাই। অথচ সে অমূল্য দানকে কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ না করিয়া হেলায় অগ্রাহ্য করিয়াই চলিয়াছি! হে সর্ব্বদর্শী পিতা, তুমি আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতাই দেখিতেছ। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সকল উদাসীনতা অবহেলা দূর কর এবং সমগ্র মন প্রাণ দিয়া তোমার পবিত্র উপাসনায় নিযুক্ত হইতে আমাদিগকে সমর্থ কর। তোমার মহান্ ধর্ম্ম আমাদের সকল জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠুক। তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

## সম্পাদকীয়

**ভাদ্রোৎসব**—ব্যক্তিগত জীবনেই হউক আর সামাজিক জীবনেই হউক, আমরা সাধারণতঃ নিতান্ত উদাসীন ও চিন্তাবিহীন ভাবে স্রোতে ভাসিয়াই চলি, নিত্য নৈমিত্তিক কাজগুলি যন্ত্রচালিতের ন্যায়ই করিয়া যাই, তাহার মধ্যে উচ্চ লক্ষ্যের বা মহৎ জীবনের বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায় না। একমাত্র বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা অবস্থাতেই একটু ক্ষণিক প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। তাহার অবসানে আবার জড়প্রায় মৃতের ন্যায়ই চলিতে থাকি। তাই একটা স্থায়ী অগ্রসরগতির কোনও লক্ষণই আমাদের মধ্যে দেখা যায় না। এইত দেড় বৎসরব্যাপী শতবার্ষিকী উৎসব হইয়া গেল! দ্বিতীয় শতাব্দীর দুইটি বৎসর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিতে চলিলাম। আমরা কি বলিতে পারি যে, নব শতাব্দীতে আমরা নূতন ভাবে নূতন উৎসাহে জীবনপথে অগ্রসর হইতেছি—

আমাদের জীবনে কি একটা স্থায়ী শক্তি ও পরিবর্ত্তন আসিয়াছে? ধীর গতিতে হইলেও আমরা কি অবিচলিতভাবে প্রধান লক্ষ্যের দিকেই চলিয়াছি, তাহা ভুলিয়া কি অন্য দিকে যাইতেছি না? এই প্রশ্নটা একবার এই সময় গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজস্থাপনের সাম্বৎসরিক সময়ে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং তৎসাধনে আমরা কতটুকু চেষ্টা যত্ন করিতেছি, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা নিশ্চয়ই একটা অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য। দীর্ঘকাল এই দিনের কথা ভুলিয়া থাকিলেও, এখন বহু বৎসর যাবতই আমরা এই উপলক্ষে ভাদ্রোৎসব করিতেছি—এবারও তাহা করিতে যাইতেছি। অন্য সময়ে ভুলিয়া থাকিলেও, স্বভাবতঃই এখন এই সকল চিন্তা আমাদের মনে উদয় হইবার কথা। আর, তাহা না করিলে আমরা সত্য ভাবে উৎসবও করিতে সমর্থ হইব না। আমাদের উৎসব একটা বাহিরের ব্যাপার নহে—উহা সম্পূর্ণরূপেই অন্তরের জিনিস, অন্তরে সত্যভাবে উপভোগ করিতে না পারিলে উহার কোনও মূল্যই থাকে না। সুতরাং যাহাতে সত্য স্থায়ী ফলপ্রদ উৎসব হইতে পারে, তাহার জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে।

১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র (১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট) তারিখে অল্প কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া, একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে, রাজর্ষি রামমোহন যখন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন, তখন তাহা যে নিতান্ত অপূর্ণ অবিকশিত অবস্থায়ই ছিল, এমন কি তিনি যে তাঁহার প্রাণের সমগ্র আদর্শটিকেও বহিরাকার দিতে পারেন নাই, তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সে বীজ যতই ক্ষুদ্র ও অবিকশিত থাকুক না কেন, তাহার মধ্যে যে অনন্ত-সম্ভাবনাময় ক্রমবিকাশশীল সত্য প্রাণ ছিল, জীবনীশক্তি ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি একজন সর্ব্বতোমুখী সংস্কারক ছিলেন। দেশের উন্নতি ও কল্যাণের পথে যত প্রকার বাধা বিঘ্ন ছিল, তাহার সকলগুলিই তিনি সংস্কার করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ সুসংস্কৃত মত প্রচার করিতে তিনি আপনার অর্থ ও শক্তি অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও তিনি সর্ব্বোপরি ধর্ম্মসংস্কারকই ছিলেন। সেই জীবনের উষাকাল হইতে শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি চিরকাল স্বদেশে বিদেশে সর্ব্বত্র বিমল তত্ত্বজ্ঞান প্রচারেই আপনাকে প্রধানভাবে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম-সমাজকে বিশুদ্ধ সুসংস্কৃত ধর্ম্মমতপ্রচারের অথবা বিমল তত্ত্বজ্ঞান-আলোচনার একটি সভা বা সমিতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। সত্যস্বরূপ বিশ্ববিধাতার সাক্ষাৎ আধ্যাত্মিক পূজার জন্য একটি উদার বিশ্বজনীন উপাসকমণ্ডলীরূপেই তিনি উহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তাঁহার বন্ধু বান্ধবদিগকেই লইয়া মণ্ডলীগঠন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু উহাকে শুধু তাঁহাদের অথবা কোনও বিশেষ সম্প্রদায় বা দেশের লোকের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখা বিন্দুপরিমাণেও তাঁহার উদ্দেশ্যের অন্তর্গত ছিল না। উদার বিশ্বজনীন ভাবে সকল দেশ ও সম্প্রদায়ের জন্যই উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বভাবতঃই তাঁহাকে কার্য্যতঃ উপাসনার একটা বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল—এ বিষয়েও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া যাহা তিনি নিজ জীবনে অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাও উপযুক্ত লোকের অভাবে সেখানে প্রচলিত করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু কোনও অপরিবর্ত্তনীয় প্রণালীর সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কোনও প্রকারেই তাহাকে আবদ্ধ রাখেন নাই। যে-দেশের যে-সম্প্রদায়ের যে-কেহ যে-কোন প্রণালীতে সত্য ও ভাবে প্রীতিতে মিলিত হইয়া সত্যস্বরূপ বিশ্ববিধাতার পূজা করিবে, তাহার ব্রাহ্মসমাজের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। সাক্ষাৎ সত্য ব্রহ্মোপাসনাই যে উহার প্রধান—একমাত্র বলিলেও অন্যায় হইবে না—উদ্দেশ্য, উহার প্রাণ, তাহা কথা ও কার্য্যে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মত অনুষ্ঠান প্রভৃতি আর যাহা কিছু সমস্তই ঐ মূল হইতে শাখা প্রশাখা রূপে বহির্গত হইয়াছে ও চিরদিন হইবে, উহার উন্নতি এবং বিকাশও এই মূলকে অবলম্বন করিয়াই চলিবে। সুতরাং ইহা ব্যতীত অপর সমস্ত থাকিলেও উহা প্রাণহীন মৃত কঙ্কাল ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না—তাহা থাকা না থাকা দুই সমান, বরং থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল হইবে। কেননা, অপর প্রাণহীন মৃত বস্তু বা সমাজ যেমন অচিরে পূতিগন্ধময় হইয়া চতুর্দ্দিকে বিষ বিস্তার করে, ইহাও তখন তাহাই করিবে। তখন উহার দ্বারা কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই সাধিত হইবে।

আমরা জানি, এই সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপাসনার তত্ত্ব একদিন এই ভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ ইহাকে অবলম্বন করিয়া উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, ইহাকে সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে তাঁহারা কোনও চেষ্টাই করেন নাই, বরং মিথ্যার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহারা তাহাদিগকে বিপথে চলিবার পথেই সহায়তা করিয়াছেন। তাহার ফলে এই পরম তত্ত্ব এক প্রকার লুপ্ত হইয়াই গেল,—বনে জঙ্গলে গিরিগহ্বরে দুই একজনের মধ্যে আবদ্ধ রহিল—এবং দেশ দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত হইল। কি প্রকার ঘোর অন্ধকার ও অধঃপতনের অবস্থার মধ্যে রাজর্ষি রামমোহন ইহাকে গৃহ পরিবারে সংসারে, সর্ব্ব সাধারণের জন্য, উন্নততর আকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। ইহা অবলম্বনে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে কি সুফল ফলিয়াছে, তাহাও কাহার অজ্ঞাত নাই। অতি অল্প লোকেই ইহাকে সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সংখ্যার তুলনায় তাঁহাদের প্রভাব যে অনেক বেশী দূর পর্য্যন্তই প্রসারলাভ করিয়াছে, এবং বহু গুণে গভীরতর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া সকলকে অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে-কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইহা হইতে সকল দিকেই যে একটা নব জীবনের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা আজ কাল সকলকেই স্বীকার করিতে হইতেছে। সুতরাং ইহার জন্য আমাদের কত গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অথচ আমরা যে অন্তরের অন্তরে সেরূপ সত্য কৃতজ্ঞতা অনুভব

করিতেছি, তাহা কিছুতেই বলিতে পারি না। তাহা করিলে আমরা নিশ্চয়ই ইহাকে আরও দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিতাম, কোনও কারণেই এ বিষয়ে এমন উদাসীন থাকিতে পারিতাম না। আর, ইহা বহগুণে বিস্তার লাভ না করিয়া ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেও আবদ্ধ থাকিতে পারিত না। ইহার বিশেষ কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, ইহা ব্যতীত অন্য উপায়েও প্রকৃত কল্যাণ ও স্থায়ী উন্নতিলাভ করা সম্পূর্ণরূপেই সম্ভবপর, এরূপ অসার কথা আমাদেরই গৃহ পরিবারের পুত্র কন্যাদের মুখেও কদাপি শুনিতে হইত না। যাহা এক সময় বাহিরে ও চারিদিকে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা আর এখন ঘরের কাহাকেও প্রভাবান্বিত করিবার শক্তি রাখে না, এরূপ অবিশ্বাস্য কথা কেহই মানিতে পারে না। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, এরূপ অনুমান করিবার কোনও হেতুই নাই। তাহার শক্তি অক্ষুণ্ণই রহিয়াছে; আমরাই উহাকে সত্যভাবে অবলম্বন করি নাই, এবং তজ্জন্যই উহার কোনও শক্তি আমাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। আমরা জীবন পাইলে অন্যেও নিশ্চয় পাইবে। আমরা উঠিলে অপর সকলে না পারিবে না। আমরা গভীররূপে চিন্তা ও আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখি ত্রুটি কোথায়, আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছি, কোন্ দিকে যাইতেছি, আর কোন্ দিকেই বা আমাদিগকে যাইতে হইবে, প্রকৃত পথ কোন্টা। তাহা করিলে সত্য পথ অবলম্বন করিয়া চলা আর কঠিন হইবে না, এরূপ দুর্গতির মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইবে না। সত্য ব্রহ্মোপাসনাকে ছাড়িয়াই যে আমাদের এই মহা দুর্গতি হইয়াছে, তাহা ব্যতীত ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে উন্নতি ও কল্যাণ লাভের দ্বিতীয় পথ নাই, ইহা গভীররূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে, আর আমরা কিছুতেই এ বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারিব না,—নিশ্চয়ই উহাকে আগ্রহের সহিত অবলম্বন করিব।

আমরা কি শুধু একটা নিয়ম বা প্রথার বশবর্ত্তী হইয়াই উৎসব করি? অথবা তাহার কোনও একটা উপকারিতা আছে মনে করিয়াই তাহাতে প্রবৃত্ত হই? না, উহা আমাদের একটা অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়াই তাহাতে নিযুক্ত হই? উৎসব ত একটা বাহিরের ব্যাপার নয়, একটা আনন্দজনক অনুষ্ঠান-মাত্রও নয়। মৌখিক কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ স্তব স্তুতির দ্বারাও ত আমাদের কর্ত্তব্যপালন হয় না। নানা প্রকারে প্রচুর আনন্দ-লাভ করিলেও, উৎসব সফল হইল বলিয়া আমরা কিছুতেই মনে করিতে পারি না। উৎসবের প্রকৃত অর্থ ঊর্দ্ধে জন্ম। যদি উচ্চতর জীবনে উন্নীত না হইতে পারিলাম, যদি জীবনদেবতার সঙ্গে সত্য ভাবে সাক্ষাৎ রূপে যুক্ত হইয়া প্রকৃত জীবনলাভ না করিতে পারিলাম, জীবনপথে অন্ততঃ এক পা অগ্রসর হইতে সমর্থ না হইলাম, তবে ত কোনও ক্রমেই উৎসব হইল বলা যায় না। প্রাণপ্রদ খাঁটি সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত উৎসব সম্ভোগ তা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং তাহা ছাড়া অপর যে কোন আয়োজনই করি না কেন, সমস্তই বৃথা। উৎসব সফল করিতে হইলে, ইহার জন্যই আমাদের সমস্ত চেষ্টা যত্ন নিয়োগ করিতে হইবে—ইহা যাহাতে সত্য ও প্রাণপ্রদ হয়, তাহার জন্য আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষায়, ব্যাকুল প্রার্থনায়, নিযুক্ত হইতে হইবে। ইহা হইতে আমরা যে অমূল্য সম্পদ্ লাভ করিয়াছি, ইহা করুণাময় পিতার অপার প্রেমের কি অপূর্ব্ব দান, তাহা যদি আমরা একবার একটু স্থিরভাবে চিন্তা করি, তবে আমাদের হৃদয় যে স্বভাবতঃই গভীর কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া যাইবে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের প্রেম ভক্তির উপহার লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত না হইয়া কিছুতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারিব না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর, এরূপ সত্য কৃতজ্ঞতা যে শুধু উচ্ছ্বাসেই পর্য্যবসিত হইতে পারে না, তাহাও অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। সে কৃতজ্ঞতা নিশ্চয়ই জীবনে ফুটিয়া বাহির হইবে, সেই পরম ধনকে বহুমূল্যজ্ঞানে আরও দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিতে আমাদিগকে সমর্থ করিবে—গভীর ভাবে সমগ্র মন-প্রাণের সহিত সাক্ষাৎ উপাসনাসাধনে আমাদিগকে নিযুক্ত করিবে,—তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা না হইলে প্রকৃত উৎসব হইল বলিয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত হইবে না।

আমরা সকলে এই ভাবে উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া এই স্মরণীয় দিনের অপূর্ব্ব গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখি, এবং ইহার অমূল্য দানকে জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়া নিজেরা ধন্য ও কৃতার্থ হই এবং দেশেরও পরম কল্যাণের কারণ হই। করুণাময় পিতা আমাদিগকে সে বুদ্ধি ও বল প্রদান করুন। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক।

* বাণীবন উৎসবে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশের সারাংশ।

## লবণত্ব

"Ye are the salt of the earth; but if the salt have lost his savour wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men."

যিশু খৃষ্ট তাঁর শিষ্যগণকে সম্বোধন ক'রে একবার বলেছিলেন —"তোমরা পৃথিবীর লবণস্বরূপ। কিন্তু লবণ যদি লবণত্ব অর্থাৎ স্বাদ হারায়, তা হ'লে তাকে কি রূপে স্বাদু করা যাবে? লবণের লবণত্ব (স্বাদ) গেলে, সে আর কোনও কাজে লাগে না, তা ফেলে দেবার এবং পদতলে দলনের যোগ্য হয়।"

এখন ভারতময় নূনের কথা—নূন তৈরি, নূন বিক্রি, নূন কেড়ে নেওয়া, নূনের জন্যে জেল, মারামারি, হৈঃ চৈঃ, ভারতময় তুমুল আন্দোলন। ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ ক্ষেপেছে, গবর্ণমেণ্ট ক্ষেপেছে।

সত্যই তো, নূন না হ'লে প্রাণ বাঁচে কি ক'রে? অন্নগ্রহণের উপাদান আর কিছু না থা'ক, একটু নূন চাই; তা না হ'লে কি

কিছু খাওয়া যায়? নূন সব জিনিষের স্বাদ, সব জিনিষের সার নূন না থাকলে কোন বস্তুর স্বাদ থাকে না? নূন বিকৃত হ'লে, কোন বস্তু ঠিক থাকে না। পাথরের মত শক্ত পাকা বাড়ীর সিমেন্টের নূন যদি বিগড়ায়, তাতে নোনা ধরে, শক্ত গাঁথুনিও আল্‌গা হ'য়ে যায়। নূন সকল বস্তুর সার, নূন সকল বস্তুর জীবন ও অন্তরস্থ নূনেই সকল বস্তুর শক্তি স্বাদ ও শোভা।

মানবজীবনের নূন কি? মানবজীবনের শক্তি স্বাদ, শোভা, মহত্ত্ব গৌরব কিসে? ব্রহ্মের সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগে, প্রত্যক্ষ যোগে। জীবন্ত ব্রহ্ম-যোগ মানবজীবনের নূন। এই নূন তৈরি করতে হবে, নিজেরা এই নূন হ'তে হবে, তারই জন্যে ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজ লবণ-গোলা, যেখানে ব্রহ্মযোগে যোগী হ'য়ে মানুষ সতেজ সুস্বাদু ও সুন্দর হবে, এবং জগতে তেজ স্বাদ ও সৌন্দর্য্য ছড়াবে। এরাজ্যে Salt Act (লবণ আইন) নাই, Salt Tax (লবণ কর) নাই, সকলের অবাধ অধিকার। এ রাজ্যের রাজা নূন বিলা'তেই ব্যাকুল। এ রাজ্যের কথা জগতে ঘোষণা করার জন্যই ব্রাহ্মসমাজ।

এ স্বরাজে সকলেই সমস্ত সম্পদের সমান অধিকারী। বিদেশী বর্জ্জন না করলে, নূন তৈরী না করলে, এ স্বরাজে বাস করা যায় না। ব্রাহ্মসমাজ জগতে সেই সত্য স্বরাজপ্রদর্শনের জন্য উদ্ভূত। সে স্বরাজে মানুষের পূর্ণ বিকাশের অবাধ অধিকার পেয়ে মানুষ ধন্য হয়, মানুষ নিত্য নব জীবন, নব জ্ঞান, নব আনন্দ পায় এবং বিস্তার করে। ব্রাহ্মসমাজ লবণ-গোলা,—ব্রাহ্মগণ জগতের লবণ। স্বদেশী বস্ত্র প'রে এ গোলায় কারবার করতে হয়। লবণ তৈরি অর্থাৎ লবণ হওয়া, এবং লবণ বিলানো—তা কি হ'চ্ছে? আমাদের স্বদেশী বস্ত্র কৈ? আমাদের লবণত্ব কোথায় ঠিক আছে?

ব্রাহ্মসমাজে, ব্রাহ্মগণের গৃহে গৃহে, নূন তৈরীর আন্দোলন এবং বিদেশীবর্জ্জনের জন্য পিকেটিং করা দরকার হয়েছে। ব্রহ্মোপাসনার সময় নাই, ব্রহ্মযোগসাধনে মন নাই, জীবন হ'তে লবণ নিঃশেষপ্রায়; ভক্তি প্রেম পুণ্যের স্বদেশী বস্ত্র দুর্লভ; বিষয়াসক্তি ও স্বার্থপরতার পোষাক প'রে, জগতে হৈঃ চৈঃ করছি, মারামারি করছি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি! যারা জনসমাজের লবণ তারাই যদি লবণত্ব হারায়, তা হ'লে শত হৈঃ চৈঃ আন্দোলনে কি হবে? স্বরাজ স্বরাজ, নূন নূন, স্বদেশী স্বদেশী ব'লে গোলমাল করা এক ব্যাপার, এবং সত্য স্বরাজের অধিবাসী হওয়া, সত্য নূন তৈরি করা, সত্য স্বদেশী বস্ত্র কেনা ও পরা আর এক জিনিষ। ব্রাহ্মগণকে ভাল ক'রে ভেবে দেখতে হবে, তাঁরা গোলমালে "তাল হারিয়ে খোলে ঘা" দিচ্ছেন কি না।

ব্রাহ্মসমাজের একমাত্র কাজ, একমাত্র লক্ষ্য—মানুষকে সত্যস্বরূপের দিকে ফেরানো, সত্য স্বরাজে নিয়ে যাওয়া, তার "স্ব"কে চেনানো দেখানো, নূন হ'তে এবং করতে শেখানো, এবং অন্যায় অবিচার অপ্রেম দলাদলি ও মিথ্যার বিদেশী পণ্য বর্জ্জন ক'রে, ন্যায়-প্রেম-শুভতারূপ স্বদেশী বসন ভূষণে নর নারীকে ভূষিত ক'রে, ব্রহ্মসহবাসের পরমানন্দ দান করা, দুঃখ তাপ অভাব দৈন্য হ'তে মুক্তি দান করা। তা কি আমরা করছি? সেদিকে মন কি আছে? ইহসর্ব্বস্ব বিত্তসর্ব্বস্ব নোনাধরা জীবন নিয়ে, বাহিরের হৈঃ চৈঃ মাত্র সার ক'রে, কি একাজ হয়? ব্রাহ্মগণকে ভগবান বলছেন,—রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ বলছেন—"তোমরা মানবসমাজের লবণ হবে, লবণ বিলাবে, তোমরাই যদি লবণত্ব হারাও, তবে আর যাই কর না কেন তাতে জীবন সার্থক হবে না।" ব্রহ্মযোগ-সাধনবিনা লবণত্ব থাকে না! এবিষয়ে ভগবান আমাদিগকে জাগ্রত করুন।

## অমর কথা (২২)

### অমৃতের ব্যাখ্যা।

### তৃতীয় ধ্যান।

### শান্তি ও পুরস্কার।

ভু'লে যাও পাপ তাপ,
ফেলে দাও দীন সাজ,
থাকুক দুখের গান—
হাসে আজি রুদ্রিরাজ।
মঙ্গল শাসনদণ্ড
যেচে নেবে প্রাণঘরে,
কেন তবে ভয়ে ভয়ে
আঁখি-জল সদা ঝরে?
রুদ্ররূপে আসিবে কি
প্রচণ্ড আঘাতে তুমি?
তবু আমি বুকে নেব
তোমারি চরণ চুমি'।
জয়-ঘণ্টা বেজে ওঠে,
কোথা গেল ফোটা তারা?
তবু বাজে ঘন ঘন
আকুল আনন্দহারা।
ধূলিমুঠি ফেলে দিয়ে,
সমাধি-বুকের 'পরে
কম্পিত আকুল প্রাণ
যেতে চায় নিজ ঘরে।

( ২ )

ঝঞ্ঝার প্রবলবায়ু
ব'য়ে গেল ঘোর স্বরে,
তাহারি হুঙ্কার-সুরে
ডেকে নিল কোন্ বরে?
গরজি' গরজি' ডাকে,
শৈল-বুকে হানা হানি,
তারি বাজে চুপে চুপে
ব'য়ে যায় কানাকানি।

মঙ্গল আসিবে নামি',
তারি তরে এত ঘটা,
শাসন-বিচিত্র-বিধি
তাই হাসে দেব-ছটা।
যে চরণ বুকে ধ'রে
ত্রিদিব উঠিল জাগি',
প্রলয় আসিছে নামি'
তাঁহারি করুণা মাগি'।
ধ্বংসের বিচিত্র গান
বসুধা-জননীবুকে,
তারই মাঝে জাগি আমি,
তাই গেল সব চুকে।
নিয়তি মানিয়া চলে,
গেয়ে যায় গান তার,
অনন্ত সাগরে ছোটে,
নাহি তার পারাবার।

একদিন চকিত নয়নে যখন শোকের ঘনজাল হৃদয়াকাশকে আচ্ছন্ন করে, যখন প্রিয়বিরহী মন আর কিছুতে সান্ত্বনা পায় না, তখন মানবপ্রাণ স্বতঃই অমৃতের জন্য পিয়াসু হ'য়ে ছোটে—তখন একবার সত্যপ্রকাশ অনন্তজীবনরহস্য ভেদ ক'রতে চায়। একবার দেহমুক্ত আত্মার সন্ধান পেতে উদ্গ্রীব হ'য়ে ওঠে। কিন্তু যে হৃদয় স্বতঃই অমৃতপিয়াসু, যথার্থ ই তাঁর অমৃতের পিপাসা অমৃতের সন্ধান। হয়ত আবার কত জন দেহের পরপারে আত্মার নিত্যবসতি কল্পনাও ক'রতে পারেন না, তাই ব্যর্থ সংশয়ে সমস্ত উপহাসে অগ্রাহ্য করেন।

কত জন হয়ত অনন্ত জীবন সম্বন্ধে জান্‌তে চান্, অথচ সংশয় সন্দেহের ভিতরই তার সত্য প্রমাণ ভাল ক'রে পেতে চান; কিন্তু কেমন ক'রে তা সপ্রমাণ হবে? আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান-লব্ধ অনুভূতি কেমন ক'রে সে ইন্দ্রিয়াতীত স্বরূপতত্ত্বের ব্যাখ্যা দেবে? অমরজীবনের শাশ্বত প্রমাণ আত্মজ্ঞানসাপেক্ষ। যে মানুষ দেহমুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে, সে তখনও জান্‌ছে 'আমি আছি, আমি থাক্‌ব', এবং ঠিক সেই আত্মজ্ঞান দেহের ঘরেও জাগ্রত। যেমন ভবিষ্যত আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের ভিতরই অনুমেয়, সেই আনুমানিক তত্ত্বজ্ঞানই সত্যরূপে পরিস্ফুট হয়। যা ভবিষ্যৎ তা যখন জীবনে সত্য হ'য়ে এল, তখন বর্ত্তমানেই তা জেগে উঠ্‌ল।

আত্মজ্ঞানকে কেমন ক'রে প্রমাণ ক'রে, ধ'রে ছুঁয়ে, বোঝান যাবে, দেখান যাবে? 'আমি আছি' এই অস্তিত্বের মর্য্যাদার ভিতরই প্রতি মানুষ চিরজাগ্রত; অথচ এ অনুভূতিকে কে প্রমাণদ্বারা বোঝাবে? অথচ কে আপন অস্তিত্বের অস্বীকার ক'রবে? সবাই জানে 'আমি' ক'রছি, আমি ভাব্‌ছি, আমি দেখ্‌ছি—তেমনি, 'পরমাত্মা আছেন' এ কথাই বা কেমন ক'রে বোঝান হবে? অথচ আত্মদর্পণেই পরমাত্মার বিমল জ্যোতি। তেমনি আমি জীবাত্মা, আমার নিত্য স্বরূপ আত্মজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন্ যুক্তি পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হবে? এ ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞান নয়, এ ত লৌকিক মত নয়! এ ত কোন কিছু বিশ্বাস ক'রে মেনে নেওয়া নয় যে, ইচ্ছামত স্বীকার কর্‌লাম আর অস্বীকার ক'রলাম! এ ত স্বভাবগত আত্মপ্রত্যয়, আত্মজ্ঞানেই প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এ কথা সত্য, এ সহজ জ্ঞান সকল জীবনে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে নি। তাই কত মানুষ পরমাত্মার অস্তিত্ব কি জানে না, আর তাই সে অস্তিত্বে যে জীবাত্মার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, সে কথাও উপলব্ধি ক'রতে পারে না। অসংখ্য মানুষ যেমন স্বাস্থ্য সম্ভোগ করে অথচ স্বাস্থ্য কি তা সে জানে না, তেমনি পরমাত্মায় আত্মার নিত্য জাগরণ, এ জ্ঞান মানুষ বুঝ্‌তে শেখে নি, চিন্তা ক'র্‌তে শেখে নি; তাই পরমাত্মা আর জীবাত্মার নিত্য প্রকাশ উপলব্ধি হয় না। যেমন পীড়িত হ'য়েই মানুষ স্বাস্থ্যের মূল্য বোঝে, তেমনই মন যখন শোকে দুঃখে পীড়িত, তখনই সে ভবিষ্যৎ কুহেলী মোচন ক'রে সত্য ভূমিতে দাঁড়াতে চায়। পরমাত্মাই জীবাত্মার প্রাণ, এই সত্য প্রতিষ্ঠার ভিতরই জীবাত্মার শাশ্বত স্বরূপ বিকশিত; তাই দেহের ঘরে ব'সেই আত্মজ্ঞানে তার নিত্য স্বরূপখানি উপলব্ধি করে। তাই বিশ্বরূপেই দেশকালাতীত সত্য মাধুরীজ্যোতি দর্শন করি, তাইত এ আনন্দ-যোগের আনন্দ-সাধনা।

তবে অসত্য হ'য়ে, ক্ষুদ্র হ'য়ে, দুর্ব্বল মানবহৃদয় সংশয়-দোলায় দোলে যখন, তখনই সংশয়-অন্ধকার। অনেকে হয়ত ভূমা মহানের অখণ্ড শক্তি জড়জগতের কার্য্য-কারণ-শক্তিরূপে ভাব্‌তে পারে, অথচ তাঁকে চৈতন্যময় জ্ঞানময় ইচ্ছাময় প্রেমময় ব'লে বুঝ্‌তে পারে না। হয়ত মানুষ তার চেতনার প্রাণসত্তা অনন্ত চৈতন্যময়ে উপলব্ধি করে, কিন্তু তিনি যে ইচ্ছাময় মহান্ পুরুষ, তাঁর এই বিশেষ স্বরূপ উপলব্ধি ক'রতে পারে না; তাই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনাই হউক, কি মহা মহীয়ান্ ব্যাপারই সম্পন্ন হউক না কেন, সব কিছুর ভিতর সেই এক ইচ্ছাময় শিব সুন্দরের মঙ্গল-জ্যোতিপ্রকাশ তেমন ক'রে ধারণা ক'রতে পারে না।

যাঁরা এমনি ক'রে কার্য্যকারণের ভিতর দিয়ে সমস্ত মেনে যায়, তারা ত বেশ নিশ্চিন্ত। বিশ্বচরাচরে এই কার্য্য আর এই কারণপরম্পরা অনুসন্ধান করে, অথচ এই সংসারে এই আমার সাধু আর এই আমার অসাধু জীবন যদি হয়, তা হোলে ভবিষ্যতে জীবনের ফল ত অবশ্যম্ভাবী, এ কথা বিশ্বাস ক'রতে চায় না কেন?

এমন মুহূর্ত্ত সংশয়বাদীদের জীবনেও আসে, যা তার সকল অবিশ্বাসকে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে দেয়। যখন তার বুকের ধনকে মৃত্যু এসে কেড়ে নিয়ে বুক খালি ক'রে দিয়ে যায়, তখন নাস্তিক সংশয়বাদীর কাছে ত আর কিছু ধর্‌বার ছোঁবার থাকে না,—তখন সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত শূন্যময়, কেবল হাহাকার, কেবল নিরাশা। বিধাতা মানববুকে এত স্নেহ এত প্রেম কেন ঢেলে দিলেন, কেন প্রাণে প্রাণে অনন্ত মিলনের পিপাসা? কেন এক হৃদয়তন্ত্রী অপরের জন্য বেজে ওঠে? এই প্রেমতত্ত্বের ভিতরই জীবাত্মা পরমাত্মার অক্ষয় যোগ সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই মানব-ইতিহাসে মানবজ্ঞানের উষাকাল থেকেই জীবাত্মার অস্তিত্ব

মানুষ নানা ভাবে স্বীকার ক'রে আসছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ভালমন্দের স্বাতন্ত্র অস্তিত্বের ভিতরই মানুষ নরক ও স্বর্গের ছবি কল্পনা ক'রেছে। সকল ধর্ম যুগ যুগান্তর ধ'রে মঙ্গলকেই বরণীয় জ্ঞান ক'রেছে। পরমাত্মার অক্ষয় বুকেই জীবাত্মার প্রাণাধার, অথচ অমরত্ব ব্যতীত পরমাত্মার নিত্য সত্তারই বা কি মূল্য? উভয় উভয়ের যোগে যোগযুক্ত।

তাই এই জগৎসংসারে নানা রহস্যের কার্য্যকারণ বুঝ্তে না পেরে, মানুষ পরজীবনের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রতে চায়। এ জগতের ব্যর্থ সংগ্রাম, ধর্ম্মাধর্ম্মের জয় পরাজয়, সমস্ত ভবিষ্যতের কল্যাণ-বিচারের আশা করে। সকল শাস্ত্র বিধি বেদ পুরাণ একদিন সত্য মঙ্গলের জয় হবেই হবে, সে কথাই প্রচার ক'রেছে। ধ্রুব সত্য ভবিষ্যৎ কল্যাণেই পরিস্ফুট।

এই বিশ্বচরাচরও সেই অনন্তগতির কথা প্রচার করে। এখন যা অন্ধ কুহেলী-আচ্ছন্ন, একদিন তাহাই কত সত্য উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে ওঠে! এই প্রকৃতির বুকে এই নশ্বর সংসারেও, যত কিছু বিধি ব্যবস্থা, যত কিছু নিয়ম, মত, যত কিছু ক্রিয়াকলাপ, যত কিছু অবশ্যম্ভাবী অক্ষয় সত্য দর্শন করি, সমস্তই সেই অনন্ত-গতির কথাই প্রচার করে, সবই দেহমুক্ত আত্মার অমরত্বের কথা ইঙ্গিতে ব'লে যায়। বিশ্বসৃষ্টি, আমাদের সমগ্র জীবনখানি, অনন্তে সুপ্রতিষ্ঠিত,—বিশ্ববুকে সকলই চিরস্থায়ী। আমি থাকি আর না থাকি, সে চিরদিনই থাকবে, তেমনই একদিন যার আত্মপ্রতিষ্ঠা হ'য়েছে সে নিশ্চয়ই আবহমানকাল জেগে থাকবে।

যখনই নিয়মভঙ্গ তখনই ধ্বংসপ্রায়। যা কিছু সুনিয়মিত সকলই কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত। যা কিছু ব্যবস্থা সকলই পূর্ব্বাপর-ঘটনা-নিয়ন্ত্রিত, যা কিছু বিচিত্র রূপ সব নিত্যস্বরূপে জগৎবুকে চিরপ্রতিষ্ঠিত। যদিও ঠিক সূক্ষ্ম ভাবে তার কারণপরম্পরা আমরা ধারণা করিতে পারি না, তবু এ কথা ধ্রুব সত্য যে, এ সংসারে এমন কিছু ঘটনার আয়োজন হবে না, যার প্রাণবীজ আজও বিশ্ববুকে সঞ্চার হয় নি। যা আকস্মিক ঘটনা—রহস্য—মনে করি, তাও অজানার সূক্ষ্ম বিধানেই নিয়ন্ত্রিত; ক্ষুদ্র জ্ঞান মানুষের, তাই তা উপলব্ধি ক'রতে পারে না। ঘটনাপরম্পরা কার্য্যকারণ আমরা উপেক্ষা ক'রে চল্‌তে পারি, কিন্তু বিশ্বকল্যাণ-দাতা একদিন তার অবশ্যম্ভাবী ফলদান ক'রবেনই ক'রবেন। তাই বিচিত্র লীলার ভিতরই কখনও রুদ্ররূপে বজ্রশাসন, কখনও আনন্দ-উপহার, আনন্দ-গৌরবদান।

যদি আমাদের জীবনের অতি সূক্ষ্ম ঘটনাটীকেও বিশ্লেষণ ক'রে বিচার করি, দেখি সবই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ারই এক এক অবশ্যম্ভাবী ফলভোগ। যেমন ভাল কর্ম্মের ভাল ফল, মন্দ কর্ম্মেরও মন্দ ফল। যখন সকল কর্ম্মেই একই নিয়ম লক্ষ্য করি, তখন মনে করি আমার আত্মস্বরূপই কি কেবল এই জ্ঞান-ক্ষেত্রের বহির্ভূত? ধর্ম্ম, যা আমার চেতনময়ী আত্মার প্রাণধর্ম্ম, সে-ই কি কেবল এ নিয়ম থেকে মুক্তি পাবে? চির সত্য চিরজাগ্রত দেবতার সর্ব্বত্র একই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। দেহের ঘরে আমার জ্যোতিসত্তা, তাই তার এই চেতনময়ী লীলা, তাই সে অমৃতের পথে অগ্রসর হ'তে চায়,—এ যে দেবতার দান! তাই ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত সত্য জ্ঞান, পুণ্য লাভ, তাই সে পূর্ণ মঙ্গলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এ কথা কে বিশ্বাস করিবে যে, যিনি হৃদয়ে আত্মোন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগালেন, তিনি কখনও উদ্দেশ্যবিহীন কিছু করেছেন? প্রাণময় সংযম, কঠোর সাধনা, নিত্য আত্মোন্নতিলাভের জন্য প্রাণপাত প্রচেষ্টা, এ সব তবে কি লক্ষ্যহীন? তাই কি উদাসীন ভাবে, দেবভাব লাভ হোল কি না হোল অগ্রাহ্য ক'রে চলে যাব? এ দেবসাধনার কি কোন সার্থকতাই নেই?

ওগো মানুষ! এ অমরত্বসাধনা কি নিরপেক্ষ আয়োজন? আবার যতই কেন আত্মোৎসর্গ করুক না মানুষ, পূর্ণতালাভের পক্ষে ক্ষুদ্র জীবন ত যথেষ্ট নয়। কত সময় ব্যর্থ নষ্ট হয়েছে, হয়ত কত অজ্ঞাত কারণে আমার জরাজীর্ণ দেহ অকালে করাল-কবলে পতিত হোচ্ছে। শক্তিহীন দেহ মন, অথচ এ কি চির-জাগ্রত স্বভাব মানুষের কেবলই তাকে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হবার জন্য আকুল করে!

এ-লোকে অমৃত পূর্ণাঙ্গীন উন্নতিসাধন হ'য়ে ওঠে কই? অসংখ্য মানুষ ত চলেছে বেশ আনন্দেই অধর্ম্মের পথে! চলেছে ত কত মানুষ অসত্য দান প্রতারণার ভিতরই প্রতিদিনের যাত্রা-পথে! এত অগণ্য পশু চলেছে, আত্মার কোন অনুপ্রেরণা নেই; তবু তাদের প্রকৃতিগত ক্ষণিক ভোগের ভিতরই কেমন পরিতৃপ্ত! হায়! হায়! সত্য বটে এই পার্থিব জীবন কোন রকমে ভোগ-সুখে কেটে যায়, ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই; কিন্তু আত্মজগতে কোথায় তার প্রতিষ্ঠা? ধর্ম্ম-জীবন এ লোকের জন্য যদি বল প্রয়োজন নাই, ও-লোকের জন্য না হোলে কি চল্‌বে? অমৃতধামের জন্য ধর্ম্মধনই ত একমাত্র পাথেয়।

এ কথা সত্য, এক দিকে আত্মধর্ম্ম অন্য দিকে সাংসারিকতা ঐহিকতা দৈহিকতা, দুইয়ের গতি বিভিন্নমুখীন। যা হয়ত আত্মার আনন্দ আরাম শান্তি, তা-ই হয়ত দেহজগতে কত দুঃখ-বেদনাকর! এ কথা কি মনে কর্‌তে চাও তবে, যে, একদিন অনন্ত পথে তোমার ক্ষতিপীড়িত বেদনাক্লিষ্ট জীবনের ক্ষতিপূরণ হবে না? হয়ত কত জীবনে এমনও হ'য়েছে বা হ'তে পারে, একটী অসত্য অন্যায় অনুষ্ঠানের ভিতরই কত সংসারের ধন যশ মান হোল! সে কর্ম্মের জন্য হয়ত তার আত্মাপ্রাণী হৃদয়নিভৃতে গোপনে গোপনে লজ্জিত ও শিহরিত হ'য়ে ওঠে। কেন তার বিবেকের ঘরে আত্মদৈন্যের জন্য এ লাঞ্ছনা, এ অবমাননা, এ আত্মতিরস্কার? আবার এমনও কত হয়েছে, আবার হয়ত কত হবে, কত সাধুপ্রাণ কর্ত্তব্যসাধনে কি কঠোর সংগ্রাম ক'রেছেন, দেহের বিন্দু বিন্দু রক্ত দান ক'রেছেন, কত প্রিয়জন কত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন ক'রে দেশের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ ক'রেছেন! কেন অগণ্য মানুষ তার ব্যর্থ অযোগ্য জীবনে পরিতৃপ্ত নয়? কি গোপন রহস্য মানবজ্ঞানের অন্তরালে লুক্কায়িত, সে জন্য ঐহিক জীবনের অতীত আরও কিছু বিশেষ সৌন্দর্য্য লাভ ক'রতে চায়? তোমরা কি বোলতে চাও, মানুষের সাধনলব্ধ উজ্জ্বল চরিত্র, শোভন সুন্দর হৃদয় বৃথাই বিনাশের পথে অবসান হোল? এ যদি কেউ মনে করেন, তবে তাঁর কাছে স্বার্থ-

সাধনই চরমধর্ম্ম, সাধুতা তাঁর কাছে বাতুলের কথা, অমর-রাজ্য তাঁর কাছে অর্থবিহীন। না গো না, তা কখনই হবে না; একজন বিধাতা আছেন। অমরধর্ম্মে, অমরত্বের ভিতরই অবস্থিতি, এই ত দেবধাম। এখানে চির ন্যায়বান বিধাতা আছেন, এখানেই সত্য ও সততার পুরস্কার।

মানবাত্মা স্বীয় ইচ্ছাসাধনার বলে পশুত্বের উপর জয়লাভ করে, সকল প্রলোভন রাগ দ্বেষ লোভ প্রতিহিংসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বাসনা কামনার উর্দ্ধে, সংযত মহান্ মুক্ত জীবন লাভ করে। এই সাধননিষ্ঠাই অমরত্বলাভ। এই অমৃত জীবনই মৃত্যুর-পরপারে আরও সুন্দর পরিণত দেবশক্তি লাভ করে, আর অনন্ত উন্নতির চরম গম্যপথে এগিয়ে যায়। লক্ষপতিই হউন না কেন, এ মহত্ব বা পূর্ণতালাভই আত্মার পরম সার্থকতা, এরই নাম ত স্বর্গ।

আবার, মানুষ হ'য়েও যে দেবশক্তি, দেব-অনুভূতি, দেব-সাধনার প্রভাব অগ্রাহ্য করে, দৈহিকতা ক্ষুদ্রতা মোহ দ্বন্দ্ব জড়তার পথে অগ্রসর হয়, যা তাকে মানবপদবীর নিম্নস্তরে পাশব-জীবন দান করে, যে মানুষ অনবরত বিবেকের মঙ্গলবাণী অগ্রাহ্য করিয়া অন্ধ প্রবৃত্তির দাস হইয়াই চলিয়াছে, মৃত্যুর পরপারে তাকে তেমনি অপরিণত খঞ্জ আতুরের মত শক্তিহীন হইয়াই আধ্যাত্মিক রাজ্যে বাস করিতে হয়। সে নিজেই নিজের দৈন্য আনয়ন করিয়াছে। যেথানে কত মুক্ত আত্মা অব্যক্ত আনন্দ-সম্ভোগের ভিতর গৌববান্বিত, সেখানে ক্ষুদ্র অবনত আত্মার কি শোচনীয় পরিণাম! এই ভীষণ আত্মদৈন্যের নামই ত বিনাশ—এই ত নরক।

নীতিহীন ইন্দ্রিয়াসক্ত পাশবিক জীবনের গর্ব্ব কোথায়? শত শত জনের দুঃখ বেদনা ভু'লে ব্যর্থ অর্থলোলুপ চিত্তের ক্ষণিক সম্ভোগেই তার কি গর্ব্ব! কেমন মানুষকে ফাঁকি দিতে পারি, কেমন অসত্যের পথে কৃতিত্বলাভ করি, কত আমার স্বার্থকলুষিত ধূর্ত্ততা, চাতুরী, কত আবার সেজন্য বাহাদুরি আস্ফালন! আমার আনন্দ-অট্টালিকা গ'ড়ে তুলি, কত আমার শক্তি! হায় মন! এই কি হোল আমার চরম সার্থকতা? আত্মার জয়-গৌরব ভু'লে গেলে? আত্মার বিশ্বভোলা ঔদার্য্য মহত্ত্ব সাধুতা উপলব্ধি করিতে পারিলে না? তবে আর তোমার কাছে অমৃতধামের কথা কেন? তবে আর কেন অমর জীবনের সত্য পুণ্য পুরস্কারের ব্যাখ্যা?

প্রতিদিনের প্রতিষ্ঠার উপরই আগামী দিবসের সত্তা। তেমনই অনন্ত জীবনের ইতিহাসও দৈনিক জীবনের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহলোকে সত্যানন্দলাভই জীবাত্মার পরম সাধনার ধন। এই ত স্বর্গলাভ। কোথায় যাব? গতি কি হবে? শুধু শুধু ব্যর্থ জটিল হিসাব নিকাশের কথা কেন? ইন্দ্রিয়-লুব্ধ মানুষ দৈহিকতারই প্রাধান্য বোঝে, ইন্দ্রিয়াতীত লোকের ধারণা করিতেও তাই দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় অক্ষম। তবুও কে বিধাতার অফুরন্ত দানের সীমা করিতে পারিয়াছে? কেন আর তবে ভবিষ্যৎ নরকভোগের কল্পনা?

আমাদের হিতাহিতবুদ্ধি প্রকৃতিগত সত্তা, এ কথা বেশ বুঝেছে যে তার প্রাণসত্তা এই দেহজগতেই অবসিত নয়। যেমন প্রকৃতিবুকে সকল নিয়মসূত্রে নিয়মিত, তেমনই একদিন যে কোন মুহূর্ত্তে রোগশয্যায় শায়িত হোয়েই হউক, কি সংগ্রাম-সাজেই হউক, প্রাণ-পাখী চকিতে মুক্ত হ'য়ে নব লোকে নব সত্তা লাভ ক'রবে—তারই গুপ্ত কাহিনী এই ঐহিক জীবনখানির উপর নির্ভর ক'রছে।

এ জীবন ত বিধাতার অভিশাপ নয়! আত্মসাধনে আত্মা-লোকে, উন্নত লোকে অগ্রসর হব, এই ত প্রেমময়ের মঙ্গল রহস্য। আমি আমার আকুল কত বিফল স্বপ্নলোকে কত আশার মালা গাঁথি, তাই নিমেষে সব ম্লানিমায় ঢেকে যায়। তবুওত সুধার অফুরন্ত দান! কত ক্ষুদ্রতা জড়তা অপবিত্রতা নিমেষে হোমানলে দগ্ধ হ'য়ে যায়! 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'সত্যমেব জয়তে' বাণীই বুকের ঘরে রণিত হ'য়ে ওঠে। এ কি রহস্য! এ কি ব্যবস্থা!

হে বিধাতা ন্যায়বান ভগবান! এ কি তোমার অফুরন্ত দান! আমার পাপপুণ্যের বিচারপতি! একদিন ত ফলাফল ভোগ করিতেই হইবে। তবে কেন আর ভয়? কেন আর বিনাশের পথে ছুটি? একদিন ত খেলা শেষ হ'য়ে যাবে, বিস্মৃতির অতলতলে ডুবে যাব। তবুত তোমারই আমি। তোমার অজানা রহস্যের ভিতরই আমারও জন্ম মৃত্যুর বিচিত্র গান,—যতই প্রিয়ধনেরা বুক খালি ক'রে চলে যায়, যতই সকলের উপেক্ষা পাই, ভালবাসায় বঞ্চিত হই, কত আশার ঘর ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়, তবুও ত আমার জাগরণ ফুরায় না! বিশ্ববুকে মহাপ্রাণে জেগে আছি, দেহের খেলা ফুরিয়ে আসে, তবুও যে ওগো ক্ষুদ্রাদপি অধম আমি তবুও ত তোমারই।

মৃত্যুর কালো ছায়ায় আমার ধরণীর আনন্দ আলোক খেলা কোথায় ফুরিয়ে যায়; চমকে উঠি। ওগো কোথায় আনন্দ, কোথায় অমৃতধাম, আত্মার আনন্দলোক! ওগো আনন্দ, আমি যে তোমারই, তুমি ভালবাস তাই ত আমার গৌরব! ওগো তুমি যে আমায় চাও গৌরবান্বিত করিতে তোমারই নামে! অথচ আমি অবহেলায়, পার্থিব সুখসম্ভোগের পথে, দেখ আমার নিজ হাতে গড়া আত্মদৈন্য অবসাদ জমিয়ে তুলেছি! দেখ আমার ব্যর্থ ক্ষুদ্র জীবন, তবুও তোমারই বুকে আমার স্থান!

ওগো দয়াময়! তোমার অনন্ত করুণা, তাইত এই শুষ্ক বুকেও আশার মন্দাকিনীধারা উৎসারিত হবে। তাইত আমার বুকেও তোমার পুণ্যপুলকধারা নেমে আস্‌বে, ধন্য হব আমি।

## প্রাপ্ত

### কঃ পন্থা।

১লা শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কঃ পন্থা। সেই পত্রিকাতেই শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-শশী গুপ্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহার শেষে তিনি প্রশ্ন করিতে পারিতেন "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্"। শাস্ত্রীমহাশয়ের কথায়

আমরা তীরে নৌকা বাঁধিয়া দাঁড় টানিতেছি, তাই অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। খবরের কাগজে লেখালেখি করিয়া কোন ফল হয় কি না বিশেষ সন্দেহ। ধর্ম্মসমাজের কাজে ব্যক্তিগত আকর্ষণ ভিন্ন ফল হওয়া কঠিন। তবে মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ হইতেছে, তাহাতে চুপ করিয়া না থাকিয়া সাধারণ ভাবে কিছু আলোচনা করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়।

প্রথম কথা ব্রহ্মকৃপা। তাঁহার কৃপা না হইলে শোক দুঃখ, কঠোর সংগ্রাম প্রভৃতি কশাঘাতের ভিতর দিয়া মানুষের মন তাঁহার দিকে ফিরে না। কৃপা ত সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাহাকে ধরিবার জন্য, সম্ভোগ করিবার জন্য, আমাদের প্রস্তুত এবং উন্মুখীন হওয়া প্রয়োজন। সেই অবস্থা লাভ করা যাহাতে সম্ভব হইতে পারে তাহারই জন্য অনুকূল ধর্ম্মসমাজের ব্যবস্থা।

ধর্ম্মজীবনলাভের প্রয়াসী হইলে, অবান্তর বিষয় লইয়া কলহ করিতে প্রবৃত্তি হয় না, অথচ জীবনে মধুরতা আসিয়া সকলকে শান্ত ভাবে কর্ত্তব্যসাধন করিতে প্রস্তুত করে। ভাল খাদ্য গ্রহণ করিলে যেমন শরীর পুষ্ট বা বলিষ্ঠ হয়, ধর্ম্মান্ন গ্রহণ করিলে দেহ শুদ্ধ সবল, মন শান্ত, বুদ্ধি পরিষ্কৃত, সমগ্র জীবন তেজোময় হয়, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন: আকাশে যে বিদ্যুৎ-রাশি বিদ্যমান তাহা পূর্ব্বে কাহারও জানা ছিল না। কিন্তু এখন মনস্বীগণ বিদ্যুৎকে ধরিয়া কত রকম অদ্ভুত খেলাই খেলিতেছেন, কত ভাবে কত রকমে মানবের কাজে লাগাইতেছেন! আমাদের রক্তমাংসে দুগ্ধ ঘৃতে যেসব উপাদান আছে, তাহা (সালফার, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি) আকাশে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা কয়জনে জানে? কিন্তু বিজ্ঞ রাসায়নিক লেবরেটরিতে বসিয়া লীলাময়ের অদ্ভুত লীলার খেলা দেখিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হন। অন্তর্জগতের শক্তিরাশি আরও কত অদ্ভুত! তাহা দুর্ব্বলকে সবল, তেজহীনকে তেজীয়ান, অশান্তকে শান্ত, নিরানন্দকে আনন্দময় করে। পূর্ব্বে যে ডাকাত ছিল, সে প্রেমময় ভক্তের প্রেমালিঙ্গনে এক মুহূর্ত্তে প্রেমিক সাধু হইয়া গেল, যে দুর্বিনীত উদ্ধত দাম্ভিক ছিল সে একজন দরিদ্রের কথায় শান্ত হইয়া গেল। ইহা কি অদ্ভুত কাণ্ড! মানুষের ভিতরে কি এক মহাশক্তির অংশ রহিয়াছে যাহা একটু সুযোগ পাইলেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে! কিন্তু ইহাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস নাই, তাই মানবসমাজের এই দুর্গতি। সাধনায় সিদ্ধ হইয়া মহাজনেরা বলিয়া গিয়াছেন, মানুষের পক্ষে দেবত্বলাভ করা সম্ভব। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতির দ্বারা নব জীবন লাভ করা যায়।

সাধারণতঃ ধর্ম্মসমাজসমূহের সামাজিক পূজা উপাসনার যে ব্যবস্থা তাহাতে শ্রবণের ব্যবস্থাই অধিক। এই ব্যবস্থাও যথোপযুক্ত নয়, সেইজন্য আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। বরং অনেক সময় অনিষ্টকর হয়। অপ্রস্তুত ব্যক্তিকে জোর করিয়া বেদীতে বসাইয়া দিলে, অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে টানিয়া আনিয়া সংগীতের জন্য বসাইলে কি রূপে উপাসকগণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন? গায়কের প্রাণে ভাব ভক্তি না থাকিলে তিনি কি রূপে উপাসকগণের প্রাণে ভাব ভক্তি জাগাইতে পারেন? ইহাতে ফল বিপরীত হয়, মনের ভাব খারাপ হয়। এইরূপ ব্যবস্থাতে যদি কেহ সামাজিক উপাসনায় উপস্থিত না হন বা বীতশ্রদ্ধ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিন্দা করা যায় না। চেষ্টা করিলে এই ব্যবস্থার নিশ্চয়ই উন্নতি করা যাইতে পারে। মাঘোৎসবের সময় ব্যবস্থা ভাল হয় এবং অনেকে আগ্রহের সঙ্গে তাহাতে যোগ দেন। এই ব্যবস্থা প্রতি সপ্তাহে হইতে পারিবে না কেন? পাশ্চাত্য দেশসমূহে সর্ব্বদা একই রূপ ব্যবস্থা। যখন রবিবারের উপাসনায় ৫০০।৭০০, কোন কোন ভজনালয়ে ৪০০০। ৫০০০ লোক, দণ্ডায়মান হইয়া একস্বরে ভগবানের নাম গান করেন, তখন শরীর রোমাঞ্চিত হয়, প্রাণ অপূর্ব্ব ভাবে পুলকিত হয়, সুবিজ্ঞ আচার্য্যের মুখে প্রতি সপ্তাহে নূতন কিছু শ্রবণ করা যায়। যখন ডাক্তার পি কে রায় মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের রবিবাসরীয় উপাসনার বন্দোবস্তের ভার লইয়াছিলেন, তখন প্রাণস্পর্শী উপদেশ এবং সুমিষ্ট গানের প্রভাবে ব্যাকুল উপাসকগণ মন্দির পূর্ণ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজকে জাগ্রত করিতে হইলে আবার সেইরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ভগবানের নাম কীর্ত্তনে শ্রবণে প্রসঙ্গাদিতে ভাবের উদ্রেক হয়, ধর্ম্মক্ষুধা জাগ্রত হয়, কিন্তু মনন ভিন্ন ব্রহ্মান্ন পরিপাক পায় না, জীবনের দোষ দুর্ব্বলতা—অকৃতজ্ঞতা, নীচতা, স্বার্থপরতা, অহংকার প্রভৃতি—ত্যাগ করিয়া শক্তি লাভ করিবার জন্য সংকল্প দৃঢ় হয় না, এবং ধ্যান ভিন্ন ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করিয়া আনন্দ-রাজ্যের অধিকারী হওয়া যায় না। আমরা যাহা শুনি, পাঠ করি বা বলি তাহার সঙ্গে আমাদের জীবনের অবস্থা কতটা মিলিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলেই আমরা কত দূর ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইতেছি বুঝিতে পারি। সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মের সমীপস্থ হওয়াতে প্রত্যেকের অধিকার, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান ঘোষণা। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনদ্বারা বৈদ্যুতিক শক্তি অপেক্ষাও প্রবলতর অদৃশ্যরাজ্যের অদৃশ্য কিন্তু জাগ্রত শক্তি লাভ করিয়া, জীবনতরী ঝড় তুফানের ভিতর দিয়া আনন্দে বাহিয়া লইয়া যাওয়া যায়। ইহা কাল্পনিক কথা নয়, মহাজনগণের পরীক্ষিত সত্য।

ব্রাহ্মসমাজ প্রধানতঃ ধর্ম্মসমাজ। আমাদিগকে ধর্ম্মানুগত জীবন লাভ করিয়া, কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি যোগে যুক্ত হইয়া কর্ত্তব্য-সাধন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা যদি জীবনের ঠিক লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে পন্থা সম্বন্ধে কোন গোল থাকে না। ধর্ম্মসমাজে সকলেই ভগবৎপ্রেমপিপাসী, কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষণ নাই, নীচ অহংকার অভিমান নাই,—সকলে ভদ্রতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিনয়ের ভাবে পূর্ণ। ইহাই ত আদর্শ, ইহাতেই ত জীবন মধুর এবং শক্তিশালী হয়। ইহার ব্যতিক্রম হইলে নিজের জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মানবসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দোষ গণতন্ত্রের নয়, কিন্তু ধর্ম্মসাধনের অভাবে আমাদের জীবন ধর্ম্মানুগত নয় বলিয়া, আমরা বিফলমনোরথ হইতেছি। যেদিন সমাজের অধিকাংশ লোক সমাজ সম্পর্কীয় বাহিরের কাজকর্ম্মকে অবান্তর বিষয় বলিয়া মনে করিবেন এবং ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবেন, সেইদিন গণতন্ত্র কি একতন্ত্র তাহার কথা

কেহ ভাবিবে না। প্রেমের প্রভাবে সমস্ত কাজ নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইবে। আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রেসিডেণ্ট রুশভেল্ট পর্য্যন্ত গণতন্ত্র সম্বন্ধে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; কিন্তু আর কোন ভাল নিয়ম নাই বলিয়াই গণতন্ত্রকে গ্রাহ্য করিতেন। গণতন্ত্রের অশেষ দোষ, কিন্তু বর্ত্তমানকালে তাহা পরিবর্ত্তন করা কঠিন। ধর্ম্মসমাজে গণতন্ত্রকে কি রূপে প্রেমতন্ত্র করা যায়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। শ্রেষ্ঠ উপায় প্রার্থনা; প্রত্যক্ষ ভাবে অন্যান্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ৪০।৪৫ বৎসর পরে প্রার্থনা সফল হইতে দেখিয়াছি; সুতরাং নিরাশ হওয়ার কথা নাই।

অল্পদিন পূর্ব্বে ডাক্তার পি কে রায় মহাশয়ের চিঠি সম্বন্ধে যে কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল, তাহাতে নানা রকম বাহ্যিক কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল। কেবল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলিয়াছিলেন যে, যুবক যুবতীদিগকে যাহাতে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করা যায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। এই কথাতে আর কেহ বড় মনোযোগ দেন নাই, সুতরাং কোন কাজও হয় নাই। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু বলিয়াছিলেন যে, যুবকদিগকে কাজে লাগান হয় না, তাহাদিগকে কাজে লাগান উচিত। এই কথামতও কোনও কাজ হয় নাই। কর্ম্মযোগের ভিতর দিয়া যুবকদিগকে সরস এবং প্রেমিক করা যাইতে পারে। সতীশবাবু নিজে ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা যুবকদিগকে এবং এমন কি বয়স্কদিগকেও আকর্ষণ করিতে পারেন। চেষ্টা করিলে হয়তঃ আগামী বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে অবস্থা অনেকটা ভাল হইতে পারে। একটা প্রধান কাজ সামাজিক উপাসনার ভাল ব্যবস্থা করা। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ প্রভৃতির উপর এই ভার দেওয়া উচিত। উপাসনা সংগীত প্রভৃতি যাহাতে ভাব ভক্তির সঙ্গে নির্ব্বাহ হয়, তাহার চেষ্টা করা নিতান্তই আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে মানব-সমাজে যে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করা ধর্ম্মসমাজের এক প্রধান কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে যুবকেরা মাঝে মাঝে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জমাট কীর্ত্তনাদি করিয়া ভাল হাওয়া প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতে পারেন। সমাজের অবস্থা দেখিয়া অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু নামকীর্ত্তনে নরনারীর প্রাণ সরস হইতে পারে। ব্রাহ্ম-সমাজে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্টতাস্থাপনের প্রয়োজন। এই সম্বন্ধে প্রবীণদের বিশেষ দায়িত্ব আছে। কাহাকেও তুলিতে গেলে, নিজে নীচু হইতে হয়। কাহাকেও আলিঙ্গন করিতে গেলে নিজে নত হইয়া কোমল হইতে হয়। ইহাতে জীবনের ক্ষতি হয় না, লাভ হয়। সাধু সন্ন্যাসীরা সকলকে 'নমো নারায়ণ' বলিয়া নমস্কার করেন। আমাদেরও মূলমন্ত্র সকলে এক ঈশ্বরের সন্তান, অথচ পরস্পরের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারি না। জগতে প্রেমের হাওয়া প্রবাহিত করা বড়ই প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্যের সময় যেমন রব উঠিয়াছিল—"নদে ভেসে যায় প্রেমে টলমল"। সেই রব কি কলিকাতা সহরে এই যুগে উঠিতে পারে না? ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী এবং যুবক সকলে মিলিয়া চেষ্টা করুন। ভগবান সহায় হইবেন। শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র নায়ক প্রস্তুত হইবেন, সভ্যগণ সকলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া মানবসমাজে নবজীবন সঞ্চার করিবেন। নায়ক এবং সেবক একাধারে বিরাজ করেন, ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য দেশে অনেক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে অসম্ভব সম্ভব হয়। তাঁহারি আশীর্ব্বাদে ব্রাহ্মসমাজের ভয়ের কারণ দূর হইয়া যাইতে পারে। আমরা যেন প্রত্যেকে ক্রমে ব্যক্তিগত অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া সমাজকে শক্তিশালী করিতে পারি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।

শ্রীহৃদয়চন্দ্র দাস।

## পরলোকগতা বসন্তকুমারী দত্ত

(শ্রাদ্ধবাসরে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক পঠিত)

আজ এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে যাঁহার পবিত্র স্মৃতির দু একটি কথা শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে বলিব, তিনি আমাদের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরলোকে পরমপিতার ক্রোড়ে গিয়া পরম শান্তিতে অবস্থান করিতেছেন। যে লোকে রোগ নাই, শোক নাই, জরা নাই, মরণ নাই, বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই, যেখানে চির শান্তি, চির আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যে লোকে যাবার জন্য মা আমাদের উন্মুখ হয়েছিলেন, বিশ্বজননী তাঁকে সেই আনন্দ-লোকে তাঁর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়াছেন। মৃত্যু আমাদের জীবনে অনেক শিক্ষা আনিয়া দেয়, মৃত্যু আমাদিগকে পরলোকের আভাস দেয়। দেহে থাকিতে যে সকল সদ্‌গুণ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি নাই—আজ যখন তিনি জীবনের পরপারে গিয়াছেন—সে গুলি আজ আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছি। তাই আজ তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিয়া তাঁর স্মৃতিতর্পণ, তাঁর পূজা, সমাপন করিব।

১৮৬০ সালে খুলনা জেলার শ্রীপুর গ্রামে তাঁহার পিত্রালয়ে মা আমাদের জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স যখন প্রায় তিন বৎসর তখন তাঁহার পিতা ও তাঁহার বয়স যখন সাত বৎসর তখন তাঁহার মাতা পরলোকগমন করেন। অতি শৈশবেই পিতৃমাতৃবিয়োগ হওয়াতে এবং বংশের প্রথম কন্যাসন্তান বলিয়া, মাতৃদেবী তাঁহার ঠাকুরমাতা এবং পিতৃব্যাদিগের অপরিসীম আদরের মধ্যে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার সেজ কাকা কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডের কর্ম্মচারী ছিলেন; সেই জন্য অধিকাংশ সময় কলিকাতার বাটীতে বাস করিতেন। মায়ের যখন এগারো বৎসর বয়স তখন তাঁহার বিবাহ হয়। বাবা সে সময়ে কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। কলিকাতাতে অধ্যয়নকালীন তিনি ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হন এবং সাধু অঘোরনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার সমসাময়িক বন্ধুগণের যাঁহারা একযোগে তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

১। ফণীন্দ্রমোহন বসু, ২। হৃদয়নাথ বসু, ৩। গোপাল-

চন্দ্র দাস, ৪। ক্ষীরোদচন্দ্র দাস, ৫। ইন্দুভূষণ রায়, ৬। বাণীকান্ত রায় চৌধুরী, ৭। মৃগাঙ্কধর রায় প্রভৃতি।

মায়ের সেজ কাকা বাবার ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ সংবাদে নিরতিশয় বিরক্ত হন এবং তাঁহার মেডিকেল কলেজে পড়িবার খরচ বন্ধ করিয়া দেন। নিরুপায় হইয়া বাবা কর্ম্ম অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হন। সেই সময়ে মায়ের সেজ কাকা স্বর্গীয় সাধু প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় মতিহারীতে কর্ম্ম করিতেন। বাবা মতীহারীতে যাইয়া গভর্ণমেণ্ট অফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং সেখানে মাকে লইয়া দাদা মহাশয়ের পরিবারে পরম শান্তিতে ব্রাহ্মজীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বাবা আমাদের অকালে, পরমপিতার আহ্বানে, আমাদিগকে একেবারে নিরাশ্রয় করিয়া, ইহ জগত হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন দিদির বয়স পাঁচ বৎসর, আমার বয়স তিন বৎসর, ও আমার ছোট ভাই নরেনের বয়স মাত্র ছয় মাস। মা আমাদিগকে লইয়া অকূলে ভাসিলেন। কিন্তু এই অসহায় অবস্থার মধ্যে মায়ের মাতৃত্ব পূর্ণ বিকাশলাভ করিয়াছিল। বাবা ব্রাহ্ম ছিলেন বলিয়া দেশের হিন্দু আত্মীয়গণ মায়ের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অসহ্য অত্যাচার হওয়াতে মা আমাদিগকে লইয়া তাঁহার কাকা সাধু প্রকাশচন্দ্রের নিকট বাঁকীপুর চলিয়া গেলেন এবং তথায় এক বৎসর বাস করিয়া পুনরায় দেশে ফিরিয়া আসিলেন। দাদামহাশয় মাসিক ৫৲ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই কয়েকটি টাকাই মায়ের সম্বল হইল এবং আমাদের শৈশবকালের অসহায় জীবন রক্ষা করিল। এই সময় বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় বসিরহাট মহকুমার স্কুলসমূহের Sub-Inspector ছিলেন। তিনি একজন অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি আমাদের জালালপুর গ্রামের নিম্নপ্রাইমারী স্কুল পরিদর্শন করিবার জন্য গ্রামে আগমন করেন। সেই সময় আমাদের কাকা গোপালচন্দ্র দাস ও ক্ষীরোদচন্দ্র দাস গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে উপরোক্ত কৃষ্ণবাবুর (আমাদের কৃষ্ণ কাকার) পরিচয় হয় এবং তাঁহারা মাকেও তাঁহার সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। এইরূপে ভগবানের কৃপায় আমাদের একজন অভিভাবক মিলিয়া গেল। তিনি আমাদের সেই দুর্দ্দিনে আমাদের যে কিরূপ সাহায্য করিয়াছেন, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। দিদি ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে হিন্দুসমাজে বিবাহ দিবার জন্য দেশের হিন্দু আত্মীয়েরা মাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে লইয়া মায়ের গ্রামে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আমাদের কৃষ্ণ কাকাই দিদিকে ব্রাহ্ম বোর্ডিংএ রাখার সমস্ত ভার লইলেন এবং ১৮৯১ সালে দিদি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। এইরূপে মা দিদির সুব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে আমাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া কাকা মাঘোৎসবে কলিকাতায় আসিলেন। স্বর্গীয় তারক গোপাল ঘোষ মহাশয় তখন Contai School এর হেড মাষ্টার ছিলেন। তিনিও সেই বৎসর মাঘোৎসবে যোগদান করিতে কলিকাতায় আগমন করেন। কাকার নিকট আমাদের অসহায় অবস্থার কথা শুনিয়া, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমার সমস্ত ভার গ্রহণ করেন এবং উৎসবান্তে তাঁহার সঙ্গে আমি কাঁথি চলিয়া যাই। নরেনকে লইয়া মা একাকিনী দেশে ফিরিয়া প্রায় এক বৎসর কাল তথায় বাস করিলেন। স্বর্গীয় ইন্দুভূষণ রায় মহাশয় পিতৃদেবের সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি ও আমাদের কাকা ক্ষীরোদচন্দ্র দাস প্রভৃতি কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু মিলিয়া কলিকাতায় দাসাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৩ সনে মা দাসাশ্রমের সেবিকা হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন ও পর বৎসর দাদামহাশয়ের আহ্বানে বাঁকিপুর গিয়া তথায় অঘোর-পরিবারের ভার গ্রহণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন কলিকাতায় কাকার বাসা হইতে City Schoolএ পড়িতে লাগিল। ১৮৯৫ সালে আমাকে Contai হইতে চলিয়া আসিতে হইল এবং আমার জন্য মা আবার বিব্রত হইয়া পড়িলেন। আমাদের কাকাবাবু ক্ষীরোদচন্দ্র দাস মহাশয় খুলনায় বাস করিতেন। তিনি কলিকাতা আসিয়া আমাদিগকে নলধা গ্রামে লইয়া যান। সেই সময়ে শ্রদ্ধেয় ললিতমোহন দাস মহাশয় গ্রামস্থ প্রবেশিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। দাদামহাশয়কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১০৲ টাকা সম্বল করিয়া ও স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া আমরা ঐ স্কুলে অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। আমরা যতই বয়োপ্রাপ্ত হইতে লাগিলাম ততই আমাদের জন্য মায়ের চিন্তা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—কি করিয়া আমাদিগকে মানুষ করিবেন, এই চিন্তায় মা একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমাদের লাবণ্যদিদি (লাবণ্যপ্রভা সরকার, তখন Miss Bose) ক্যাম্বেল হাসপাতালের সংলগ্ন মহিলা হোষ্টেলের ভার গ্রহণ করেন এবং মাকে সহকারিণী রূপে তিনি সেখানে লইয়া যান। আমি বেলগেছিয়া ভেটারিনারী কলেজে ভর্ত্তি হই ও নরেন নলধাতে অধ্যয়ন করিতে থাকে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমি কলেজ হইতে পাশ করিয়া কাজ লইয়া বাঁকিপুর চলিয়া যাই, নরেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় এফ এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়। আমরা মাকে আর কাজ করিতে দিলাম না। আমি তাঁহাকে লইয়া আমার কর্ম্মস্থলে বাস করিতে লাগিলাম। মায়ের নিকট থাকিয়া আমাদের দিনগুলি বেশ আনন্দে কাটিতে লাগিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে নরেন আমেরিকা চলিয়া গেল। মা প্রার্থনা করিলেন "ঠাকুর, তুমি অসাধ্য সাধন করিলে, যাহা কখনও কল্পনা করি নাই, তুমি তাহাই ঘটাইলে!" এখন হইতে তিনি আমার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূ দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। মা নিজে অতি সুগৃহিণী ছিলেন, সাংসারিক সমস্ত কাজ তিনি অতি শৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন করিতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। পুত্রবধূকেও তিনি সেই রূপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে নরেন আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিল। তাহার তিন বৎসর পর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তাহার বিবাহ হয়। পৌত্রপৌত্রী দর্শন করিয়া তাঁহার জীবন তখন সুখময় হইয়াছিল। কিন্তু এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের ভিতরেও

মা গত দুঃখময় জীবনের কথা এক দিনের জন্যও ভুলিয়া যান নাই। সর্ব্বদা আমাদিগকে অতীত জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন।

ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতা ও কৃপার উপর তিনি চিরদিন দৃঢ়ভাবে নির্ভর করিতেন, এবং জগতে সাধুতার জয় ও অসাধুতার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, এই আন্তরিক বিশ্বাস তাঁহার গভীর ছিল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হন। গত বৎসর এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে অবস্থা অতিশয় সঙ্কটাপন্ন হয়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সে বার সুস্থতা লাভ করেন। এই ভাবে ভালোমন্দ অবস্থার ভিতর দিয়া বৎসরাধিক কাল অতিক্রম করিয়া গত ১৯শে জুন বৃহস্পতিবার রাত্র ১২-৩০ মিনিটের সময় তিনি মহা প্রস্থান করিলেন। আমরা মাতৃহীন হইলাম।

মা আমাদের একাধারে পিতা ও মাতা উভয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। শৈশবকালে পিতৃহীন হওয়াতে পিতার স্নেহ, পিতার শাসন, হইতে আমরা বঞ্চিত ছিলাম। মা আমাদের সকল অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। একদিকে যেমন তিনি মায়ের স্নেহ, মায়ের ভালবাসাতে আমাদের জীবন মধুময় করিয়াছিলেন, তেমনি আবার অপর দিকে প্রয়োজন মতো আমাদের শৈশবে আমাদিগকে কঠোর শাসন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। মার চরিত্রে এই কঠোর এবং কোমল ভাবের সমাবেশ ছিল। যদি কখনো বুঝিতে পারিতেন যে কাহারও প্রতি কোনরূপ রূঢ় ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ছোট-বড় বিচার না করিয়া তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

মা! তুমি যে লোকে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলে, তোমার আকুল প্রার্থনায় জগজ্জননী তাঁর কাছে সে লোকে তোমায় লইয়া গিয়া আমাদের বাবা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের সঙ্গে তোমার অনন্ত মিলন করাইয়া দিলেন। এ মিলনে বিচ্ছেদ নাই। মাগো, তুমি তো অনন্ত শান্তি লাভ করিয়াছ; কিন্তু আমরা যে পিতৃহীন ছিলাম পিতার স্নেহ কি তাহা কখনো জানি নাই, সেজন্য বেশী ক'রে তোমাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম। যদিও তুমি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছিলে, তবুও তোমাকে এতো শীঘ্র হারাইব তাহা তো ভাবি নাই। তোমার কাছে কত দোষ করেছি সেজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিবারও সময় দিলে না। যদিও জানি তুমি নিজগুণে ক্ষমা চাহিবার আগেই আমাদের ক্ষমা করে' গিয়েছ। মা, তুমি তো চলে গেলে! তুমি দেহে থাকতে আমরা বুঝতে চেষ্টা করি নাই, তুমি আমাদের কি ছিলে। সংসারে আমাদের উপর তোমার সকল কর্ত্তব্য তুমি সুসম্পন্ন করেছ, কিন্তু আমরা তার কিছুই করিতে পারি নাই—তোমার কাছে কত দোষ করেছি সেজন্য আজ অনুতপ্তচিত্তে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

দয়াময়ী মা, তুমি আমাদের মাকে তোমার শান্তিপ্রদ অভয় ক্রোড়ে স্থান দিয়েছ—সেখানে তিনি অনন্তকালের জন্য আশ্রয় পেয়েছেন, সেখানে তিনি আমাদের পিতৃদেব ও অন্যান্য কত পূজনীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া তোমারই গুণগান করিতেছেন এবং শান্তিতে তোমারই আশ্রয়ে বিরাজ করিতেছেন। তবে আমরা বৃথা শোক করি কেন? কেন এত আকুল হই? তুমি আমাদের শোকাশ্রু মুছিয়ে দাও। আমরা সকলে যেন মায়ের সদ্‌গুণগুলি জীবনে লাভ করতে পারি। আমরা যেন তাঁর ইচ্ছা মত, তাঁর ইঙ্গিত মত, আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন ক'রে যেতে পারি। মার মত আমরা মৃত্যুকে জয় ক'রে হাসিমুখে তোমার ডাক শু'নে তোমার কাছে যেতে প্রস্তুত হ'তে পারি। তাঁর আত্মা শান্তি পায়, এরূপ কার্য্য আমরা যেন আমাদের জীবনে করে' যেতে পারি। মার জন্য আজ আর কি প্রার্থনা করবো, প্রভু? মা আমাদের বড় দুঃখিনী ছিলেন; কিন্তু তিনি তোমার প্রেমে তোমার বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তুমি তো তোমার অভয়-ক্রোড়ে তাঁকে স্থান দিয়েছ। তাঁর জন্য এই ভিক্ষা চাই, যেন তিনি দিন দিন তোমার প্রেমে, তোমার পুণ্যে, প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে উন্নত হ'তে উন্নততর লোকে যেতে পারেন।

হে মাতার মাতা! আমাদের মাতাকে তুমি তোমার বক্ষে রাখিয়াছ, তোমার দিকে আমাদের দৃষ্টি যাইবে বলিয়া। তবে তুমি আমাদিগকে দিব্য চক্ষু দাও, যেন আমরা তোমার ভিতর আমাদের মাতাকে দেখিতে পাই। তুমি তাঁহাকে কতগুণে গুণবতী করিয়াছিলে, না জানি সেই অমৃত-নিকেতনে লইয়া আরো কতো অতুল সম্পদ দিতেছ! শোকের ভিতর দিয়া তুমি স্বর্গের ছবি দেখাইয়া থাক—এ ছবি যেন জীবনে চির মুদ্রিত থাকে। অনেক দিন পূর্ব্বে আমাদের পিতা যে-লোকে গিয়াছেন এবং মা যে-লোকে যাইবার জন্য এতদিন প্রতীক্ষায় ছিলেন, সেই লোকে মাতৃদেবী তাঁহারই অনুসরণ করিলেন। আমরা সেই লোকের দিকেই চাহিয়া যেন তাঁদের পুণ্যস্মৃতি প্রাণে জাগরূক রাখিতে পারি—এই প্রার্থনা। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

## ব্রাহ্মসমাজ

**ভাদ্রোৎসব**—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে দ্ব্যধিক শতবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইবে। সকলে ব্যাকুল প্রাণে উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যাহাতে উহাকে সফল করিয়া তুলিতে পারেন তাহার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অনুরোধ জানাইতেছেন—

৫ই ভাদ্র (২২শে আগষ্ট) শুক্রবার—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় আনন্দমোহন স্মৃতিসভা। সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। বক্তা—শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, রেভাঃ ডাঃ আরকুহার্ট, মৌলভি আবদুল করিম।

৬ই ভাদ্র (২৩শে আগষ্ট) শনিবার—উৎসবের প্রধান দিন। প্রাতে উষাকীর্ত্তন, ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

৭ই ভাদ্র (২৪শে আগষ্ট) রবিবার—প্রাতে ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

৮ই ভাদ্র (২৫শে আগষ্ট) সোমবার—সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বক্তৃতা বক্তা শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ।

---

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৯শে জুলাই চট্টগ্রাম নগরীতে বাগআঁচড়া নিবাসী

পরলোকগত আদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী মাতঙ্গিনী দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। ২২শে জুলাই তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন শাস্ত্রপাঠ ও প্রার্থনা, জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রীতিলতা রায় সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দে ৬৲ টাকা মূল্যের একখানি চেয়ার দান করিয়াছেন। গত ২১শে জুলাই বাবু অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী ঊর্ম্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহাদের পিতৃব্যপত্নী মাতঙ্গিনী দেবীর পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান প্রদত্ত হয় :—বাঁকিপুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৲, মিশনফাণ্ড, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৩৲।

বিগত ২৭শে জুলাই কার্সিয়াং নগরীতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সেনের পত্নী (পরলোকগত স্যার কে জি গুপ্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা) লাবণ্যময়ী সেন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৩রা আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত শেষাদ্রি আয়াঙ্গারের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে বিবিধ প্রতিষ্ঠানে ১০০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ৩রা আগষ্ট পরলোকগতা কামিনীসুন্দরী সেনের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনী রায় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। বিগত ১০ই আগষ্ট পুত্রদ্বয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সরোজকুমার সেন প্রচার বিভাগে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ৭ই আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে পূর্ণিয়ার রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুর ক্যান্সার রোগে ভুগিয়া ৬২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মহদন্তঃকরণের লোক ছিলেন এবং নানা সৎকার্য্যের সহিত যুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের জন্যও তিনি অনেক করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে পূর্ণিয়ায় অনেক কাজের বিশেষ ক্ষতি হইল।

বিগত ৭ই আগষ্ট বালীগঞ্জ উপনগরীতে কুমিল্লায় বাবু অনঙ্গমোহন ঘোষ ৬৩ বৎসর বয়সে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এক সময় কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন।

বিগত ১০ই আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পত্নী ঊর্ম্মিলা দেবী নিউমোনিয়া ও অন্যান্য রোগে ভুগিয়া ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম বিশ্বাস ও হৃদয়ের স্নেহভালবাসার গুণে অনেকের আশ্রয় স্বরূপ এবং সতীশ বাবুর সকল কার্য্যে বিশেষ সহায় ছিলেন।

বিগত ১২ই আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে বাবু ললিতমোহন সেন বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিত দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে সকলে মুগ্ধ ছিল। জননীকে বৃদ্ধ বয়সে অতি গুরুতর শোক পাইতে হইল।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনাবিধান করুন।

---

**ব্রাহ্মছাত্রদের কৃতিত্ব**—বিগত বি এস্ সি পরীক্ষাতে শ্রীমান অমলচন্দ্র বসু পাশ কোর্সে ও বি এ পরীক্ষাতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীমান্ অমিয়কুমার সেন অর্থনীতি শাস্ত্রে দ্বিতীয় বিভাগে অনার্স পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

**শুভবিবাহ**—বিগত ১০ই জুলাই কটক নগরীতে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া অরুণা ও ঢাকা জেলার অন্তর্গত কুঠীবাড়ী গ্রাম নিবাসী পরলোকগত জগবন্ধু রায়ের পুত্র শ্রীমান্ সতীশচন্দ্রের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৫শে শ্রাবণ শান্তিপুরে শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল বসাকের সহিত শান্তিপুর অনাথাশ্রমের পালিতা কন্যা কল্যাণীয়া সুহাসিনীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। উভয়ে পূর্ব্বে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

---

**কটক ব্রাহ্মসমাজ**—কটক ব্রাহ্মসমাজের এক ষষ্টিতম বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে ব্রহ্মমন্দিরে সম্পন্ন হইয়াছে :—

১৫ই আষাঢ় উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৬ই আষাঢ় সায়ংকালে কথকতা হয়। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় কথকতা করেন। ১৭ই আষাঢ় প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং পুনরায় সায়ংকালে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৮ই আষাঢ় বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে ময়ূরভঞ্জ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আগমন করিয়া সঙ্গীত সংকীর্ত্তন করিয়া উৎসবের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

---



ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ৩১শে শ্রাবণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি এ

Registered No. 65

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৩ম ভাগ
১০ম সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১
2nd September, 1930.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা।

### উদার প্রার্থনা

অসত্য অন্যায় অবিচার অত্যাচার হ'তে,
ধরণীরে নিয়ে চল প্রভু! শান্তির জগতে।
ভ্রান্তি মোহ মদগর্ব্ব যত হউক্ চূর্ণ—লয়,
নিখিলে উঠুক ধ্বনি এক,—জয় তব জয়।
এক দেশ এক জাতি গড়ে তোমারে মানিলে,
সকলেই ভাই বোন, আঁখি তোমাতে থাকিলে।
সবে প্রজা তুমি রাজ এক, সকলের পতি,
তোমারি শাসন-দণ্ড-তলে বিশ্বের প্রণতি।
বোঝে না মানে না আজো যারা তোমার এ বিধান,
তাদেরে দেও শুভ মতি, আর কর চক্ষুমান।
দেখাও অমৃতলোক, যেথা চরম বিচার,—
পাপে সমদণ্ড সকলের, পুণ্যে পুরস্কার।
করহে অনন্ত বিশ্বভূপ! পাদপ্রান্তে তব,
বিশ্ব মানবেরে নত-শির—দিয়ে দৃষ্টি নব।

হে প্রেমময় জীবনবিধাতা, আমাদের জীবনের জন্য যাহা অতি প্রয়োজনীয় তাহাকে তুমি তোমার মঙ্গল বিধানে এক দিকে যেমন সুলভই করিয়াছ, তেমনি অপরদিকে তাহার পথে নানা বাধা বিঘ্নও রাখিয়াছ। সে সকল বাধা বিঘ্ন না থাকিলে আমরা আলস্য আরামেই সকল শক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলিতাম, উন্নতি ও বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারিতাম না। যেমন বহির্জগতে দেহ সম্বন্ধে, তেমনি অন্তর্জগতে হৃদয় মন আত্মা সম্বন্ধে, তুমি একই ব্যবস্থা করিয়াছ। তোমার সহিত সাক্ষাৎ যোগেই, তোমার সত্য উপাসনাতেই, আমাদের সর্ব্ব প্রকার কল্যাণের মূল নিহিত রাখিয়া, তুমি আমাদের নিকট অতি সুলভই হইয়া রহিয়াছ—যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন, সর্ব্বত্র সকল সময়ে তুমি আমাদিগকে ঘেরিয়াই রহিয়াছ, সরল প্রাণে চাহিলেই কৃপা করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতেছ। অথচ, আমরা নানা অসার বিষয়ে মত্ত থাকিয়া, আপনার দোষেই, অধিকাংশ সময় তোমাকে সত্য ভাবে চাহি না বলিয়া, তোমা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি। তথাপি তুমি আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ কর না,—সে সকল বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়াই, নানা দুঃখ বেদনার আঘাতে, তোমার কৃপার ভিখারী হইতে, আকুল প্রাণে তোমার শরণ লইতে, বাধ্য কর। হে প্রেমস্বরূপ, তোমার এই অসীম প্রেমই আমাদের একমাত্র আশার স্থল। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে চিরদিনের জন্য তোমার করিয়া লও,—আমরা নিয়ত তোমাকে প্রাণে লাভ করিয়া, জীবনের সকল বিষয়ে তোমার অনুগত হইয়া, ধন্য ও কৃতার্থ হই, চিরকল্যাণের পথে অগ্রসর হই। তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

## সম্পাদকীয়

**সত্য উপাসনার বাধা**—আমরা গত সংখ্যায় ভাদ্রোৎসব প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, সত্যে ও ভাবে সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপাসনাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত বা জাতীয় কল্যান ও উন্নতির মূল। ইহাকে অবলম্বন না করিলে, অন্য কোনও উপায়েই নিজের ও দেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইবে না। ইহা যে একটা নিতান্ত কঠিন অসাধ্য ব্যাপার নহে, বরং অতি সহজ ও স্বাভাবিকই, তাহাও আমরা অনেকবার বলিয়াছি। ইহার জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে বা গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য পরিহারপূর্ব্বক বনজঙ্গলে গিরিগহ্বরে যাইয়া, অস্বাভাবিক তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হওয়ারও কোনই প্রয়োজন নাই। গৃহপরিবারে সমাজে বাসজনিত

সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যপালন করিয়া, নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও, যথাবিহিত আহার বিহার করিয়াও, ইহাতে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভবপর। বরং এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া দূরে গেলেই, উচ্চ ধর্ম্মসাধন অঙ্গহীন হইয়া যায়, প্রকৃত কল্যাণের পরিবর্ত্তে অনেক অকল্যাণেরও কারণ হইয়া উঠে। ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে, এ পথে কোনও বাধা বিঘ্নই নাই, আলস্য নিদ্রা আরামেই, বিনা সাধনেই, কোনও প্রকার চেষ্টা যত্ন না করিয়াই, আপনা আপনি গন্তব্যস্থানে যাইয়া উপস্থিত হওয়া যায়, চরম সিদ্ধি হস্তগত হয়। বর্ত্তমানে বহু লোক যে এরূপ কোনও একটা সহজ পন্থা, ঐন্দ্রজালিক শক্তি, পাইবার জন্য খুবই ব্যস্ত, তাহা আবিষ্কার করিবার জন্য নানা দিকে ছুটিয়াও বেড়াইতেছে, তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু বাস্তব জগতে তাহা কোনও রূপেই সম্ভবপর নহে। কোথাও এরূপ কোনও "আলাউদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ" নাই, যাহার সাহায্যে বিনা চেষ্টা যত্নে সমস্ত অভীপ্সিত ফল লাভ করা যায়। অথচ, এ কথাও অতি সত্য যে, যাহা যত অধিক প্রয়োজনীয় তাহা তত বেশী সুলভ, তাহার জন্য তত কম শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়।

প্রকৃতিরাজ্যে দেখিতে পাই, আমাদের দৈহিক জীবনের জন্য একান্ত আবশ্যক যে বাতাস তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ, এবং যে রক্তপ্রবাহ বা শ্বাস প্রশ্বাস অবিশ্রান্ত না চলিলে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, তাহা আমাদের ইচ্ছানিরপেক্ষ হইয়াই নিয়ত আপনা আপনি চলিতেছে, আমাদের কোনও চেষ্টা যত্নের অপেক্ষা রাখিতেছে না। অন্তরজগতেও দেখিতে পাই, যে জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছা ব্যতীত আমাদের অস্তিত্বই থাকে না, তাহার অনেকটা আমরা অজ্ঞাতে অলক্ষিতে বিনা চেষ্টা যত্নে প্রতি মুহূর্ত্তে লাভ করিতেছি। যদি অনেক চেষ্টা যত্ন শ্রম করিয়া, বহু কষ্টে, অনেক দূর হইতে এই সকল সংগ্রহ করিতে হইত, তাহা হইলে যে কিছুতেই আমাদের বাঁচিয়া থাকা সম্ভবপর হইত না, সে-কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ, এ সকলের জন্য যে আমাদের কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই, কোনও প্রকার চেষ্টা যত্ন শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার না করিয়াই আমরা অবিশ্রান্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি, এরূপ কথাও কেহই বলিতে পারে না। নানা কারণে স্বাভাবিক নিয়মের প্রাণপোষক বায়ুও বিষাক্ত ও প্রাণনাশক হইয়া যায়, আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের বা রক্ত-চলাচলের যন্ত্রও বিকল হইয়া পড়ে। আমরা ইচ্ছা করিয়াও কিছু সময়ের জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া রুদ্ধ রাখিতে পারি। এ সকল স্থলে আমাদের উদাসীনতা অবহেলা আলস্য ও চেষ্টা যত্নের অভাব কিরূপ মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়, কষ্টস্বীকার করিয়াও উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা কত প্রয়োজনীয় হয়, এবং তাহা না করিলে যে স্বাস্থ্যলাভ ও শারীরিক উন্নতি-বিধান কিছুতেই সম্ভবপর হয় না, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞান প্রেম ইত্যাদি সম্বন্ধেও ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই একই নিয়ম কার্য্য করিতেছে। আধ্যাত্মিক জীবনও ইহার বহির্ভূত নহে।

প্রাণস্বরূপ জীবনদেবতা আমাদের অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া, সর্ব্বত্র সকল মুহূর্ত্তে আমাদিগকে ওতপ্রোতভাবে ঘেরিয়া রহিয়াছেন, যখনই আমরা সত্য ভাবে তাঁহাকে চাই, তাঁহার উন্মুখীন হই, তখনই তাঁহাকে পাই। আমাদের উদাসীনতা অবহেলা বিরোধিতা সত্ত্বেও, তিনি অলক্ষিতে অজ্ঞাতে অনেক সময় আমাদিগকে এ বিষয়ে অগ্রসরও করেন, আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সত্য উপাসনাতেও আমাদিগকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাহা ত সকল সময় ঘটে না,—অধিকাংশ সময়ই ত এত কাছে থাকা সত্ত্বেও, আমরা সত্য ভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি না, তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ অনুভব করি না, তাঁহার খাঁটি উপাসনায় নিযুক্ত হইতে পারি না। তিনি তাঁহার অসীম প্রেম ও জীবন্ত মঙ্গল বিধাতৃত্বের দ্বারা আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিলেও, এই রূপ নিত্য সাক্ষাৎ অনুভূতি ও প্রাণপ্রদ উপাসনা ব্যতীত যে আমরা স্থায়ী ভাবে উন্নতি ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারি না, তাহা ত আমরা ভাল করিয়াই জানি। এই সত্য সাক্ষাৎ যোগের বাধাগুলি দূর না করিলে যে আমরা কিছুতেই এ বিষয়ে কোন প্রকার সফলতা লাভ করিতে পারি না, এবং সে বাধাগুলির অধিকাংশই যে আমাদের নিজ দোষ ত্রুটিরই ফল, তাহাও বিস্তারিত করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সে সকল দোষ ত্রুটি যে আমাদের নিজ চেষ্টা যত্নে দূর না করিলে সহজে বিদূরিত হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র। অবশ্য, আমাদের নিজ দোষ ত্রুটি প্রসূত নয়, এমন কোনও বাধা বিঘ্নই আমাদের নিকট উপস্থিত হয় না, অথবা আমরা ইচ্ছা ও আগ্রহ করিয়া নিজ হইতে সহজে দোষ ত্রুটিগুলি দূর না করিলে যে আমাদিগকে বিশ্ববিধাতার মঙ্গল শাসনে নানা দুঃখ ক্লেশে জর্জ্জরিত হইয়া চেষ্টা যত্ন করিতে বাধ্য হইতে হয় না, এরূপ কথাও কেহই বলিতে পারে না। তথাপি আলস্য ও উদাসীনতার মধ্যে নিশ্চেষ্ট থাকা যায় না, তাহা উচিতও নয়। এই সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিবার জন্যই সাধনের প্রয়োজন। আমরা কয়েকটি বাধা সম্বন্ধে আজ একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। আমরা সাধারণতঃ যে গুলিকে গুরুতর বাধা বলিয়া মনে করি, পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, তাহার অনেক গুলিই প্রকৃত বাধা নয়,—কাল্পনিক। সেগুলি অতি সহজেই দূর করা যায়। অনেক সময় তাহাদের পশ্চাতে যে সত্য গুরুতর বাধাগুলি থাকে, তাহা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে পতিতই হয় না। সুতরাং তাহা দূর করিবার জন্য আমরা কোনও চেষ্টাই করি না। অথচ তাহা করিলে অপর অনেক গুলিও অতি সহজেই বিদূরিত হইয়া যায়।

আমাদের উদাসীনতা অবহেলা এবং আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতার অভাবই যে সর্ব্বপ্রধান বাধা, এবং আত্মচিন্তা আত্মপরীক্ষা ও উচ্চ আদর্শ বা মহৎ লক্ষ্য বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা না করাই যে আবার তাহার মূল কারণ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এ কথা ইতিপূর্ব্বে এক সংখ্যায় ব্রহ্মোপাসনা-শিক্ষাপ্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই বাধাটা দূর হইলে, উপাসনা প্রার্থনা যে সরল ও স্বাভাবিক, সত্য ও প্রাণপ্রদ হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। এই জন্য কি প্রকার সাধন আবশ্যক তাহাও স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাওয়া

যাইতেছে; ইতিপূর্ব্বেও তাহা অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আজ আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এই বাধাটা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত, এই বিষয়ে যথোপযুক্ত চেষ্টা যত্ন না করিয়া, আর যাহাই করি না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, সর্ব্বোপরি এই কথাটাই সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে। ইহা ভুলিলে কোনও প্রকারেই চলিবে না।

সংসারে বাস করিতে হইলেই নানা কার্য্যে বহু সময় দিতে হয় এবং নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপকারী ঘটনাও অনেক সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। এই হেতু উপাসনাদির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না, মনস্থির করিয়া উপাসনায় নিযুক্ত হওয়াও কঠিন হইয়া উঠে। তাহার উপর বর্ত্তমান যুগের কঠোর জীবন-সংগ্রাম ও কর্ম্মবাহুল্য এই অবস্থাটাকে পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং স্বভাবতই ইহাকে অতি গুরুতর বাধা বলিয়াই আমরা মনে করিতে পারি। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, আমাদের দোষেই এই গুলি এত কঠিন বাধা হইয়া দাঁড়ায়, প্রকৃত পক্ষে তাহারা তাহা নয়। সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য আমাদের উন্নতি ও বিকাশের জন্যই মঙ্গলময় বিধাতা ব্যবস্থা করিয়াছেন; আমাদের সংকল্পিত ব্যবস্থা ও প্রণালীর বিরোধী যে সকল ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহারই মঙ্গল বিধানে ঘটে, আকস্মিক ভাবে কোনও কল্যাণবিরোধী শক্তি বা ইচ্ছা হইতে আসে না। জগতে সেরূপ কোনও দ্বিতীয় শক্তি বা ইচ্ছা নাই। অপর লোকের ইচ্ছা হইতে যাহা প্রসূত হয়, তাহাও তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত আমার নিকট আসিতে পারে না,—তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য আসিতে দেন বলিয়াই আসিতে পারে। সকল সময় আপনার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার সুযোগ যে এ জগতে কেহই পায় না, তাহা হইতেই ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিলে প্রত্যেক ঘটনার মূলে তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় ও জীবন্ত বিধাতৃত্বই দেখিতে পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই সকল কর্ত্তব্য যদি তাঁহারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাঁহারই অনুগত হইয়া, সম্পন্ন করি এবং আমাদের অনভিপ্রেত বিপদ আপদ বাধা বিঘ্ন যাহা কিছু আসে, তাহা যদি তাঁহারই মঙ্গল ব্যবস্থা জানিয়া অবনত মস্তকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করি, তাহা হইলে এই সকলের দ্বারা আমাদের উপাসনার সাহায্যই হইতে পারে, তাহা আরও সত্য এবং গভীরই হইয়া উঠিতে পারে। পথে ঘাটে চলিতে ফিরিতে কর্ম্মব্যস্ততা ও জনকোলাহলের মধ্যেও, আমরা অন্তরে সত্য উপাসনার অবসর পাইতে পারি, প্রার্থনা স্মরণ মনন চিন্তা ধ্যানের সময় ও সুযোগ পাই। ইহার কিছুই অন্তরের কার্য্যে কোনও বাধা উৎপন্ন করিতে পারে না। যখন আমরা অন্য ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া কাজ করি, তখনই তাহা শুধু বাধাস্বরূপ নয়, মহা অনিষ্টকারীও হইয়া উঠে,—আমাদিগকে উন্নতি ও কল্যাণের পরিবর্ত্তে অবনতি ও অকল্যাণের পথেই লইয়া যায়। আর, সংসারে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, অলস অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিরই সময়ের অভাব হয়, যাহারা যত অধিক কর্ম্মে নিযুক্ত তাহারা তত বহু কাজের জন্য যথেষ্ট সময় পায়, কখনও তাহাদের সময়ের অভাব ঘটে না। চেষ্টা যত্ন ও ইচ্ছা থাকিলে অনায়াসেই সময় করিয়া লওয়া যায়।

বিশ্ববিধাতা আমাদিগের পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গল উন্নতি অবনতি একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন,—আমরা কোনও বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া চলিতে পারি না। ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধেও এই সঙ্গ ও সাহায্যের কত প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা আমরা সকলেই জানি। তেমনি কুসঙ্গের দ্বারা কিরূপ অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহাও কাহার অবিদিত নহে। এই কুসংসর্গ একটি গুরুতর বাধা। যে স্থানের বায়ু দূষিত হইয়া গিয়াছে, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যেমন স্বাস্থ্যলাভের জন্য স্বাস্থ্যকর বায়ুর মধ্যে যাইতে হয়, তেমনি বিরোধী সংসর্গ হইতে সর্ব্বথা দূরে থাকিয়া, সৎসঙ্গে বাস না করিলে, প্রাণের সরস ভাব রক্ষণ ও বর্দ্ধন করা যায় না। এই জন্য জীবিতের ও মৃতের উভয়ের সঙ্গই করিতে হয়। সৎগ্রন্থপাঠ ও সাধুজীবনী আলোচনার দ্বারা এইরূপ সঙ্গ করা সকলেরই আয়ত্তাধীন। ইহার জন্য অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। এইরূপ সুযোগ হইতে কেহই বঞ্চিত হইতে পারে না। জীবিত লোকের সঙ্গ করার সুযোগ সকল সময় সকলের পক্ষে না ঘটিতে পারে। যে সকল সংসর্গ আলাপ আলোচনাতে ধর্ম্মভাব ম্লান হয়, উপাসনার ব্যাঘাত জন্মে, তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এরূপ বন্ধুবান্ধবদের সংসর্গে যে কি গুরুতর অনিষ্ট হয়, অনেকে তাহা ভাবিয়া দেখে না; আর, যাহারা তাহা একটু অনুভব করে, তাহাদেরও অনেকের সেই সাহস নাই যে, সেস্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে। ইহা দ্বারা যে কত জনের কিরূপ মহা অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রত্যেক কল্যাণার্থী ব্যক্তিকে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। এই বাধাকে যেরূপেই হউক দূর করিতে হইবে। শুধু তাহা করিলেও যথেষ্ট হইবে না। তৎপরিবর্ত্তে সাধুসঙ্গও যে বিশেষভাবে করিতে হইবে, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কথা বলিয়া উপাসনা করিবার অভ্যাসটি আর একটি গুরুতর বাধা। আমাদের সামাজিক উপাসনাতে আচার্য্যকে কথা বলিয়া উপাসনা করিতেই হয়। আজ সে সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত নির্জ্জন উপাসনাতেও অনেকে কথা বলিয়া উপাসনা করিতে অভ্যস্ত। সে সম্বন্ধে একটা কথা বলা আবশ্যক বোধ করিতেছি। এই কথা বলিয়া উপাসনা করিবার অভ্যাস বশতঃ যে অনেক সময় কথাগুলিই অভ্যস্ত হইয়া যায়, প্রাণ কথার পশ্চাতেই ধাবিত হয়, তাহাতে সাময়িক একটা ভাবের উচ্ছ্বাস হইলেও যে তাহা হৃদয়ের গভীর স্থলে সকল সময় প্রবেশ করে না, উপাসনা যে অনেক সময় প্রাণহীন চিন্তা বা মিথ্যা মন্ত্রোচ্চারণমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সকল সময়ই যে এরূপ হয় তাহা অবশ্য কেহই বলিবে না। হৃদয়ের সত্য ও গভীর অনুভূতি হইতেও বাক্য বাহির হইতে পারে,

অনেকের অনেক সময় তাহা হইয়াও থাকে। তথাপি উহাতে যে উক্ত প্রকার বিপদ রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নীরবে উপাসনা করিতে বসিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার পর, যাহাকে সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিতে হয়, তাহার এ ক্ষেত্রে একটা অতিরিক্ত বিপদ রহিয়াছে। তাহার দৃষ্টি অন্তরের দিকে না থাকিয়া বহিপ্র্রকাশের দিকে, মনমুগ্ধকর বাক্যবিন্যাসের দিকে নিবদ্ধ হইতে পারে। বিষয়ে যদি আমরা সর্ব্বদা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করি, তবে উপাসনা মিথ্যা প্রাণহীন বাহ্যিক আড়ম্বরে পর্য্যবসিত হইতে পারে। তাহা হইলে অপরাপর ধর্ম্মের বাহ্যিক পূজা ও অনুষ্ঠান হইতে যে ইহার কোন পার্থক্যই থাকিল না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহার অনিষ্টকর ফলও আমাদের অবিদিত নাই। প্রাণহীন মন্ত্রোচ্চারণ নামজপ প্রভৃতির কুফল আমাদের চারিদিকে অনেক রহিয়াছে। আমাদের নিজ জীবনেও তাহার পরিচয় না পাই, এমন নহে। এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এই বাধা দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে। যদিও কথা না বলিয়া উপাসনা করিতে গেলে প্রথমে বড়ই সংগ্রামের মধ্যে পড়িতে হয়, উহা নিতান্তই ক্লেশকর ও ব্যর্থ চেষ্টা বলিয়া বোধ হয়, তথাপি আমাদের বিবেচনায় তাহাই করা শ্রেয়স্কর। কালে তাহাতেই উপাসনা সত্য স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া উঠিবে।

অনেকে উপাসনা বলিতে শুধু চিন্তা, বুদ্ধি বিচার দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধীয় কতকগুলি তত্ত্বের আলোচনা বা মন্ত্রের অর্থ অনুধাবন করা, বুঝিয়া থাকেন। ইহাতে ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অনুভূতি নাই, শুধু চিন্তা ও কল্পনার সাহায্যে মনের মধ্যে ঈশ্বরের রূপ গড়িয়া তাঁহার পূজাতে মিথ্যা তৃপ্তিবোধ জন্মে। ইহাও একটা অতি গুরুতর বাধা। অতি সূক্ষ্ম বাধা বলিয়া অনেক সময় ইহা ধরিতে পারা যায় না। তাই বলিয়া অনেক সময় ইহা বুঝিতেই পারা যায় না। এই জন্য বহু লোক ইহাতে বিভ্রান্ত হয়। এ বিষয়ে পূর্ব্বে অনেকবার অনেক কথা বলিয়াছি। আজ আর বিস্তারিত আলোচনা করিব না। কিন্তু এই সূক্ষ্ম বাধাটিকে অতিক্রম করিতে না পারিলে আমরা কিছুতেই খাঁটি সাক্ষাৎ ব্রহ্মোপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব না, এই কথা ভুলিলে চলিবে না। তাই সর্ব্বপ্রযত্নে এই বাধাটি দূর করিতেই হইবে।

আর একটি অতি গুরুতর বাধা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি বা সাধন ভজনের অহঙ্কার,—ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর না রাখিয়া আপনার শক্তি সামর্থ্য চেষ্টা যত্নের উপরই একান্ত আস্থাস্থাপন। ইহা যে কি প্রকার অনিষ্টকর তাঁহা সকলেই জানি। কথিত আছে অহঙ্কার স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছে এবং সেখান হইতেও সাধককে ভূপতিত করে। এই কথাটাও বহুবার আলোচিত হইয়াছে। ইহা দূর না করিতে পারিলে সত্য সাক্ষাৎ উপাসনা কিছুতেই হইবে না।

এই সমস্ত বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। আমরা সকলে সাক্ষাৎভাবে সত্যস্বরূপ প্রেমময় জীবন-দেবতার উপাসনা করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই, নিত্য কল্যাণ ও উন্নতির পথে অগ্রসর হই। আমাদের সকলের জীবনে তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

# অমর কথা ( ২৪ )

## অমৃতের ব্যাখ্যা।

### চতুর্থ ধ্যান।

#### পুনর্মিলন

তুমি দিলে, তুমি নিলে,
তবে কেন কাঁদি আমি ?
দুখের শয়ান রচি'
কেন জাগি দিন যামি ?
বেদনার গানে কি গো
ত্যাগের সুরটী বাজে,
ন্যায়দাতা প্রাণসখা,
তোমারি করুণা সাজে ?
আমার আমার যত,
সবই ত তোমারই বোলে,
দেছ সখা মিশে যেতে
অনন্ত সিন্ধুর কোলে।
কে বলেছে শেষ হলো
মরণমধুর রূপে,
জননীর ব্যথা সব
ভু'লে যাও চুপে চুপে ?
অনিমেষ আঁখি জাগে
বেদন-পুলক সাজে,
খুলে যায় গানখানি,
সে কোন্ মুরলী বাজে ?
শুদ্ধ নিবিড় তান,
প্রেমের পুলকদান,
ভ'রে ওঠে কোন্ সুরে
কাহার মধুর গান ?
জানি কি বা কেন বঁধু
ভেঙে দিল রূপখানি,
স্বরগ-আশীষধারে
কি জানি কি দিবে আনি !
কেমনে কাড়িবে সখা,
দিলে যা আমার ক'রে ?—
রাখ বুকে ক্ষতি নাই,
তোমারি প্রেমের ঘরে।
মোর ধন তোমা কাছে,
এতো নয় কেড়ে নেওয়া—

অনন্ত উদার দান
একেবারে সঁপে দেওয়া!
আঁখি ভাসে জলধারে,
আপন আবেগভরে,
উৎসারিত প্রেমসিন্ধু
ছুটে যায় কা'র তরে?

———

তবু সে সলিলমাঝে
কি বেদন-তীর্থ হাসে,
অফুরন্ত ভালবাসা
তোমারি স্বরগবাসে।
মিলন-মন্দির গড়ে
প্রেমের মহিমা-বরে,
দেখা হবে, মিলে যাব,
প্রাণে প্রাণে এক ক'রে।
মরণ ছিঁড়েছে ডোর—
ক্ষণিক দেহের বাঁধ—
খুলেছে তাহারি সনে
যত কিছু মোহ ফাঁদ।
অনন্ত অসীম প্রেমে
কোথা হায় শেষ তার!—
তোমারি মহিমামাঝে
পরেছে অমৃত হার।

হৃদয়রক্তরঞ্জিত অসহ্য ব্যথার ক্ষত গভীর থেকে গভীরতর হউক। ছুটুক রক্তধারা নিত্য নূতন ক'রে। গাই আমার অব্যক্ত গোপন ব্যথার কাতর গানখানি নিত্য নূতন ক'রে। ওগো আমার ভালবাসার ধনেরা, কোথায় তোমরা? আজ নীরবে বিরহবেদনগান বুকের তারে ভাল ক'রে রণিয়ে তোল। যখন রূপের ঘরে ছিলে, কত আমার স্নেহ প্রেমের আনন্দ-প্রকাশ কত ছন্দে, কত সুরে, কত প্রেমসোহাগচুম্বনে, কত আনন্দ-উচ্ছ্বাসে! আজ ত সব শেষ, ভস্মমুঠি বুকে ক'রে কি কথা বলি বল ত? এখন কেবল চোখের জলেই, ঘন দীর্ঘশ্বাসের অব্যক্ত হা হুতাসের ভিতরই, আমার স্নেহ প্রেমের বুকফাটা নিবেদন। এখন ব্যথার পূজার ভিতরই নিত্য স্মৃতি-অর্ঘ্যনিবেদন। আমার নিঃসঙ্গ যাত্রাপথে কোথায় সে আনন্দময় রূপখানির নিত্য সাহচর্য্যের ভিতর পুলকস্পন্দন? চলেছি শূন্য হাতে, রিক্ত কাতর হৃদয়ে, নিবিড়তম বেদনায় কেবলই ব্যথিত পীড়িত হ'য়ে। আজ নয়নজলে নীরবে উদাসপলকে কেবলই ঊর্দ্ধে দৃষ্টি উধাও হ'য়ে যায়, আর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ওঠে প্রাণ। অন্তরতম অন্তস্থল থেকে ব'লে উঠি, ওগো ভগবান্ অন্তর্য্যামী বিধাতা, আমার এ কি কোরলে? কেন আমার হৃদয়-ঘরকে প্রেমালোকে আলোকিত ক'রে আবার এমন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললে? কেন জীবন-প্রভাতেই প্রিয়ধনেদের আমার বুক খালি ক'রে ডেকে নিলে? কেন তবে এত ভালবাসা, এত আনন্দ-লীলা? কেন আমার আনন্দ-কুঞ্জ নিত্য নূতন মাধুরীতে ভ'রিয়ে দিলে? তবে কেন আরও নিবিড়তম আনন্দ ঢেলে দিলে না? কেন মৃত্যুর কালো ছায়ায় চকিতে সে প্রেমানন্দহসিত উজ্জ্বল স্বরূপখানি চিরদিনের মত নীরব ক'রে দিলে?

এ ক্লান্ত যাত্রাপথে কত নূতন বন্ধু এলেন! কিন্তু কই আমার শূন্য বুকে তাঁদের সে স্থান? আমার যা কিছু সবই ব্যর্থ দীনতার দৈন্যে দীন অবসন্ন। আমার প্রার্থনা ব্যর্থ, আমার প্রতীক্ষাও বা ব্যর্থ, সবই বিফলে অবসান। এখনও হয়ত সকলে ভালবাসেন, কিন্তু হারাণ ধনের সে শূন্যস্থান ত কেউ পূর্ণ করতে পারল না! হৃদয়ঘরে একবার যেখানে যাঁর আসন পাতা হ'য়ে গেছে, সে ত শূন্য প'ড়ে রইল—সে আসনে কে বসবে? কে সে অভাব মেটাবে? তাই ত ব্যথার ঘন অবসাদের ভিতর আমার প্রেমপূজার নিত্য নীরব সাধনা। তাই ত বুকের ঘরে প্রিয় সখার মরণ-বেদীতলে আমার বিরহকাতর প্রেমমুগ্ধ বিশ্বস্ত হৃদয়ের নিত্য নীরব পূজার অর্ঘ্যরচনা। যে দিন আমার জীবন-সমাপ্তি, সেই দিন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হৃদয়ের এ কাতর প্রতীক্ষার আকুল জাগরণের পালা চ'লবে। তার পর জানি না সে কি অব্যক্ত মিলনানন্দ-অনুভূতি।

কেন তোমরা আমায় আর সান্ত্বনার কথা বল? তোমরা কি আমার প্রিয় ফিরিয়ে দিতে পারবে? কালে আমার গভীর ব্যথার বহির্মুখীন প্রকাশ-অবসান হয়ত জগত আর দেখতে পাবে না, কিন্তু অন্তঃপুরে হৃদয়নিভৃতে আমার যে দিনরজনী আকুল প্রতীক্ষা, সে ত চিরদিন জাগ্রত হ'য়ে রইল! আমি যতই কেন জগতের কাছে তা গোপন রাখতে চাই না, আমার মর্ম্মকাতর প্রতীক্ষাত ফুরোবে না! তবে কেন আর সান্ত্বনার কথা?

বল ঠাকুর! তবে কেন আমার কাতর প্রার্থনা বিফল হ'য়ে গেল? দয়া কি নেই তোমার? যা করবার তাই কোরলে, আমার বুকের ধনের সব শুব্ধ হোয়ে গেল, হৃদয়স্পন্দন থেমে গেল, সর্ব্বশক্তিমানের ইচ্ছারই জয় হইল। দেহমুক্ত আত্মা কে জানে কেমন ক'রে নব যাত্রাপথে আনন্দমহিমালোকে অগ্রসর হোলেন।

তোমরা আমায় কি সান্ত্বনার বাণী শোনাবে বল ত! তোমরা বল, 'কেন কাঁদ জননী, তোমার সন্তান যে বড় সুখে আছে', হয়ত বল 'তোমার সাধ্যত নেই তাকে সেই মুক্ত দিব্য-ধামের মহানন্দযাত্রা থেকে ফিরিয়ে আন। যিনি সকল দুঃখের পরপারে জয়গৌরব লাভ করেছেন, তাঁকে আর কেন এ বেদনা-সম্ভোগের দেশে পুনরাহ্বান?' ওগো এ কি দীন আশ্বাসবাণী! জানিত আমার প্রাণের পুতলি সুখে আছেন, আরামে আছেন, তাতে আমার রিক্ত কাঙাল প্রাণের ক্ষুধা মেটে কই? আমি যে কাঙাল রিক্ত, প্রেমধনে বঞ্চিত লাঞ্ছিত, আমার আশা আনন্দ আরাম গৃহ কোথায়? আমার প্রিয়ধনের দিব্যালোকে আনন্দ-সমাধির ভিতর সকল কামনার অবসান হয়েছে, কিন্তু তাতে আমার ক্ষতিপীড়িত রিক্ত জীবনের শান্তি আরাম কোথায়? কোথায় আমার প্রাণের আনন্দ-প্রতিমা? তখন মনে হয়, হায়, অভাগা মানব, কোথায় তোমার জন্য দয়া? ওগো দয়াময়!

কোথায় দয়া? দেখ নিরাশাকাতর হৃদয়ের কত দীন অভিযোগ! বল দয়াময়, রোগশয্যায় ভীষণ ব্যাধির অব্যক্ত যাতনার ভিতরও কি তুমি আছ? তোমার প্রেমাবেষ্টনে তখনও কি নিবিড় ক'রে ধ'রে আছ? ওগো, তুমি যে প্রেমের ঠাকুর, যখন মানুষ আর সহ্য ক'রতে পারে না, তখনই তাকে সংজ্ঞাহীন ক'রে দাও, তার দৈহিক বেদনার আর অনুভূতি থাকে না। অথচ আমি ত আমার প্রিয়ের সংজ্ঞাহীন দেহের সংগ্রাম দেখিতে পারি না। ভয়ে ভীত চঞ্চল হ'য়ে উঠি। দৈহিক মানসিক বেদনায় অধীর হ'য়ে যাই। ওগো পিতা! দেখ তোমার দুর্ব্বল সন্তানের অধীর আকুলতা। কেন তোমার এ দেওয়া, আবার কেন তুলে নেওয়া, তুমিই জান।

কেন নিলে বল ত ভগবান! আমি কি অপরাধ করেছি? আমি ভালবাসার মোহে মুগ্ধ, তাই কি এ কঠোর বিধান? আমি কি নিবিড় শান্ত যোগের অযোগ্য, তাই এ অমোঘ বজ্রপাত! সত্যি ঠাকুর, স্বীকার করি অন্ধ আমি, মুগ্ধ আমি, ভালবাসার ধনদের বুকে জড়িয়ে ধরতে চাই, চোখে চোখে রাখতে চাই,—সমস্ত হৃদয় মন ঢেলে দিয়েও ক্ষুধা মেটে না, সইতে পারি না ক্ষণিক ব্যবধান, মনে করি যে রত্নের সন্ধান পেলাম তা বুঝি আমার চিরদিনের।

অজানা ভাগ্যবিধাতা! এ কথাত জানিয়ে দিয়েছ—এ পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয়, জানি ত একজন না এক জনকে অগ্রগামী হোতেই হবে। তাই যখন প্রথম প্রিয়সখার হাতখানা চেপে ধরি, নিত্য সঙ্গী মনে করি, সেই মুহূর্ত্তেই ত একদিন বিচ্ছেদসম্ভাবনা, এই ভবিষ্যৎবাণী কাণে কাণে বলা হোয়ে যায়! যখন অপত্যস্নেহে গদ গদ হোয়ে প্রাণপুত্তলির আনন্দস্বরূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ হোয়ে সে বদন সুন্দর স্নেহচুম্বনে সোহাগে আচ্ছন্ন কোরে ফেলি, তখনই ত গোপনে গোপনে জানিয়ে দিয়ে যাও যে, এক দিন হয়ত এ ধন থেকে বঞ্চিত হোতে হবে। তাই সেই মুহূর্ত্ত থেকে প্রস্তুতির কথা—একদিন বিশ্বরাজের, আনন্দময়ের, আনন্দবেদীতলেই তাঁর আনন্দদান তাঁকেই নিবেদন করতেই হবে।

হায় রে হায়! এ কি মোহ! ভুলে যাই সত্যস্বরূপ, ভুলে যাই বিচ্ছেদবেদনার কথা ক্ষণিক আনন্দসম্ভোগের ভিতর, তাই ত বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের আয়োজন হয়, তাই ত চমকে উঠি, তাই ত গভীর মর্ম্মন্তুদ বেদনায় ছটফট্ করি।

ওগো পরম পিতা, তোমার জগতে অফুরন্ত দান, অফুরন্ত সম্ভোগের বস্তু, অথচ কোন কিছুতেই একেবারে মুগ্ধ হোয়ে, আসক্ত হোয়ে, থাকতে দেবে না। এখানে ত চিরদিন থাকব না, তাই ত নিত্যানন্দসম্ভোগ এ জগতে চিরদিন রাখনি! এ কি তোমার বিচিত্র লীলা, বিচিত্র বিধান! এ জীবন যে অনন্ত জীবনেরই মঙ্গলপ্রভাত। আত্মালোকে পুণ্য পবিত্রধামের প্রথম ভিত্তিস্থাপন এই ক্ষণিক চেতনলীলায়। তাই সর্ব্বদাই শেখাচ্ছো ঐহিক ক্ষণসম্ভোগে নিত্য সুখ নাই, সত্য জীবনলাভেই অনন্ত পথের নিত্য পাথেয়। ওগো ঠাকুর! এ সংসারে যা কিছু সবই ত তোমার—আমার কোন্‌টা বল? হায়রে মোহমুগ্ধ মন! জীবনের চরমগতি ভু'লে গিয়ে এ কি ব্যথার মোহঘন জঞ্জাল!

জনকজননীর মৃত্যুমলিন হিমকঠোর রূপখানির ও কি স্বরূপমাহাত্ম্য! যে জনক জননীর স্নেহসরস ধারায় এ জীবন নিত্য নূতন কোরে গ'ড়ে উঠেছে, যে বরাভয় আশ্রয় সন্তানকে সকল দুঃখ ঝঞ্ঝার ভিতরও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে, যে স্নেহকাতর প্রাণ সন্তানের কল্যাণকামনা করেছে, আজ যে প্রাণ চায় সে জনকজননীর পা দুখানি বুকে জড়িয়ে চোখের জলে হৃদয়ের ভক্তিধারায় ধুয়ে দিতে।

প্রাণপুত্তলির মরি কি শান্ত আরাম মহানিদ্রাবেশ! কত দিন যামিনী দেহমন পাত কোরে ওকি আমার মালা গাঁথা! মাতৃস্নেহের কি সুনির্ম্মল স্বরূপ! মৃত্যুমলিন বদনকমলেও সন্তানের কি দিব্য জ্যোতি! কি শান্ত বিমল পুণ্য বিভা! বুকের স্তব্ধ স্পন্দনের ভিতরেও ওকি নিবিড় স্নেহের পরিচয়! চির বিদায়ের গান গেয়ে যায়, আমার বাছা যে একেবারে নীরব হোয়ে গেল, তবু ওকি স্বরূপ! এ কি বিরহ! উঃ শোকাতুরা জননীহৃদয়ের অব্যক্ত বেদনার সান্ত্বনা কোথায়? কেবলই চির নীরবতা, অনন্ত সমাধি!

হায় হায়! অভাগিনী পতিবিরহবিধুরা সতীর আজ কি আলুলায়িত কেশ, স্খলিত বেশ! পতির শবদেহ বুকে ক'রে মরি কি বিচিত্র স্বরূপ! অবলুণ্ঠিতা শোকাবনতা শুদ্ধ নারীমহিমা! কাঁদ কাঁদ অভাগিনী, আজ ঢাল ঢাল কোরে অশ্রুজল—সে পুণ্য সলিলধারায় প্রেমাস্পদের চরণযুগল ধৌত ক'রে দাও। আজ অব্যক্ত বুকফাটা মর্ম্মবেদনা কে বুঝবে? ওগো কেন এ বিরহগান, কেন এ অভাগিনীর নিঃসঙ্গ ব্যর্থ জীবনযাত্রা?

কত আর বলি বল? ভাই ভগিনীর মৃত্যুমলিন রূপখানিরই বা কি গম্ভীর সত্তা! এ কি পরীক্ষা! কেন হৃদয়নিভৃতে এ স্নেহ প্রেমের উৎসধারা? কেন হৃদয়ের কোমল ভাবরাশির এ বিচিত্র স্পন্দনরহস্য? কেন এ ব্যাধির নির্ম্মম পীড়ন? কেন এ বিরহতাপ, অসহ্য বিরহজ্বালা? আমার সাধ্য কি এ বিচিত্র রহস্য ভেদ করি! যতই ভাবতে যাই, ততই ক্ষুদ্র বুদ্ধি পরাস্ত হোয়ে স্তব্ধ হোয়ে যায়।

ওগো পুণ্যময় মঙ্গল দেবতা! আমি শোকাকুল হৃদয়ে কত অভিযোগ করি, কিন্তু আমি কি জানি কিসে পরম কল্যাণ? এই চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর সংসারের কেন এ বিচিত্র অভিজ্ঞতাদান, তুমি জান ঠাকুর। তবে শান্ত হই, তবে তোমার সত্য বাণী শুনে চলবার শক্তি দাও। যদি দুঃখ বেদনা আমায় নবতর অভিজ্ঞতা দান করে, নবতর সত্য শুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দেয়, তবে দাও ঠাকুর, নিত্য নব চেতনা নিত্য নব বেদনার দানে। মেনে চলবো তোমার আদেশ, শিবতত্ত্বে সমস্ত উৎসর্গ করি। কেন ব্যর্থ অভিযোগ? পরম কল্যাণময় তাঁর ইচ্ছারই জয় হউক। আমার সসীম দৃষ্টি অসীমের মহিমাতত্ত্ব কি বুঝবে? কত ভুল, কত ভ্রান্তি আমার!

বিধাতার মহিয়সী ইচ্ছার ভিতরই সকলের মহাযাত্রা। যিনি অগ্রগামী তিনি কেন গেলেন আমি কি জানি? জানি

কি মঙ্গল লক্ষ্যসাধনা প্রতি জীবনের প্রথম শুভ মুহূর্ত্তেই তার সূচনা চলেছে, তাই কালে বিকশিত হোয়ে উঠ্ছে। আবার মরণসখার আহ্বানে চলেছেন সকলে, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের সকল বিজ্ঞান পরাস্ত। জীবন-আলোক সহসা নির্ব্বাপিত হোয়ে যায়। সকল চিকিৎসা চেষ্টা যত্ন বিফল হোয়ে যায়, বিধাতার ইচ্ছারই জয়। ক্ষুদ্র মানুষ সে ভূমা মহানের অগম্য অপার লীলা কেমন কোরে বুঝ্বে? তাঁর ইচ্ছাতেই প্রিয়ধনের মহাপ্রয়াণ, তাঁরই দেওয়া নয়নজলে আমার এ বেদনার গান।

ওগো প্রেমময়! একবার প্রেমবন্ধনে যে হৃদয়ের অনন্ত যোগ-বিধান করেছ, তা আর কেমন ক'রে ছিন্ন হবে? কে বলে আমার প্রিয় হারিয়ে গেছেন? যা বিধাতার দান তা কেমন ক'রে হারাবে? ইহকাল পরকাল সবই একই বিশ্বপাতার আনন্দ-বুকে। জানি সকলে আছে, আমার প্রেমমুগ্ধ হৃদয় দেখ কত আকুল, প্রেম কেমন ক'রে ফুরোবে ওগো প্রেমময়?

নব আনন্দলোকে তোমার শুদ্ধ পূর্ণ মঙ্গলসত্তা লাভ কোরব। আমার যখন নয়নজলে বুক ভাসে, না জানি দিব্যধামবাসী তোমরা তখন কি শাশ্বত আনন্দসম্ভোগে নিমগ্ন! যখন আমি কম্পিত কণ্ঠে তোমাদের নাম করি, না জানি তখন তোমরা কি আনন্দসম্ভোগে নিমগ্ন! যখন আমি কম্পিত কণ্ঠে তোমাদের নাম করি, না জানি তখন তোমরা কি আনন্দে আমার নবযাত্রার কথা মনে কর! ধন্য মহিমাময়ী আত্মা। আমার দেহের ঘরে সে বিদেহীর আনন্দ-উপলব্ধি কেমন ক'রে ধারণা করি? হয়ত তুমি আমার যাত্রাপথে এখনও দিব্যপথের সহায় ও সাথী হোয়ে আমাকে কল্যাণের পথেই আহ্বান কোরছ।

না গো না, বিচ্ছেদ নাই, বিশ্বভুবন একেরই লীলা। এ-ধরণীর বুকে তাঁরই আনন্দ ছায়া, অনন্তের পরিচয়। আমি এ লোকে আনন্দ সম্ভোগ করি, ও-লোকেও অনন্ত আনন্দ উপলব্ধি কোরব। আমার সকলেই একের বুকে। আমি কি জানি কেন এখনও আমার দেহের লীলা? জানি কি কি জন্য আছি এ সংসারে? জানেন ইচ্ছাময়, তাঁর কি ইচ্ছা পূর্ণ হবে, আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে। একদিন ত যাবই, আজই হউক কি এক বৎসর পরে, কবে কে জানে? একদিন সে নব প্রভাত উদয় হবেই হবে। প্রভাতালোকে ব্যর্থ স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে যায়! সেই নব প্রভাতে কেমন কোরে জেগে উঠ্ব কে জানে? আবার পুনর্মিলন, আবার প্রেমসম্মিলন, সেই জন্য এতদিন কেঁদেছিলাম? তবে প্রাণে প্রাণে নিত্য যোগের অব্যক্ত আনন্দে যোগযুক্ত হোয়ে থাকি। ধন্য যোগানন্দ! ওগো যোগসুন্দর, নত হই, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণত হই। পুনর্মিলন! এ কি সম্ভব? কেমন ক'রে তা আশা করি, কোথা থেকে তা সম্ভব হবে?

ওগো বিধাতা, তুমি আমার আত্মাকে শুদ্ধ লোকে জন্মদান করেছ, কত আশার কথা শুনিয়েছ! কত ভক্তজীবনে সে মহীয়সী ইচ্ছার জয়লীলা সংসারে! যেজন্য কেঁদে মরি তা ত ক্ষণিক, একদিন সব কিছুর অবসান হবে। এমন কি, ধূলিময় সংসারেও কেবলই মিলনের গান। অণু পরমাণু সবই মিলনের পথে ছুটেছে। চেতন অচেতন সব কিছুর গতি একই মিলন-মঙ্গলযজ্ঞে। সবই আকর্ষণের শক্তিতে আকৃষ্ট। এই মিলন-মন্ত্রের ভিতরই জগতের পরম সৌন্দর্য্য, পরম শৃঙ্খলা।

আলোকে আলোকেই মিলন, ধূলিতে ধূলিতেই মিলন। জলবিন্দু নদনদী সমুদ্রগর্ভ থেকে বাষ্পরূপে উধাও হয়, আবার জলবিন্দুতেই পরিণত হয়। এক স্বভাববিশিষ্ট যত বিন্দু সব মেশামেশি হোয়ে একের মাহাত্ম্য প্রচার করে। যা কিছু ভিন্ন-মুখীন তা বিভিন্ন পথে ছুটে যায়। মঙ্গলবিধাতা পরম প্রেমময় ব্রহ্মানবুকে সে প্রেমধারা উৎসারিত করেছেন, আত্মার ধর্ম্ম প্রেমধর্ম্মী, শুদ্ধ পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপের ভিতরই সার্থকতা লাভ কোরবে। যদি এই দেবনিয়ম মিলনমহিমা জড়জগতেরে এই বিচিত্র স্বরূপ দান করে, তবে কে জানে দেবলোকে সে মহিমা কেমন ক'রে মহিমান্বিত হবে?

যে রূপখানির ভিতর আমার প্রিয়ধনদের পরিচয় হোয়েছিল, ধূলির দেহ ধূলিতে মিশেছে, কিন্তু যে সত্যস্বরূপ প্রেমস্বরূপ প্রেমের উৎসখনি আত্মপুরে জন্মলাভ করেছে, সে ত অমর অক্ষয়-স্বরূপ। এই নশ্বর দেহখানির প্রতি আকর্ষণ হবেইত। এ যে আমার প্রিয়ধনদের আবাসগৃহ, তাইত এত ভালবাসি। একদিন এ আবরণ-উন্মোচন হোয়ে যাবে। কে জানে সে বিদেহী আত্মার সহিত কেমন কোরে পরিচয় লাভ হবে? কত সন্দেহ সংশয় কুহেলী জমে ওঠে। কেন এ বৃথা কল্পনা জল্পনা? দেবশক্তি, দেবমহিমাতত্ত্ব আমরা কি বুঝি? অণু পরমাণুর সমষ্টির ভিতরই বা আমার চেতনময়ী আত্মার পরিচয় কি কোরে পাই, তা কি আমরা জানি?

এ কি ঐন্দ্রজালিক শক্তি কেমন কোরে নব বসন্তাগমে উদ্ভিদ-জগতে ফলে ফুলে নব ছন্দলীলা জেগে ওঠে, কেমন ক'রে বিচিত্র বিভিন্ন অস্তিত্বের স্বরূপ লাভ করে? কেমন কোরে পরাগরাশি বিচিত্র লক্ষ্যসাধনে অসংখ্য ফুলদলে ছড়িয়ে পড়ে, নব প্রাণের সূচনা করে, নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যের ভিতর বনে উপবনে কুঞ্জকাননে কত মনোহর মঙ্গল শোভা বিকসিত হোয়ে ওঠে! কেমন কোরে হয়, কি কোরে হয়, কে বোলতে পারে সেই বিচিত্র রহস্য? এ জগতের অব্যক্ত রহস্যলীলার ভিতরই অনন্তের পরিচয়দান। যে অনন্ত শক্তিতে ক্ষুদ্র পরাগরেণু-কণাটী বিচিত্র শক্তিলাভে চেতনাশক্তির ভিতর নব নব বৃক্ষের জন্ম-ইতিহাস বহন করে, সেই সর্ব্বশক্তিমানের মঙ্গল রহস্যের ভিতরই অনন্ত জীবন অপেক্ষা করে। তাইত মৃত্যুর পরপারে অমৃতধাম, মিলননিকেতন। তাই ওগো প্রিয়ধন, অনন্তে জাগরণ, এ-লোকে ও-লোকে অনন্ত যোগ। যেখানেই থাক সুখে থাক। তোমাদের অবর্ত্তমানে আমার দুঃখ বেদনা চির জাগ্রত হোয়ে থাক। যেদিন মঙ্গল আবাহনে ডেকে নেবে, সেদিনই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার জয় হবে। আমি জানি, সে ইচ্ছা আমার কল্যাণের পথেই আহ্বান ক'রবে, তাই কঠোর নীরস কর্ত্তব্যসাধনার ভিতরই চলেছি আমার গান গেয়ে। পাপ অপরাধ দেখ আমায় দূরে নিয়ে যায়, আর তোমাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করে।

তোমাদের মৃত্যুবেদনায় আমি নিষ্পেষিত পীড়িত, কিন্তু

আত্মার আনন্দ-অনুভূতির তুলনা নাই। তোমরা আত্মযোগে যুক্ত হ'য়ে আছ, তোমাদের ভালবাসা এ ধরণীকেই দেবলোকে পরিণত ক'রেছে।

ওগো দিব্য পিতা, তুমি আমাদের সকলের পিতা। একদিন প্রিয়বিচ্ছেদে আকুল হ'য়ে নয়নের জলে অভিযোগ কোরেছিলাম, ওগো আমার ভাগ্যবিধাতা, এ কি কোরলে? এখন দেহান্তে তেমনি ক'রে দুহাত তুলে ধন্যবাদ দিই। ভালই করেছ সখা, সকলকে নিয়েছ, তাই আনন্দে চলেছি ভবপারাবারে। প্রিয়বিরহ আমার দেহ মনকে ভেঙ্গে দিয়েছে, তাই ত সততা সাধুতার জন্মদান করেছ এ নীরস তপ্ত বুকে। তাই ত তোমার নৈকট্য-সম্ভোগ আমার জীবনে সম্ভব হইয়াছে। তাই ত পার্থিব সম্ভোগে অতৃপ্ত হ'য়ে তোমার নিত্যসঙ্গসম্ভোগে ছুটেছি, নিত্য-বন্ধনযোগ স্থাপিত হ'য়েছে। আমি আর শুধু পার্থিব ধূলিকণা নই, আমি নিত্য দিব্যলোকবাসীর সহিত অক্ষয়যোগে যুক্ত। ধন্য তোমার দেওয়া নেওয়া।

এক সময় মৃত্যুবিভীষিকায় আমার প্রাণ চমকে উঠ্‌ত। কেমন ক'রে মরণসখার স্বরূপখানি আমি ভালবাস্‌তে শিখ্‌লাম! তোমারই মঙ্গল বিধানে সব মধুময় হোয়ে গেল। সমস্ত পুণ্য আলোকে আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌ল!

আজ সমস্ত আশার আলোকে আলোকিত, আজ ঐ মৃত্যু-পরপারে আমার নিত্য গৃহপ্রদীপখানি জ্বলে উঠেছে, আজ আমার জীবনে সত্য লক্ষ্য ফুটে উঠেছে। আজ পৃথিবীর মৃত্যু-অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় শাশ্বত লোক উজ্জ্বল হ'য়ে আস্‌ছে। ধন্য তুমি প্রেমময়, তোমার প্রেমে আমার সকল সন্দেহকুহেলী উধাও হোয়ে যাক। তোমার আদেশ মেনে চলি। তোমারই প্রেম এ-লোকে ও-লোকে, দ্যুলোকে ভূলোকে। তুমিই আত্মার আনন্দধাম।

## পরলোকগতা লক্ষ্মীপ্রভা বড়া

লক্ষ্মীপ্রভা আসাম প্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলায় এক আসামীয়া পরিবারে ১২৮৩ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ধনীরাম দাস। লক্ষ্মীপ্রভার তিন ভগিনী ও দুই ভাই ছিলেন, এক ভগিনী ও দুই ভাই অল্পবয়সেই পরলোকগমন করেন। বাল্যকালে উক্ত জেলার বালিকা-বিদ্যালয়ে মধ্য ইংরেজী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। গৌহাটী সহরের উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে 'উত্তরপার' নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত জয়রাম বড়ার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। জয়রামবাবু শিলং সহরে সেক্রেটেরিয়েট্ আফিসে কেরাণীর কর্ম্ম করিতেন। বিবাহের পর লক্ষ্মীপ্রভা স্বামীর সহিত শিলং সহরেই বাস করিতে লাগিলেন। প্রথম বয়সে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত গৃহস্থালী কর্ম্ম, আর আসামীয়া মহিলাদের প্রধান গৃহশিল্প বস্ত্রবয়নকার্য্য করিয়া সন্তোষের সঙ্গে দিনযাপন করিতেছিলেন; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পারিবারিক জীবনে গুরুতর পরিবর্ত্তন দেখা দিল। লক্ষ্মীপ্রভার কোন সন্তানাদি হয় নাই; সেজন্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোন অশান্তির লক্ষণ দেখা যায় নাই, বেশ সদ্ভাবেই তাঁহাদের দিন কাটিতেছিল। কয়েক বৎসর পরে হঠাৎ তাঁহার স্বামীর মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে লাগিল, তিনি সন্তান কামনায় পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং প্রথমা পত্নীকে কিছুই না জানাইয়া গোপনে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলেন। বিবাহের অল্পদিন পরে জয়রামবাবু তাঁহার নব-পরিণীতা পত্নীকে লইয়া শিলং ফিরিয়া আসিলেন। এই ঘটনায় লক্ষ্মীপ্রভা একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি এ অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। পতি আবার বিবাহ করিলেন তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু গোপনে কেন করিলেন, ইহাই তাঁহার নারীত্বের উপর গুরুতর আঘাত প্রদান করিল, তাঁহার মত অবস্থাপ্রাপ্ত তাঁহার দেশের শত শত নারীর তপ্ত অশ্রুজল তাঁহার বুক ভিজাইয়া দিতে লাগিল। তিনি সে সময় অশ্রুবিগলিত হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত আমার যে সমস্ত স্বদেশীয়া ভগিনীগণ পশুবৎ ব্যবহার পাইতেছেন, আমি তাঁহাদের সম্মুখে এমন দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইব, যাহাতে আমার মত অবস্থায় পড়িলে তাঁহারা আপনাদিগকে নিরাশ্রয় ও অন্যের গলগ্রহ মনে না করেন। তিনি দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন, পথ আছে, খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে। এখন দেশের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সময় এতটা উন্নত ছিল না। তাঁহার শিক্ষা সামান্য ছিল, কিন্তু তিনি অবরোধপ্রথা ও হিন্দু আইনের কঠোর শাসনের মধ্যে থাকিয়াও, হৃদয়ে উন্নত আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন অনুভব করিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, সৎপথে থাকিয়া, স্বাবলম্বী হইয়া, নারীর সম্মুখে উন্নত আদর্শ ধরিবেন। তখনই তাঁহার মনে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল। লক্ষ্মীপ্রভা আর স্বামীগৃহে সপত্নী সঙ্গে থাকিতে পারিলেন না। তিনি স্বামী ও সপত্নী কর্ত্তৃক পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন। একদিন দ্বিপ্রহর রজনীতে প্রয়োজন বশতঃ ঘরের বাহিরে গিয়াছেন, স্বামী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। স্বীয় ধর্ম্মপত্নী, হিন্দুসমাজের কুলবধূ, এই গভীররাত্রে কোথায় থাকিবেন, স্বামী একটুও ভাবিয়া দেখিলেন না। লক্ষ্মীপ্রভা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে সে রাত্রির মত অনেক আসামিয়া ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; কিন্তু নানা কারণে সেখানে বেশী দিন থাকা সম্ভবপর হইল না। অগত্যা পিতা মাতার নিকটেই যাইতে হইবে, তাঁহারা গোয়াল-পাড়ায় থাকেন, টেলিগ্রাম করিয়া আনাইতেও কয়েকদিন সময় লাগিবে, এই কয়েকদিন থাকিবার মত আশ্রয়ও তিনি পাইলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া একটি ব্রাহ্মপরিবারে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। সেখানেও তাঁহার লাঞ্ছনার শেষ রহিল না, স্বামী তাঁহার নামে নালিশ করিলেন, পরন্তু ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে ফুসলাইয়া নিয়া ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত করিয়াছেন এরূপ অপবাদ রটনা করিলেন। তখনও তিনি হিন্দুই আছেন, থাকিবার স্থান না পাইয়া ব্রাহ্মবাড়ী আশ্রয় নিয়াছেন মাত্র।* যাহা হউক,

Registered

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

| ৫৩শ ভাগ<br>১১শ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১<br>18th September, 1930. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০<br>অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য [illegible] |
|---|---|---|

## প্রার্থনা।

হে গুরু জ্ঞানদাতা, তুমি এই সংসারের মোহান্ধকারের মধ্যে চির পথপ্রদর্শক হইয়া রহিয়াছ বলিয়াই আমরা নানা ভুল ভ্রান্তির মধ্যেও কল্যাণের পথে একটু চলিতে সমর্থ হইতেছি। তুমি যদি অন্তরে থাকিয়া সর্ব্বদা তোমার ইঙ্গিত প্রেরণ না করিতে ও সতর্ক না করিয়া দিতে, এবং বাহিরে তোমার সাধু সন্তানদের দৃষ্টান্ত সম্মুখে না ধরিতে, তাহা হইলে আমরা বিভিন্ন দিকের নানা আহ্বানে বিভ্রান্ত হইয়া, কখনও প্রকৃত পথ ধরিতে পারিতাম না। কত দিক হইতে কত মধুর আহ্বান আমাদের নিকট নিয়তই আসিতেছে! তাহার অনেক গুলিই আমাদিগকে তোমার পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতে চায়। অনেক সময় তাহারা মোহন বেশে কল্যাণের রূপ ধরিয়াও আসে। তখন তোমার দিব্য দৃষ্টি না পাইলে আমরা কিছুতেই তাহা বুঝিতে পারি না। তাই আমরা মহৎ উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইয়াও কত সময় অকল্যাণের দিকেই ধাবিত হই। কিন্তু হে প্রেমময় পিতা, তুমি কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ কর না, তোমার অপার প্রেম সর্ব্বদাই আমাদিগকে দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়াই হউক অথবা সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে মুগ্ধ করিয়াই হউক, বিপথ হইতে ফিরাইয়া আনে। তোমার এই জীবন্ত প্রেম ও করুণা নিয়তই জগতে কার্য্য করিতেছে। তাই তুমি আমাদিগের সম্মুখে তোমার প্রিয়সন্তানদের মহৎ দৃষ্টান্ত ধরিয়া আমাদিগকে নিয়ত তাহাদিগকে অনুসরণ করিবার জন্য ডাকিতেছ। অথচ আমরা তাহা না দেখিয়া না শুনিয়া আপনাদের ভাবেই চলিতেছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর,—আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তোমার নির্দ্দেশ মানিয়া, তোমার পথে চলিয়া, ধন্য ও কৃতার্থ হই, কল্যাণের দিকে নিয়ত অগ্রসর হই। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

---

## সম্পাদকীয়

**দেশের সেবা**—যেমন স্ত্রী পুত্র পরিবারের তেমনি দেশের সেবায় আপনার সময় ও শক্তি সামর্থ্য যথোপযুক্তভাবে নিয়োগ করা, প্রত্যেক মানুষের একটি অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যপালনদ্বারা দেশের অপেক্ষা তাহার নিজেরই অধিকতর কল্যাণ সাধিত হয়। যে শুধু আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত থাকে, সে কিছুতেই জীবনে সুখ শান্তি, কল্যাণ ও উন্নতি, প্রকৃত মনুষ্যত্ব, লাভ করিতে পারে না। মানবাত্মার উন্নতি ও বিকাশের জন্যই বিশ্ববিধাতা মানুষকে গৃহ পরিবার সমাজের মধ্যে রাখিয়াছেন, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া অপরের জন্য ভাবিতে ও খাটিতে যাহাতে সে বাধ্য হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তথাপি মানুষ যে স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হইয়া আপনার অকল্যাণ সাধন করে না, এরূপ কথা বলা যায় না। আবার, অনেকে স্ত্রী পুত্র গৃহপরিবার লইয়া একটু বৃহত্তর স্বার্থের গণ্ডী রচনা করিয়া, উক্ত সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের বাহিরে আর এক শ্রেণীর লোক আবার নিজ সমাজ ও দেশকে লইয়া তদপেক্ষা বৃহত্তর একটি গণ্ডীর মধ্যে আপনাদিগকে আবদ্ধ করেন। ইহার ফলে উভয়ত্রই যে প্রকৃত উন্নতি ও বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়, নিজের মহা অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ, এ ক্ষেত্রে স্বার্থটা একটু বিস্তৃত হইলেও, উহা স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে, উহার মধ্যে প্রকৃত মহৎভাব একটুকুও নাই। বিশ্ববিধাতা মানব হৃদয়ে যে নিঃস্বার্থ প্রেম দিয়াছেন, যাহাতে সে অপরের

জন্য আপনাকে নিঃশেষে ব্যয় করিয়াই সুখী ও কৃতার্থ, অপরের নিকট হইতে কোনওরূপ প্রতিদানের জন্য একটুও আকাঙ্ক্ষিত নহে, তাহাতেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব। তাহার প্রসার ও বিকাশকে রুদ্ধ করিলেই তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইল, তাহার মহা অকল্যাণ সাধিত হইল। কাজেই গৃহ পরিবার সমাজের বা দেশের সেবা করিলেই যে যথেষ্ট হইল বা কর্ত্তব্য যথোপযুক্তভাবে সম্পন্ন হইল এবং পরম কল্যাণ সাধিত হইল, এরূপ মনে করিবার কোনও হেতুই নাই। নিঃস্বার্থ প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়া সেবা করিলেই উক্ত কর্ত্তব্য সম্যক্ পালিত হইল বলা যাইতে পারে। আবার, কার্য্যমাত্রই সেবা নহে। এমন অনেক কার্য্য আছে যাহা হইতে কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই প্রসূত হয়। প্রেমের দ্বারা চালিত হইয়াও অজ্ঞতা বা চিন্তাহীনতা বশতঃ এমন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া যায়, যাহার ফলে নানা প্রকার অকল্যাণই ঘটিয়া থাকে। এরূপ কার্য্য কখনও সেবা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কাজেই কোনও সেবার কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে হৃদয়কে নিঃস্বার্থ প্রেমে পূর্ণ করিতে হইবে এবং প্রকৃত কল্যাণ কোন্ পথে তাহা বাছিয়া লইতে হইবে।

প্রকৃত প্রেমের মধ্যে কোনও স্বার্থপরতা বা সংকীর্ণতা থাকিতে পারে না। অথচ সংসারে নিঃস্বার্থ উদার প্রেমের যথেষ্টই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব যে, সাধারণতঃ মানুষ প্রেমের বিকার মোহকেই প্রেম বলিয়া ভ্রম করে। অনেকেই ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারে না, বুঝিবার জন্য কোনও চেষ্টাও করে না। এই জন্যই লোকে প্রেমকে অন্ধ বলিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে প্রেম অন্ধ নহে, মোহই অন্ধ। তৎপরিবর্ত্তে প্রেমই মানুষকে চক্ষুষ্মান করে। মোহই মানুষের দৃষ্টিকে ক্ষুদ্র সীমাতে আবদ্ধ করিয়া গণ্ডী রচনা করে, আর প্রেম তাহার দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়া সকল প্রাচীর দূর করিয়া দেয়। মোহ হইতেই অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে অপ্রেম বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, প্রেম হইতে কখনও অপ্রেম উৎপন্ন হইতে পারে না। এখানেই ইহাদের পার্থক্য স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং যেখানেই অপরের প্রতি অপ্রেম রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেখানেই নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝিতে হইবে প্রকৃত প্রেমের একান্ত অভাব ঘটিয়াছে। প্রেম ও অপ্রেম বা বিদ্বেষ কোনও প্রকারেই একত্র থাকিতে পারে না। আমরা এই সহজ কথাটা ভুলিয়া যাই বলিয়াই মোহকে প্রেম বলিয়া ভ্রম করি। স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য।

প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে অপর দেশের প্রতি বিদ্বেষ থাকিতে পারে না। যদি সেরূপ বিদ্বেষ থাকে তবে বুঝিতে হইবে সেখানে প্রকৃত স্বদেশপ্রেম নাই। প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকদের জীবনে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা স্বদেশকে ভাল বাসেন বলিয়া অপর দেশকে কম ভালবাসেন না, নিজের দেশের কল্যাণ সর্ব্বান্তঃকরণে চাহেন বলিয়া অপর দেশের কল্যাণ কম চাহেন না। ইহার দৃষ্টান্তরূপে স্বভাবতঃই ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান রাজর্ষি রামমোহনের কথাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে উদয় হয়। তিনি যেমন দেশকে ভাল বাসিয়াছেন, তাহার সেবায় আপনাকে নিঃশেষে দান করিয়াছেন, এরূপ আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া দেখা যায় না। স্বদেশে বিদেশে, সজনে নির্জ্জনে, স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশের কল্যাণচিন্তাই তাঁহার হৃদয়কে সর্ব্বদা অধিকার করিয়া থাকিত। দেশের দুর্গতি ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় কত তীব্র বেদনাই না অনুভব করিয়াছে, কত তপ্ত অশ্রুই না তিনি বিসর্জ্জন করিয়াছেন! বিদেশে বন্ধুগণ যখন তাঁহাকে অনেক সময় বিমর্ষভাবে থাকিতে ও নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা হইতে আমরা তাহার একটু আভাসমাত্র পাই। কিন্তু তাহার গভীরতা সম্যক্ প্রকারে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি কি না, সন্দেহের বিষয়। তিনি স্বদেশকে এরূপ গভীরভাবে ভাল বাসিয়াও আবার সকল দেশকেও কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহাও আমরা সকলেই অবগত আছি। সুদূর স্পেন, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশের জন্যও তাঁহার হৃদয় কিরূপ কাঁদিত তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইংলণ্ডের কয়লাখনির সামান্য মজুরদের জন্যও তাঁহার উদার হৃদয়ে কতটা স্থান ছিল, তাহাও আমরা জানি। আর, সে ভালবাসা যে একটা বাষ্পময় ভাব মাত্র ছিল না, তাহা যে তাঁহাকে সকলের কল্যাণচিন্তায় ও কার্য্যে বিবিধ প্রকারে নিযুক্ত করিয়াছে, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। হৃদয়ে সত্য প্রেম থাকিলে এরূপই হয়। ইহাই প্রেমের ধর্ম্ম। সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহার সহিত তুলনীয় না হইলেও,তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত তাঁহার অনুরূপ জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া ইহার সাক্ষাৎ পরিচয় আমরা অনেকেই পাইয়াছি। এই সময় বিশেষভাবে আনন্দমোহন বসু ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়দের কথা স্বভাবতঃই আমাদের মনে উদয় হইতেছে। সেদিন আমরা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের স্মৃতিতর্পণ করিলাম, আবার ২৭শে সেপ্টেম্বর ও ৩০শে সেপ্টেম্বর রাজর্ষির ও শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিতর্পণ করিবার আয়োজন করিতেছি। তাঁহাদের গভীর স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে যে কোনও বিদ্বেষ বা অপ্রেম মিশ্রিত ছিল না, তাঁহাদের উদার প্রেম যে অপর সকলকেও আলিঙ্গন করিয়াছিল, তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় আমরা সকলেই পাইয়াছি। আর, তাঁহারা দেশের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের জন্য কিরূপ আপনাদিগকে নিঃশেষে ব্যয় করিয়াছেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহারা আমাদের সম্মুখে অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই রাখিয়া গিয়াছেন। এই উদার প্রেমের পথ পরিত্যাগ করিয়া যদি আমরা মোহের অধীন হইয়া বিদ্বেষের পথে চলি, তবে আমাদের ও দেশের কোনও কল্যাণই যে সাধিত হইবে না, তৎপরিবর্ত্তে মহা অকল্যাণই যে সাধিত হইবে, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না।

সর্ব্বদা হৃদয়ে এই বিশুদ্ধ উদার প্রেম যেরূপ পোষণ করিতে হইবে, তেমনি প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্য বাছিয়া লইয়া তাহাতে নিযুক্ত হইতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে-কোনও প্রকার কার্য্যই সেবা নয়, অবলম্বনীয়ও নয়। যাহারা মনে করে কোনও প্রকারে কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিলেই হইল, তাহারা

যে কার্য্যের পরিবর্ত্তে অকার্য্যই করিয়া থাকে, তাহা বিশেষ করিয়া বলা বাহুল্য। অন্যায় কার্য্য হইতে কখনও শুভফল প্রসূত হইতে পারে না। হঠাৎ সিদ্ধিলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় অনেকে নানা অন্যায়ের পথ আশ্রয় করে। ন্যায় ও ধর্ম্ম ভিন্ন যে কল্যাণ নাই, তাহা ইহারা ভুলিয়া যায়। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পথপ্রদর্শকগণ দেখাইয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের ভিত্তির উপরই সকল কার্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, একমাত্র তাহারই উপর ব্যক্তিগত ও জাতিগত সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ নির্ভর করে। সংসারে অর্থ বিত্ত বিদ্যা বুদ্ধি সকলের প্রয়োজন আছে। সর্ব্বপ্রকার উন্নতি লাভের জন্য সকলকেই চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্ববিধ উন্নতি ও বিকাশের জন্য স্বাধীনতা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ধর্ম্ম ও ন্যায়কে ছাড়িয়া ইহার কোনটাতেই প্রকৃত কল্যাণ নাই, আর যথার্থভাবে তাহা লাভও করা যায় না। ন্যায় ও ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীনতা দাঁড়াইতে পারে না। এইজন্য সর্ব্বোপরি ধর্ম্মকেই প্রধান লক্ষ্য স্থানে রাখিতে হইবে। ধর্ম্মের জন্য ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার কোনও যে প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা নহে। তথাপি অবস্থাবিশেষে ধর্ম্মের জন্য ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেও হইতে পারে; কিন্তু ইহাদের জন্য কখনও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা যায় না।

আজকাল চারিদিকে স্বাধীনতার কথা খুবই শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা কোথায় তাহা অনেকেই জানে না। স্বাধীনতা বলিতে অনেকে নিজের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য বা স্বেচ্ছাচারিতা এবং অপর সকলের অধীনতা ভিন্ন আর কিছুই বুঝে না। অন্তরে স্বাধীন না হইলে যে বাহিরে স্বাধীন হওয়া যায় না, স্বাধীনতা যে সকলের জন্যই এবং সকল বিষয়েই চাই, ধর্ম্ম ও নীতির অধীন না হইয়া যে কেহই স্বাধীন হইতে পারে না, সে জ্ঞান তাহাদের মোটেই নাই। তাহাদের স্বাধীনতা ঘোরতর অধীনতা ও দাসত্বেরই নামান্তর মাত্র। এই জন্যই ইহারা কখনও প্রকৃত স্বাধীনতার সম্মান করিতে পারে না, অপরকে স্বাধীনতা দিতে পারে না। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পথপ্রদর্শকগণ প্রকৃত স্বাধীনতা কি তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা তাহার মর্য্যাদা কখনও ক্ষুণ্ণ করেন নাই, —নিজেরা যেমন সকল বিষয়ে স্বাধীনতা চাহিয়াছেন, অপরকেও তেমনি পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতার জন্যই তাঁহারা নির্ভীকভাবে আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তাঁহারা অন্তরে সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম ও নীতির অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়াই, একমাত্র ধর্ম্ম ও নীতিকেই সকল বিষয়ে জীবনের চালক করিয়াছিলেন বলিয়াই, অপর সকল অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। অভয়পদ লাভ করিয়া তাঁহারা বিগতভীঃ হইয়াছিলেন বলিয়াই, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে ও সকল লাঞ্ছনা অত্যাচার বহন করিতে তাঁহারা কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্যই স্বাধীনতার প্রয়োজন। স্বাধীনতা যতই বাঞ্ছনীয় হউক না কেন, তাহার জন্যও কিছুতেই মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, ব্রহ্মানুগত জীবন লাভ না করিলে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লব্ধ হয় না। কাজেই দেশের সকলে যাহাতে এই মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, তাহার জন্যই সর্ব্বাগ্রে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাই দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা। ভুলিলে চলিবে না যে, স্বরাট্ না হইয়া স্বরাজ লাভ করা যায় না। নিজে মুক্তিলাভ না করিয়া দেশকে মুক্ত করা সম্ভবপর নয়। দেশসেবার প্রকৃত পথ তাঁহারাই দেখাইয়া গিয়াছেন। আমাদিগকে সেই পথই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। তদ্ব্যতীত নিজেদেরও কল্যাণ নাই, দেশেরও প্রকৃত মঙ্গল নাই।

আমাদের সকলের চিন্তা ও দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হউক। আমরা দেশসেবার প্রকৃত পথ অবলম্বন করিয়া নিজেদের ও দেশের কল্যাণ সাধন করি। মঙ্গলময় বিধাতার শুভ ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

## ব্রহ্মোপাসনা-সাধনের বাধা

ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা ভারতের নিজস্ব বস্তু, অন্য দেশ হইতে ধারকরা বস্তু নহে। ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের ধারকরা বস্তু হওয়া দূরে থাক্, বরঞ্চ ইহাই সত্য বলিয়া মনে হয় যে প্রাচীন কালে আমাদের দেশে যেমন পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মজ্ঞান বিকশিত হইয়াছিল তেমন ব্রহ্মজ্ঞান অন্য দেশে অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই দেখা যাইত। যে সকল জাতি ও সম্প্রদায় সাধারণতঃ একেশ্বরবাদী বলিয়া পরিচিত, তাহাদের একেশ্বরবাদ পরীক্ষা করিলে দেখা যায় তাহা অনেক স্থলেই একটী বৃহৎ দেববাদ মাত্র, প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মবাদ নহে। কিন্তু ভারত প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াও, ব্রহ্মোপাসনার আস্বাদন পাইয়াও, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী ব্রহ্মোপাসনা করিতেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মের পারিবারিক ও সামাজিক উপাসনা দেশ মধ্যে কোন দিন প্রচলিত হইয়া থাকিলেও দেশ তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। ১০২ বৎসর পূর্ব্বে দেশে অসংখ্য শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির, ও কালীমন্দির ছিল, কিন্তু একটীও ব্রহ্মমন্দির ছিল না। দেশের দুর্গতির অন্যান্য কারণ ছাড়িয়া দিয়া কেবল এই একটী কারণের দিকে তাকাইলেই এই দুর্গতির যথেষ্ট ব্যাখ্যা হয়। যে দেশ অনন্তস্বরূপকে ভুলিয়া যায় এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক উপাসনা হইতে বঞ্চিত থাকে, তাহার দুর্গতি অনিবার্য্য। সুতরাং ৬ই ভাদ্র, যে দিনে দেশে সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল, সে দিনের মত শুভদিন দেশের ইতিহাসে আর নাই। ব্যক্তিগত জীবনেও যে দিন পরিমিত দেবতার বাহ্যপূজার স্থলে অনন্তস্বরূপের আধ্যাত্মিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হয়, সে দিনই জীবনের মহত্তম দিন। রাজা রামমোহন

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে বিগত ৬ই ভাদ্র, প্রাতঃকালীন উপাসনাতে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক বিবৃত উপদেশের সার।

রায় এই মহাজাগরণে জাগ্রত হইয়া দেখিলেন দেশ উপনিষদের ঋষিদের পরব্রহ্মকে ভুলিয়া শিব, শক্তি, বিষ্ণু, সূর্য্য ও গণপতি এই পঞ্চদেবতার পূজায় মগ্ন হইয়া আছে, এমন কি বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত যে অপরব্রহ্ম বা ব্রহ্মার পূজা প্রচলিত ছিল, তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি জাতীয় দুর্গতির এই মূলকারণ দূর করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন এবং উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা ও ব্রহ্মসূত্রাদি ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ প্রচার করিতে লাগিলেন। আমরা এই ১০২ বৎসর কাল শত শত বাধাবিঘ্নের মধ্যে তাঁহার প্রদর্শিত লক্ষ্যসাধনের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছি, এই কথা বোধ হয় কেহই বলিবেন না। অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ আমি যাহা বুঝি তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। মানুষের ধর্ম্মচিন্তা প্রধানতঃ তিনটী স্তরের ভিতর দিয়া উন্নত হয়। মানুষ যত দিন স্বাধীন চিন্তা আশ্রয় না করিয়া পরম্পরাগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তত দিন দেববাদী থাকে এবং বাহ্য উপচারে দেবতার পূজা করে। সে যখন পরম্পরাগত মতে সন্তুষ্ট না হইয়া স্বাধীনভাবে ধর্ম্মচিন্তা করে তখন আনুমানিক ( inferential ) জ্ঞানে ঈশ্বরবাদে উপনীত হয় এবং ঈশ্বরের মানসিক উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। এই উপাসনাকেই রাজা 'পরম্পরা উপাসনা' বলিয়াছেন। অনেক ঈশ্বরোপাসক এখনও বুঝিতে পারেন না যে উপাসনার আর একটী উচ্চতর স্তর আছে। কিন্তু রাজা অতি স্পষ্টভাবেই সেই স্তরের কথা বলিয়াছেন। সেই স্তরটী আনুমানিক জ্ঞানের অতীত, উহা সমাধিমূলক। ঈশ্বরকে জগৎ ও জীবের স্রষ্টা পাতা বলিয়া চিন্তা করিতে গিয়া আমরা তাঁহাকে জগৎ ও জীব হইতে ভিন্ন করি এবং যত দিন এই ভিন্নতা বা ভেদের মধ্যে অভেদ না দেখি, তত দিন প্রকারান্তরে তাঁহাকে পরিমিত করিয়া ফেলি, কারণ জগৎ ও জীব যাঁহা হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ তিনি অতিবৃহৎ হইলেও প্রকৃত পক্ষে অনন্ত হইতে পারেন না, তিনি জগৎ ও জীবের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া পড়েন। ফলতঃ যত দিন বিষয় ও বিষয়ী, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা, একান্ত ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, যত দিন আমরা জগৎ ও জীব হইতে ঈশ্বরে, অর্থাৎ এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে যাইতে চেষ্টা করি, যত দিন এই 'পরং-পর' ভাব অর্থাৎ পরোক্ষভাব থাকে, তত দিন প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা, অনন্তের উপাসনা, আরম্ভ হয় না। 'অনন্ত' অর্থ যাহার বাহিরে কিছু নাই, সমস্তই যাঁহার অন্তর্ভূত। ভেদমূলক পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা অনন্তকে ধরা যায় না। সুতরাং অন্ধবিশ্বাস-মূলক পরিমিত দেবতার পূজা পরিত্যাগ করিয়াও, বিচারমূলক জ্ঞানযোগে ঈশ্বরোপাসনা অবলম্বন করিয়াও, সাধক অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী হন না। একটী অনন্ত বস্তুর অস্পষ্ট ধারণা, যে বস্তু জড় ও আত্মার আশ্রয়-রূপে সর্ব্বগত হইয়া বর্ত্তমান আছে এরূপ বস্তুর ধারণা, তাঁহার থাকিতে পারে। কিন্তু এই ধারণা সাক্ষাৎ অনুভবগত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হয় না। আত্মা ও অনাত্মা, বিষয় ও বিষয়ী, পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র, এই সংস্কার অনন্তের অনুভূতিকে বাধা দেয়। বিষয়জগৎ এবং নিজ ক্ষুদ্র আত্মাই সাধকের কাছে প্রত্যক্ষ বস্তু বলিয়া বোধ হয়, ইহাদের আশ্রয়রূপী অনন্ত আত্মা কেবল অনুমানের বিষয়ই থাকেন। ক্রমশঃ আত্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইলে দেখা যায়, যাকে অনাত্মা বলি, বিষয় বলি, তাহা আত্মার বাহিরে নহে, আত্মার অন্তর্ভূত। রূপরসাদি বিষয় আত্মজ্ঞান দ্বারা জড়িত হইয়াই প্রকাশিত হয়, আত্মজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিলে এই সমুদায়ের কোনও অর্থই থাকে না। ফলতঃ প্রত্যেক জ্ঞানব্যাপারে, দর্শন শ্রবণাদি ক্রিয়ায়, আমরা প্রকৃত পক্ষে নিজ আত্মাকেই জানি, আত্মার অতিরিক্ত কোন বস্তু জানি না। এই আবিষ্কার হইতে সেই অনন্ত বস্তুর প্রকাশ আরম্ভ হয় যাঁহার বাহিরে কিছুই নাই। দেশ কালই সমুদায় সীমার মূল, উহারাই জগৎকে খণ্ড খণ্ড করিয়া অনন্তকে ঢাকিয়া রাখে। যখন দেখা যায় যে দেশ কাল আত্মার অতিরিক্ত নহে, ইহারা আত্মার অন্তর্ভূত হইয়াই প্রকাশ পায় এবং আত্মার অন্তর্ভূত হইয়াই চালিত হয়, তখন জগতের খণ্ডত্ব, বিষয় ও বিষয়ীর একান্তভেদ, চলিয়া যায়। তখন দেখা যায় যাহাকে কেবল নিজের ক্ষুদ্র আত্মা বলিয়া ভাবিয়াছিলাম তাহা বস্তুতঃ ক্ষুদ্র নহে, প্রকৃত পক্ষে ইহা অনন্ত অখণ্ড, সকল দেশ ও কাল ইহার অন্তর্ভূত এবং ইহা দেশকালকৃত সমুদায় সীমার অতীত। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে এই আত্মা সর্ব্বাধার সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বরূপী হইয়াও, নিজ অনন্তত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও, জীবের সসীম জীবনরূপে প্রকাশিত হইতে পারে, ইহার অসীমত্বের ভিতরে জীবের সসীমত্বের একটী স্থান আছে। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়াতে আমাদের সসীম ব্যক্তিত্বের অতীত বস্তু আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ সর্ব্বাধার আত্মা তাঁহার জ্ঞানের এক নূতন অংশ লইয়া আমাদের আত্মারূপে প্রকাশিত হন। এস্থলে আমাদের সহিত তাঁহার অভেদ অথচ ভেদ প্রকাশ পায়। আমাদের লব্ধ জ্ঞান আমরা প্রতিক্ষণেই হারাইয়া ফেলি, আমরা বিস্মৃতিশীল। কিন্তু সেই হারান জ্ঞানই আমাদের নিকট পুনরায় প্রকাশিত হইয়া, "ইহা আমাদেরই পূর্ব্বজ্ঞান", এইরূপে প্রকাশিত হইয়া, দেখাইয়া দেয় যে চিরস্মৃতিশীল পরমাত্মা আমাদের অন্তরাত্মারূপে বর্ত্তমান, আমাদের জ্ঞানসম্পত্তি তাঁহাতে অক্ষুণ্ণ। আমরা নিদ্রাশীল, সুষুপ্তির সময় আমরা সমস্ত জ্ঞানই হারাইয়া ফেলি, নচেৎ সুষুপ্তির কোন অর্থই নাই। কিন্তু আমাদের পুনর্জ্জাগরণে প্রকাশ পায় আমাদের অন্তরাত্মা অনিদ্র, তিনি নিদ্রিত হইলে আমাদের জাগরণ সম্ভব হইত না। নৈতিক সংগ্রামে, আমাদের পাপাচরণ, অনুতাপ, প্রার্থনা ও পুণ্যলাভে, পূর্ণ ও অপূর্ণের একত্র সমাবেশ স্পষ্টই প্রকাশিত হয়। পূর্ণ পবিত্রস্বরূপের সাক্ষাৎ প্রকাশেই আমাদের পাপবোধ জন্মে, অনুতাপ ও প্রার্থনা আসে, এবং তাঁহার অনুপ্রাণনে অর্থাৎ তাঁহার শুদ্ধাত্মাকে আমাদের আত্মারূপে সঞ্চারিত করাতেই, আমাদের পুণ্য লাভ হয়। পূর্ণ অনন্তস্বরূপ কিরূপে আমাদের নিকট সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হন তাহা অতি সংক্ষেপে বলিলাম। রাজা রামমোহন রায় আরো সংক্ষেপে এই সমাধিমূলক উপাসনার কথা বলিয়াছিলেন এবং এবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভের উপায়রূপে দেশীয় ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক শাস্ত্র প্রচার করিয়াছিলেন।

আমরা অনেক দিন তাঁহার প্রদর্শিত পথ উপেক্ষা করিয়াছি এবং পরম্পরাগত অন্ধ বিশ্বাস এবং ভেদমূলক বিচারের উপর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রত্যক্ষ উপাসনার ফল হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। সম্প্রতি দেশীয় শাস্ত্রালোচনা এবং পাশ্চাত্য দর্শনালোচনার সাহায্যে রাজার বাণী স্পষ্টতর হইতেছে এবং তাঁহার প্রদর্শিত লক্ষ্যসাধন সুগম হইতেছে। এই লক্ষ্যসাধন শ্রম-সাপেক্ষ, আধ্যাত্মিক আলস্য ও জড়তা থাকিলে এই লক্ষ্যে পঁহুছান অসম্ভব। একান্ত সাধনশীল হইয়া আমরা নিজ নিজ জীবনে এবং সমাজের সমবেত প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষ ব্রহ্মোপাসনার পরিত্রাণ-প্রদ ফল দেখাইতে না পারিলে ব্রাহ্মসমাজ-প্রতিষ্ঠার উচ্চ উদ্দেশ্য জাতীয় জীবনে সফল হইবার আশা নাই।

# গীতার ধর্ম্ম। (৫)

## কর্ম্মযোগ ও তাহার ফল।

গীতার মৌলিক সাধনা কর্ম্মযোগ। সংক্ষেপে ইহা নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণনা করা যাইতে পারে। ফলকামনাশূন্য হইয়া এবং "আমি করিতেছি" এইরূপ কর্তৃত্ব-অভিনিবেশশূন্য হইয়া করণীয় কর্ম্মসকল করিতে হইবে। ইহাদ্বারা চিত্তের শান্তি ও স্থৈর্য্য হয়, এবং মানব আত্মার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। কিন্তু আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য কেবল নিষ্কাম কর্ম্মই যথেষ্ট নহে, জ্ঞান ও সমাধি আবশ্যক। আত্মাতে প্রতিষ্ঠার সহিত সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি ও সর্ব্বভূতের হিতে রত হইলে, জ্ঞান ও সমাধিযোগে ব্রহ্মদর্শন হয়। ব্রহ্মদর্শন ভক্তিসাধনার উপায়, এবং ভক্তির দ্বারা আরও জ্ঞান লাভ হইলে সাধক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং সংসার হইতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হইয়া বাস করেন।

গীতার কর্ম্মযোগ ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ সাধনা এবং সাংখ্য মতেরই বিশেষ পরিণতি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঈশোপনিষদে এই সাধনার কথা বলা হইয়াছে এবং উপনিষদ্ সাহিত্যে দেখা যায় যে অনেক নৃপতি ও অনেক ব্রাহ্মণ সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াই ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিয়াছেন,—নৃপতিগণ রাজকার্য্য ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের ব্যবসা, দেবতাগণের তুষ্টির উদ্দেশ্যে যাগ যজ্ঞের পৌরহিত্য, পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু এ কথা সাংখ্য ও বৌদ্ধ মতের প্রভাবে লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। লোকে কেবল দুইটি পথ মাত্র দেখিতে পাইত—একটি সংসার ও অনুষ্ঠানমূলক লৌকিক ধর্ম্মসাধনা, দ্বিতীয়টি সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপ বৈরাগ্য। সংসারিগণ হয় সংসারের সুখ, ধন, মান, যশ লইয়া থাকিত, অথবা ইহার জন্য বা সংসারের আদর্শে পরলোকে সুখের কামনা করিয়া, ধর্ম্মসাধনা করিত। যাহারা মুক্তির আকাঙ্ক্ষী তাহারা সংসারের সকল কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া ও কর্ম্মসন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া জ্ঞানালোচনা বা যোগশাস্ত্রানুযায়ী প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করিত। জ্ঞানের সহিত সন্ন্যাস এমন ভাবে যুক্ত হইয়া গিয়াছিল যে, গীতাকার বুদ্ধিযোগ ও জ্ঞানদ্বারা যে সন্ন্যাস বলিতেছেন না, ইহা অর্জ্জুনের প্রশ্ন দ্বারা বার বার সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। এই দুই পথের মধ্যে গীতা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া বলিলেন, কর্ম্মত্যাগ করিও না, নিয়ত কর্ম্ম কর, সন্ন্যাসে আত্মার মুক্তি হওয়া কঠিন, ফলকামনাশূন্য হইয়া ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে, তাহাদ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়।

সংসারাসক্ত ও সংসারতপ্ত মানবের পক্ষে ইহা অতি উপাদেয় উপদেশ। ইহাদ্বারা যে সংসারের আসক্তি দূর হয়, এবং অশান্ত চিত্ত শান্ত হয়, সে বিষয়ে ভুল নাই। গীতা সত্যই বলিয়াছেন, "জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ (সাংখ্যৈঃ) যে স্থান প্রাপ্ত হন, কর্ম্ম-যোগিগণও (যোগৈঃ) সেই স্থান প্রাপ্ত হন, সাংখ্য ও যোগকে যে এক দেখে, সেই প্রকৃত দ্রষ্টা।" (৫।৫)। এই জন্যই সংসার ত্যাগের যে দোষ, তাহা হইতে কর্ম্মযোগ মুক্ত নহে। অন্যকথা পরে বলিব, এখানে কেবল একটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করি। মাতা সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করেন এবং কোন অনাথাশ্রমের নার্স ও পিতৃমাতৃহীন শিশুকে কর্ত্তব্যবোধে পালন করিতে পারে; কিন্তু উভয়ের কাজ এক প্রকার হয় না এবং উভয়ে একই কাজের দ্বারা সমান ফল লাভ করেন না। মাতা তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রীতি ঢালিয়া দিয়াছেন, ইহাতে কর্ত্তব্য মধুর হইয়াছে, কাজও সুন্দর হইয়াছে এবং মাতার হৃদয় নিঃস্বার্থ হইয়াছে। নার্সের মাতৃস্নেহ নাই, কেবল কঠোর কর্ত্তব্যবোধ রহিয়াছে, তাহাদ্বারা শিশুর প্রতিপালন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না এবং হৃদয়ও কোমল হয় না। কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রীতি না থাকিলে, তাহার দ্বারা নিজের বা অপরের কল্যাণ হয় না। কিন্তু গীতা রাগ (অনুরাগ) বা স্নেহ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছেন, কারণ ইহা অহঙ্কার বা কর্তৃত্বাভিনিবেশ।

এই জন্য গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগ আমাদিগের কতদূর অনুসরণীয় তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। ইহার সম্যক্-রূপে আলোচনা করিতে হইলে, কেন কর্ম্ম পরিত্যাগ উচিত নহে, নিষ্কাম ও অনাসক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠানের হেতু কি, কোন্ কর্ম্ম আমাদিগের অনুষ্ঠেয় এবং সেই সকল কর্ম্মে কতদূর অনাসক্ত ও নিষ্কাম হওয়া উচিত, এই সকল বিষয় আমাদের বর্ণনা করিতে হইবে।

গীতা সন্ন্যাসকে কতকগুলি কারণে দোষ দিয়াছেন—(১) সন্ন্যাস মানবের চরম লক্ষ্য নহে, আত্মজ্ঞানলাভ করা ইহার লক্ষ্য, কিন্তু কর্ম্ম ব্যতীত সন্ন্যাসদ্বারা ইহা সম্যক্ প্রকারে লাভ হয় না ("ন সমধিগচ্ছতি" ৩।৪ অর্থ সম্যক্ প্রকারে লাভ হয় না)। কর্ম্ম আত্মশুদ্ধি অর্থাৎ জড়সংস্পর্শ হইতে আত্মাকে মুক্ত করিবার উপায় ("আত্মশুদ্ধয়ে," ৫।১১)। (২) কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্বভাবই কর্ম্ম করা, তাঁহা রোধ করা মানবের পক্ষে অসম্ভব। যাহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় রোধ করে তাহারা মনে মনে নানা সুখ ও কর্ম্মের চিন্তা পোষণ করে, ইহাদ্বারা কর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। বরং মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্ম করা প্রয়োজন

(৩।৭)। (৩) কর্ম্মই কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্বধর্ম্ম, কর্ম্মরোধ তাহার পক্ষে পরধর্ম্ম; স্বধর্ম্ম অপূর্ণ হইলেও, সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; স্বধর্ম্মে মরণও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ। (৩।৩৫)। অতএব কর্ম্মে যে দোষ ত্রুটিই থাকুক, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা তাহা করাই কর্ত্তব্য। (৪) কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না, বৃথা শরীরপাতে ধর্ম্মসাধনার ক্ষতি। (৫) কর্ম্মের দ্বারাই জনকাদি ঋষিগণ সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। (৬) লোকসংগ্রহ বা সমাজস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লোকশিক্ষা জন্য কর্ম্ম করা প্রয়োজন।

ইহার পরেও গীতার অস্পষ্ট ভাষা হেতু কেহ কেহ মনে করেন যে, গীতাকার অনধিকারীর পক্ষে কর্ম্মযোগ ও অধিকারীর পক্ষে সন্ন্যাস ব্যবস্থা করিয়াছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩ ও ৪ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বুঝিলে এ সন্দেহ দূর হয়। "যোগে আরোহণেচ্ছু ব্যক্তির কর্ম্মই যোগসাধনের উপায় বলিয়া কথিত হয় (এখানে কর্ম্মানুষ্ঠানের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, যেমন নিয়ত তুমি কর্ম্ম কর, কর্ম্ম অকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ।" যোগারূঢ় ব্যক্তির শম উপায় বলিয়া কথিত হয়। ৩। "শম" কি, তাহা পরের শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হইতেছে, "যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ও কর্ম্মে আসক্ত হন না, সর্ব্বসংকল্পত্যাগী এমন ব্যক্তি যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন।" এখানেও কর্ম্ম রহিয়াছে, কিন্তু অনাসক্তি ও সংকল্পত্যাগের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কর্ম্ম অপ্রধান।

এইরূপে সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হইল। এখন কর্ম্মযোগের মূল তত্ত্ব আমরা সাংখ্যদর্শনে প্রাপ্ত হই। গীতার শেষভাগের লেখক সাংখ্যদর্শনোক্ত ত্রিগুণের অতীত অবস্থা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা কর্ম্মযোগের দ্বারাই সাধনীয়। ইহা দ্বারা তিনি সাংখ্যের সহিত কর্ম্মযোগের সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। "প্রকাশ (সত্ত্ব), প্রবৃত্তি (রজঃ) ও মোহ (তমঃ), ইহারা আপন আপন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে যিনি দ্বেষ করেন না, এবং নিবৃত্ত হইলে (সেই অবস্থার) যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি উদাসীনের ন্যায় স্থিত হইয়া গুণসকলের দ্বারা বিচলিত হন না, বরং গুণসকল গুণেতেই নিযুক্ত থাকে ইহা মনে করিয়া অবস্থিতি করেন ও চঞ্চল হন না; আপনাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি সুখে দুঃখে, প্রস্তর ও কাঞ্চনে, প্রিয় ও অপ্রিয়ে, নিন্দা ও আত্মপ্রশংসায়, মান ও অপমানে, মিত্র ও শত্রুপক্ষে সমভাবাপন্ন, সকল প্রকার চেষ্টা পরিত্যাগী, তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন।" (১৪।২২-২৪)।

সাংখ্যদর্শন অনুসারে আত্মা নির্ম্মল, নিষ্ক্রিয় ও জড়সম্পর্করহিত (ত্রিগুণাতীত, কারণ গুণ একমাত্র জড়েরই ধর্ম্ম)। বুদ্ধি, মন ইন্দ্রিয়াদি সকলই জড় হইতে উৎপন্ন এবং জড়শক্তিতে পরিচালিত। তাহারা আপনাদের স্বভাব অনুসারে কর্ম্ম করিবেই। আত্মা অবিদ্যাবশতঃ আপনার জড়াতীত শুদ্ধস্বরূপ ভুলিয়া এই সকলকে আপনার কার্য্য ও আপন কর্তৃত্ব বলিয়া জ্ঞান করে এবং এইরূপে তাহা কর্ম্মে বদ্ধ হয় এবং সুখে দুঃখে ও পাপে মগ্ন হয়। এই ভ্রান্তির অপর নাম আসক্তি, সঙ্গ, কর্তৃত্বাভিমান বা অহঙ্কার। সাংখ্যে অহঙ্কার ও যোগে অস্মিতা নামেই ইহা বিশেষ পরিচিত। ইহার অর্থ সকল কর্ম্ম ও সুখ দুঃখ আমাতে অর্থাৎ আত্মাতে বর্ত্তমান, কিন্তু ইহা ভুল, কারণ ইহা জড়েই রহিয়াছে, আত্মাতে নাই। ফলকামনাও অহঙ্কার বা আসক্তির অন্তর্ভূত, কারণ কর্ম্মের বা ফলের সহিত অহং এর সম্পর্ক জড়িত রহিয়াছে। সাংখ্যমতে আত্মাকে জড়সম্পর্ক হইতে মুক্ত করিয়া আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সন্ন্যাস ও জ্ঞানসাধন করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। গীতা বলিলেন, সন্ন্যাসের দ্বারা ইহা হওয়া কঠিন; ফলকামনা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া করণীয় সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলেই আত্মা জড়সম্পর্ক হইতে মুক্ত হইতে পারে এবং তাহাতে কোন পাপ স্পর্শে না—এমন কি নরহত্যা করিলেও পাপ হয় না। জড়ের স্বভাব ইন্দ্রিয়াদির পক্ষে অতিক্রম করা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক, বাহিরের কর্ম্ম রোধ করিলে মনে কর্ম্মের চিন্তা থাকে। এই জন্য অন্তরেন্দ্রিয়কে ইচ্ছা দ্বেষ, হর্ষ শোক, ইত্যাদি আসক্তি ও ফলকামনা হইতে মুক্ত করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত গীতা আরও একটি উপায় উল্লেখ করিয়াছেন,—সকল কর্ম্ম আত্মাতে নহে, ঈশ্বরে সমর্পণ করিলেও, আত্মা কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ও স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে? ইন্দ্রিয়গণকে স্বাধীনতা দিলে তাহারা যে পথে ইচ্ছা সে পথে যাইবে। গীতাকার, অন্ততঃ গীতার ব্যাখ্যাকার, মনে করেন যে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল তাহাদিগকে ইহজন্মে নিয়মিত করিবে। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত ইহজন্মের কর্ম্মও আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না, কারণ জন্মান্তর থাকিলে ইহজন্মের কর্ম্মফলও পরজন্মের জন্য সঞ্চিত হইবে। এই জন্য তিনি উপদেশ দিলেন যজ্ঞ করাই একমাত্র করণীয় কর্ম্ম। কিন্তু যজ্ঞের প্রসিদ্ধ অর্থ হোমে ইহা সম্ভব হয় না দেখিয়া, পরে দ্বাদশ প্রকার কর্ম্মকে যজ্ঞ নামে অভিহিত করিলেন। গীতার দ্বিতীয় ভাগের লেখক এই অসামঞ্জস্য সংশোধন করিয়া যজ্ঞের স্থানে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই তিনটি করণীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও সকল কর্ম্ম নিঃশেষ হয় না দেখিয়া নিত্য ("নিয়ত") কর্ম্মও কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা করিলেন। নিত্যকর্ম্ম শাস্ত্র অনুসারে করিতে হইবে এবং তাহার মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রহিয়াছে। যাহারা শাস্ত্র মানে না, তাহারা মোহের বশীভূত হইয়াই কাজ করে, ইহাই তাঁহার মত (১৬শ অধ্যায়ে আসুরী সম্পদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু শাস্ত্র না মানিয়াও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনেকে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাদের কর্ম্মও কি অসৎ? মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত আছে, যাহারা শাস্ত্রবিধি অনুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও যজ্ঞানুষ্ঠান না করে, তাহারা উপনিষদুক্ত ব্রহ্মজ্ঞান সাধনা করিলেই মুক্তি লাভ করে। এই দ্বিতীয় লেখকও সেইরূপ অর্জ্জুনের প্রশ্নচ্ছলে (১৭শ অধ্যায়ে) বলিতেছেন, যাহারা শাস্ত্রবিধি

দরণ না করিয়াও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করে, তাহারা "ওঁ তৎসৎ" এই ব্রহ্মপ্রতিপাদক মন্ত্রের দ্বারা তাহা শোধন করিয়া লইবে। এইরূপে কর্ম্মকে ক্রমে প্রসারিত করা হইয়াছে।

অবশ্য অনাসক্ত নিষ্কাম কর্ম্মই আত্মজ্ঞানসাধনার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ইহার সহিত জ্ঞান ও ধ্যান উভয়ই চাই। ইহা ব্যতীত গীতা একটি নূতন কথা বলিয়াছেন,—সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, সর্ব্বভূত আত্মভূত হইয়াছে এমন অবস্থা, বা সর্ব্বভূত-হিতেরত হওয়া চাই। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের কথা, যোগদর্শনেও সম্ভবতঃ বৌদ্ধদর্শন হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, ("মৈত্রীকরুণামুদিতা ও উপেক্ষার ভাবনা হইতে চিত্তের প্রসন্নতা হয়")। গীতা ইহার অন্য কারণ দিয়াছেন। ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ আত্মার শান্তভাব চাই, দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন সেইরূপ হওয়া চাই। কিন্তু এই সমদৃষ্টির ত্রুটি এই যে, ইহা কেবল অন্তরে সাধন করিতে হইবে, কারণ কার্য্যতঃ শাস্ত্রঅনুসারে বর্ণাশ্রম মানিয়া চলিতে বলা হইয়াছে।

যাহা হউক, এই প্রকারে আত্মাকে প্রস্তুত করিয়া ধ্যান-দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে। এ ধ্যান আত্ম-ধ্যান নহে, ঈশ্বরে নিবিষ্টচিত্ত এবং ঈশ্বরকে পরমপুরুষার্থ জ্ঞানে তন্নিষ্ঠ হইয়া (মচ্চিত্তো, মৎপরঃ) তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে। (৬।১৪)। "এইরূপে যে নিষ্পাপ যোগী সদা আত্মাতে যুক্ত, সে অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ সুখ প্রাপ্ত হয়।" (৬।২৮)। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে আরও জ্ঞান এবং তৎপরে মুক্তি বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ হয়। "ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ" অর্থ সংসারের অন্ধকার দূর হইলে, মানব যে আত্মজ্যোতিলাভ করে, তাহাও নিষ্প্রভ হইয়া ব্রহ্মজ্যোতিতে আত্মা জ্যোতিষ্মান্ হয়। আত্মা ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, ইহা গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া অনুমতি হয় না। ইহাই গীতার সাধনার ক্রম।

এখন গীতার এই কর্ম্মযোগের উপদেশ কতদূর যুক্তিযুক্ত, তাহা আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। সাংখ্যতত্ত্বের দ্বৈতবাদ ও আত্মার যে স্বরূপ উক্ত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিলে, গীতার উপদেশ বিশেষ অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, সাংখ্যের আত্মতত্ত্ব ও দ্বৈতবাদ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যজ্ঞ ও শাস্ত্রীয় উপদেশ অবশ্য করণীয়, ইহাও যে গ্রহণযোগ্য নহে, তাহাও আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। অতএব বর্ত্তমান জ্ঞানের আলোকে কর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, গীতার কর্ম্মযোগ কতদূর গ্রহণ করা যাইতে পারে।

মনোবিজ্ঞান অনুসারে চারি প্রকার কর্ম্ম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে—অজ্ঞাতকর্ম্ম, যথা, নিদ্রায় মানুষের হস্তপদ চালনা; সহজাত কর্ম্ম, ইহা সজ্ঞান হইলেও মানবের কর্ত্তৃত্ব-বিহীন, যথা, শিশুর ক্ষুধা হেতু ক্রন্দন ও স্তন্যপান; সজ্ঞান উদ্দেশ্যযুক্ত কর্ম্ম, ইহা মানবের কর্ত্তৃত্বাধীন; এবং অভ্যাসমূলক কর্ম্ম, ইহা প্রথমে সজ্ঞান উদ্দেশ্যযুক্ত ছিল, কিন্তু পরে অভ্যস্ত হইয়া অজ্ঞাত বা সহজাত কর্ম্মের প্রকৃতি গ্রহণ করিয়াছে। ইহার মধ্যে অজ্ঞাত বা সহজাত কর্ম্ম মানবের কর্ত্তৃত্ববিহীন এবং তাহা ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের মধ্যে আসিতে পারে না। অভ্যাস-মূলক কর্ম্ম আসিতে পারে; কারণ তাহা মূলে সজ্ঞানকর্ম্ম হইতে উৎপন্ন এবং চেষ্টা দ্বারা অভ্যাস পরিবর্ত্তন করা যায়। কিন্তু সজ্ঞান উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্মই মানবের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র! এই ক্ষেত্রে মানব স্বাধীন ও তাহার কর্ত্তৃত্ব আছে বলিয়া তাহার কর্ম্মে পাপপুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার আছে। ব্যাঘ্র নরহত্যা করিলে তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হয় না, কারণ ব্যাঘ্র বিচারবুদ্ধিবিহীন হইয়া সহজাত জ্ঞানের বশে ইহা করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ নরহত্যা করিলে পাপপুণ্য বিচারের মধ্যে পড়ে; কারণ সে বিচারবুদ্ধিযুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে তাহা করিয়াছে। কর্ম্মে মানবের কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে, মানবের পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, চেষ্টা, সাধনা কিছুই থাকে না, সে ইতর প্রাণীর পর্য্যায়ে পড়িয়া সহজাত বা অজ্ঞাত কর্ম্মে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু কর্ম্ম হইতে মানবের কর্ত্তৃত্ব কখনও অপসারণ করা যাইতে পারে না। যিনি কোন কর্ম্মে আপন কর্ত্তৃত্ব বিসর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, ও যিনি কর্ম্ম করিতেছেন, ইহারা সকলেই আপন আপন কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগ করিয়াই কর্ত্তৃত্ববিসর্জ্জন, কর্ম্ম পরিত্যাগ ও কর্ম্ম করিতেছেন। সাংখ্যমতে এই কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি, মন বা ইন্দ্রিয়ের, আত্মার নহে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে (২য় প্রবন্ধে) বলিয়াছি, এ মত সমীচীন নহে, বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি আত্মারই ধর্ম্ম, আত্মা হইতে বিযুক্ত নহে। এই জন্য কর্ম্মে আত্মার কর্ত্তৃত্ব কখনও দূর হয় না।

কিন্তু গীতায় প্রথমতঃ সাংখ্যদর্শন অনুসরণ করিয়া কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব "স্বভাব" ও "অজ্ঞানের" উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ের ১৪—১৫ শ্লোকে বলিতেছেন, "কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলসংযোগ ঈশ্বর সৃষ্টি করেন না, স্বভাবই প্রবর্ত্তিত করে। ঈশ্বর কাহাকেও পাপ বা পুণ্যদান করেন না, অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) আবৃত থাকে, তাহাতে জীবসকল মোহযুক্ত হয়।" এখানে "স্বভাব" বলিতে জড় ও অজ্ঞান বুঝিতে হইবে, কারণ কার্য্য যে জড়ের এবং আত্মার উপর কর্ম্মের প্রভাব যে মিথ্যা অহঙ্কারজনিত, এ কথা বহুস্থানে উক্ত হইয়াছে। ইহার ভাব এই যে কর্ম্মসকল ও কর্ম্মের ফল জড়ের কার্য্য, আত্মার নয়, ঈশ্বরেরও নহে; মানুষ মিথ্যা 'আমি' 'আমি', করিয়া মনে করে যে সে কর্ত্তা, আর ফল ও পাপপুণ্য ভোগ করে। কিন্তু সপ্তম অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব বলিতে গিয়া গীতা বলিলেন যে, জড়ও ঈশ্বরের অপরা প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের ত্রিগুণাত্মক মায়া-দ্বারা সকল প্রাণী মোহাচ্ছন্ন রহিয়াছে (৭।১৩)। গীতার শেষভাগের লেখক এই দুই মত ও তাহার সহিত পূর্ব্বজন্ম-সংস্কার এক করিয়া মানুষকে একেবারে কর্ম্মাধীন করিয়া ফেলিয়াছেন। "তুমি যে অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া মনে করিতেছ 'আমি যুদ্ধ করিব না', এ চেষ্টা তোমার বৃথা, প্রকৃতি তোমাকে নিয়োজিত করিবেই। হে কৌন্তেয়!

মোহবশতঃ যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ ও অবশ হইয়া তুমি তাহা করিবেই। হে অর্জ্জুন! সর্ব্বভূতের হৃদয়ে ঈশ্বর অবস্থান করিতেছেন এবং যন্ত্রারূঢ় বস্তুর ন্যায় সকল ভূতকে তিনি স্বীয় মায়া (জড় প্রকৃতি) দ্বারা ভ্রমণ করাইতেছেন।" অতএব গীতার মতে মানবের কর্ম্মসম্বন্ধে কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। দ্বিতীয়তঃ আত্মার পাপপুণ্যও অলীক, কারণ ইহাও জড়ের ধর্ম্ম, আত্মা অজ্ঞান হেতু মনে করে তাহার পাপপুণ্য আছে। যেখানে আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই, সেখানে পাপপুণ্য একটা কার্য্য কারণ ব্যাপারের মধ্যে পড়ে। যেমন ঠাণ্ডা লাগাইলে জ্বর হয়; স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিলে কেহ সুখে থাকে, সেইরূপ পাপ করিলে পরলোকে বা পরজন্মে শাস্তি, ও পুণ্য করিলে সুখ, ইহার অধিক আর কিছু নহে, আত্মার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এ মতে নৈতিক বিধির গৌরব একেবারে লোপ পায়, মানুষ কেবল ভয়ে ও সুখের ইচ্ছায় পাপপুণ্য অনুষ্ঠান করে।

এখন আমরা পূর্ব্বের কর্ম্মবিশ্লেষণে পুনরায় উপস্থিত হই। প্রথমে দেখিয়াছি, সজ্ঞান উদ্দেশ্যমূলক কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক সজ্ঞান (উদ্দেশ্যমূলক) কার্য্য কোন সজ্ঞান উদ্দেশ্য ব্যতীত হইতে পারে না। এমন কি বালকের ক্রীড়ারও একটা উদ্দেশ্য আছে, তাহা আনন্দ। উদ্দেশ্যের আবার দুইটি প্রকৃতি থাকে—যাহা স্বকীয় আত্মার বা অপরের পক্ষে শ্রেয়, অথবা যাহা কর্ম্মীর পার্থিব জীবনের পক্ষে শ্রেয়। কতকগুলি উদ্দেশ্য এমন আছে যাহা চিরন্তন একই প্রকৃতির, কিন্তু অধিকাংশ কাজই এরূপ যে তাহা উভয় উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। যেমন একজন ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে সংসার করে, আর একজন সুখের উদ্দেশ্যে সংসার করে; একজন দান করে অপরের দুঃখনিবারণের জন্য, অপরে যশোলাভের জন্য—একই কার্য্য দুই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে। সে যাহা হউক, প্রত্যেক কর্ম্মি কর্ম্মের মধ্যে এই দুই উদ্দেশ্যই বুঝিতে পারে এবং আপন ইচ্ছা অনুসারে কর্ম্ম নির্ব্বাচন করিয়া লয়, অথবা একই কর্ম্ম উভয় উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করিবার সম্ভাবনা থাকিলে, কর্ম্মের প্রকৃতি নির্ব্বাচন করিয়া লয়। পার্থিব জীবনের পক্ষে যাহা শ্রেয়, তাহা যদি আত্মার বা অপরের শ্রেয়ের ক্ষতি বা অবহেলা করিয়া করা হয়, তবে তাহা পাপ এবং তাহাতে পার্থিব জীবনের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু যাহা আত্মার পক্ষে বা অপরের পক্ষে শ্রেয়, তাহা পার্থিব জীবনের ক্ষতি করিয়া অনুষ্ঠান করিলেও, তাহাই সাধু ও পুণ্য কর্ম্ম। কিন্তু তাহাতেও আত্মার বা অপরের শ্রেয়ের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করে। এ দিকে পার্থিব জীবনের উপর অনুরাগও দোষের নহে, যে পর্য্যন্ত না তাহা আত্মার শ্রেয়ের পথে অথবা অপরের শ্রেয়ে বাধা উৎপন্ন করে। পাপ পুণ্যের প্রকৃতি স্থূল ভাবে ইহাই। এ পাপপুণ্যজ্ঞান শাস্ত্রীয় আদেশের উপর নির্ভর করে না, ইহা মানব আপন অন্তরেই বুঝিতে পারে। পাপে অন্তর শুষ্ক হইয়া যায় ও আপনার প্রতি আপনার ঘৃণা আসে; পুণ্যে আত্মার বিকাশ হয়, ও আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে পাপী সে সাংসারিক জীবনে আসক্ত। কিন্তু যে পুণ্যবান সে আত্মার বা অপরের শ্রেয়ের প্রতি অনুরাগী। কিন্তু আসক্তি ও অনুরাগ একই পর্য্যায়ভুক্ত। সাধুকর্ম্মে অন্তরের অনুরাগ না থাকিলে, তাহা স্বাধীন ভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আবার অসাধু কর্ম্মের উপর দ্বেষ না থাকিলে, মানব তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহে না। যে সম্পূর্ণ পরাধীন দাস সেই অনুরাগ না থাকিলেও শাস্তির ভয়ে সাধুকর্ম্ম করে এবং দ্বেষ না থাকিলেও অসাধু কর্ম্ম হইতে বিরত হয়। এই জন্য দেখা যায় স্বাধীন কর্ম্ম, তাহা সাধুই হউক বা অসাধুই হউক, তাহাতে অনুরাগ বা দ্বেষ হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি না। নিন্দা প্রশংসা, মান অপমান, লাভ ক্ষতি, শত্রু সুহৃদ—এ সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হওয়া যায়, সুখ দুঃখ সহ্য করা যায়, কিন্তু কর্ম্মে অনুরাগ না থাকিলে কর্ম্ম হয় না, এবং দ্বেষ না থাকিলে অসাধুকর্ম্ম হইতে মুক্ত হওয়া যায় না।

ফল কামনা-শূন্য হইয়া সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যায় কি না, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইলে কর্ম্মের আর একটা দিক আমাদিগের দেখিতে হইবে। যে কর্ম্মেই মানব প্রবৃত্ত হউক না কেন, তাহার একটা পরিণাম আছে, যেমন গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের পরিণাম আত্মার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। মরুভূমিতে অবতীর্ণ হইলাম, কিন্তু মরুভূমি পার হইব কি না এ চিন্তা করিব না, সারা জীবন যদি পথভ্রান্ত হইয়া মরুর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াই তথাপি পার হইবার পথ খুঁজিব না, এরূপ চিন্তা লইয়া কোন বুদ্ধিমান লোক কোন সাধারণ কাজে প্রবৃত্ত হয় না। মানুষ বিফল হইলে, পুনরায় ফললাভের জন্য নূতন পথে কাজ আরম্ভ করে, অথবা সফল হওয়া অসম্ভব মনে হইলে সে কাজ পরিত্যাগ করে। কেবল এক শ্রেণীর কাজ আছে যেখানে মানুষ ফলকামনাশূন্য হইয়া কাজ করিতে পারে। যে কাজ ধর্ম্মবুদ্ধি (বিবেক) বা ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিয়া আরব্ধ করা হয়, সেই কাজ সম্বন্ধেই ফলাফল বিচারের কোন প্রয়োজন থাকে না। কারণ সেখানে মানবের কাজ করিবারই অধিকার আছে, ফলের অধিকার, যিনি বিবেকের বিধাতা ও কর্ম্মের আদেষ্টা তাঁহার হাতে। তিনি সফলতা ও বিফলতা উভয়ের মধ্য দিয়াই কল্যাণ আনয়ন করিয়া থাকেন। আত্মার কল্যাণ যেখানে লক্ষ্য, সেখানে সফলতা বা বিফলতা অবান্তর বিষয়। তাহার পর যখন আমরা বুঝি যে প্রেম, পুণ্য ও সত্য ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিলে আমরা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি, তখন ফলাফলবিচারশূন্য হইয়া আমাদিগের সেই সকল কার্য্য অনুষ্ঠেয়। গীতার একটি প্রধান অভাব এই যে, শাশ্বত নৈতিক বিধি, মানবের স্বতঃ ধর্ম্মবুদ্ধি এবং "ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" সেই ঈশ্বরের সাধু কর্ম্মে প্ররোচনা স্বীকার করেন নাই। গীতা যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহা জড়ের ন্যায় মানবের স্বভাবতঃই ঈশ্বরের একান্ত অধীনতা, এবং নৈতিক বিধি ও বিবেকের স্থলে রাখিয়াছেন শাস্ত্র। স্বেচ্ছায় ও প্রেমে ঈশ্বরের অধীন হওয়া শ্রেষ্ঠ সাধনা, কিন্তু মানুষ স্বাধীন ইচ্ছা-

বিহীন জড়ের ন্যায় অধীন হইলে, মনুষ্যজীবনের বিশেষত্ব থাকে না। এ বিষয় পূর্ব্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রসম্বন্ধেও পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি। এখানে এই মাত্র বলি যে, শাস্ত্র নীতি ও বিবেকের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। শাস্ত্রের পশুহিংসামূলক যজ্ঞ হিংসাসংস্পৃষ্ট ও বৃথা কার্য্য, জাতিভেদমূলক বিধি বিবেক ও শাশ্বত নৈতিক ধর্ম্ম-বিরোধী। ইহা ব্যতীত শাস্ত্র অনুসরণে মানব স্বাধীন বিচার-মূলক বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া পশুস্বভাবমূলক সহজাত কর্ম্মের ন্যায় কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে। ইহাতে মানবের শ্রেয় নাই। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও কর্ম্মের সফলতায় উল্লাস ও গর্ব্ব এবং বিফলতায় দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে স্থির রাখিতে হইবে, গীতার এ উপদেশ মূল্যবান।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আত্মাকে সকল জড়সম্পর্করহিত, স্থির ও নিষ্ক্রিয় মনে করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, ইহা গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আত্মার স্বরূপ উক্ত মত হইতে ভিন্ন। আত্মা বিষয়ী ও কর্ত্তা, স্ব-তন্ত্র, জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যস্বরূপবিশিষ্ট এবং এ সকলের পূর্ণ আদর্শ অভিমুখে গতিশীল। আত্মজ্ঞ হইতে হইলে, (১) জ্ঞানে বিষয় হইতে বিষয়ীকে ভিন্ন করিয়া দেখিতে হইবে, (২) প্রেম ও পুণ্যের অনুসরণ করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, (৩) পরতন্ত্রতা (সংসার, মানব ও শাস্ত্রের অধীনতা) ত্যাগ করিতে হইবে এবং (৪) সত্য জ্ঞানের আলোচনা করিতে হইবে। এই উপায়ে মানুষ বুঝে যে সে জড় নহে, তাহার স্বরূপ আহার-বিহার ও সুখভোগ নহে, সে সত্য জ্ঞানে প্রেমে ও পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে স্বাধীন স্বয়ং কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন ও পাপ-পুণ্যভাগী এবং জ্ঞানদ্বারা দৃষ্টের অতীত অদৃশ্যরাজ্যে যাইতে পারে। আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে জ্ঞান পুণ্য ও প্রেমের আদর্শ মানবের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, এবং জ্ঞানদ্বারা আত্মার মূল কারণে প্রবেশ করিয়া যিনি অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম ও অনন্ত পুণ্যের আধার ও আত্মার প্রতিষ্ঠাভূমি, সেই ঈশ্বরের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ইহাই স্বাভাবিক সাধনা।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী।

# সত্যস্বরূপের আধ্যাত্মিক উপাসনা

## সাধন, শিক্ষাদান ও প্রচার।

(৩)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একটি উপাসকমণ্ডলী, সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের একটি অংশ। এ মণ্ডলীর বিশেষ আদর্শ ও বিশেষ ভাব আছে, বিশেষ কার্য্যপ্রণালী অনুসারে সেই আদর্শ ও ভাবের সাধন করা এর উদ্দেশ্য। এক লক্ষ্য এক আদর্শ এক ভাব এবং এক প্রণালী যেখানে সেখানে শক্তি জাগে। দশ জনের মধ্যে লক্ষ্যে আদর্শে এবং সাধন-প্রণালীতে যদি মিল না থাকে, তা হ'লে এক মণ্ডলীভুক্ত হওয়ার কোন মানে থাকে না। সুতরাং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণকে সর্ব্বপ্রথম ভাবতে হবে, আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হয়েছি কেন, রয়েছি কেন? আমাদের লক্ষ্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বদাই শোনা যায়—আধ্যাত্মিক উপাসনা প্রচার করা অর্থাৎ ঈশ্বর কেমন এবং তাঁর সত্য উপাসনা কিরূপে করণীয় তার তত্ত্বটা অন্তদের জানিয়ে দেওয়া। এটাও একটা কাজ, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, কেহ যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হ'ন, তখন যদি তাঁর মনে এই ভাবটি প্রবল থাকে, তা হ'লে লক্ষ্য সম্বন্ধে গোড়ায় গলদ হ'ল। আর যাঁরা বহুকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য আছেন, তাঁরা যদি এই উত্তর ঠিক ক'রে রেখে থাকেন, তা হ'লে তাঁদের পক্ষে আগাগোড়াই গলদ বলতে হবে। সমস্যা হচ্ছে এখানে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যাঁরা স্থাপনকারী ছিলেন তাঁরা নিজেদের এবং পরিবারের ও ধর্ম্মবন্ধুগণের ধর্ম্মসাধনকে সুগঠিত মণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এ মণ্ডলী গঠন করেছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল নিজেরা উপাসকমণ্ডলী হওয়া, নিজেরা হ'য়ে, সন্তানগণকে উপাসনা শিক্ষা দিয়ে, জগতে প্রচার করা। এই উদ্দেশ্য থাকলেও, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগের অধিকাংশ সভ্যই ব্যস্ত হয়েছিলেন বাহিরের নানা কাজ নিয়ে, অতি অল্প সংখ্যক সভ্যই উদ্দেশ্যসাধনে নিষ্ঠাবান ছিলেন। তার ফলে ১২।১৩ বছর যেতে না যেতে শাস্ত্রীমহাশয়ের মনে সাধারণ সমাজের সভ্যগণের আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ঘোর অতৃপ্তির উদয় হয়, এবং গভীর চিন্তা ও প্রার্থনার পর তিনি সাধনাশ্রম স্থাপন করেন। যা সমস্ত সমাজে হয় নাই, তাই একটী ছোট মণ্ডলীতে গ'ড়ে তুলবার চেষ্টা করেন। যদি একটি ছোট মণ্ডলীতে আধ্যাত্মিক জীবন গভীর ও জীবন্ত হয়, তা হ'লে তার প্রভাবে সমাজে আধ্যাত্মিকতা বিস্তৃত হবে, এই ছিল তাঁর আশা। সে আশা কত দূর পূর্ণ হয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

ধর্ম্মসমাজের শক্তি, উপাসকমণ্ডলীর বল, বড় বড় বাড়ী ঘরে বা মোটা স্থায়ী ফণ্ডে, বা সভ্যগণের বিবিধ প্রকার সাংসারিক উন্নতিতে নয়; বহু সংখ্যক সাধন-পরায়ণ উপাসনাশীল সভ্যদের মধ্যে আত্মিক যোগ, সাধন ভজন সেবা ও সত্যের সংগ্রামে মিলনই ধর্ম্মমণ্ডলীর শক্তির মূল। ধর্ম্মসাধনে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন এবং মণ্ডলীগত জীবন, তিনই পরস্পরের সহায়, এক সূত্রে বাঁধা। সমাজের সভ্যগণের মধ্যে যে পরিমাণে সহসাধক ও সহকর্ম্মী সমভাবে জাগে, সেই পরিমাণে সমাজের মণ্ডলীত্ব ও সজীবতা।

এ বিষয়ে সমাজের প্রত্যেক সভ্যের দায়িত্ব আছে। Sleeping partner দিয়ে ধর্ম্মমণ্ডলী গড়ে না। Sleeping partnerরূপ সভ্যসংখ্যা যত বাড়ে, উপাসকমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা ততই বেশী হয়। উপাসকমণ্ডলীর একমাত্র মূলধন উপাসনাশীল জীবন। তার স্থানে আর কিছু বসালেই মৃত্যু। উপাসক-মণ্ডলীর সভ্য হওয়া, সভ্য থাকা, এবং নূতন সভ্য গ্রহণ করা,—এ সকলের কষ্টিপাথর উপাসনাশীলতা এবং উপাসনায় মিলনাকাঙ্ক্ষা।

উপাসকমণ্ডলী মানেই কয়েকজন উপাসনাশীল ব্যাকুল আত্মার মিলন, পরস্পরের সহায়তার জন্য। ধর্ম্মজীবন গঠনে, সত্যের সংগ্রামে, ব্রহ্মানন্দ আস্বাদনে পরস্পরের সঙ্গ ও সহায়তা লাভের ব্যাকুলতা ব্যতীত জীবন্ত মণ্ডলী হ'তে পারে না। এ ভাবের সংক্রামকতা আছে। দশ জন ভাবে বিভোর হ'লে, শত জন সহস্র জন সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়। একটি বৃহৎ সমাজের সব সভ্যকে এক মণ্ডলী করা কঠিন, কিন্তু সমাজের মধ্যে কয়েকটি ছোট ছোট মণ্ডলী গঠন করা সম্ভব, এবং তা যদি গ'ড়ে উঠে তাতে সমাজের শক্তি বাড়বে। কিন্তু সব মণ্ডলীরই কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ থাকা চাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনের প্রধান ক্ষেত্র গৃহ-পরিবার। ভগবানের ভাল সন্তান, বাধ্য সন্তান হওয়া মানেই, সংসারে পরিবারে ভাল মা বাপ ছেলে মেয়ে ভাই বোন দাস দাসী হওয়া, সব কর্ত্তব্য ভাল ক'রে করা, প্রেমসাধন জ্ঞানসাধন ও সেবা সব ভাল ক'রে পূর্ণমাত্রায় করবার জন্তে চেষ্টা করা। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এই সাধনাধারা ছোট মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে,

এবং সমাজ-কেন্দ্রের সঙ্গেও যোগ রক্ষা কর্‌তে হবে। বিচ্ছিন্ন সাধক বা বিচ্ছিন্ন পরিবার, খুব ভাল হ'লেও তাতে সমাজের শক্তি জাগে না। এবং মণ্ডলীর ও সমাজের বৃহত্তর জীব হ'তে বিচ্ছিন্ন থেকে কেহ সত্য জীবনে বেশী অগ্রসরও হ'তে পারে না। শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত

## ব্রাহ্মসমাজ

**প্রচার**—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ১১ই শ্রাবণ ভাগলপুর ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১২ই শ্রাবণ শ্রীযুক্ত প্রেমসুন্দর বসু সস্ত্রীক ইয়োরোপ হইতে ভাগলপুর নিজগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার বাড়ীতে ব্রাহ্মবন্ধুগণের সম্মিলন হয়। তাহাতে বিশেষ উপাসনাদি হয়; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২২শে শ্রাবণ মুঙ্গের গমন করিয়া পরের দিন তিনি মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং সঙ্গীতাদি করিয়া ধর্ম্মালোচনা করেন। এখান হইতে ভাগলপুর ও কলিকাতা হইয়া কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে গমন করেন।

**উৎসব**—ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবের কার্য্য নিম্ন লিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে—২৭শে শ্রাবণ সায়ংকালে মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়; শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৮শে শ্রাবণ কৈলাশ-ভবনে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে মন্দিরে বক্তৃতা হয়; রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বক্তৃতা করেন। ২৯শে শ্রাবণ প্রাতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহের বাড়ীতে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৩০শে শ্রাবণ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যাকালে মন্দিরে পুনরায় উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৩১শে শ্রাবণ প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণকালে মন্দিরে মহিলাদের উৎসব হয়; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় মন্দিরে বরদা বাবু কথকতা করেন। ৩২শে শ্রাবণ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় মন্দিরে বালকবালিকাদের উৎসব হয়; এই উপলক্ষে বরদা বাবু বালকবালিকাদের লইয়া প্রার্থনা করেন। বালকবালিকারা সঙ্গীত ও আবৃত্তি করিলে পর, বরদাবাবু তাহাদের উপদেশ দেন। তৎপর জলযোগান্তে সন্ধ্যার পর মন্দিরে পুনরায় উপাসনা হইয়া উৎসব শেষ হয়; বরদা বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উৎসবান্তে কয়েকদিন কুমিল্লা অবস্থিতি করিয়া কৈলাশ-ভবনে দুই দিন সায়ংকালে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। ৩২শে শ্রাবণ প্রাতঃকালে গভর্ণমেণ্ট প্লিডার শ্রীযুক্ত ভূধর দাসের ভবনে কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটরী অনঙ্গমোহন ঘোষের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশার্থ বিশেষ উপাসনাদি হয়; তাহাতে বরদাপ্রসন্ন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

কুমিল্লা হইতে ৪ঠা ভাদ্র শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ও শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী ব্রাহ্মণবেড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। এই দিন সায়ংকালে ব্রাহ্মণবেড়িয়া সমাজমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৫ই ভাদ্র পূর্ব্বাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় মন্দিরে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ৫টার সময় বার্ষিক সভা হয়। শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় মন্দিরে কথকতা করেন। ৬ই ভাদ্র প্রাতে মন্দিরে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উপাসনা করিয়া উৎসব শেষ করেন।

---

**শুভবিবাহ**—বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে কৃষ্ণনগর নিবাসী পরলোকগত বিপিনবিহারী দত্তের বালবিধবা কন্যা কল্যাণীয়া সুলেখারাণী বসু ও পরলোকগত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান অনুকুলচন্দ্রের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১০ই আগষ্ট এলাহাবাদ নগরীতে পরলোকগত পরেশ-রঞ্জন রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শীলা ও ডাক্তার নীলরতন ধরের এবং কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া বুলবুল ও পরলোকগত গিরিশচন্দ্র দের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান কিরণচন্দ্রের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৫শে আগষ্ট শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসুর মাতা পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরী পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল নানারূপে ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন।

বিগত ২৪শে আগষ্ট পাটনা নগরীতে পরলোকগতা লাবণ্যময়ী সেনের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য এবং শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে পতি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২০০৲ টাকা, কার্সিয়াং হাসপাতালে ২০০৲ তথাকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ১০০৲ এবং কলিকাতাস্থিত হোমিওপ্যাথিক হাসপাতালে একটি রোগীর জন্য লাবণ্যময়ী বেড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাহার উপযোগী মূলধন প্রদান করিয়াছেন।

বিগত ২৭শে আগষ্ট, পূর্ণিয়া নগরে পরলোকগত রায় বাহাদুর নিশিকান্ত সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বদিন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত সকালে ও সন্ধ্যায় শোকার্ত্ত পরিবারকে লইয়া উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। সহস্র লোক (হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ) উপাসনা-স্থলে উপস্থিত থাকিয়া গম্ভীরভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রথমে স্থানীয় দল নিশিকান্ত বাবুর জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তিনটী সঙ্গীত করেন। পরে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। উদ্বোধনে আচার্য্য, আত্মা যে অমর এবং অনন্ত উন্নতিশীল, ইহা বুঝাইয়া দেন, এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উপকারিতা ও আবশ্যকতা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করেন। উপাসনান্তে শাস্ত্রপাঠের সময় আচার্য্য সংস্কৃত শ্লোকগুলি বাঙ্গালা ও ইংরেজীতে ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার জীবনচরিত পাঠ এবং প্রার্থনা করেন। তদনন্তর আচার্য্যের প্রার্থনা। উপাসনার অঙ্গীভূত সমস্ত গানই শ্রীমতী বিনোদিনী চৌধুরী কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল। অতঃপর সকলে উঠিয়া ভস্মস্থাপনের স্থলে গমন করেন; তথায় ভস্মস্থাপন হইলে সঙ্গীত হইয়া অনুষ্ঠান শেষ হয়। সন্ধ্যাকালে ভস্মস্থাপনস্থলে পুনরায় পরিবারের ও অপর অনেকের সমাবেশ

হয়; এবং উপাসনা প্রার্থনা ও সঙ্গীত হয়। পরদিন ২৮শে তারিখে আত্মীয় ও পরিচিত সকলকে ভোজন করান হয়। প্রায় তিন হাজার লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তৎপর দিন কাঙ্গালী-বিদায়। চতুর্থদিন প্রজাদের সকলকে খাওয়ান হয়। নিশিবাবু পূর্ণিয়া নগরের ও জিলার বহু লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে মিউনিসিপালিটীর ভাইস্-চেয়ারমেনের পদে নিযুক্ত হন; পরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারমেন ও চেয়ারমেনের পদ লাভ করেন। এই তিন পদে থাকিয়া তিনি ক্রমশঃ নগরের ও জেলার বহু উপকার সাধন করিয়াছেন। নগরের হাসপাতালের জন্য তিনি বহু অর্থ দিয়াছেন, এবং ধনী লোকদের নিকট হইতে অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়া হাসপাতালের উন্নতি কল্পে ব্যয় করিয়াছেন। সহরের ও জিলার স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনার্থে অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন। অনেক লোক ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার নিকটে উপকার ও সাহায্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে পূর্ণিয়া শোকে মগ্ন।

তিনি পূর্ণিয়ায় একটী ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ব্রাহ্মপ্রচারকগণ উত্তরবঙ্গে প্রচার করিতে যাইয়া তাঁহার গৃহে আশ্রয় ও অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, বিষয় কর্ম্ম হইতে শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিয়া ভগবানের চিন্তায় মন সমর্পণ করিবেন। ভগবান্ তাঁহার আগেই তাঁহাকে আপন ক্রোড়ে লইয়া গিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন এবং আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্তহৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

**দান**—পরলোকগত ক্ষেত্রমোহন বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু প্রচার বিভাগে ২৲, এবং পুত্র শ্রীমান হেমন্তকুমার দাতব্য বিভাগে ২৲, দান করিয়াছেন। শ্রীমতী সুনীতিবালা ঘোষ পরলোকগত স্বামী দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষের বার্ষিক শ্রাদ্ধে দাতব্য বিভাগে ২৲, দান করিয়াছেন। পরলোকগতা সরোজিনী সরকারের আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রতিশ্রুত দান ১০০৲, নিম্ন লিখিত প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত হইয়াছে:—প্রচার বিভাগে ২৫৲, সাধনাশ্রম ৫৲, শিবনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারে ৫৲, নবদ্বীপ স্মৃতি ভাণ্ডারে ৫৲, রাঁচি অন্ধ বিদ্যালয়ে ১০৲, হাজারীবাগ অনাথাশ্রমে ১০৲, দেওঘর কুষ্ঠাশ্রমে ১০৲, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ ১৫৲, রাঁচি ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, ও কুষ্টিয়া ব্রাহ্মসমাজ ৫৲।

এ সমস্ত দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল চিরশান্তি লাভ করুন।

**পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী**—সবিনয় নিবেদন, মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় আগামী ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই আশ্বিন (৩০এ সেপ্টেম্বর এবং ১লা ও ২রা অক্টোবর), মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন চট্টগ্রামে সম্পন্ন হইবে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন ব্রাহ্মব্রাহ্মিকাদিগের এবং ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিকারীদিগের মিলনের ও ব্রহ্মোৎসব সম্ভোগ করিবার ক্ষেত্র। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সবান্ধবে উৎসবে যোগদান করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন।

যাঁহারা বিদেশ হইতে আসিবেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ৭ই আশ্বিন, ২৪এ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন মহাশয়কে "নন্দনকানন, চট্টগ্রাম", ঠিকানায় পত্র লিখিয়া জানাইবেন। তাঁহাদের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত সম্মিলনীর পক্ষ হইতে করা হইবে। সকলে বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন।

সম্মিলনীর অধিবেশনের সময় মহিলাদিগের ও যুবকদিগের স্বতন্ত্র সম্মিলন হইবে।

অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়

(১) ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন। (২) ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। (৩) ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ। (৪) ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনা সাধারণের আকর্ষণের বস্তু করিবার উপায়। (৫) অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডার। (৬) বিবিধ।

বিবিধ:—(১) সম্মিলনীর নূতন বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও কর্ম্মচারী নিয়োগ; (২) বার্ষিক অধিবেশন সম্বন্ধে গত বৎসরের (১৯২৯ সনের) নির্দ্ধারণ পুনর্ব্বিবেচনা; (৩) সম্মিলনীর সভ্যগণের বার্ষিক চাঁদার নিম্নহার ১৲ টাকা স্থলে ৩৲ টাকা নির্দ্ধারণ; (৪) শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন মহাশয় লিখিত দুইখানি পুস্তিকা ছাপাইবার ব্যবস্থা;

অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যপ্রণালী

১৩ই আশ্বিন (৩০এ সেপ্টেম্বর), মঙ্গলবার—মধ্যাহ্ন ২ ঘটিকায় সম্মিলনীর প্রারম্ভিক অধিবেশন। প্রার্থনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে। প্রথমতঃ সম্মিলনী সম্পাদকের নিবেদন; তৎপর সম্মিলনীর সভাপতি নির্ব্বাচন ও সভাপতির অভিভাষণ। তৎপরে সম্মিলনী সম্পাদক কর্ত্তৃক রিপোর্ট পাঠ।

সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুর দিন উপলক্ষে স্মৃতিসভা।

১৪ই আশ্বিন—১লা অক্টোবর, বুধবার—প্রাতে ৬।০ ঘটিকায় উপাসনা; উপাসনান্তে সম্মিলনীর ২য় অধিবেশন। আলোচ্য বিষয়—ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় সম্মিলনীর ৩য় অধিবেশন—আলোচ্য বিষয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ। সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় বক্তৃতা।

১৫ই আশ্বিন—২রা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৬॥০ ঘটিকায় উপাসনা, তৎপর সম্মিলনীর ৪র্থ অধিবেশন—আলোচ্য বিষয়—ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনা সাধারণের আকর্ষণের বস্তু করার উপায়। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় সম্মিলনীর ৫ম বা শেষ অধিবেশন—আলোচ্য বিষয়—অনাথ ধন ভাণ্ডার এবং বিবিধ বিষয় সমূহ।

(প্রয়োজন হইলে প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে)।

বিনীত
শ্রীমথুরানাথ গুহ
সম্পাদক, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনী।

## অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধন ভাণ্ডারের কার্য্য বিবরণ। ঢাকা।

(১৯২৯—৩০; অক্টোবর—আগষ্ট)

১। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরেই সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতাদের উদ্যোগে সমাজের অতি হিতজনক এই স্থায়ী ফণ্ড স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসর ইহার মূলধন ৭৭০১৷৮; এবং সুদ হইতে ৩৫৭৲ টাকা সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে। ৩৬৷৩৭ বৎসর মাত্র পৌণে আট হাজার টাকা সংগৃহীত হওয়া অতি সামান্য উদ্যোগের পরিচায়ক। প্রতিষ্ঠাতাদের কেহ কেহ অদ্যাপি জীবিত আছেন, এবং ইহার উন্নতি আশা করিতেছেন। ফণ্ডের বর্ত্তমান ট্রাষ্টী শশিভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র

ঘোষ রায় সাহেব, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ রায় বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ। ইঁহারা সকলেই সমাজে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। ইঁহারা সকলেই ফণ্ডের হিতৈষী এবং উন্নতিকামী। গত বৎসরের সংগৃহীত মূলধনের ৩৯৪৲ টাকার মধ্যে দুই শত টাকাই অন্যতম ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চেষ্টায় হইয়াছে। আমরা সাগুনয়ে ফণ্ডের ট্রাষ্টী, সম্মিলনীর পরিচালক ও সভ্য, এবং ব্রাহ্মসমাজের সহৃদয় মহোদয়গণের সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা যেমন নিজে দান করিবেন, তেমনি সহৃদয় মহোদয়গণের নিকট অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিলে ফণ্ডের দ্রুত উন্নতি হইতে পারে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সর্ব্বদা এই ফণ্ডের উন্নতির চেষ্টা করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। যাঁহারা অর্থ দিয়া ও চেষ্টা করিয়া এই ফণ্ডের উন্নতির সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। সংক্ষেপে আলোচ্য বর্ষের সংক্ষিপ্ত হিসাব, এবং দাতাদের ও সাহায্যপ্রাপ্তদের নাম উল্লেখ করিতেছি।

### সংক্ষিপ্ত হিসাব।

( ১৯২৯—৩০ ; অক্টোবর—আগষ্ট )

জমা—

১। এককালীন দান ও চাঁদা, মূলধন—৩৯৪৲ ; ২। সুদ আদায়—৩৮৯৸৬ ; ৩। গত বৎসরের স্থিত মূলধন—১৩০৭।৮ ; ৪। গত বৎসরের স্থিত সুদ—১২৩।/৪ ; মোট—৮২১৪৷৷৵৬।

খরচ—

১। মাসিক দান—৩৪৭৲ ; ২। এককালীন দান—৩০৲ ৩। মনি অর্ডার কমিশন—৫৸৹ ; ৪। ডাক ব্যয়—১৸৹ মোট—৩৬৩৸৵৹ ; ৫। হস্তে—জি, পি, নোট—৭৭০০৲ টাকা ; সেভিংস্ ব্যাঙ্ক—সুদ—১৪৯।৴১০ ; মূলধন—মোট—৮২১৪৷৷৵৬।

সাহায্যপ্রাপ্তদের নাম।

১। শ্রীমতী বিভা গুহ, ৪৪৲ ; ২। শ্রীমতী সুরবালা মল্লিক, ৪০৲ টাকা ; ৩। শ্রীমতী জে মা পাকল, ৪০৲ টাকা ; ৪। শ্রীমতী সরযূবালা দাস, ৪০৲ টাকা ; ৫। শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ মল্লিক, ৪০৲ টাকা ; ৬। শ্রীমতী পুণ্যদা চ্যাটার্জ্জি, ৪০৲ টাকা ; ৭। শ্রীমতী সরোজকুমারী চক্রবর্ত্তী, ৩৮৲ টাকা ; ৮। শ্রীমতী তরুবালা দাস বড়ুয়া, ৩৭৲ টাকা ; ৯। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী নাথ, ২৮৲ টাকা ; ১০। মিসেস মালিকরাম নারায়ণ, ১০৲ টাকা।

দাতাদের নাম।

রাজমোহন দাস রায় সাহেব, ১২৲ টাকা ; শ্রীযুক্তা বিনোদিনী চৌধুরী, ৫৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চ্যাটার্জ্জি, ৫৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত গুরুচরণ সরকার, ৫৲ টাকা ; শ্রীযুক্তা অম্বিকা সুন্দরী রায়, ২৲ টাকা শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন বসু, ২৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন, ১৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র রায়, ১৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সেন, ১৲ টাকা ; শ্রীযুক্তা হেম কুসুম রায়, ১৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু, ১৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন গাঙ্গুলী, ২৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষ, ২৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন সেন রায় সাহেব, ১০০৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস, ১০৲ টাকা ; শ্রীযুক্তা সরলা দত্ত, ৫৲ টাকা ; মিসেস অপূর্ব্ব দত্ত, ৫৲ টাকা ; শ্রীযুক্তা হরিপ্রভা তাকেদা, ৫৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত রাজমোহন দাস রায় সাহেব, ২৲ টাকা ; মিসেস জগচ্চন্দ্র দাস, ৫৲ টাকা ; ডাক্তার প্রভাতচন্দ্র রায়, ২৲ টাকা ; শ্রীযুক্তা সারদাসুন্দরী বসু, ১০৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন সেন রায় সাহেব, ১০০৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ দাস, ২৲ টাকা ; শ্রীযুক্তা শান্তিলতা কর, ২৲ টাকা ; মিসেস অপূর্ব্ব দত্ত, ৫৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র রায়, ২৲ টাকা ; শ্রীযুক্তা চারুবালা মজুমদার, ১০৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর, ১৫৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বসু, ২৲ টাকা ; শ্রীযুক্তা হরিপ্রভা তাকেদা, ৫৲ টাকা মিসেস অপূর্ব্ব দত্ত, ৫৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী কর, ২৲ টাকা ; [শ্রীযু]ক্ত সুকুমার দাস গুপ্ত, ১০৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত লালমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন, ৫৲ শ্রীযুক্তা চারুবালা মজুমদার, ১০৲ টাকা ; শ্রীযুক্তা বিভুবালা বক্‌সি, ৫৲ টাকা ; শ্রীযুক্তা সফিয়া কাজি, ৫৲ টাকা ; শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ, ৫৲ টাকা ; মিসেস প্রবোধানন্দ চক্রবর্ত্তী, ২৲ টাকা ; শ্রীযুক্তা মণিকা সেন, ২৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন, ১৲ টাকা ; শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, ১০৲। হারাণ জিনিষের মূল্য, ৩৲ টাকা। মোট ৩৯৪৲ টাকা।

শ্রীবঙ্কবিহারী কর
সম্পাদক
অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ভাণ্ডার, ঢাকা।



ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ৪ঠা আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু বি-এ

Registered No. 56

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৩ম ভাগ | ১লা কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১ | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
১৩শ সংখ্যা | 18th October, 1930. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা।

হে বিশ্বনিয়ন্তা, জীবনের অদ্বিতীয় প্রভু ও কর্ত্তা, তুমি সকল বিশ্বকে যেরূপ ভাবে তোমার ইচ্ছার একান্ত অনুগত করিয়া চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছ, আমাদের সম্বন্ধে যে সেরূপ ব্যবস্থা কর নাই, আমাদিগকে যে স্বাধীনতা দিয়া আপনা হইতে তোমার অনুগত হইয়া চলিবার অধিকার দিয়াছ, ইহাতে আমাদের প্রতি তোমার অপার প্রেম ও করুণারই পরিচয় পাইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা অনেক সময়ই তোমার প্রদত্ত এই উচ্চ অধিকারের মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া, আমরা আপনার ভাবে আপনার খেয়ালে তোমার বিরুদ্ধ পথে চলিয়া, নিজেদের মহা অকল্যাণসাধন ও নানা দুঃখ ক্লেশ আনয়ন করি—তোমার পথে চলিবার আনন্দ ও কল্যাণহইতে বঞ্চিত হই। তুমি জীবন্ত বিধাতা হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে কার্য্য করিতেছ বলিয়াই আমরা চিরদিন এই ভাবে চলিতে পারি না, আমাদিগকে সে পথ ছাড়িয়া একদিন না একদিন তোমার অনুগত হইতেই হয়। তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে ফিরাইয়া না আনিলে আমাদের উদ্ধারের আর অন্য উপায় ছিল না। তোমার এই দয়ার কত পরিচয় আমরা জীবনে সর্ব্বদাই পাইতেছি, তবুও কেন যে আমাদের দুর্ম্মতি দূর হয় না, সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে তোমার অনুগত হইয়া চলিতে সমর্থ হই না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। হে দুর্ব্বলের বল, তুমি আমাদিগকে বল দাও, যাহাতে আমরা এই দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বদা তোমার পথে চলিতে পারি, সর্ব্ব প্রকারে তোমার হইয়া যাইতে পারি। তোমার ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক। সর্ব্বত্র তোমার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক।

## সম্পাদকীয়

**ব্রহ্মানুগত্যসাধন**—আমরা বিগত সংখ্যায় যে সামান্য আলোচনা উপস্থিত করিয়াছিলাম তাহাতে দেখিতে পাইয়াছিলাম যে, ইচ্ছার ব্রহ্মানুগত্যসাধনের অভাবই এই দেশের সর্ব্বপ্রকার দুর্গতির মূল কারণ। উহার অভাবেই আমরা ব্যক্তিত্বের মেরুদণ্ডস্বরূপ চরিত্রের দৃঢ়তা হারাইয়া অধঃপাতের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি। বর্ত্তমানে সর্ব্বতোমুখী অনন্ত উন্নতি ও কল্যাণের হেতুস্বরূপ ধর্ম্মের যে পূর্ণতর আদর্শ আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কথাও তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছিল। সাধারণ ভাবে মানবজীবনসম্বন্ধে একটা উন্নততর আদর্শ বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু তাহার সঙ্গে যে সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের যোগ আছে, এরূপ বলা যায় না। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া মানবজীবনের কোন প্রকার পূর্ণ আদর্শই সম্ভবপর হইতে পারে বলিয়া যে আমরা মনে করি না, তাহা বলা বাহুল্য। মানুষের সমগ্র জীবনটাই যে তাহার ধর্ম্মজীবনের অন্তর্গত, ধর্ম্মটা যে তাহার কোনও বিশেষ অংশে আবদ্ধ নহে, তাহাও বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য কতকগুলি বিশেষ সাধন ও অনুষ্ঠানকেই যে ধর্ম্মসাধন বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রহ্মোপাসনাই আমাদের প্রধান সাধনপ্রণালী। ইহার মধ্যে আমাদের ধর্ম্মাদর্শের পূর্ণ পরিপুষ্টিসাধনের, জ্ঞানে প্রেমে ইচ্ছায় বা পুণ্যে জীবনদেবতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগস্থাপনের দ্বারা তাঁহার অনুরূপ জীবনলাভের, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উন্নতিপথে অগ্রসর হইবার, ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহা যে অতি সহজ ও স্বাভাবিক পথ তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই—পূর্ব্বে অনেকবার তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মকে সত্য রূপে

জানিলে যে স্বভাবতঃই ভালবাসিতে হয়, এবং তাঁহার প্রতি যথার্থ প্রেমভক্তি জন্মিলে যে আপনা হইতেই ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অনুগত না হইয়া পারে না, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। কিন্তু যেমন জ্ঞান ও প্রেমের বিকাশসাধন-বিষয়ে এতদতিরিক্ত অন্য আনুষঙ্গিক উপায় অবলম্বনেরও প্রয়োজন রহিয়াছে, তেমনি ইচ্ছার আনুগত্যসাধনসম্বন্ধেও অন্য প্রকার বিশেষ উপায় গ্রহণ করিবার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। অদ্য আমরা সে বিষয়েই সামান্য একটু আলোচনা উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

যদিও উপাসনার মধ্য দিয়া সাধকের প্রাণে সর্ব্বদা সকল বিষয়ে ব্রহ্মানুগত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি অতি সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে বিশেষ রূপেই বর্দ্ধিত হয়, তথাপি আমাদের ন্যায় সাধারণ সাধনার্থীর পক্ষে সেরূপ উপাসনাতে নিমগ্ন হওয়া এবং দীর্ঘকাল সে অবস্থা রক্ষা করা কত কঠিন, তাহা সকলে বিশেষ করিয়াই অবগত আছি। বিশেষতঃ, দীর্ঘকাল প্রবৃত্তির দাসত্বে নিযুক্ত থাকিয়া আমরা অনেকেই যেভাবে আপনাদের ইচ্ছা-শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছি ও অভ্যাসের শৃঙ্খলে আপনাদিগকে সুদৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছি, তাহাতে সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্তভাবে বিরুদ্ধ পথে চলিবার মত বললাভ করা আমাদের পক্ষে কত কঠিন তাহা আমরা ভালরূপেই জানি। নিয়মিত চর্চ্চার দ্বারাই সকল প্রকার শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বিশেষ অবস্থাতে হঠাৎ যে বললাভ করা যায়, তাহা প্রায়ই দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। অভ্যাসকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেওয়াও এক দিনের এক মুহূর্ত্তের কাজ নয়, তাহার স্থলে নূতন অভ্যাস ধীরে ধীরেই গড়িয়া তুলিতে হয়। দীর্ঘকাল যে অভ্যাসের শৃঙ্খলে আমরা আপনাদিগকে জড়িত করিয়াছি, তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে আবার বিরুদ্ধ অভ্যাস রচনা না করিলে কিছুতেই চলে না। এই উভয় বিষয়েই যে আমরা নিয়মিত উপাসনা হইতে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হই, তাহা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তাহা ব্যতীত অন্য কতকগুলি বিশেষ ব্রতও গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক, নানা উপায়ে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞার বল বর্দ্ধিত করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা অপরিহার্য্য। আমরা যাহাতে প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা চালিত না হই, প্রবৃত্তিগুলি যাহাতে সর্ব্বদা আমাদের বশে থাকে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে ও তাহার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। যে প্রবৃত্তিটাকে বেশী প্রবল হইতে দেখা যাইবে, সর্ব্বাগ্রে তাহার সম্বন্ধেই এই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে,—তাহাকে অনাহারে শুষ্ক করিয়া ও কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া বশে আনিতে হইবে। ইহাকেই শাস্ত্রী মহাশয় মনের কাণ মলিয়া দেওয়া বলিয়াছেন নিয়মিত ভাবে এই মনের কাণ মলিয়া দেওয়া যে কত আবশ্যক তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি যে কি প্রকার দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার বলে, কঠোর বৈরাগ্য ও সাধনের দ্বারা, আপনার চরিত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। তথাপি এ সম্বন্ধে তিনি আত্মজীবনীতে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ঈশ্বরচরণে প্রার্থনাদ্বারা আমার হৃদয়পরিবর্ত্তন ঘটিলে, আমার প্রাণে এক নূতন সংগ্রাম জাগিয়াছিল। সকল বিষয়ে আপনাকে ঈশ্বরের অনুগত করিবার জন্য দুরন্ত প্রতিজ্ঞা জন্মিয়াছিল। ইহার ফল জীবনের সকল দিকেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। সকল বিষয়ে আপনাকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আত্মনিগ্রহের উদ্দেশ্যে, পাঠ্য বিষয়ে মধ্যে মধ্যে অপ্রীতিকরবোধে যে যে বিষয় অবহেলা করিতাম, তাহাতে অধিক মনোযোগী হইলাম। যে যে বিষয়ে আসক্তি ছিল তাহা ত্যাগ করিতে এবং যে কিছু অরুচিকর তাহা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার মনে আছে, আগে অঙ্কে অমনোযোগী ছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ পরীক্ষাতে কখনও এক শতের মধ্যে বিশের উপর নম্বর পাইতাম না। ১৮৬৬ সাল হইতে তাহা বদলাইয়া গেল। অঙ্কে এরূপ মনোযোগী হইলাম যে, ১৮৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলাম। তৎপরে সেই প্রতিজ্ঞা ও সেই দৃঢ়ব্রত রহিয়া গেল। এই সময়ে আমি প্রথমে মাংসাহার পরিত্যাগ করি, প্রাণীহত্যানিবারণের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু মাংসের প্রতি আসক্তি ছিল বলিয়া। মাংসাহারে এমনই আসক্তি ছিল যে, ভবানীপুরে চৌধুরী মহাশয়দিগের বাড়ীতে বাসকালে প্রায় প্রতি রবিবার প্রাতে কালীঘাট হইতে জীবন্ত পাঁঠা আসিত। ডাক শুনিলেই আমার পড়াশুনা বন্ধ হইত। তাহাকে কাটিয়া কুটিয়া রাঁধিয়া পেটে না পুরিতে পারিলে আর কিছু করিতে পারিতাম না। কবিতা পড়িতে ও কবিতা লিখিতে অতিরিক্ত ভালবাসিতাম বলিয়া কিছুদিন কবিতা পড়া বন্ধ করিয়া দিলাম, ফিলজফি ও লজিক পড়িতে আরম্ভ করিলাম। বন্ধুদের সহিত হাসিঠাট্টা ও গল্পগাছা করিতে ভাল বাসিতাম। কিছুদিন মনের কান মলিয়া দিয়া মৌনব্রত ধরিলাম।"

তাঁহার জীবনে এরূপ আরও অনেক ঘটনা আছে; সকল গুলির উল্লেখ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই ভাব তিনি তাঁহার নানা কবিতা ও উপদেশের মধ্যেও বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শের প্রধান অঙ্গ বলিয়া চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। বাস্তবিক ইহা ব্যতীত সুদৃঢ় চরিত্র কিছুতেই গড়িয়া উঠিতে পারে না। কেবল যে যাহা পাপ ও অন্যায় তাহাই পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে। যাহা পূর্ণ স্বাধীন ভাবে চলিবার পথে কিছুমাত্র বাধা উপস্থিত করে, তাহাকে দৃঢ়হস্তে সমূলে উৎপাটিত করিতে হইবে। প্রাণিহত্যাকে পাপ বলিয়া অনুভব করিবার বহু পূর্ব্বেই, শুধু আসক্তির দাসত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্যই, তিনি মাংসাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নিজের প্রবৃত্তিকুলের উপর আত্মকর্তৃত্বস্থাপনের জন্যই অপ্রীতিকর কার্য্যেও আপনাকে দৃঢ়তার সহিত নিযুক্ত

করিয়াছেন, ইহাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইচ্ছাকে আপনার বশে আনিতে না পারিলে ব্রহ্মানুগত করা সম্ভবপর হইবে কি প্রকারে? তাই সমস্ত প্রচেষ্টার মূলেই প্রধানতঃ সংযম দেখিতে পাওয়া যায়; সমস্ত চিন্তা ভাব ও কার্য্যকে সংযত রাখিতে হইবে, আত্মশাসনে রাখিতে হইবে, এই ভাব রহিয়াছে।

সংযম ব্যতীত কেহ কোন দিন সুদৃঢ় চরিত্র লাভ করিতে পারে নাই। সকল উন্নতচরিত্র লোকদিগের জীবনেই ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কোনও বন্ধু রাজর্ষি রামমোহনকে অজ্ঞাতসারে সংযমের বাঁধ ভঙ্গ করিতে বাধ্য করিয়া তামাসা দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই হেতু তিনি সে মূর্খ বন্ধুকে জ্ঞানী শত্রু অপেক্ষাও অধিকতর অনিষ্টকারী বলিয়া তীব্র তিরস্কার করিয়াছিলেন, এবং অসংযত আচরণের জন্য দীর্ঘকাল অজ্ঞ বন্ধুর মুখদর্শন করেন নাই। পূর্ব্বকালে এই দেশে গুরুগৃহে শিষ্যদিগকে কঠোর সংযমের মধ্যে বাস করিতে হইত। উহা তাহাদের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। সংযম ব্যতীত কিছুতেই আত্মকর্ত্তৃত্বস্থাপন সম্ভবপর হইতে পারে না। এইজন্য সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে সংযমের বাঁধে বাঁধিবার ব্রত প্রত্যেককে গ্রহণ করিতেই হইবে। এ বিষয়ে বিন্দু পরিমাণে শিথিল হইলেই কালে সেই ছিদ্র অবলম্বন করিয়া সকল বাঁধ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া শিথিলতাই অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে এবং তৎসূত্রে সমস্ত প্রতিরোধ-শক্তি হারাইয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হইবে। সকল জীবনের উত্থান ও পতনের ইতিহাস এই "সংযম" কথাটির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই প্রথম হইতেই সকল বিষয়ে এই সংযমকে জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত যে কিছুতেই ইচ্ছার ব্রহ্মানুগত্যসাধন সম্ভবপর নহে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

ত্যাগ ও বৈরাগ্য যে এই সংযমব্রতপালনের দুই প্রধান সহায় তাহাও সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ত্যাগ ও বৈরাগ্য না থাকিলে, সংযমসাধন একটা কঠোর সংগ্রামের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ত্যাগ ও বৈরাগ্য থাকিলে ইহা অনেকটা সহজ হইয়া যায়। অবশ্য তাহাও যে খুব সহজ, বিশেষ চেষ্টা যত্ন ও অভ্যাস-সাপেক্ষ নহে, এরূপ কথা কেহ বলিবে না। ব্রহ্মানুরক্তি বা ভক্তির পথই যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও আনন্দদায়ক তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেখানে তাহার অভাব ঘটে সেখানে একমাত্র এই পথই অবলম্বনীয়। ইহাতে বিশেষভাবে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ আবশ্যক হয় বটে। কিন্তু এই চেষ্টা ও সঙ্কল্পযুক্ত অনুশীলনের ফলে উহা যেরূপ সবল ও সুদৃঢ় হইয়া উঠে, আর কিছুতেই সেরূপ হইতে পারে না। সকল বৃত্তিই অনুশীলনদ্বারা বিকশিত পুষ্ট ও সবল হইয়া থাকে এবং তদভাবে শুষ্ক দুর্ব্বল ও মৃতপ্রায় হইয়া যায়। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। কোথাও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এইভাবে ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন উহার দৃঢ়তাসাধনের জন্য যে একান্ত আবশ্যক, তাহা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল সহজ আরামপ্রদ পথের অনুসরণদ্বারা কিছুতেই এই দৃঢ়তা সাধিত হইতে পারে না। সকল বিষয়েই কোমল ও কঠোর উভয়েরই প্রয়োজন আছে। সকল বৃত্তি সম্বন্ধেই বিশ্ববিধাতার এই ব্যবস্থা। কোথাও শুধু আরামপ্রদ পথ অনুসরণ করিয়া পূর্ণতালাভ সম্ভবপর নয়। তাই উভয় প্রকার উপায়ই অবলম্বন করা আবশ্যক। ইচ্ছা সবল ও দৃঢ় না হইলে কিছুতেই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে যে গন্তব্য পথে অগ্রসর করিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে যে বিশেষ বিশেষ ব্রতগ্রহণ ও উপায়াবলম্বন করা আবশ্যক হইবে, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সাধারণ ভাবে এই দিকে আমাদের দৃষ্টি ও চিন্তা আকৃষ্ট হইলেই যথেষ্ট হইবে। আমাদের শিক্ষা ও সাধনের মধ্যে এই জীবননিয়ন্ত্রণের বা ইচ্ছার ব্রহ্মানুগত্যসংসাধনের ও সুস্থ সবল সুদৃঢ় মেরুদণ্ডবিশিষ্ট উন্নত মানবচরিত্রগঠনের যথোচিত আয়োজনের বড়ই অভাব যে রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন থাকিলে আর কিছুতেই চলিবে না। আমাদিগকে এজন্য বিশেষ সচেষ্ট হইতেই হইবে। জীবনবিধাতা কৃপা করিয়া এই অভাবদূরীকরণে আমাদের সকলকে সমর্থ করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে, সমাজে, দেশে ও জগতে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউক।

# তরুণদিগের প্রতি নিবেদন

আমার দুই একজন যুবকবন্ধু যখন বলিলেন যে, এই উৎসবে তাহাদেরও একটি দিন থাকিলে ভাল হয়, তখন আমি সাগ্রহে সম্মতি দিলাম। কিন্তু যখন তাহারা সেই দিন আমাকেই আচার্য্যের কার্য্যভার লইতে অনুরোধ করিলেন, তখন আমার মনে চিন্তা আসিল, আমি তরুণ তরুণীদের জন্য কি নিবেদন করিতে পারি? তরুণ কাহারা? যাহারা আমার চেয়ে বয়সে ছোট তাহারাই যুবক নহেন; আবার যাহারা আমার চেয়ে বয়সে বড় তাহারাই বৃদ্ধ নহেন। তরুণ তাহারাই যাহারা কোন আদর্শে বা পথে অনন্যচিত্ত ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া চলিতেছেন বা চলিবার জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। একজন বৃদ্ধও যুবকপদবাচ্য হইতে পারেন, আবার একজন যুবকও বৃদ্ধ-পদবাচ্য হইতে পারেন। অন্তরাত্মার বিষয়ান্তরনিরপেক্ষ সত্য দৃষ্টি ও সত্যধারণক্ষমতাই তরুণত্বের পরিচায়ক; কেবলমাত্র দেহের নবীনত্ব ও বলবীর্য্যই উহার পরিচায়ক নহে।

বহুদিন পূর্ব্বে দেরাদুনে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে একটি আশ্চর্য্য ঝরণা দেখিয়াছিলাম। ঝরণাটির নাম সহস্র-ধারা। অসংখ্য ছোট ছোট জলধারা একটি গহ্বরে পড়িতেছে। তাহার আশে পাশে অনেক বৃক্ষ ও গুল্ম রহিয়াছে। কোন কোন বৃক্ষ

---

সম্মিলন-ব্রাহ্মসমাজের ভাদ্রোৎসবে যুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক নিবেদিত।

ও গুল্ম আংশিক বা সর্ব্বাঙ্গীণভাবে সেই জলধারার প্রভাবে প্রস্তরীভূত ( Focilised ) হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ এই প্রস্তরীভূত বা অর্দ্ধপ্রস্তরীভূত বৃক্ষ। তরুণ সেই ঝরণাপার্শ্ববর্ত্তী জীবন্ত সবুজ, তাজা বৃক্ষগুলি—বড় ঋতুর আগমনে যাহারা সাড়া দেয় ও নব নব পত্র-পুষ্প-ফলসম্ভার লইয়া পথিকের সেবা করে। ইহা সত্য যে নবীন দেহের বলবীর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই একটি আন্তর যৌবনের আস্বাদন পাইয়াছি। নব নব সত্য ও আদর্শের সম্মোহন রূপ অন্তরাত্মাকে মুগ্ধ করিয়াছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত গতানুগতিকের রূপান্তরকারী বিষময় জলধারা আমাদের মনন-শক্তিকে সংস্কারের পাষাণে পরিণত না করিয়াছে। যদিও অতীতের দিকে চাহিয়া বলিতে পারি না, "সত্যের পথে চলা একবারে ব্যর্থ হইয়াছে অথবা একবারে সফল হইয়াছে", তবুও পথ চলার দু'একটি অভিজ্ঞতার কথা ত বলিতে পারি। হে তরুণ ভ্রাতা, হে তরুণী ভগিনী, আপনাদিগকে আদরের সঙ্গে ও সম্মানপুরঃসর এই উৎসবে অভ্যর্থনা করিয়া আমি নিজকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের জীবনবৃক্ষ এখনও গতানুগতিকের রূপান্তরকারী বিষময় জলধারার প্রভাবে আসিয়া পড়ে নাই। আপনারা এখনও তরুণত্বের মহিমাময় অধিকারে সম্পদ্‌বান্। সত্যদৃষ্টি ও সত্যধারণের অধিকার ( Privilege ) আপনাদের অক্ষুণ্ণ আছে।

ভাই বোন্, তোমরা একটি সত্যকে, একটি বিশেষ আদর্শকে ধর, এই আমার প্রথম, প্রধান ও শেষ কথা। এইটিই তরুণদিগের বিশেষ privilege. ভারতের ইতিহাসে যে একটি স্মরণীয় দিনের বার্ষিক উপলক্ষ্যে আমরা এই উৎসবে সম্মিলিত হইয়াছি, সেই দিনের ঋত্বিক যিনি তাঁহার তরুণ জীবনের কথা স্মরণ কর। বালক রামমোহন বার বৎসর বয়সে পাটনায় পারসিক ও আরবী অধ্যয়ন সমাপন করিলে, পিতৃকর্ত্তৃক বেনারসে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে ৪ বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় ও নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। চিন্তাশীল ও ধর্ম্মপ্রাণ রামমোহনের চিত্ত প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অধঃপতন দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইল। পারসিক ও আরবী অধ্যয়নকালে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের একেশ্বরবাদ যে বীজ অঙ্কুরিত করিয়াছিল তাহা দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিমল ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলন করিয়া সতেজ বৃক্ষরূপে বাড়িয়া উঠিল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পিতা রামকান্ত রায়ের সঙ্গে তাঁহার প্রায়ই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম ও তাহার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে আলাপ ও বিচার হইতে লাগিল। তিনি "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক একখানি পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করিলেন। ইহাতে পিতা ও আত্মীয়বর্গ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন ও অবশেষে রামমোহনের পিতৃগৃহে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। ইহার ফলে তিনি ভারতের নানাস্থানে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ও অবশেষে ভ্রমণ করিতে করিতে উত্তুঙ্গ হিমগিরি পার হইয়া তিব্বতে যান। সে সব কাহিনী তোমরা জান; তাহার বিশেষ বিবরণ এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। ধর্ম্ম ক্রিয়াকলাপ বা বাহ্য অনুষ্ঠানে নাই, ধর্ম্ম আত্মার ধন ও স্বভাব, তাহার সাধন সত্যে ও আত্মায়। ঈশ্বরের আন্তর উপাসনা ও সত্যের সাধনায়ই ধর্ম্ম লাভ হয়, অন্যথা নয়—এই সত্য, এই আদর্শ কিশোর রামমোহনকে পাগল করিয়াছিল। এই সত্যটিকে রামমোহন জীবনের মূলমন্ত্র করিয়াছিলেন ও উহাকে জয়যুক্ত করিতে ও দেখিতে তিনি কি না সহ্য করিয়াছিলেন, কি না ত্যাগ করিয়াছিলেন, কি না কঠিন সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা জানেন। যৌবনে বা বাল্যেই এই সত্যটির নিকট রামমোহন আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—এ বার্দ্ধক্যের কথা নহে। যুগ-যুগান্তরের সংস্কারপ্রসূত মনের দাসত্বপ্রবণতার ( Slave mentality ) মোহনিদ্রা হইতে জাগিবার জন্য ভারতের জীবনে যে যৌবনের সাড়া পড়িয়াছে, তাহার বোধন-মন্ত্র বালক রামমোহনই প্রথম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। কারণ, ধর্ম্ম মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন ও সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক শক্তির জনক। সেই ধর্ম্ম-সাধনে যিনি স্বাধীন চিন্তার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন, তিনিই স্বাধীনতাকে আমাদিগের জাতীয় জীবনে অতি গভীর স্থানে প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। এ বীজ কালে বনস্পতি-রূপে বিকশিত হইয়া আমাদিগের জাতীয় জীবনের গৌরব বর্দ্ধন করিবেই করিবে। বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য, শ্রীশঙ্কর, St. Francis of Assissi, Lloyd Garrison—সকলেই যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের আদর্শদ্বারা ভূতগ্রস্তের মত গ্রস্ত ও পরিচালিত হইয়াছিলেন। ইহা কি প্রকাশ করিতেছে না, যৌবনের একটি inherent privilege আছে? Charles Kingsley এর একটি সুন্দর উক্তি তোমাদিগকে বলি—

"Get hold of some truth. Let it blaze in your sky like a Greenland Sun never setting day or night. Give up your soul to it, see it in everything and everything in it, and the world will call you a bigot and fanatic, and then, a century hence, will wonder how the bigot and fanatic continued to do so much than all the cool and sensible folk around him." মেরু প্রদেশে সূর্য্য অস্ত যায় না। সেখানে ছয় মাস দিবা ও রাত্রি। হে যুবক, যে সত্যটি, যে আদর্শটি তুমি ধরিয়াছ তাহা মেরু-প্রদেশের সূর্য্যের মত তোমার চিদাকাশে চিরদিন অনস্তমিত থাকুক। জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা ও কার্য্যের ভিতর সেই সত্যের হাতে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ কর। সকল বস্তুর মধ্যে তাহা এবং তাহার মধ্যে সকল বস্তু দর্শন কর। অপরে তোমাকে ক্ষেপা কি একগুঁয়ে—গোঁড়া বলিতেছে, সে দিকে কান দিও না। সত্যান্বেষীকে পৃথিবীর বুদ্ধিমান শান্ত শিষ্ট লোকেরা এই রূপই বলিয়া থাকে। এক শতাব্দীর পর এই শ্রেণীর লোকেরাই বলিবে, "ক্ষেপাই ত মানুষ ছিল—আর সকলে গড্ডলিকাপ্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছিল"।

আজকালকার প্রধান অভাব হচ্ছে idealism-এর অভাব। হাল্কা বড় realistic: অপরকে idealist বলে, তাহাই

চালাইয়া নিয়া আসিয়াছে, realistic যারা তারা নয়। খৃষ্টধর্ম্মের জন্ম ও ইতিহাস তাহা বার বার প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। শ্রদ্ধেয় কবি রবীন্দ্রনাথ বোলপুর শান্তিনিকেতনে যে তাঁহার বিদ্যালয় আছে তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে একদিন কথায় কথায় আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমাদের যুবকেরা tame—তারা ইট কাঠ পাথরের মত, তাদের মধ্যে idealism নাই। একটি বিশিষ্ট মানবজীবন যাপন করার মধ্যে, কোন একটি আদর্শের জন্য জীবনযাপন করিয়া সেই আদর্শটির জন্য ত্যাগস্বীকার করিয়া, সুখ স্বার্থ ও পার্থিব যাহা কিছু তাহা বিসর্জ্জন করিয়া, তজ্জন্য বিপদ ও দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া, যে আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ আছে, তাহা তাহারা বুঝে না। England এ বাস কালে তিনি Latin শিক্ষা করিবার জন্য একজন শিক্ষক খুঁজিতেছিলেন। অবশেষে একজন যুবককে তিনি নিযুক্ত করিলেন; তাহার পরিধেয় মলিন ও ছিন্ন, অর্থ উপার্জ্জনের দিকে তার মন নাই। তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা অজ্ঞাতনামা কবি ও সাহিত্যিকদিগের লেখা উদ্ধার করা। এই আকাঙ্ক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া, সেই যুবক যৌবনের সকল সুখের আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই, সত্যকে কি করিয়া পাইব—সত্যের দর্শন কি করিয়া পাইব? আত্মাই সত্যের প্রকাশক—সত্যের অমোঘ দ্রষ্টা। সত্যকে লাভ করিবার জন্য জ্ঞানীর কাছে ঘুরিতে হইবে না—বাহিরে সত্যের দর্শন হইবে না। তোমার জীবনখানি, তোমার constitution এবং fact of life এ, সেই সত্যের earnest, যে সত্য তুমি পাইতে অধিকারী ও বাধ্য। আমার কথায় বলবো না। গভীর জ্ঞানী ঋষিকল্প Emerson বলেছেন,—Soul is the perceiver and revealer of Truth. We know truth when we see it, let the sceptic and scoffer say what they choose. Foolish people ask you, when you have spoken what they do not wish to hear, "How do you know it is truth and not an error of your own?" We know truth when we see it, from opinion, as we know when we are awake that we are awake." সত্যকে নিজ আত্মাদ্বারা দেখে সত্যকে জান্‌তে হয়—এই জানার মধ্যে reasoning or ratiocination নাই। ইহাতে ভুল ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। সেই অবস্থায়ই আত্মা সত্যকে দেখ্‌তে পান, যে অবস্থায় তিনি নিজকে পরমাত্মার প্রকাশরূপে দেখ্‌তে পান। Emerson এর কথায়, মানুষ যখন নিজের ভিতরে Divinity দেখ্‌তে পায়, তখনই তাহার সত্য দর্শন হয়। নিজের ভিতরে Divinity দেখ, সত্যের দর্শন অচিরেই লাভ হইবে। এই Divinity এর বোধ মানুষকে অমিত বল, অমিত তেজ, অমিত অভয় দেয়; আর দেয় a greater and higher Self-reliance. দুই রকমের Self-reliance আছে; একরূপ Self-reliance আছে যাহা offensive, exclusive, assertive to an undesirable degree—যেমন Carlyle; আর একরূপ Self-reliance আছে যাহা unobtrusive, all-inclusive, ever contented, generous and happy like sun-shine—যেমন Emerson. "Emerson", says one writer, "was a sweet-tempered Carlyle; living in the sun-shine. Carlyle was a militant Emerson moving among thunder-clouds. Both believed ardenty in a spiritual destiny for man, both felt with glowing fervour the glory and satisfaction of God. While Carlyle declaimed, Emerson smiled. Emerson had the beauty of a tranquil faith and the compossure of a soul that was deeply touched by the sense of Eternity."

এই যে greater and higher Self-reliance based on the profound sense of Divinity—এই বোধ মানুষের জীবনে একটি অমূল্য পরিবর্ত্তন আনিবেই আনিবে। Emerson বলেছেন এই বোধ—"must work a revolution in all their offices and relations of men, in their religion, in their education, in their pursuits, their modes of living, their association, in their property, in their speculative views." কারণ, মানুষ তখন জীবনের সকল ব্যাপারকে, সকলের চেয়ে যে শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড তার মধ্যে আছে তাহাদ্বারা, পরিমাপ করে। যাহার ভিতরে দেবত্বের বোধ জাগ্রত হইয়াছে, তিনি দেবত্বের বোধের কষ্টিপাথরদ্বারা জীবনের ঘটনা ও ব্যাপারগুলির মূল্য মাপিয়া লন। তখন মিথ্যা যাহা, ঝুটা যাহা, ক্ষণভঙ্গুর যাহা, ছোট, মলিন, দৈহিক বা প্রবৃত্তিকলুষিত যাহা, তাহা তার উচিত মূল্যেই তার দৃষ্টিগোচরে আসে। সেগুলিকে তিনি তখন স্বরূপতঃ চিনিতে ভুল করেন না। এবং সেগুলিকে বর্জ্জন করিতে তার আনন্দ হয়, কষ্ট হয় না। আপনার দেবত্বকে দেখা আর উপাসনা (prayer) একই। উপাসনার একটি উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা Emerson দিয়াছেন—Prayer is the contemplation of the facts of life from the highest point of view. জীবনের যাবতীয় ব্যাপারগুলিকে যদি স্বরূপতঃ দেখ্‌তে হয়, তার প্রকৃত মূল্য কি তাহা জান্‌তে হয়, তাহা হইলে যতগুলি দৃষ্টিকুট আছে তন্মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও view command করে, তার উপরে বসেই তাকে দেখ্‌তে হবে। আপনার দেবত্ববোধের standpoint ভিন্ন আর কোন view-point উচ্চতম, শ্রেষ্ঠতম হইতে পারে? এবং এই view-point হইতে জীবনকে দেখ্‌তে যাইয়াই আমরা অবশ্যম্ভাবীরূপে পরমাত্মার সান্নিধ্য উপলব্ধি করি,—আমার প্রতি যে তাঁর দৃষ্টি, স্নেহাবলোকন, সেই দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলাই।

আমরা দুই ভাবে পূজার মন্দিরে প্রবেশলাভ করিতে পারি। এক দীনতা ও অনুতাপের দ্বার দিয়া; আমরা এই দ্বারের কথা উৎসবাদিতে আচার্য্যদের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি। আর এই একটি দ্বার—নিজের দেবত্ব ও অমৃতত্বের বোধ। যুবকদের

মুখে অনেক সময় শুনিতে পাই, "অনুতাপ বুঝি না, অনুতাপ হৃদয়ে আসে না; আমি এমন কিছু করি নাই যাহাতে হৃদয়ে প্রকৃত অনুতাপের উদয় হইতে পারে।" যদি তাহাই হয়, তবে নিজের ভিতরে দেবত্বের বোধ জাগ্রত করিয়া তুলুন, এই দ্বার দিয়া জীবননাথের পূজার মন্দিরে প্রবেশ করুন। আমার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতার নির্ষ্যস্বরূপ আপনাদিগকে এই একটি কথা বলিতেছি, ঈশ্বরোপাসনা ব্যাপারটি অতিশয় ব্যক্তিগত। ব্যক্তিগত না হইলে ইহার মূল্য কিছু নাই। Emerson এর সমস্ত উক্তির মধ্যে এই উক্তিটির মূল্য যে কত, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

"If you would know what the great God speaketh, you must go into your closet and shut the door, as Jesus said. God will not make himself manifest to cowards. You must greatly listen to yourself, withdrawing yourself from all the accents of other men's devotion. Even their prayers are hurtful to you, until you have made your own." উদ্ভিজ্জগতে ও প্রাণিজগতে পরাজপুষ্ট ( parasites ) যেমন, আধ্যাত্মিক জীবনেও তেমনি পরাজপুষ্ট এক শ্রেণীর লোক আছে। তারা পরের ভক্তি উচ্ছ্বাস, পরের অভিজ্ঞতা, পরের সাধনলব্ধ জ্ঞানটুকু নিয়া নাড়াচাড়া করিয়া নিজের আত্মার ক্ষুধা মিটাইতে চায়। কিন্তু যে জগতে এক আর এক দুই এইরূপ যোগক্রিয়াদ্বারা পাওয়ার তত্ত্ব নাই, যে জগতে পাওয়ার অর্থ হওয়া, হইয়া পেতে হয়, সেই জগতে পরাজপুষ্টের স্থান নাই। তাই তাহাদের ক্ষুধাও যায় না, আর তাহাদের অভিযোগ ও দোষদর্শনেরও অন্ত নাই। অমুকের উপাসনা সরস নয়, অমুকে উপাসনা দীর্ঘ করেন, অমুকের উপাসনা বাক্যবহুল ও পুনরুক্তিদুষ্ট ইত্যাদি অভিযোগ লাগিয়াই আছে। ভাই, ভগিনী, আগে অন্তর-মন্দিরে প্রবেশ কর, তোমার নিজের হিসাব তোমার মহাজনের সঙ্গে মিটাইয়া লও, তোমার নিজের genius ও constitution কি তাহা বুঝিয়া লও, তোমাকে কি মূলধন ( talents ) দিয়া কোন্ কোন্ অবস্থানিচয়ের মধ্যে জীবনদাতা রাখিয়াছেন তাহা অন্তরবাসী জীবনদেবতার নিকট বুঝিয়া লও, এবং তোমার জন্য যে সত্যটি, যে আদর্শটি, অভিপ্রেত তাহা তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ কর। শ্রমবিমুখ কাপুরুষ যাহারা, যাহারা parasites, অথবা যাযাবরের মত গৃহহীন ও ঘুরিয়া বেড়ায়, সত্যলাভ তাহাদের ভাগ্যে নাই। মনে রাখিও, অন্যের উপাসনা প্রার্থনাও তোমার পক্ষে অকল্যাণজনক হইতে পারে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার উপাসনা, তোমার প্রার্থনা, তুমি না করিয়াছ।

এ কথা বলিও না, "আমি অতি নগণ্য, আমার শক্তি সামর্থ্য অতি কম, আমি দুর্ব্বলচিত্ত, আমি আর কি আদর্শ ধরিয়া চলিব?" আমি একথা শুনিতে চাহি না—মানি না, বিশ্বাস করি না। প্রত্যেক সন্তানের জন্যই পিতার ঘর আছে, তাঁহার অভিপ্রায় সুনির্দ্দিষ্ট আছে; প্রত্যেককেই তাহার স্বভাবের মধ্যে মূলধন ( talents ) দিয়া রাখিয়াছেন, যাহা তিনি তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলির মধ্যে খাটাইয়া দ্বিগুণ চতুর্গুণ করিতে পারেন। প্রত্যেকের talents হচ্চে earnest from God এবং তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা হচ্ছে তাহা খাটাইবার, বাড়াইবার, Call বা নোদক। বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, St. Francis of Assissi, এঁদের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম। Lloyd Garrison, মহাত্মা গান্ধী, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশব, পণ্ডিত শিবনাথ, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, তিলক, গোখলে, বিজ্ঞানাচার্য্য রমন্ ও জগদীশচন্দ্রের কথাও তুলিব না। দুইজন অপেক্ষাকৃত অপরিচিত সত্যসেবীর কথা বলি।

বেহালাতে একটি Blind School আছে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা যিনি, তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি অর্থ পদমর্য্যাদা, বা বিশেষ দক্ষতা কিছু ছিল না; কিন্তু ছিল বালক বালিকাদিগের জন্য তাঁহার হৃদয়ে অগাধ করুণা। তিনি যৌবনে একদিন কোথায় যাইতেছিলেন, পথে কতকগুলি অন্ধ বালক বালিকা দেখিয়া তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা জাগিল এদের জন্য কিছু করিতে হইবে। তাঁহার প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষাকে তিনি দেবতার প্রেরণা বলিয়া শিরোধার্য্য করিলেন। অর্থ নাই, তবুও তিনি কয়েকটি অন্ধ বালক বালিকা লইয়া একটি আশ্রম স্থাপন করিলেন ও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। একজন পাদ্রীর সঙ্গে পরিচিত হইলেন। তিনি Braille system জানিতেন না; এই পাদ্রীর নিকট তিনি তাহা শিক্ষা করিলেন। সে পাদ্রী তাঁহাকে কিছু অর্থসাহায্য করিতে চাহিলেন; কিন্তু শুধু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বালক বালিকাদিগের জন্য স্কুলটি থাকিবে, এইরূপ বলাতে তাঁহার অর্থসাহায্য তিনি গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর পরলোকগত সাধু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি অনেক বিষয়ে প্রতিষ্ঠাতাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে সংগ্রাম চলিতে লাগিল। পরিশেষে কোন ধনাঢ্য দাতার নিকট তিনি একলক্ষ টাকা পাইলেন ও উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠানটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিলেন! এই প্রতিষ্ঠাতার নাম মিঃ লালবিহারী সাহা। বঙ্গদেশের গভর্ণর এখন এই প্রতিষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষক ও Government অনেক অর্থসাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু অর্থবল লোকবল যাহা পরে আসিয়াছিল তাহারাই এই প্রতিষ্ঠানটির কারণ নহে। পরলোকগত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা উল্লিখিত পাদ্রী মহাশয়ও উহার জন্মদাতা নহেন—জন্মদাতা মিঃ সাহার অন্তরে যে অন্ধদিগের কল্যাণসাধনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। তিনি এই আদর্শটিকে মূলমন্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন, ইহার নিকট সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন।

আরও একজনের কথা বলি। ইনিও আমাদের মত সাধারণ লোকই ছিলেন, কিন্তু অন্তরে প্রকাশিত সত্যকে

সেবা করিয়া ঋষিকল্প হইয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই ইনি একটি নারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন পুরোহিত দুইটি হস্ত মিলিত করিয়া মন্ত্রপাঠ করিয়াছিল, তখন তাঁহার অন্তরে এই কল্যাণ সঙ্কল্প জাগিল, "আমি এই নারীর প্রেমের উপযুক্ত হইব"। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া তাঁহার আত্মদৃষ্টি খুলিয়া গেল; নিজের অনেক দোষ দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিতে হইল, মহত্ত্ব ও নিষ্কাম প্রেমের অনুশীলন করিতে হইল। তিনি দেখিলেন, প্রকৃত প্রেমের মূলে শ্রদ্ধা ও ঈশ্বরানুগত জীবন। পত্নীর সঙ্গে একযোগে তাই তিনি আজীবন মহত্ত্ব ও ঈশ্বরানুগত জীবনের সাধনা করিলেন। তাঁহাদের এই মিলিত অমৃতময় জীবনের কথা যাঁহারা জানেন ও তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদিগকে আর ভুলিতে পারেন নাই। গার্হস্থ্য জীবনের ছোট বড় সকল ব্যাপারে কি করিয়া ঈশ্বরানুগত থাকিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যানের বিমল আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়, তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। নির্ম্মল ব্রহ্মপ্রেম ও তৎসহযোগে নির্ম্মল মানবপ্রীতি এই পতি পত্নীর যুগল জীবনে মণিকাঞ্চনের মত প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহাদের মিলিত জীবনকাহিনী গার্হস্থ্যাশ্রমবাসীদের গীতাস্বরূপ।

তিনি সমাজকর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রচারক না হইয়াও অনেক প্রচারক অপেক্ষা ভাল প্রচারের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার নাম আপনারা কি জানেন? বাঁকিপুর ইঁহার প্রধান কার্য্যস্থল ছিল, ইঁহার নাম প্রকাশচন্দ্র রায়। ১৭।১৮ বৎসর হইল লোকান্তর গমন করিয়াছেন; কিন্তু ইঁহার পুণ্যময় মধুর স্মৃতি অনেকের জীবনে অমৃত অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

বিশিষ্ট আদর্শের পথে গমনপ্রসঙ্গে দুই একটি বাঁধার কথা বলি। একটি বাঁধা "অন্যে কি মনে করিবে"; আর একটি বাঁধা Consistency এর ভয়। যদিই বা তুমি অন্তরে প্রকাশিত সত্যটির নিকট আপাততঃ বিশ্বস্ততার সহিত বাধ্য হইতে সক্ষম না হও, অন্ততঃ সেই পথের এই সব বাধা ও প্রলোভনের সঙ্গে লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হও। Consistency রক্ষা করিবার জন্য চিন্তিত বা ব্যাকুল হইও না। প্রবাদ আছে "Consistency is the bugbear of fools"—এই প্রবাদটির ভিতরে অনেকখানি practical wisdom নিহিত রহিয়াছে। তোমার অন্তরে এখন যে আদর্শটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকেই সরলভাবে ও বিশ্বস্ততার সহিত অনুসরণ করিতে তুমি বাধ্য—দশ বৎসর পর তুমি কি করিবে তার কোন দাবী এখন তোমার উপর নাই। Emerson এর কয়েকটি সারবান কথা তোমাদিগের নিকট উদ্ধার করিতেছি :—

"If we cannot at once rise to the sanctities of odedience and faith, let us at least resist our temptations, let us enter into the state of war, and wake Thor and Woden in our Saxon breasts. This is to be done in our smooth times by speaking the truth. Check this lying hospitality and lying affection. Live no longer to the expectation of these deceived and deceiving people with whom we coverse. Say to them, O father, O mother, O wife, O brother, O friend, I have lived with you after appearances hitherto. Henceforward I am the truth's. Be it known unto you that henceforward I obey no law less than the eternal law. I will have no covenants but proximities. * * *

But so you may give these friends pain. Yes, but I cannot sell my liberty and my power to save their sensibility. Besides, all persons have their moments of reason, when they look out into the region of absolute truth; then will they justify me and do the same thing."

নিরাশার কথা বলিব না। মঙ্গলময়ের রাজ্যে নিরাশার স্থান নাই। আমরাই অলস, শ্রমকাতর, সুখাসক্তচিত্ত, তাই নিরাশার কথা কোন কোন সময় বলি। চল, যে অন্বেষণ বহু প্রকারে বাহিরে ছড়াইয়া আছে, তাহাকে তীরের মত একলক্ষ্য করিয়া আত্মচৈতন্যে আনিয়া বিদ্ধ করি। সর্প যেমন শীতঋতুতে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকিয়া কোন সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রের মুখে চাহিয়া থাকিয়া উপরের আলোকসম্ভারের একটি রশ্মি চক্ষে ধরিবার জন্য একদৃষ্টিতে অবস্থিতি করে, জ্যোতির্ব্বিদ্ যেমন কোন সুদূর গগনবিহারী জ্যোতিষ্কের একটি আলোকরেখা নয়নপথে পাইবার জন্য চক্ষে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়া সারাটি নিশি জাগিয়া বসিয়া থাকেন, একদৃষ্টি একলক্ষ্য হইয়া—চল ভাই বোন, আমরা তেমনি করিয়া চিদাকাশে সত্যজ্যোতির জন্য একদৃষ্টি হইয়া চাহিয়া থাকি। আমাদের অন্বেষণ, আমাদের সাধনা, আমাদের ক্রন্দন ব্যর্থ হইবে না। সত্যরূপ ধ্রুবতারার আলোক সাধকের চক্ষে আসিয়া পড়িবেই পড়িবে! জীবনদাতা আছেন—তিনি সস্নেহে চাহিয়া আছেন তোমার পানে, আমার পানে। সকল তপস্যা, সকল ত্যাগ, সকল জাগরণের পর অমৃতপ্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে আত্মা ভরিয়া যাইবে। তখন কি আনন্দ! রসো বৈ সঃ!

"নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়, পরিপূর্ণ জ্ঞানময়,
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত-আকাশে!
রয়েছি বসি' দীর্ঘনিশি, চাহিয়া উদয়-দিশি,
ঊর্দ্ধমুখে করপুটে, নবসুখ, নবপ্রাণ, নবদিবা আশে।
কি দেখিব, কি জানিব, না জানি সে কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মনমাঝে, সে আলোকে
মহাসুখে, আপন আলয়মুখে, চ'লে যাব
গান গাহি', কে রহিবে আর দূর পরবাসে!"

তপস্যার অন্তে যেমন, তপস্যার মধ্যেও তেমনি, আনন্দ। তপস্যার মধ্যে, সত্যের জন্ত ত্যাগ ও সংযমের মধ্যেও, আনন্দ—অপরিসীম আনন্দ—উচ্ছ্বাসময় আনন্দ। কারণ, Religion is essentially the search for the cry of spirit by the fragment that is the spirit in man for the whole Spirit, the unsatisfied craving of the part for completeness, the pressure against the limitations of time and space by the Eternal and Spaceless.

ইহা অসীম মায়ের বুকে যাইবার জন্ত সসীম শিশুর ক্রন্দন ও আকুলি বিকুলি। এ ক্রন্দনেও আনন্দ ও তৃপ্তি।

পিতা নোঽসি। তুমি যে পিতা, এই বোধ তুমি আমাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ও প্রবল কর। এই বোধে আমাদের সকল অকল্যাণচিন্তা অকল্যাণকামনা ও অকল্যাণভীতি দূর হউক। এই বোধে আমাদের মধ্যে সত্যের অন্বেষণ সত্য হউক।

---

# অমর কথা (২৫)

## অমৃতের ব্যাখ্যা

### ষষ্ঠ ধ্যান

### পূর্ণমিলন

এ নয় স্বপন, এ নয় কুহেলী,
বিশ্ববুকেতে ঘুমের খেলা,
সীমার মাঝারে মরণপাথারে
ভেসে চ'লে যাওয়া জীবন-ভেলা।
সবই বেজে ওঠে অসীম সুরেতে,
পাগল গোপন হৃদয়-তন্ত্রে,
ভরে ওঠে প্রাণ, গেয়ে চলে গান,
জাগায়ে নবীন জীবন-মন্ত্রে।
ধরণীর বুকে যত ভালবাসা
জাগিবে আপন চেতন-পুরেতে,
তাহাদেরি মাঝে জাগিব হে সুখে,
ছুটিব অমর মোহন পুরেতে।

ধন্ত কর দান খানি
তোমারি মহিমামাঝে,
ধীরে ধীরে উঠি ফুটে
আমারি জীবন-সাঁঝে।
সমাধির মৌন বুকে
বেদনার গানখানি
অশ্রুজলে রচে শত
তোমারি মহিমা মানি।
ধ্যানের মহিমালোকে
যত কিছু ওঠে হেসে,
তোমারি অনন্ত গান,
সব হাসে নব বেশে।
বিশ্বাস-আনন্দ-লোকে,
মরণ-সাগরপারে,
ত্রিদিবের গানখানি
বেজে ওঠে মন-তারে।

যুগে যুগে তত্ত্ববাণীর আনন্দ ঘোষণায় অতীতের মঙ্গল সুরে শত সহস্র বৎসর ধ'রে প্রকৃতির বুকে ক্ষুদ্র বালুকাকণা থেকে ঐ গগনমণ্ডলে জ্যোতিষ্কসভায়, আর মানবের বুকে, মর্ম্মগুহায়, বিবেকের আনন্দ সাড়ায়, ঐ একই কথা—দেবতা আছেন। ভূমা মহান্ অগম্য অপার বিভু পুণ্য পবিত্র সুন্দর বিশ্ববুকে চেতন অচেতন সকলকে এক বিচিত্র মঙ্গল সাম্য সুষমায় সুশোভিত করেছেন। অণু পরমাণু কিছুই ত হারায় না। চেতনময় আত্মসুন্দরেরই কি লয় হবে?

যখনই বলা হয়েছে 'দেবতা আছেন', তখনই স্বীকার করা হ'য়েছে মানবের অমরত্ব। অমর হোলাম যখন, তখন জ্ঞানত ফুরোবে না। আত্মজ্ঞান যদি জেগে না রইলেন, তবে আমার জীবন হ'তে নব জীবনের মূল্য কোথায়? ধ্বংস ও জীবনের অস্তিত্ব সঙ্কেত সমান। মৃত্যুর পরপারে মানব-চেতনার এই মঙ্গল ধারার ভিতরই প্রাণময় উৎসর্গ-লীলার অনন্ত প্রবাহ চোলবে। যদি স্মৃতির আনন্দবুকে সব জেগেই না থাকবে, তবে আর পাপ পুণ্যের ভেদাভেদ কোথায়? তবে আর ধর্ম্ম অধর্ম্মের, জয় পরাজয়ের, সার্থকতা রইল কই? যদি ইহ পর জীবনের ধারাবাহিক জ্ঞানযোগ ছিন্ন হ'য়ে যায়, তবে আর পূর্ণতার সাধনা কেন? অনন্ত জাগরণে পরিপূর্ণ শিবসুন্দরের পুণ্যজ্যোতিসত্তার ভিতরই অনন্ত জীবনজ্যোতি। এই অনন্ত যোগই ইহ পরকালের মিলনভূমি। কে জানে কেমন ক'রে এই দুর্ব্বল দেহ-পিঞ্জর ভগ্ন ক'রে মুক্ত আত্মা তার মহিমাময়ী মাতার ভিতর নব শক্তি নব দীক্ষা লাভ কোরবে? জীবনসন্ধ্যায় কত রজনীর শান্ত সুষুপ্তিলীলার ভিতর কত বিস্মৃত শৈশব ও যৌবনের আনন্দছবি জীবনপটে অঙ্কিত হ'য়ে ওঠে, আর তার মধুর ঝঙ্কারে প্রাণ মন রণিত হয়! এ কি স্মৃতির মঙ্গল গন্ধ বাল্যে যৌবনে বার্দ্ধক্যে, আর আনন্দলীলাতরঙ্গ। এ কি যোগানন্দ অমৃতসুধাপান!

এমনি কোরেই ত ভূত ভবিষ্যতের প্রাণময় মিলনছন্দ! এমনি কোরেইত যুগ যুগান্তরের কর্ম্মসাধনা বিশ্ববুকে চির সঞ্চিত। স্মৃতির জয়গৌরবই ইহ পরকালের যুগ যুগান্তরের আনন্দমিলন। এমনি কোরেই পাপ পুণ্যের কর্ম্মফলাফল। পার্থিব জ্ঞান ধারণা কোরতে পারে না সে দেহাতীত লোক, অতীন্দ্রিয় স্বরূপ। জানি না সে অহেতুকী প্রেম ভক্তির আদান প্রদান। অজ্ঞানতার দীন অন্ধকারে দৃষ্টি আচ্ছন্ন। অথচ কত উন্নত ঋষিপ্রাণ ধ্যানালোকে আত্মজ্যোতিপ্রভাবে, লক্ষ যোজন দূরে থেকেও, প্রাণযোগের গভীর সত্তা উপলব্ধি করেন। অজ্ঞান যে সে বোঝে না সে গভীর তত্ত্বকথা।

হৃদয়ের নিবিড় যোগ অনন্ত যোগ। এ যোগ তখনই ছিন্ন হ'তে পারে, যখন পরম দেবতার আনন্দ-অস্তিত্ব সংসার থেকে লোপ হ'য়ে যায়। আমি ক্ষুদ্র, অপরিপূর্ণ দীন আমি জানি না ত আমার ভবিষ্যৎ; কিন্তু জানি আমার অজানা ভাগ্যবিধাতা আমার জন্য কল্যাণই রেখেছেন। শিশুর মত দুর্ব্বল অবোধ ভাল মন্দ বুঝি না, তবু মায়ের বুকে বুক রেখে নিশ্চিন্ত হই। ক্ষুদ্র দুর্ব্বল ভাষার সাধ্য কি প্রকাশ করে?

অমরকথা, অমরচিন্তা বুকের ঘরে নিত্য মিলনানন্দ-আশা জাগিয়ে তোলে। কেন প্রাণ থেকে থেকে মৃত্যু-যবনিকা ভেদ ক'রে অমরধামে উধাও হ'য়ে যেতে চায়? কেন এ দুর্ব্বল হৃদয়ে এ অফুরন্ত আশা, ভালবাসা? কে যেন বাক্যহীন বাণীতে একদিন পাপ পুণ্যের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল ভোগ কোরতেই হবে, এ কথা মর্ম্ম-কোণে নিরন্তর গোপনে গোপনে জানিয়ে দিয়েছেন। তাইত মানুষের ধূলা খেলায় নিত্য পুণ্যের সাধনা, তাইত নিরন্তর এ ক্ষুদ্র বক্ষ-পুরে দেবাসুরের নিত্য হানাহানি আর জাগরণ উদ্বোধন।

অনন্ত মিলনেই প্রেমের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এই মিলন-গানেই মানবচরিত্রে নৈতিক জীবনের বিচিত্র দুর্জ্জয় শক্তি। মানুষ সে আনন্দ-আলোক, অনন্ত মিলন, বুঝ্‌তে না পেরে পরস্পরের অনন্ত বিনাশের কথা মনে করে। ব্যর্থ সংশয়-কুহেলীঘোরে যখন দৃষ্টি অন্ধ, তখন হায়! হায়! মানুষ জটিল তর্ক দেবতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ জ্ঞান পুণ্য প্রেমধনে বঞ্চিত হ'য়ে এ কি অনর্থের পথে ছুটে চলে!

মানুষ ইচ্ছা করুক, আর নাই করুক চিরকালের দেবতা যিনি তোমার আমার সকলের জন্য যা কল্যাণ রেখেছেন অনন্তযুগে, তা আর কে খণ্ডন করে? যাঁর শক্তিলীলায় বিশ্ববুকে আনন্দবিকাশ, সেই শিবসুন্দরের ইচ্ছালীলাতেই জীবাত্মার বুকে পুণ্যপ্রভায় আনন্দজ্যোতিঃস্ব, আর অখণ্ড শাসনবিধি—রুদ্র স্বরূপমহিমা।

ঐ শোন ভীম বজ্রবাণী। কে তুমি প্রগল্‌ভা জননী! কে তুমি সত্যবিমুখীন পিতা! শিশুর কোমল বুকে তুচ্ছ অবহেলায় কত অসত্যের অজ্ঞান অন্ধকার জটিল কুহেলী জমিয়ে তুলছ! সাবধান! একদিন এ জন্য হিসাব দিতে হবেই তোমার। এ উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম অবহেলিত জীবনের বিষময় ফল কে ভোগ করে? তোমার তরল আমোদ প্রমোদ একদিন কোন্ অশুভক্ষণে শিশুর হৃদয়মুকুরে প্রতি-ফলিত হ'য়ে উঠতে কে জানে? আজ তার অবনত জীবন, অসত্য ঘৃণিত পথের যে অবশ্যম্ভাবী চরম পরিণতি, আজ তার মরণযন্ত্রণাক্ষণে বল কে সেজন্য দায়ী? কোমল সুন্দর তরুণ জীবনকমলদল কেন হায় আজ এ ঘোর অসত্যের কালিমায় কলঙ্কিত? এ কি অকালকীটদষ্ট ছিন্ন জীবন-শতদল!......

আপনার স্বার্থসাধনে বেশ ত চলেছ ধরণীবুকে আনন্দে গর্ব্বে! যেন তুমিই তোমার মালিক! বিশ্বভুবন যেন তোমারই হাতে গড়া। সবাইকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'রে আপনার অভীষ্টসিদ্ধিলাভে ছুটি, কে বা আপন, কে বা পর, কোথায় কি জানি না, জানি না ইহকাল পরকাল। কোথায় স্বর্গলোক কে জানে? তবে কার বুকে আমি অনন্তকালে জাগ্‌ব বল ত? এমনি ক'রেই যার দিন ব্যর্থ কেটে গেল, কার বুকের ঘরে, কার প্রেমের আলোকে নিত্য পুলকস্পন্দনে তার নিত্য স্মৃতিপূজা হবে? আর যে খেটে গেল দশের জন্য, দিয়ে গেল হৃদয়খানি, সে যে জেগে রইল বিশ্বকে, সকল হৃদয় জুড়ে। তার মৃত্যু কোথায়? আর যে জন রইল আপনার সুখ দুঃখ নিয়েই, ভুলে গেল দশের কথা, তার যে মরণসাগরপারেও একা একাই বিদেশীর মত সহানুভূতি-প্রেমশূন্য জীবন নিয়ে একাকিত্বের ভিতর জাগ্‌তে হবে না কি? চলেছি ভবপারাবারে, কই আমার ভালবাসার ধন ত কেউ নেই সংসারে! আমি ত কারুকে ভালবাসিনি, আমি ত কারুর বেদনায় বুকভরা স্নেহ প্রেম ঢেলে দিই নি, তবে আমি কেন আশা কোরব? যদি বা দিয়েছি এক-মুষ্টি ভিক্ষা, যদি বা সাধারণের মঙ্গলযজ্ঞে আমার অর্থ-ভাণ্ডার খুলেছি কোনদিন, সে ত আমারই জন্য। তাইত দেহের খেলা যেদিন ফুরিয়ে যাবে, সে দেবলোকের আনন্দ উৎসবে ত আমি সেই একাকিত্বের দীনতায় দীনহীন—আমার সার্থকতা কোথায়? একদিন কিন্তু সে মরণহীন লোকে মিল্‌তে হবে সকলকে। দুর্দান্ত হৃদয়হীন প্রতারক হয়ত কত অনাথার সর্ব্বনাশ করেছ, কিন্তু মনে রেখ ওগো নির্ম্মম জন! নিষ্পেষিত বক্ষের প্রতি দীর্ঘশ্বাস, প্রতি ব্যাকুল বেদনার করুণ নিবেদন, দেবতার বুকে জাগ্রত। মনে রেখ কত দুঃখী তাপী বুকফাটা শোকোচ্ছ্বাস হাহাকার, বিলাপ, নীরবে গোপনে দেবতার চরণে ব্যথার পূজা, ব্যর্থ নয়। শুনেছেন জেনেছেন অন্তর্যামী দেবতা। একদিন সকলের সঙ্গে মিলিত হবে সে দেহাতীত লোকে, তোমার আমার যা কিছু ক্ষুদ্রতা, যা কিছু পাপ, যা কিছু মিথ্যা, সব সত্য আলোকে সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠ্‌বে। এলোকে সকলের চোখে ধূলো দিয়ে গেলাম, আমাকেও ভুলিয়ে গেলাম, কিন্তু যেদিন দেহের দীন আবরণ উন্মুক্ত হ'য়ে গেল, সেদিন সব লুকোচুরি—সকল চাতুরী—অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেল। তখন কোথায় আমার ঢাকাঢাকি! যদি বোলতে চাও, এসব কিছু নেই, পরকালও নেই, ঈশ্বরও নেই, অনন্ত জীবনও নেই, সবই শূন্যময়, তবে আবার ওকে তোল? তবু কেন বুকের ঘরে মর্ম্মকোণে থেকে থেকে ভয় বিভীষিকা! যতই কেন চতুর হও না, তোমার পাপতাপ অস্বীকার কর না, যা সত্য তার বিনাশ নাই। একদিন সে সত্যস্বরূপে প্রকাশিত হবেই হবে।

ওগো দেবতা! ওগো পরমগুরু, পরম সত্য বিচারক! সত্যি কি আমার দেহাতীত লোকে সব ধরা পড়ে যাবে? মনে কোরতেও যে লজ্জায় চমকে উঠি। ওগো শোন দুঃখী তাপী জন! লাঞ্ছিত পদদলিত ব্যথিত জন! একদিন সবাই সত্যরূপে জেগে উঠ্‌ব। একদিন আবার সকল কর্ম্মের হিসাব, সকল জবাবদিহি দিতে হবে। একদিন পাপপুণ্যের ফলাফল ভোগ কোরতেই হবে। কে দেবে তোমায় সান্ত্বনা! অদৃষ্টের ফল, স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ কোরতেই হবে।

যে অপরাধী, যে পাপী, তারই তাই মরণান্তে জেগে ওঠ্‌বার ভয়। যিনি পুণ্যবান, মৃত্যু ত তাঁর কাছে শুভ আহ্বান। তাঁর কত আনন্দ আশা, মুখে চোখে কত হাসি! তখন শুদ্ধ মুক্ত জীবাত্মার কি আনন্দ-যাত্রা! তখন তাঁর সকল দুঃখের অবসান। তাইত তিনি ইহলোকে জীবনসংগ্রামে ভীত নন। মৃত্যুর কালো রূপের ভিতরই তিনি কি আনন্দ-আলোকে হেসে ওঠেন, আর বদনকমলে দিব্য জ্যোতিবিভা।

কে তুমি বৃদ্ধ? ধর্ম্মপথে, সত্যপথে, চল্‌তে গিয়ে রক্তাক্ত, ব্যথিত, গৃহহীন, শ্রান্ত ক্লান্ত? তোমার বদনকমলে তবুও ওকি দিব্য লেখা? মহাযাত্রার আনন্দগানে আর দুঃখ নাই, ক্লান্তি নাই, সংগ্রাম নাই, মহাযাত্রায় সব কিছু অবসান হবে। তোমার উদার ত্যাগের সত্যমহিমা এবার প্রকাশ হবে। তোমার জীর্ণ তনু রুগ্ন ভগ্ন, আর পারে না কর্ম্মপথে চল্‌তে, জীবাত্মা আর পারেন না দেহযন্ত্রে তাঁর কর্ম্মলীলা সাধন কোরতে! ঐ যে প্রাচীন বৃক্ষের মত সকল সার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে, ফুরিয়ে গেছে তার নিত্য নূতন ফল ফুলবিতরণ জগতের বুকে। তোমার জীবন-প্রভাতের আনন্দসঙ্গী সব চলে গেছেন। একে একে সকলে চলেছেন, এখন তুমি অপরিচিতের মত একা একা দিনের কাজে

হয়ত চলেছ সভয়ে ধীরপদে, কিন্তু ভয় নাই, তুমিও ত শীঘ্রই চলেছ সে অমৃত পথে।

ঐ যে মরণসাগরপারে তোমার নিত্যগৃহ। ঐ যে প্রিয়জন-মিলনধাম। ঐ যে দেববালাগণের আনন্দলীলা। যে আঁখি ক্ষীণদৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছিল আজ তার এ কি দৃষ্টিলাভ! এ কি অব্যক্ত আনন্দপ্রকাশ! এ কি অমোঘ শক্তিলীলা! ধন্য আমি, ধন্য আমার নীরস জীবনসংগ্রাম! ধন্য আমার দেবতার সত্য ভালবাসা।

আবার মিল্‌তে হবে, ওগো বালক বৃদ্ধ যুবা, ধার্ম্মিক পিতার সাধু সন্তান সন্ততি, সবাই আবার জাগ্রত হব। কত দুঃখে চ'ল সংসারে, কত ক্লান্তি ভারের ভার আর বইতে পারি না। বুঝেছেন পিতা আমার ক্লান্ত সংগ্রাম, বুঝেছেন জননী দীন সন্তানের মর্ম্ম-ব্যথা—আছেন সকলে, একদিন সকল রহস্য উদ্‌ঘাটন হ'য়ে যাবে।

ঐ যে অমৃত পথ অনন্ত প্রসারিত, হয়ত সেখানে কত দুঃখ, কত কণ্টকাকীর্ণ, দুরারোহ, তবুও চলেছে সত্য লোকে সত্য পথের পথিক দল। দেবতাবাঞ্ছিত পথ, অমৃত পথ। তাই বলি সাবধান! অসত্যের পথে কেন আর? সত্য পথে চল মন।

হায়! হায়! আমার এখনও কত দুর্ব্বল বাসনা, কত রিপুর ভীষণ তাড়না, ব্যর্থ প্রগল্‌ভতার কত জ্বলন্ত স্বরূপ, কত কুহক মদলালসা, আর কত আপাতমধুর মোহন প্রকাশ! নিমেষে ক্ষণিক চঞ্চল দোলায় কোথায় দুলিয়ে দেয়। ভুলে যাই মঙ্গল, বুঝিও না কখন কেমন ক'রে আমার বাসনালুব্ধ মন প্রলোভনের পথে সর্ব্বনাশের আয়োজনে ছুটে চলেছে। ক্ষণে ক্ষণে আমার কত ভুল, হয়ত আমিও বুঝি নি আমার সে ভ্রম। তুমি জেনেছ চির কল্যাণ। তুমি মনে রেখেছ আমার ভুল ত্রুটী মোহ পরমাদ। এই চির জাগরণের দেশে কেমন ক'রে এ ভুলের অপরাধ নিয়ে তোমার সম্মুখীন হব? আমার মঙ্গল বিবেকবাণী আমার লুব্ধ চিত্তের ক্ষণিক উত্তেজনার ব্যর্থ পিপাসাচরিতার্থতার কাছে যে হার মেনে যায় ক্ষণে ক্ষণে। দেখ অন্তর্য্যামি! আমার প্রেমবিহীন মলিন হৃদয়, দেখ কত স্থৈর্য্য ধৈর্য্যহীন। কই সে দীনতা, কই সে দেবত্ব, মানবত্ব?

মনে রেখ প্রিয়ধনদের ভবিষ্যৎ মিলনের আনন্দ আশায়। তোমার প্রতি দিনের প্রার্থনায় তাঁদের স্মরণ কর, মনে রেখ দিবসের আনন্দসম্ভোগে, কর্ম্মদোলায়, মনে রেখ দুর্দ্দিনে, ঘন তমসাচ্ছন্ন রজনীতে, ঝড় বাদলে। ভুল না সে চিরবাঞ্ছিত স্মৃতিপূজা। প্রেমই মঙ্গলবন্ধন, প্রেমেই দেহের পরপারে নিয়ে চলে উন্নত লোকে। প্রেমই স্বর্গ মর্ত্ত একাকার করে, প্রেমেই প্রেমময়ের বিশ্বলীলা, প্রেমই জগৎবুকে আনন্দস্বরূপে ফুটে ওঠে। যখনই তোমার হাতখানি শুভকর্ম্মে এগিয়ে যাবে, যখনই শত্রুকে মিত্র বল্‌তে পারবে, যখনই নিন্দুকের বাক্যবাণে মর্ম্মবিদ্ধ হ'য়েও তাকে ক্ষমার আনন্দমহিমায় বরণ কোরবে, যখনই দুঃখী তাপীর সঙ্গে সহানুভূতি-অশ্রু ঢেলে দেবে; যখনই জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যাবে, মনে রেখ প্রিয়স্মৃতি, হৃদয়মন্দিরে স্মৃতি-পূজার মঙ্গল অর্ঘ্য সাজিয়ে নিয়ে চল। তবেই ত বুঝ্‌তে পারবে কেমন ক'রে অমৃতের দ্বার তোমার কাছে খুলে যাবে। তবেই ত জান্‌তে পারবে কেমন ক'রে বিদেহী জন এখনও তোমার সত্যরূপে, পুণ্যব্রতে, তাঁরা প্রসন্ন হ'য়ে আনন্দে আশীর্ব্বাদ করেন।

নিত্য মিলন অবশ্যম্ভাবী, মুছে ফেল অশ্রুজল। ওগো অভাগা জনক জননি! কে কাঁদ দিন রজনী একমাত্র সন্তানের বিরহ-বেদনায়? কে তুমি দুঃখিনী পতিব্রতা সতি! নীরবে নয়নের জলে প্রেমাস্পদের সমাধিবুক নিত্য ধৌত ক'রে চল? কে তুমি ভাই বোন, প্রিয় বন্ধু, হৃদয়ের নির্ম্মাল্যে ভাই বোনের স্মৃতি অর্ঘ্য নিবেদন কর? একদিন ব্যথার পূজার সমাপন হবে, কোমল বুকে যত কিছু বেদনার আঘাত সব উপসম হবে। মৃত জন জাগ্রত, চির বিচ্ছেদ নাই জগতে, সকলের জন্য মিলন-উৎসব প্রতীক্ষা কোরছে।

সত্য দেবত্ব আমার সান্ত্বনার সহায় হউন। যখন ভাল-বেসেছি একদিন জানি ত দেহের বিরহবেদনা সইতেই হবে। একদিন যে অব্যক্ত আনন্দ সম্ভোগ করেছি! আজ সমাধির মৌনকুঞ্জে কি জন্য নীরবে একা একা সে বেদনার গান গেয়ে যাই? কি বোল্‌ছ সবাই, আমার সব কিছু ঐ সমাধিবুকে ধূলি ধূসরে? না গো না, তা কি কোরে হবে? আমি কি ধূলিময় দেহে আমার প্রেম প্রতিষ্ঠা করেছি? চোখে, চোখে ঝলকে ঝলকে যে প্রেম-পুলকস্পন্দন, প্রেমসোহাগে মননে বচনে হাসির লহরীতরঙ্গে, সব কি ধূলিময়? ও যে চৈতন্যের প্রেমলীলা, জীবাত্মা জীবাত্মায় পরমপ্রেম অভিব্যক্তি। আর জীবাত্মা যে পরমাত্মার বুকে চির জাগ্রত। এ কি দেবতার দান! ঐ মঙ্গললোকে প্রিয়ধনদের প্রাণের ঘরে যে আমার স্থান এখনও চির বিরাজিত। এখনত আর স্বার্থকোলাহল নেই, এখন কেবল শুদ্ধ মুক্ত প্রেম আরও কত পবিত্র, আরও কত মহত্তর!

ওগো আমার প্রিয়জনেরা, এস আমার অশ্রুজলে, সমাধির চির মৌনবুকেই এস। কোন্ সমাধি প্রেমের ঘরে ব্যবধান আনবে? বিধাতার দান প্রেমমঙ্গলবন্ধন কে ছিন্ন করে? প্রেম আছে তাইত বেদনাবিরহ, আর অশ্রুমলিন তীর্থে নিত্য ব্যথার পূজা। মঙ্গললোকে আবার মিলন, যেখানে দুঃখ নাই, বিচ্ছেদ নাই; স্রষ্টা পাতা বিধাতা যাকে জন্ম দিয়েছেন তাকে যে অনন্ত জীবনের আনন্দ-আভাসে সমস্ত সার্থক করেছেন। ধূলিময় সংসারেও দেবগন্ধ, স্বর্গের আনন্দগান, বিশ্বাসে প্রেমেই যে তার অস্তিত্ব।

মরণসাগরপারেই আমার আনন্দগৃহ, আমার সত্য জন্মভূমি। সজলনয়নে উর্দ্ধ মুখে করজোড়ে প্রতীক্ষা কর, পবিত্র দীক্ষা সার্থক হউক। এই মরজগতে বাস ক'রেই অমৃতে বাস করি। যদি অপরাধের দৈন্যে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হই, ওগো ঠাকুর, তবুও শুদ্ধ হব। যদি অশুদ্ধ ভাব আমার চিত্তদর্পণকে এখনও মলিন করে, ওগো শুদ্ধ সুন্দর, আশীর্ব্বাদ, কর এ মোহপরমাদ দূর কর। কত অন্যায় করেছি, তবুও চোখের জলে কেবলই প্রার্থনা করি, বল দাও, এবার শুদ্ধ হব।

আমরা মিল্‌বই মিল্‌ব। প্রাণের দেবতা, ধন্য তোমার করুণা! দেহ ফুরালো, তবু মিলন ফুরালো না, ধন্য তোমার ভালবাসা। আমি কি বোলে প্রকাশ করি? দেখ আমার দীন সাজ, দেখ আমার দুর্ব্বলতার মোহ; ওগো আমার পূর্ণ মঙ্গল দেবতা, তোমার ভুবনজোড়া আসনখানি আমার বুকেও সুপ্রতিষ্ঠিত কর, আমি নীরব পূজারী হ'য়ে তোমার মৌন বিশ্বসভাতে নীরবেই প্রণত হই, হরিষে বিষাদে আমার প্রতি দীর্ঘশ্বাস, বেদনার অশ্রু, তোমার ভিতরই, ওগো নীরব দেবতা, প্রাণসখা, সার্থক হউক।

## ব্রাহ্মসমাজ

**রাজর্ষি রামমোহন স্মৃতি**—রাজর্ষি রামমোহন রায়ের পরলোকগমনের সপ্তনবতিতম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। তাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সভাপতির কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীমতী নীরজাপ্রভা চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-

কুমার মিত্রও কিছু সময়ের জন্য সভাপতির কার্য্য করেন।

রামমোহন লাইব্রেরী গৃহেও আর একটি স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে ডিব্রুগড় ব্রহ্মমন্দিরে একটি স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। সহরের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে একটি বৈদিক সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উদ্বোধনসঙ্গীতের পর শ্রীমতী জগদা দেবী বরদোলৈ, শ্রীযুক্ত রোহীন্দ্রনাথ শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত চিদানন্দ দাস সংক্ষেপে বক্তৃতা করেন। আরাধনা সঙ্গীতের পর শ্রীমতী রত্নাবলী বড়ুয়া বি এ, একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, শ্রীযুক্ত বিষ্ণুকিঙ্কর কলিতা একটি কবিতা পাঠ ও শ্রীযুক্ত আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা এবং শেষে সভাপতি বক্তৃতা করেন। সভাপতি ও অন্যান্য বক্তাদের ধন্যবাদ দেওয়ার ও শেষ সঙ্গীতের পর সভা ভঙ্গ হয়।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পরলোকগমনের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে মৌখার ব্রাহ্মসমাজ খাসিয়া ভাষায় কীর্ত্তন ও প্রার্থনা এবং বাঙ্গালাতে উপাসনা করা হয়। অপরাহ্ণে পুনরায় কীর্ত্তন ও উপাসনাতে বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাসগুপ্ত মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; তৎপর খাসিয়া সঙ্গীত ও কীর্ত্তন হইয়া কার্য্য শেষ হয়।

---

**পণ্ডিত শিবনাথ স্মৃতি**—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনের একাদশ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ৩০শে সেপ্টম্বর প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে স্মৃতি সভার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ সভাপতির কার্য্য এবং শ্রীমতী সুশীলা বসু, শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ রায় বক্তৃতা করেন।

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২২শে ভাদ্র (৮ই সেপ্টেম্বর) পরলোকগত যাত্রামোহন সেনের ২য়া কন্যা (শ্রীযুক্ত হিমাংশু কুমার দাস গুপ্তের পত্নী) শ্রীমতী ইন্দিরা বালা দুইদিনের জ্বরে হুকুল গুড়ি চা বাগানে ৫টি অল্পবয়স্ক পুত্র রাখিয়া ২৯বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে যাঁহারাই পরিচিত ছিলেন, তাহারা সকলেই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মোহিত হইতেন। গত ৪ঠা আশ্বিন (২১শে সেপ্টেম্বর) তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত ভগবান চন্দ্র গুহ উপনিষদ পাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে হিমাংশু বাবু নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন:—বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ ২৲ ঐ ছাত্র সমাজ ১৲ ঐ মিশন ফণ্ড ২৲ চট্টগ্রাম সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ২৲, ডিব্রুগড় ব্রাহ্ম সমাজ ২৲, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ ২৲, ব্রাহ্ম মিশন ফণ্ড ২৲, সাধনাশ্রম ২৲, নবদ্বীপ অনাথ ধন ভাণ্ডার ২৲, ধুবড়ী ব্রাহ্ম সমাজ ১৲, গোয়াল পাড়া ব্রাহ্ম সমাজ ১৲, ঢাকা পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম সমাজ ১৲, অনাথ আশ্রম ১৲, অনাথ ধন ভাণ্ডার ১৲, একটি দুঃখী পরিবার ৫৲, ফরিদপুরের সোনাল বাড়ী বালিকা বিদ্যালয় ৫৲। মোট ৩২৲ টাকা।

বিগত ১০ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত রাধানাথ দেবের কন্যা (শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের পত্নী) প্রতিভা ঘোষ দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৮ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল আচার্য্যের কার্য্য এবং পুত্র শ্রীমান রণজিৎকুমার জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন।

বিগত ৪ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা কণিকা দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রনা ভোগ করিয়া একমাত্র ভ্রাতাকে রাখিয়া শান্তিধামে গমন করিয়াছেন। রণজিৎকুমার একমাসের মধ্যে দুইটি গুরুতর শোক প্রাপ্ত হইলেন।

বিগত ১৪ই অক্টোবর ধুলিয়ান গ্রামে শ্রীযুক্ত আশুতোষ পালের মাতা পরলোকগমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন এবং আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

---

**শুভবিবাহ**—বিগত ৪ঠা অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিকের তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া নীলিমা ও চট্টগ্রাম নিবাসী পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র দাসগুপ্তের পুত্র শ্রীমান বিমলচন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৪ঠা অক্টোবর চট্টগ্রাম নগরীতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাসের মধ্যমা কন্যা কল্যাণীয়া অমিয়া ও পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্র নাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৬ই অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত তারকগোপাল ঘোষের কন্যা কল্যাণীয়া সরিৎবাসিনী ও সুপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রচন্দ্র রায়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান বিমানবিলাসের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৭ই অক্টোবর লক্ষ্ণৌনগরীতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষালের কন্যা কল্যাণীয়া সান্ত্বনা ও পরলোকগত শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান অজিতকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

**প্রচার**—শ্রীযুক্ত শ্যামদাস কাচারী গোয়ালপাড়া ও গারো পর্ব্বতের সীমান্তে নলবাড়ী হইতে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ীর নিকট তাঁহার নিম্নপ্রকাশিত প্রচার বিবরণ পাঠাইয়াছেন—

"মাটিয়া" নামক গ্রামে (গারো পাড়ায়) প্রার্থনাসমাজ স্থাপন করিয়াছি। গত রবিবার ২০।২৫ জন লোক প্রার্থনায় যোগ দিয়াছিল। নন্দেশ্বর নামক গ্রামেও প্রার্থনাসমাজ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেছি।

খামারীতে প্রার্থনাসমাজ স্থাপন করিতে বহু চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। পূজার বন্ধে ১০।১২ মাইল দূর গ্রামে গিয়া বনগাঁও, বরমাটিয়া, হাতিমরা, বড় পাথার, দেখীমারী, ডালুয়াবাড়ী, ও গুলামারী নামক গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র দাস শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ীর নিকট তাঁহার নিম্নলিখিত প্রচারবিবরণ পাঠাইয়াছেন—

সিংরা, মাসাং, আমবাড়ী ও রংজুলী হইতে রাভা জাতির মধ্যে প্রচার করিয়া আজ রাত্রিতে রাজসিমলা ফিরিয়া আসিয়াছি। রংজুলী ও আমবাড়ীতে প্রচারের বিশেষ কোন ফল হয় নাই, কিন্তু মাসাং ও সিংরাতে কিছু কাজ হইয়াছে।

শেষোক্ত গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা বলিয়াছি। তাঁহারা গ্রামবাসীদিগের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং প্রার্থনাসমাজ সম্বন্ধে আলাপ করিবেন এবং প্রার্থনাসমাজ স্থাপন করিবেন, এ বিষয়ে স্বীকৃত হইয়াছেন।

**সংকীর্ত্তনে প্রচার**—গত ১১ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পান্নালাল দের নেতৃত্বে কতিপয় বন্ধু নন্দী ব্রাদার্স কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দীর কোন্নগরস্থিত বাগানবাড়ীতে বিশেষ উৎসব সম্ভোগ করিতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যায় মাণিকবাবু কীর্ত্তনে উপাসনা করেন। তাহাতে পল্লীস্থ হিন্দু ভদ্র পরিবারের প্রায় ৫০টী মহিলা এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পরদিন প্রত্যুষে মাণিকবাবু কয়েকটী কীর্ত্তন করিবার পর সকলে মিলিয়া উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে রাস্তায় বাহির হইলে রাস্তার লোকেরা সেই কীর্ত্তনে যোগ দিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইলে রবিবাসরীয় উপাসনা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। মহিলাদিগের অনুরোধে মাণিক বাবু পুনরায় অপরাহ্নে কয়েকটী কীর্ত্তন করেন। নন্দী ব্রাদার্স কোম্পানির এবং শ্রীযুক্ত পান্নালাল দের পরিবারস্থ মহিলাবৃন্দ এই ব্রহ্মনামকীর্ত্তন এবং প্রচারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

**বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ**—বিগত ২৮শে শ্রাবণ সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরে সাধু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের স্মরণার্থ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী একটী বক্তৃতা করেন। তৎপরে প্রিন্সিপ্যাল নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় কয়েকটী কথা বলেন।

বিগত ১লা আশ্বিন ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের স্মরণার্থ সভায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস এবং শ্রীমান্ কল্যাণকুমার চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন। (এই দুইটী সভা ছাত্র সমাজের পক্ষ হইতে আহূত হইয়াছিল।)

বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষ হইতে ব্রহ্মমন্দিরে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা আহূত হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস সভাপতির কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়, মৌলবী মফিজুদ্দিন আহাম্মদ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বসু বক্তৃতা করেন।

বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপরে মনোমোহন বাবুর সভাপতিত্বে শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস, বাবু নিশিকান্ত বসু, বাবু প্রসন্নকুমার দাস এবং সভাপতি কিছু কিছু বলিলে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বিগত ২৭শে ভাদ্র সর্ব্বানন্দভবনে ব্রাহ্মবন্ধুসভার ৪র্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতিরূপে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কথিত প্রার্থনাতত্ত্ব পাঠ করিয়া (ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা হইতে) একটী আলোচনা উপস্থিত করেন। অনেক বন্ধুই এই বিষয়ে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করিলে সভার কার্য্য শেষ হয়।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর সায়ংকালে সর্ব্বানন্দভবনে ব্রাহ্মবন্ধু সভার ৫ম অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী রাজার দিনের বিশেষত্ব স্মরণে সঙ্গীত ও প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত হইতে পাঠ করিয়া তাঁহার প্রচারিত একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত করেন। অনেক বন্ধুই বিশদভাবে এই বিষয়ে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলে প্রীতি জলযোগে সভার কার্য্য শেষ হয়।

বিগত ৩০শে আষাঢ় সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ গুপ্তের গৃহে তাঁহার মাতার বার্ষিক পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৩১শে ভাদ্র উক্ত গৃহে বিনয়বাবুর পিতার বার্ষিক পারলৌকিক অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উভয় দিনই উপাসকগণ প্রীতি ভোজন করিয়াছিলেন।

বিগত ২০শে আশ্বিন সায়ংকালে বাবু ললিতমোহন দাসের গৃহে তাঁহার পিতা আচার্য্য কালীমোহন দাসের বার্ষিক পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতি জলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

**শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ**—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে ২৭শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত সভায় সঙ্গীত ও প্রার্থনান্তে শ্রীযুক্ত রামদয়াল দাস শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন শ্রীযুক্ত কবীন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চৌধুরী জীবনী আলোচনা করেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক গমন উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে সমবেত সভায় শ্রীমতী নলিনীবালা চৌধুরী প্রার্থনান্তে জীবনী আলোচনা করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করেন, এবং শ্রীযুক্ত রামদয়াল দাস, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীযুক্ত কবীন্দ্রনাথ দাস জীবনী আলোচনা করেন।

বিগত ৭ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ হোসেন পালের পুত্রের (তৃতীয় সন্তান) জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান তদীয় বাসভবনে সম্পন্ন হয়। (জন্ম ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৩০)। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন, সচ্চিদানন্দ বাবু প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা প্রদত্ত হয়।

১০ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম দাসের পুত্রের প্রথম বাৎসরিক জন্মদিন উপলক্ষে তদীয় বাসভবনে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন

ভগবান সন্তানদিগের মঙ্গল করুন।

বিগত ১২ই অক্টোবর পরলোকগত অভয়চরণ দাসের অষ্টমবার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা হয়। রায় সাহেব শিবনাথ দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস স্বর্গীয় পিতার জীবনী পাঠ করেন।

**পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ**—বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সপ্তনবতিতম স্মৃতি উৎসব সম্পন্ন করেন:—প্রাতঃকালে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন, সন্ধ্যায় এক সাধারণ সভা হয়। মিঃ পি কে বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ডাক্তার মুহম্মদ শহিদুল্লা, অধ্যাপক কাজি আবদুল ওদুদ, ডাক্তার মোহিনীমোহন দাস, শ্রীযুক্ত অরুণকান্তি নাগ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র সাহা বক্তৃতা করেন।
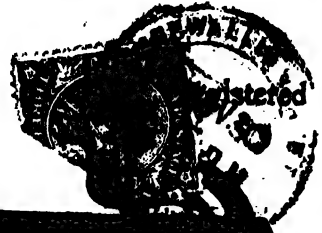
ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ৮ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু বি-এ

Registered No. 56

# তত্ত্ব কৌমুদী

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৩ ভাগ
১৪শ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১
2nd November, 1930.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা, যদিও আমাদের জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় যাহা তাহা তুমি নিতান্ত অনায়াসলভ্যই করিয়াছ, দয়া করিয়া সর্ব্বদা অযাচিত ভাবেই প্রদান করিতেছ, তথাপি আমাদের উন্নতি ও বিকাশের জন্য শ্রম ও সংগ্রামেরই ব্যবস্থা করিয়াছ—আলস্য আরামে সে পথে অগ্রসর হইবার কোনও উপায়ই রাখ নাই। আমরা অনেক সময়ই তোমার এই কল্যাণকর বিধির কথা ভুলিয়া যাই, এবং সকল বিষয়ে একমাত্র আলস্য ও আরামই খুঁজিয়া বেড়াই, তাহাতেই সমস্ত সময় ও শক্তি নষ্ট করি। আমরা একবারও চাহিয়া দেখি না, কোন্ পথে কোথায় চলিয়াছি, জীবনের কি মহা অনিষ্টসাধন করিতেছি। ইহাতে আমরা এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, সময় সময় একটু বুঝিতে পারিলেও, ক্ষণিক চেষ্টা যত্ন করিলেও, ইহার হাত হইতে সহজে মুক্ত হইতে পারি না। তাই ত আমাদের জীবনে এই দুর্গতি লক্ষিত হইতেছে,—দিনের পর দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর না হইয়া ধীরে ধীরে অবনতির পথেই চলিয়াছি, দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতরই হইয়া পড়িতেছি। হে দুর্ব্বলের বল, তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের হৃদয়ে সে বল ও শক্তি আনিয়া দিবে, যাহাতে আমরা সকল আলস্য ও আরামপ্রিয়তার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, সর্ব্বদা নিষ্ঠার সহিত তোমার কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারি, সকল প্রকার শ্রমে ও সংগ্রামে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিতে সমর্থ হই? তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ হউক।

## সম্পাদকীয়

**শ্রমবিমুখতা ও আরামপ্রিয়তা**—মানুষ আদি অজ্ঞানান্ধকারের যুগে মনে করিয়াছে, নানা প্রতিকূল অবস্থার সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়াই তাহাকে এ সংসারে বাঁচিয়া থাকিতে ও সকল বিষয়ে জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই সে তখন একটু অতিরিক্ত পরিমাণেই শ্রমশীল কষ্টসহিষ্ণু ও আত্মনির্ভরপরায়ণ হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহা তাহার শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার জীবন সম্বন্ধেই দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমে সে জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারিয়াছে, এই প্রকৃতিরাজ্যে অনুকূল ব্যবস্থাই অধিকতর পরিমাণে রহিয়াছে, এবং তাহা বুঝিয়া চলিতে পারিলে তাহার শ্রম ও ক্লেশের অনেক লাঘব হইতে পারে, বহু বিষয়ে আপনার শক্তি সামর্থ্য অপেক্ষা এই প্রকৃতির নিয়মের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিলেই তাহার উদ্দেশ্য সহজে সুসিদ্ধ হয়। এক-দেশদর্শী লোকের নিকট এই দুইটি তত্ত্ব পরস্পরবিরোধী বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়েই সত্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের মধ্যে কোনও বিরোধই নাই। কিন্তু সকল দিক ভাবিয়া না দেখাতে, অধিকাংশ মানুষ চিরদিনই এ বিষয়ে মহা ভ্রম করিয়া আসিতেছে, উভয়ের সামঞ্জস্য না করিতে পারিয়া এক সীমায় যাইয়া পৌঁছিয়াছে। কাজেই পূর্ব্বে তাহার মধ্যে যে সকল গুণ একটু অত্যধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহার একান্তই অভাব দেখা যাইতেছে, তৎপরিবর্ত্তে বিপরীত দোষগুলিই অনেক বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে। অত্যধিক শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও আত্মনির্ভরপরায়ণতার পরিবর্ত্তে আজকাল

একান্ত আলস্য ও শ্রমকাতরতা, আরামপ্রিয়তা এবং আত্মনির্ভরহীনতা ও বিনা আয়াসে কোনও প্রকারে অপরের দ্বারা কার্য্যসাধন করিয়া লইবার স্পৃহা অধিকাংশ লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল বিভাগেই ইহার এত দৃষ্টান্ত চারিদিকে রহিয়াছে যে, বিশেষ ভাবে তাহার কোনটার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন দেখিতেছি না।

প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ শ্রমলাঘব করিবার ও সহজে কার্য্যসিদ্ধি করিবার যে সকল উপায় বাহির করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কিছু বলিবার নাই। তাহার দ্বারা তাহার উন্নতির পথ সুগমই হইয়াছে, অধিকতর উন্নতিলাভ করিবার সময় ও সুযোগই ঘটিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ইহার কোনটাই তাহাকে শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও আত্মশক্তিনিয়োগের দায়িত্ব হইতে মুক্ত করে নাই, বরং অন্য প্রকারে তাহা বর্দ্ধিতই করিয়াছে। কোথাও এইরূপ নিয়ম আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাতে আলস্য আরামে, বিনা শ্রমে ও কষ্টস্বীকারে এবং আপনার চেষ্টা যত্ন শক্তি নিয়োগ ব্যতীত, কোনও কার্য্য সাধিত হইতে পারে, শুধু অপরের দ্বারা আপনার উন্নতি ও কল্যাণসাধন সম্ভবপর হইয়া থাকে। কোথাও কোনও দিন এই প্রকারে কেনও রূপ মহত্ত্ব কেহ লাভ করিতে পারে নাই। দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার এবং সমগ্রশক্তিনিয়োগের দ্বারাই তাহা প্রত্যেককে অর্জ্জন করিতে হইয়াছে। যাহাকে আমরা অলৌকিক শক্তি মনে করি, অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, মূলে উহা অসীম শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যপরায়ণতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই এই কথা সত্য। কিন্তু শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ে একটু আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য, অপর দুই বিষয়ে অন্য কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

ধর্ম্মসাধন বিষয়ে পূর্ব্বে যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও কল্যাণলাভের জন্য এক সময় মানুষ যে নানাপ্রকার অস্বাভাবিক কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছে, আপনার শক্তিরই উপর যে একান্ত নির্ভর করিয়াছে, তাহার অসারতা ও অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা অনেক সময় অনেক কথা বলিয়াছি। ধর্ম্মসাধনের যে সরল সহজ স্বাভাবিক পথ আছে, বিশ্বসংসার যে এ পথে আমাদের বিশেষ সহায়তাই সাধন করে এবং সর্ব্বোপরি প্রেমময় জীবন-বিধাতা যে আমাদের সকলকেই চির উন্নতি ও কল্যাণের দিকে লইয়া যাইবার জন্য সতত নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহার অপার করুণা যে কাহাকেও পরিত্যাগ করে না, সে কথাও আমরা বহুবারই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া যে বিনা সাধনে, আলস্যে আরামে, কোনও প্রকার শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার না করিয়াই, আপনার যথোচিত চেষ্টা যত্ন ব্যতীতই, শুধু বাহিরের সাহায্য ও সহায়তায় কেহ হঠাৎ সিদ্ধিলাভ করিবে, ধর্ম্মজীবনের উচ্চ শিখরে উপনীত হইবে, এরূপ কথা আমরা কখনও কোথাও বলি নাই, কেহই বলিতে পারে না। প্রেমময় পিতা ও তাঁহার জগতের ব্যবস্থা যতই অনুকূল হউক না কেন, জড় বস্তুর ন্যায় আমাদের নিজের কিছুই করিতে হইবে না, এরূপ নিয়ম তিনি কোথাও করেন নাই, বরং আমাদিগকে যেমন কতকটা স্বাধীনতা ও কর্ত্তৃত্ব দিয়াছেন, তেমনি এমন কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থারও সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, আমাদের সকল শক্তির উন্নতি ও বিকাশসাধন করিতে হইবে।

যতদূর সম্ভব কম শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া উদ্দেশ্যসাধনের সহজ পন্থা বাহির করিবার চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা যদিও মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও কিছুমাত্র দূষণীয় নহে, তথাপি তাহার আতিশয্য হইতে প্রসূত শ্রমবিমুখতা ও আরামপ্রিয়তাবশতঃ কোনও অস্বাভাবিক উপায়ে বা অপরের পরিশ্রম ও কষ্টবহনের দ্বারা আপনার উন্নতিসাধনের আগ্রহ সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না—উহা স্বাভাবিকও নয়, কল্যাণজনকও নয়, বরং নিতান্ত অনিষ্টকরই। ইহার দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না, বাহিরের কার্য্যসাধন বিষয়ে অল্প কিছু ফল পাওয়া সম্ভবপর হইলেও, প্রকৃত উন্নতিসাধন বিষয়ে, আপনার শক্তি-বিকাশ বিষয়ে কোনও প্রকার ফললাভেরই সম্ভাবনা নাই। শারীরিক ও মানসিক জীবনে কতকগুলি কার্য্য বা উদ্দেশ্য-সাধন হইলে এক প্রকার সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকা যায়; শক্তির বিকাশ ও উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও কিছু পরিমাণে চলিতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে সে কথা কোনও মতেই বলা যায় না। ধর্ম্ম আর এখন কতকগুলি কার্য্যের উপর মোটেই নির্ভর করে না, বাহিরের কোনও ফললাভ করাও আর উহার উদ্দেশ্য নহে। ধর্ম্মের লক্ষ্য পরব্রহ্মের সহিত যোগস্থাপনই বলি, আর আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ও বিকাশসাধনই বলি, তাহাতে কিছু আসে যায় না। দুইই এক কথা। দুই বিভিন্ন দিক হইতে দেখিতে গেলেই পৃথক দেখায়, মূলতঃ কোনই পার্থক্য নাই। কাজেই হওয়া ভিন্ন করাতে ধর্ম্ম নাই। হইতে হইলেই করিতেও হয়, কিছু না করিয়া হওয়া যায় না—সে করা অবশ্য কখনও বাহিরের কিছু নয়, সম্পূর্ণ ভিতরেরই। কিন্তু না হইয়া শুধু করার যে এখানে কোনও মূল্য নাই, ইহাই এ ক্ষেত্রের বিশেষত্ব।

হইতে হইলেই যে কিছু করিতেও হইবে, একটু শ্রম ও ক্লেশস্বীকার করিতে হইবে, পথের বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, অনায়ত্ত কিছু আয়ত্ত করিতে হইবে, আত্মশক্তির চালনা করিতে হইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অপরের নিকট হইতে যত সাহায্যই গ্রহণ করি না কেন, তৎসাহায্যে নিজের শক্তি যতটুকু ব্যবহার বা অনু-শীলন করিব, আমার যে কেবল ততটুকুই উন্নতি বা বিকাশ-সাধন হইবে, অপরে যতই উন্নত হউক না কেন, আমাকে যতই সাহায্য করুক না কেন, আমার নিজ চেষ্টা যত্ন শ্রমের অতিরিক্ত ফল যে আমি কিছুতেই পাইব না, তাহাও বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। অপর কেহই আমাকে

কোনও প্রকারে হঠাৎ উন্নতির উচ্চ শিখরে লইয়া যাইতে পারিবে না। আমাকেই ধীরে ধীরে সে পথে চলিয়া সেস্থলে উঠিতে হইবে। এইজন্যই ব্যক্তিগত ধর্ম্মসাধনের এত প্রয়োজনীয়তা। বিনা সাধনে কোনও অলৌকিক উপায়ে অথব অপর কাহারও শক্তিতে বা সাধনের বলে কিছুতেই সে জীবন লাভ করা যায় না। এই জন্য কি প্রকার সাধন অবলম্বন করিতে হইবে তাহা আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে। সে সমস্ত সাধনের কথা আমরা অনেকেই জানি বহুবার তাহার আলোচনাও হইয়াছে।

এ পথে যে সকল বাধা বিঘ্ন আছে তাহারও সকলগুলির আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাহার অনেক গুলির কথা আমরা জানি, এবং কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অপর অনেকগুলি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। কোনও কোনও বিষয়ে বহুবার আলোচনাও হইয়াছে। ধর্ম্মজীবনলাভ বিষয়ে যাহার উদাসীন নহে, অন্ততঃ কিছু পরিমাণে আকাঙ্ক্ষিতই, তাহাদের সম্মুখে যে সর্ব্বপ্রধান বাধা রহিয়াছে তাহাই আমাদের আলোচ্য। কতকটা ভ্রান্ত ধারণা আর অনেকটা ব্যক্তিগত ও জাতীয় প্রকৃতি হইতেই এই বাধা উৎপন্ন হয়। আমরা স্বভাবতঃই অতি অলসপ্রকৃতিবিশিষ্ট, শ্রমকাতর ও আরামপ্রিয়। আমাদের মধ্যে আত্মনির্ভরেরও অত্যন্ত অভাব, পরের উপর নির্ভরশীলতা বড়ই বেশী। সাধারণতঃ সকলগুলিই এক মূল হইতে উৎপন্ন। আরামস্পৃহা হইতেই শ্রমবিমুখতা ও অন্যের উপর নির্ভরশীলতা জন্মে, অথবা শ্রমবিমুখতা হইতেই আরামস্পৃহাদি উপস্থিত হয়। কিন্তু আরামস্পৃহার আরও একটা উৎস আছে। তাহার দিকেও এই প্রসঙ্গে একটু দৃষ্টিপ্রদান করা আবশ্যক। তাহা হইতেছে সুখলালসা বা আনন্দলোলুপতা।

এ সংসারে সকল কার্য্যের মধ্যেই সুখ আছে, ধর্ম্মসাধনের মধ্যেও সুখ বা আনন্দ যথেষ্টই রহিয়াছে। কিন্তু যেমন অন্যত্র তেমনি এখানেও, সুখ বা আনন্দকে লক্ষ্যস্থানে রাখিয়া চলিলে যে কেবল সুখ হইতেই বঞ্চিত হইতে হয় তাহা নহে, অনেক অনিষ্টও ভোগ করিতে হয়। ইহার দ্বারা চালিত হইয়া ধর্ম্মসাধনের মধ্যে মানুষ কত অস্বাভাবিকতা ও কৃত্রিমতা আনয়ন করে, তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তদ্ব্যতীত ইহার জন্য যে আমরা অনেকেই অতি অল্পেই সাধনপথ পরিত্যাগ করিয়া, উন্নতি এ কল্যাণলাভে বঞ্চিত হই, তাহার বহু প্রমাণ আমাদের ও অপরের জীবনে উজ্জ্বল ভাবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আজ কাল প্রায় সকল বিষয়েই মিষ্টতার প্রলোভনের দ্বারা আকৃষ্ট ও প্রলুব্ধ করিবার দিকে একটা অত্যধিক চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। মিষ্টতার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে স্বীকার করিয়াও, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না যে, সকল অবস্থাতেই উহা কল্যাণকর, কোনও অবস্থাতেই অনিষ্টকর নহে। কিন্তু তাহারও যে একটা উপকারিতা আছে, সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং উহার কোনটাই লক্ষ্যস্থানীয় অথবা সর্ব্বদা গ্রহণীয় বা বর্জনীয় হইতে পারে না। সর্ব্বত্র একমাত্র কল্যাণের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। সেই কল্যাণলাভের জন্য নিয়মিত সাধন, মিষ্টই হউক আর তিক্তই হউক, একান্ত আবশ্যক জানিয়া, অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া, ধর্ম্মলাভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে সকল প্রকার আরামস্পৃহা বিসর্জ্জন দিয়া, অনলস ভাবে, সুদৃঢ় সংকল্পের সহিত, দিনের পর দিন যথোচিত সাধনে নিযুক্ত থাকিতেই হইবে। এরূপ অবস্থায় কোনও বাধা বিঘ্ন, দুঃখ ক্লেশ, সাময়িক ব্যর্থতা ও পরাজয়ই যে সাধনার্থীকে স্বীয় পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না, কোনও প্রকারে নিরুৎসাহ নিরুদ্যম, অবসন্ন ও কাতর করিতে সমর্থ হয় না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর, এই দ্বিতীয় প্রকারের আরামস্পৃহা অথবা সুখলালসা বা আনন্দলোলুপতাই যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রতিবন্ধক, সাধনার্থীর অতি মারাত্মক শত্রু, তাহাও অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ লোকই একমাত্র এই কারণেই দুই একবার একটু চেষ্টা করিয়া, নিরস ও তিক্ত বোধে, এই পথ ছাড়িয়া দেয়, অথবা বাঞ্ছিত রসের লোভে বিপথে গমন করে—যে কারণেই হউক, উন্নতি ও কল্যাণলাভে বঞ্চিত হয়। কাজেই এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই বিশেষ সতর্ক থাকা একান্ত আবশ্যক।

আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, সর্ব্ব প্রযত্নে এই শ্রমবিমুখতা ও আরামস্পৃহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে, কোনও মতেই কল্যাণ নাই, কিছুতেই আমরা নিষ্ঠার সহিত সাধনে নিযুক্ত থাকিতে পারিব না, ধর্ম্মজীবনের উন্নতি ও বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইব না। এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। করুণাময় পিতা আমাদের এই দুর্ব্বলতা দূর করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

**সভ্যদিগের চাঁদার হার**—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের নিকট সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়দের স্বাক্ষরিত ইংরাজি ভাষায় যে পত্রখানা প্রেরিত হইতেছে, তাহার মর্ম্মানুবাদ আমরা ব্রাহ্মসমাজস্তম্ভে প্রকাশ করিলাম। তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অর্থের প্রয়োজন কত অধিক তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাহার তুলনায় সভ্যদের চাঁদার হার যে নিতান্ত অল্প, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আয়ের শত করা ১৲ টাকা হিসাবে চাঁদা দেওয়ার একটি প্রস্তাব বহু বৎসর পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছিল। তদনুসারে অল্প কয়েক জন সেই হারে এখনও চাঁদা দিতেছেন। তৎপর আর একবার আয়ের শতকরা।০ চারি আনা হিসাবে অতিরিক্ত চাঁদা দেওয়ার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে কেহ কেহ কয়েক বৎসর উক্ত প্রকার বর্দ্ধিত হারে চাঁদা দিয়াছিলেন। হয়-ত দুই এক জন এখনও সেই হারে দিতেছেন। কিন্তু অধিকাংশেরই চাঁদার হার নিতান্তই কম। পূর্ব্বনিয়মানুযায়ী অনেকের চাঁদার হার বার্ষিক ।০ মাত্র। ইহা যে কত অপ্রচুর তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সমাজের কার্য্য ভালরূপে চালাইতে হইলে যে কিরূপ টাকার প্রয়োজন তাহা কাহাকেও

বলিয়া দিতে হইবে না। অন্যান্য ধর্ম্মসমাজের লোকেরা কিরূপ প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। আমরা আশা করি, সকলে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব চাঁদার হার বৰ্দ্ধিত করিয়া দিবেন। কেহই এ বিষয়ে আর উদাসীন থাকিবেন না। দিনের পর দিন যদি সমাজের ঋণভার বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে অচিরে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে তাহা সকলে একটু বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

## সত্যস্বরূপের আধ্যাত্মিক উপাসনা

## সাধন, শিক্ষাদান, ও প্রচার

( ৪ )

যে ব্যক্তি সত্যস্বরূপের আধ্যাত্মিক উপাসনাসাধনে অনুরাগী সে-ই ব্রাহ্ম। এবং সেইরূপ উপাসনায় অনুরাগী ব্যক্তিদের মণ্ডলী ব্রাহ্মসমাজ। এবং সে মণ্ডলীর মুখ্য কাজ আধ্যাত্মিক উপাসনা করা, উপাসনায় পরস্পরের সহায় হওয়া। ঘর বাড়ী, চাঁদা, নিয়ম, কর্ম্মচারী, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, সবই উপলক্ষ,—উপাসনার সহায়তা করার জন্য। যদি দেখা যায় যে, সমাজের বাড়ী তৈরি করার ভার কাঁধে নিয়ে এত ব্যস্ত হওয়া গিয়েছে যে উপাসনায় বস্‌বার সময় নাই, অথবা চাঁদার চিন্তায় মন এত চঞ্চল যে চোক বুজ্‌লেও সেই কথাই মনে আসে, অথবা সমাজের কোন বিভাগে কে কর্ত্তা হবে সেই চিন্তায় দল-পাকানোটা এত বড় কাজ হ'য়ে ওঠে, যে, সত্যস্বরূপকে সরিয়ে রাখ্‌তে হয়, তাহ'লে, সেরূপ অবস্থায়, আমরা ব্রাহ্ম থাকি না; আমাদের তৈরী বাড়ী ঘর যতই বড় হোক, চাঁদা যতই বেশী হোক, দলাদলি যতই উৎসাহের সঙ্গে চলুক,—আমাদের সমাজ ব্রাহ্মমণ্ডলী থাকে না; এবং আমাদের দ্বারা যে উপাসনার বাহ্য আয়োজন হয় সর্ব্বসাধারণের জন্য, আমাদের পক্ষে তাতে আধ্যাত্মিকতা বা আন্তরিকতা থাকে না। এরূপ উপাসনায় কারও তৃপ্তি হয় না, শিক্ষা হয় না, প্রচারও হয় না।

কোন কোন ঝি বিকালে দেরী ক'রে আসায় যদি বলা যায়, "এত দেরী ক'রে এলে?" তাহ'লে উত্তর পাওয়া যায়—"আমি নাইব না, খাব না?" এ যেমন ফাঁকা কথা, একটা ফাঁকি মাত্র। ১১টার সময় বাড়ী গিয়ে ৪টার মধ্যে স্নান আহার করা রোজ হয়, ৪।৫ ঘণ্টা যথেষ্ট সময়, দেরী করে অন্য কোন কারণে—ইচ্ছা ক'রে। তেমনি, আমরা যখন নানা কাজে ব্যস্ত হ'য়ে উপাসনায় মন দিবার সময় পাই না, তখন মনকে এবং বন্ধুদের বলি, "এও তো কাজ, প্রিয়কার্য্যসাধন তো উপাসনার অঙ্গ," এও ফাঁকি। সমাজে এ ফাঁকি বেশ পাকা হ'য়ে বসেছে।

ব্রহ্মোপাসনা মানেই ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা এবং স্তায় ও প্রেম-সঙ্গত কাজকর্ম্ম। কেবল ধ্যানও নয়, কেবল কাজও নয়। ধ্যানের ও প্রার্থনার অনুযায়ী কাজ ও আচরণ এবং দৈনিক জীবন, কাজ ও আচরণে প্রতিষ্ঠিত ধ্যান ধারণা,—এই হচ্ছে সত্য উপাসনা। এর বিভাগ হয় না। তোমরা ধ্যান ধারণা কর, আমরা কাজকর্ম্ম করি, কর্ত্তৃত্ব করি—এমন ক'রে উপাসনার বিভাগ হয় না। কিন্তু আমরা তা করতে হাত পাকাচ্ছি।

রামমোহন রায় মণ্ডলী ও মন্দির গড়েছিলেন উপাসনার জন্য; মহর্ষি ঘোর সাধন করেছিলেন উপাসনার জন্য, কেশবচন্দ্র কঠোর সংগ্রাম ও বহু বিস্তৃত মণ্ডলী করেছিলেন উপাসনার জন্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও সাধনাশ্রমের সৃষ্টি উপাসনার জন্য,—সকলের এক লক্ষ্য—সত্যস্বরূপ প্রেমস্বরূপ ভগবানে সরল ব্যাকুল ভক্তিতে আত্মসমাধান, তাঁর সঙ্গে প্রেমযোগসাধন। কাজের আড়ম্বর যতই বড় হোক, উহা এই উপাসনার স্থান নিতে পারে না। কাজ অকাজ, সেবা অসেবা, ধুমধাম পরিহাস—যদি এই উপাসনা একটু সরিয়ে রেখে তা করা হয়, যদি সে সব উপাসনার অনুগত না হয়। আমাদের নানা কাজে যে ঝগড়া বিবাদ, কপটাচার নীচতা প্রকাশ পায়, তার কারণ এখানে। জীবনের সবই কাজ। উপাসনাও কাজ। কিন্তু উপাসনা সব চেয়ে প্রধান ও বড় কাজ, আর সব তার অধীন ও অন্তর্গত। উপাসনার মূল, অন্তরে পরমাত্মার সঙ্গে প্রেমযোগ,—তাহ'তে জ্ঞান শক্তি প্রীতি সেবা সব উৎসারিত হবে। আমাদের সব দুর্গতির মূল, এবিষয়ে শিথিলতা। কাজের আড়ম্বরে আমরা আসল বস্তুতে মন দিতে শিথিলতা করছি। এ বিষয়ে চিন্তার ও আচরণের স্রোত না ফিরালে সমাজের কল্যাণ নাই। সমাজের কর্ত্তৃত্ব ও নেতৃত্ব যাঁরা হাতে নিয়েছেন, তাঁদের দায়িত্ব অসীম। বাঁধা কাজ চালানোই কাজ নয়। আসল কাজ হচ্ছে উপাসনা করা, সকলকে নিয়ে উপাসনা ক'রে মণ্ডলী হওয়া। এই এক কাজের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, সম্পাদকগণ, প্রচারকগণ, জ্যেষ্ঠগণ দায়ী। বাহিরের ঠাট সব বজায় আছে, সভ্যসংখ্যা, চাঁদার পরিমাণ, প্রচারকগণের ভ্রমণের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বেড়েছে, কিন্তু উপাসনা-শীলতা ও মণ্ডলীত্ব বাড়ে নাই। তাহ'লে সব বৃথা।

ব্রাহ্মসমাজ উপাসকমণ্ডলী, তার লক্ষ্য সমবেত হ'য়ে সত্য-স্বরূপের আধ্যাত্মিক উপাসনা করা, নিজেরা ভক্তিরসে সরস হওয়া, সে রসে, সরস হ'য়ে জীবনের কাজকর্ম্ম আচরণ গৃহ পরিবার সব শুদ্ধ ও সুন্দর করা, জগতের সামে স্বর্গরাজ্যের একটি দৃষ্টান্ত মত হওয়া। এই হ'ল প্রধান কাজ, একমাত্র কাজ। এ হ'লে, প্রচার আপনিই হবে। আর এ না হ'লে, সন্তানগণকে এ ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া কঠিন হবে, অপর লোকদের মধ্যে এ ধর্ম্ম প্রচার করার পথ পাওয়া যাবে না।

আমরা, যারা "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটি বিশেষ মণ্ডলীর সভ্য হয়েছি, আমরা উপাসনাকে ধ'রে, উপাসনা ক'রে, ভক্তিরসে র'সে, পরস্পরের সঙ্গে প্রেমযোগে যুক্ত হ'য়ে, এক উপাসকমণ্ডলী হ'তে তৎপর আছি কি না, ও যদি না থেকে থাকি, এ বিষয়ে যদি উদাসীনতা এসে থাকে, তা হ'লে সে অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে, নব উদ্যমে আবার লাগ্‌তে ব্যাকুল কি না; এতে আমার পরিত্রাণ ও সর্ব্ববিধ কল্যাণ, সন্তানদের ও সমাজের মঙ্গল, এ ছেড়ে মঙ্গল নাই,—এ বিশ্বাসে উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'তে মন প্রস্তুত কি না,—তারই উপর সব নির্ভর করছে। উৎসব, সম্মিলন, কনফারেন্স সব ব্যর্থ হয়, যদি

সত্যের ও সংকল্পের সাধনে নিষ্ঠা না থাকে। আমাদের সব বড় বড় আলোচনা, উপদেশ, নির্দ্ধারণ, সেই জন্ত শূন্তে মিলিয়ে যায়। এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না দিলে, পরিবর্ত্তন আসা সম্ভব নয়। উপাসনা কর্‌তে হবে, উপাসনা বিষয়ে প্রসঙ্গ নয়। প্রসঙ্গ বৃথা, যদি উপাসনা না করি। ক্রমশঃ

সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত

---

# অমর কথা (২৬)

## মৃত্যুঞ্জয় স্মৃতি উৎসব

বল জয়, বল জয়,
দেবতার জয়,
অফুরান দান যে গো—
সবই জেগে রয়।
ধূলিমুঠি ল'য়ে খেলা,
জাগরণ-গান,
আশীষ-আলোকে জাগা,—
অমৃত সে দান।

—•—

বল জয়, বল জয়,
জয় শিবময়,
তুমি আমি সব সেথা
হেসে জেগে রয়।
বীজ হোতে ফুল ফোটে,
মরি কি বা চুপে!
ফুটিতে জনম হেথা,
নব নব রূপে।

—•—

সমাধির হিমরূপ
কোথা গেল মোর,
ধন্ত শুভ দিনখানি,—
ভাঙে ঘুমঘোর।
ঘুম ভেঙে গেয়ে উঠি
ধন্ত মহারাজ,
ধন্ত মম জাগরণ,
নব নব সাজ।

—•—

দুখের রজনী শেষ,
হোল অবসান—
সখার বুকেতে জাগি,
এ কি মম মান!
দুখ ভেঙে মনে হয়,
এ তুমি আপন,
দুদিনের খেলা ধুলা,
ভাঙন গড়ন।

—•—

সুর কোথা গাও আজি
দেবতার জয়,
শুভ্ররূপে জাগি সদা
মহা মহিমাময়।
দেবলোকে নিয়ে চলে
পুণ্য মহাগান,
ধন্ত হোল গানখানি
দেবতার দান।

—•—

যেদিন শোকের ভারে মুহ্যমান মানুষ ভালবাসার ধনের, ভক্তের, শবমঙ্গল বুকে ক'রে চোখের জলে আকুল হ'য়ে ফেরে, সেদিন ও-কি বাণী শোনা গেল? কোথায় খোঁজ ধূলি-মুষ্টির ভিতর ভক্তের আনন্দ অস্তিত্ব? ঐ দেখ দেহমুক্ত আত্মা ছুটেছেন ঊর্দ্ধলোকে, অমৃতধামে। কোথায় মৃত্যু? এখন বল ত কে দিয়েছ ব্যথা বুকে যাত্রীর? কে পরিয়েছ কাঁটার মালা? কে মেরেছ ভক্তের বুকে বিষাক্ত শলাকা ঐ যোগ-শুদ্ধ শান্ত কোমল শুভ্র তনুখানিতে? এখন কেন তুমি বিশ্বাসঘাতক চমকে ওঠ আপন মনে?

মৌন সমাধির অন্তরালেই অনন্ত জাগরণ। তাইত দুদিনের খেলা-ঘরে আনন্দোৎসব, তাইত মৃত্যুঞ্জয়ে আনন্দবরণ। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা মৃত্যুবিরহ যত কিছু দুঃখ বেদনা সব কিছু হোতে মুক্ত হ'য়ে আজ যে ভাগবতী তনুলাভ, তাইত আনন্দোৎসব। ভক্তজীবনখানির কি আনন্দে কর্ম্মসাধনা ভগবৎপ্রেরণায়। মানুষের সসীম কর্ম্মদোলায় স্বার্থলীলায় মঙ্গলগান শুনিয়ে চলেন, বিশ্বের শুভসাধনায় সমস্ত উৎসর্গ কোরে আপনভোলা প্রেমগদগদ হৃদয়খানির কি বিচিত্র দেবপ্রভাব! কেন এত রক্তপাত, এত বেদনা সত্যসাধনায়? এমনি কোরেইত দেবসন্তানের রক্তপাতেই জগৎবুকে দেবভাবের জন্মদান; এমনি কোরেইত নির্ম্মম অবিশ্বস্ত পাষাণবুকে ভগভক্তির অনুপ্রেরণার মহা উদ্বোধন। সে মঙ্গলবীজ একদিন কেমন কোরে বিশ্ববুকে অঙ্কুরিত হোয়ে উঠবে কে জানে? এমনি ক'রে সাধুতার নিষ্পেষণ নির্ম্মম পীড়ন যখন দেখে মানুষ, তখন যে আর আশা উৎসাহ থাকে না। পার্থিব ধন ঐশ্বর্য্য সব কিছু যেদিন হারিয়ে যায়, সেদিন আবার চতুর্দ্দিক অন্ধকার। অথচ বিনাশ নাই দেব-আত্মার। আবার জাগরণের পালা, আবার নব প্রভাতে নব উদ্বোধন। যেই দেহের আবরণ চ'লে গেল, তখনই মানুষের কাছে সত্য স্বরূপখানি ফুটে উঠবে। তখনই দেবত্ব সংসারে, তখনই মানুষ বুঝল নিন্দা প্রশংসা জন্ম মৃত্যু কিছুই নয়—সব কিছুর ভিতর দেবত্বের,—মহত্ত্বেরই—জয়। দেবতার আসন তখন হৃদয়ঘরে প্রতিষ্ঠিত হোল, তখন মহাপ্রাণ সাধু জীবনের সত্য পূজা আরম্ভ হোল। এমনি ক'রেই সাধু জীবনের মহৎ আদর্শ ক্ষুদ্র মানবের

বুকে আশার কথা জাগিয়ে দেয়। এমনি কোরেই ব্যর্থ বেদনা পীড়নের ভিতরই সত্য মঙ্গল মন্ত্র জপ ক'রে চলে। এমনি ক'রেই তখন মৃত্যুঞ্জয় স্বরূপতত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়, আর মরণ সাগরপারে অমৃতের আনন্দ-আলো জ্বলে ওঠে। সাধুতার মহান্ আদর্শের ভিতরই তুমি আমি সকলেই মুক্তির সন্ধান করি, শুভ সুন্দর স্বরূপের ভিতর কল্যাণে জাগ্রত হই। তখন আর কি রইল? সকল অশুভ পাপ তাপের ঊর্দ্ধে কেবল জীবাত্মা আর পরমাত্মা, তখন জীবনে উদারতা, প্রেমে বিশালতা, ভগবদ্ভক্তি ভূমা মহানের সর্ব্বব্যাপিত্বের আনন্দ প্রকাশ; তখন আর ক্ষুদ্রে আমার তৃপ্তি নাই, তখন অমৃতেই আনন্দ।

সাধুতায় মঙ্গল আদর্শের ভিতরই একদিন মানুষের কর্ম্ম অবসান হবে, একদিন নবলোকে নবপ্রেরণা নেমে আসবে। কোথায় ধূলি? কোথায় ছাই? চৈতন্যেই আত্মার অস্তিত্ব, চৈতন্যেই অনন্ত জীবনের আভাস।

মৃত্যু নাই, তাইত কল্যাণময়ী বাণী। তোমার দেহ ধূলিসাৎ হবে হউক, ভয় নাই। তুমি চেতনময়ী আত্মা, তোমার মৃত্যু কোথায়? যখন পাপমলিন তখনই মৃত্যু; যেদিন দেহের মৃত্যু হয়, আর ত দৈহিকতার কোন কিছু ব্যর্থ আঘাত এসে পীড়ন করে না! তেমনিই যেদিন অজ্ঞানতার অন্ধকারে জীবাত্মা মলিন, সেদিনই তার কাছে সব কুহকাচ্ছন্ন। সেদিনই তাঁর আত্মসত্তা দুর্ব্বল দীন হীন।

মোহ পাপে অবসন্ন জনেরই অজ্ঞানতায়, মৃত্যুসম অন্ধকারে, সমস্ত আবৃত। যতক্ষণ মানুষের পাশবৃত্তি, স্বার্থলালসা, মোহপাপ, ততক্ষণ এ মৃত্যুবেদনার ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। দেহের মৃত্যুই সত্য মৃত্যু নয়। আত্মবিনাশেই প্রকৃত মৃত্যু। যদি সাধুতা দেবত্ব দেবসাধনার ভিতর বিকসিত হ'য়ে ওঠে, তবে আমার বিনাশ কোথায়? তাইত পাপের উপরে মানুষের তপস্যা সাধনা, তাইত সাধুতাতেই আত্মপ্রসাদ, দেব-আশীর্ব্বাদ-লাভ।

পাপ তাপের অজ্ঞান-অন্ধকারেই আমার দুষ্কৃত কর্ম্মের যথার্থ প্রতিফল। শুভক্ষণে পুণ্যবান মহাত্মার শুভ প্রেরণা মানুষকে যেদিন মুক্তিপথের সন্ধান ব'লে দিয়ে গেল, ধন্য সে দিন, তাঁর সে মহৎ প্রভাব দেবস্বরূপ।

যতই কেন দীর্ঘযাত্রা মনে হউক না, তবুও চল্‌তে হবে। জীবন ক্লান্ত ব্যথিত হোয়েও দেবসন্তানের আনন্দগৌরব রক্ষা কোরতেই হবে। জীবনসংগ্রামের সকল বেদনা দুঃখ বহন কোরতেই হবে। একদিন সব কিছুর অবসান হবে, একদিন মুক্তির সমাচার নেমে আস্‌বেই আস্‌বে, একদিন মৃত্যুমাঝে অমৃতনাম অমৃত লোকে নিয়ে যাবেই যাবে।

ধন্য জীবাত্মা, ধন্য তোমার নীরস দীক্ষা বেদনা সংগ্রাম, ধন্য তোমার নীরব সাধনা তপস্যা, ধন্য তুমি, যদি পরম লক্ষ্য ক'রে থাক সত্য, তা হোলে আনন্দের বুকে বাস ক'রে ধন্য হয়েছ। আর আমি দেখ এখনও ক্ষণে ক্ষণে ক্ষুদ্রে আকৃষ্ট হই, এখনও আমায় কত কলুষ ফাঁকি, তবুও সংগ্রাম করি, তবুও চোখের জলে, অনুতাপের অনলে, ঊর্দ্ধমুখে করপুটে প্রতীক্ষা ক'রে আছি। একদিন দেবতার বরে আমারও নব জীবন লাভ হবে। একদিন আমার কত বিক্ষত রক্তাক্ত হৃদয়েও শান্তির আনন্দধারা ব'য়ে যাবে। যখন অমৃতে জন্ম, অমৃত বিনাশ অসম্ভব।

তাই ত কেবলই সান্ত্বনার কথা। কে তুমি অশান্ত পুত্র-শোকে কাতর পিতা? কেন ধূলিমুষ্টির ভিতর তোমার সন্তানের অস্তিত্ব সন্ধান কর? দৃষ্টি ঊর্দ্ধে স্থাপন কর, দেখ অমৃতময়ে অমৃত সন্তান। আনন্দে স্মৃতিপূজা কর, জীবন ও অমরত্ব একসূত্রে গ্রথিত, যেখানে প্রেম সেখানেই জাগরণ; সকলেই আছেন, সকলেই অমৃতে বাস করেন।

ওগো অভাগিনী পতিব্রতা সাধ্বী সতি! আর দুঃখ নাই তোমার। অমৃতময়ে চল, মৃত্যুঞ্জয়ে বাস কর; তুমিও অমৃতে তিনিও অমৃতে; অমৃতময়ের আনন্দবুকে সকলেই আছি; তাই নিত্য-নবোৎসব, তাই মহাযাত্রায় সকলে আনন্দোৎসব কর।

সকল দুঃখের অবসান হোল, মৃত্যুঞ্জয়ে সকলের অমরত্ব লাভ হোল। জন্ম মৃত্যুর ভিতরে মানবজন্মের সার্থকতা কোথায়? চলেছে অমৃতধামের যাত্রীদল, সকলেই অমৃতের সন্তান, তবে আর কেন নিরাশার গান?

ধরণীর বুকে, কালের মাঝারে,
বাঁধা যে আছিনু দিবস যামি!
মরণ-সখার আশীষ-আলোকে
আজিকে জাগিনু গোপন আমি।
ভয়ে কাঁপে বুক সদা ধুক্ ধুক্,
তাঁহারি মাঝারে উঠিনু জাগি'
সখা যে ডেকেছে স্বরগপুরেতে,
তাইত করুণা-আশীষ মাগি।
পরম গোপন চরম সাধন,
পান করি সুধা অমৃত দান;
মরণ মাঝারে শরণ জেগেছে
সীমার সুরেতে অসীম গান।

---

যত কিছু জমে পাতা রাশি রাশি,
ঢেকেছে সমাধি ধূসর ধূলি,
রূপের মাধুরী ছাই হোল হায়
আঁকিল সে কোন্ মোহন তুলি?
নিমেষে চুকেছে সকল বাঁধন,
মরণ-কুহেলী মিটিল ক্ষণে,
বেদনার বোঝা ফেলে দিয়ে যাই,
চুকিল যা কিছু তাহারি সনে।
স্বরগে উঠেছে জয় কোলাহল,
ছুটিয়া চলেছি সে আহ্বানে,
বিজয়ের মালা দেবলোকে গাঁথে,
তাই আমি ধাই মরণ-পানে।

কার ভালবাসা অনিমেষ পাত
আমায় নেবেগো আসন পাতি',
তাহারি মাঝারে সব জানা হবে
বেদনা ভুলিয়া উঠিব মাতি'।
সৃষ্টির বুকে অসীম যেয়ানে
কোটি ভানু হাসে, আলোকে ধায়,
তারামণ্ডিত পুলকহসিত
বসুধা-জননী সে আলো চায়।
ত্রিদিবের আলো মাখিয়া অঙ্গে,
নিখিল ভুবন পুলকে হাসে,
আমার পরাণে অসীমের খেলা,
তাই দুখ নাশে, আলোকে ভাসে।

---

আনন্দভরা প্রেমের নিঝর,
ক'রে দেখে সে কি বাঁধনহারা?
নিয়ে যাবে মোরে স্বরগদুয়ারে,
ভকতজীবন-আশীষধারা।
অফুরান গান দেবতার হওয়া,
শুভ্রতা আলো অমৃত খনি,
তাই জাগি শুধু আশীষ-আলোকে,
সখা যে রয়েছে হৃদয়মণি।

---

## পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর চত্বারিংশত্তম অধিবেশন।

### ( চট্টগ্রাম )

নানা বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনীর অধিবেশন এবৎসর বিগত পূজাবকাশের সময় ৩০শে সেপ্টেম্বর, এবং ১লা ও ২রা অক্টোবর তারিখে চট্টগ্রাম সহরে সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকাগণ ব্যতীত প্রায় ৭০ জন সভ্য বঙ্গ, বিহার ও আসামপ্রদেশের নানা স্থান হইতে সম্মিলনীতে যোগদান করিবার জন্য এবার চট্টগ্রামে মিলিত হইয়াছিলেন।

৩০শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন প্রার্থনা করিলে পর সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্ব প্রথমে সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ ও শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন সুললিত ভাষায় সমাগত প্রতিনিধিদিগের অভ্যর্থনাসূচক দুইটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় সম্মিলনীর সভাপতি মনোনীত হন। সঙ্গীতান্তে সভাপতির অভিভাষণ। বক্তৃতার প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয় যে সকল পরলোকগত ব্রাহ্ম তাঁহাদের জীবনের মাধুর্য্য ও সেবাব্রতের দ্বারা চট্টগ্রাম সহরে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপরে সম্মিলনীর সভ্য যে সকল ভ্রাতা ও ভগিনী গত বৎসরের মধ্যে পরলোকগমন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও শ্রদ্ধানিবেদনান্তে, বর্ত্তমান অধিবেশনে অধিক সংখ্যক যুবককে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও যাহাতে যুবকগণ, তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্ম-নেতৃবর্গ সমাজের উন্নতিকল্পে যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন ও আরম্ভ করিয়া অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা, তাঁহাদের নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করেন, সে অনুরোধ করিলেন। কারণ, যুবকেরাই ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যত আশা ও ভরসার স্থল।

রাজা রামমোহন রায়ের যুগ হইতে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাবলীর আলোচনা করিয়া সভাপতি মহাশয় প্রদর্শন করিলেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মক্ষেত্র সমস্ত পৃথিবীব্যাপী, ইহা একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ নহে। ব্রাহ্মসমাজের অনেক কার্য্যই এখনও অসম্পন্ন রহিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ একটী পরিধিবিহীন বৃহৎ বৃত্ত। বিশ্বজনীন প্রেম ও পৃথিবীব্যাপী জনসেবাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। আমাদের এই দেশ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক সুসংস্কৃত অনেক মত ও কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও এমন অনেক কার্য্য রহিয়াছে যাহা এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। এগুলি গ্রহণ না করিলে, দেশের কোন কল্যাণই হইতে পারে না। নানা নূতন সমস্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তাহারও সমাধান আবশ্যক।

ধর্ম্মের যে সার্ব্বভৌমিক দিক তাহা এদেশ এখনও স্বীকার করিতেছেন না। সেইজন্য এখনও চতুর্দ্দিকে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের চক্ষের সমক্ষে কত নর নারী প্রতি বৎসর আত্মহত্যা করিয়া জীবন শেষ করিতেছেন। এই সকল দারুণ অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিশালী করিতেই হইবে। শুধু ব্রাহ্মদের ত্যাগধর্ম্মের দ্বারাই ইহা সম্পন্ন হইবার নহে। দেশের এই দুর্গতি দূর করিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমান সকলের সহানুভূতি ও সাহায্য একান্ত আবশ্যক। ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তির মূল এবং সেই শক্তি ব্রহ্মোপাসনার পথ দিয়া মানবাত্মাতে সঞ্চারিত হয়। অতএব ব্রাহ্মসমাজকে এদেশে শক্তিশালী করিতে হইলে, একমাত্র ব্রহ্মোপাসনাই দৃঢ়ভাবে ধরিতে হইবে। ইহার পর সভাপতি মহাশয় আসন পরিগ্রহ করিলে প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সন্ধ্যাকালে ৬॥০ ঘটিকার সময় স্বর্গীয় আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মরণার্থে ব্রহ্মমন্দিরেই একটী সভা হয়। তাহাতে সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের নানা ঘটনার উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন।

পরদিবস বুধবার ১লা অক্টোবর প্রাতের উপাসনায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপরে ৯ ঘটিকায় সম্মিলনীর ২য় অধিবেশনে "ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন" সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

ধীরেন্দ্রবাবু উপাসনান্তে যে উপদেশ দেন, তাহাতে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, এই সংসার মায়া নহে, ইহা শয়তানের রাজত্বও নহে; এই সংসার ভগবানের লীলাস্থল। ব্রহ্মের প্রকাশ

সংসারের মধ্যে যেমন উপলব্ধি করা যায় তেমন আর কোথায় করা যায় না। অতএব ব্রহ্মসাধন করিতে হইলে এই সংসারই তাহার প্রকৃষ্ট স্থান। ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে আলোচনায় ধীরেন্দ্রবাবুর এই উপদেশ অবলম্বন করিয়াই সকলে আপন আপন বক্তব্য প্রকাশ করেন।

যুগধর্ম্মাচার্য্য রাজা রামমোহন রায় এই নূতন আদর্শ ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিতে হয় না। সংসারে আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী পুত্র পরিবার, পরিবৃত হইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে। সভাপতি মহাশয় ধীরেন্দ্রবাবুর এই মতের পোষকতা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত সেন বলেন যে, প্রকৃত সাধনা করিতে হইলে সংসারে থাকিয়া হইতে পারেই না। ধর্ম্মসাধন ও সংসারপালন সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন, তাহা কোনরূপেই একসঙ্গে চলিতে পারে না। অতঃপর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রাণহরি রক্ষিত, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী উক্ত আলোচনায় যোগদান করেন এবং তাঁহারা সকলেই ধীরেন্দ্র বাবুর মতেরই সমর্থন করেন। তদনন্তর সভার কার্য্য শেষ হয়।

পুনরায় অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় প্রচার কার্য্যের আলোচনার্থ সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব বঙ্গের বিভিন্ন জিলায় নমঃশূদ্রদের মধ্যে কি ভাবে প্রচার হইতেছে ও হওয়া উচিত, তাহাই প্রধানতঃ আলোচিত হইল। শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেন, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন ও সভাপতি মহাশয় এ বিষয়ে আপন আপন মত প্রকাশ করিলেন। তৎপরে সর্ব্বসম্মতি ক্রমে ধার্য্য হইল যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিশ্বাসকেই নমঃশূদ্রদের মধ্যে প্রচার কার্য্য করিবার জন্য প্রচারক নিযুক্ত করা হউক। এবং ইহাও ধার্য্য হইল যে, মাধববাবুর আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ সেন সংগ্রহ করিয়া দিবেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেনকে সম্মিলনীর অবৈতনিক প্রচারক নিযুক্ত করিবার একটী প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়। কিন্তু অধিক সংখ্যক সভ্যের মতানুসারে উক্ত প্রস্তাবটীর বিচার করিবার ভার সম্মিলনীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উপর অর্পিত হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন, ও শ্রীহট্টের শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চৌধুরী তাঁহাদের অবসর সময়ে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন।

তদনন্তর ব্রাহ্মসমাজের "নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ" বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ আলোচনা হয়। সভাপতি মহাশয়, নারী-নৃত্য ও প্রকাশ্য অভিনয় প্রভৃতির দ্বারা দেশের কি নৈতিক অধোগতি হইতেছে তাহা বর্ণনা করেন। তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে গত বৎসরের অধিবেশনে এই বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পুনঃ গৃহীত হইল। যথা—

১। ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রত্যেক ব্রাহ্মের ও ব্রাহ্মিকার ইহা একটি প্রধান কর্ত্তব্য হউক যে, তাঁহারা কোন মতেই দুশ্চরিত্র নরনারী কর্ত্তৃক অভিনীত কোন অভিনয় দর্শন করিবেন না বা কুরুচিপূর্ণ কোন চিত্রাভিনয়ও দেখিতে বিরত থাকিবেন।

২। যে সকল ব্রাহ্ম উক্ত প্রকার থিয়েটার ও বায়োস্কোপকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করিয়া অথবা উৎসাহ প্রদান করিয়া সমাজের নৈতিক আদর্শকে হীন করিতেছেন, এই সম্মিলনী তাঁহাদের এই প্রকার কার্য্যের, তীব্র নিন্দা করিতেছেন ও যাহাতে তাঁহারা অবিলম্বে উক্ত প্রকার সংশ্রব বর্জ্জন করেন, তাহার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন।

৩। উক্ত প্রস্তাবদ্বয় কার্য্যকারী করিবার জন্য এই সম্মিলনী ভারতবর্ষের সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে অনুরোধ করিতেছেন যে, যাঁহারা আপত্তিজনক থিয়েটার বা বায়োস্কোপের সহিত কোন সম্বন্ধ রক্ষা করেন তাঁহাদিগকে যেন সমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য বা অন্য কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব ও দায়িত্ব পূর্ণ পদে নিযুক্ত না করেন।

৪। ভারতীয় নারীদিগের মধ্যে নৃত্যের আকাঙ্ক্ষা দ্রুত বর্দ্ধিত হওয়ায় সম্মিলনী অতিশয় ভীত হইয়াছেন ও যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কোন পুরুষ বা নারী উক্ত নৃত্যে যোগ না দেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে এই সম্মিলনী অনুরোধ করিতেছেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার বসু একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি প্রতিজ্ঞাপালন, যথা সময়ে ও যথা-নিয়মে কার্য্য করিবার অভ্যাস, প্রতিবাসী প্রভৃতির প্রতি সদয় ব্যবহার প্রভৃতি কতকগুলি অতি সাধারণ অথচ প্রায় সকলের নিকটই অনাদৃত শিষ্টাচারের উল্লেখ করিয়া, সেগুলির প্রতি সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় মহিলাদের মধ্যে নব প্রচলিত পোষাকের উল্লেখ করিয়া, ব্রাহ্ম মহিলাদের সে বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। যাহাতে ব্রাহ্ম মহিলারা ইউরোপীয় কুপ্রথা অবলম্বন করিয়া কুরুচিপূর্ণ কোন পরিচ্ছদ পরিধান না করেন, তাহার জন্য উপদেশ দেন।

এই বেলা ১॥ঘটিকার সময় স্থানীয় মিউনিসিপাল স্কুল-গৃহে ব্রাহ্ম যুবকদের একটি বিশেষ অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। যুবক-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রণেন্দ্র কুমার দাস গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। উক্ত সমিতি সমস্ত বৎসর যে যে কার্য্য করিবেন বলিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলিই করিতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে, সম্পাদক ব্রাহ্ম যুবক সমিতির নামে কোন সমিতি রাখিবার আবশ্যকতা আছে কি না, সে বিষয়ে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু সময়াভাবে উক্ত প্রস্তাবের চরম নিষ্পত্তি হইতে পারিল না। সর্ব্বশেষে ঐদিন সন্ধ্যায়

ব্রহ্মমন্দিরে "আদর্শ ধর্ম্ম" সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

পরদিন বৃহস্পতিবার ২রা অক্টোবর প্রাতের উপাসনায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তদনন্তর সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশনে "সামাজিক উপাসনা কিরূপে সাধারণের আকর্ষণের বস্তু হয়", এই বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত হয়। এই বিষয়ে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় কলিকাতা হইতে একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বপ্রথমে পঠিত হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার বসু, শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমতী হেমলতা দেবী, শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন আলোচনায় যোগদান করেন ও কি ভাবে উপাসনা সরস হইতে পারে, তাহার নানা উপায়ের কথা বলেন। তৎপরে মধ্যাহ্নে স্থানীয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ ও প্রতিনিধিবর্গ প্রীতিভোজনে মিলিত হন ও পরস্পরের সহিত পরস্পরে পরিচিত হন। অতঃপর বিশ্রামান্তে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় মিউনিসিপাল স্কুলগৃহে সম্মিলনীর শেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে আগামী বর্ষের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ পুনরায় সম্মিলনীর সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। পরিশেষে সায়ংকালে উপাসনান্তে সম্মিলনীর কার্য্য সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সায়ংকালীন উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

রাত্রের উপাসনান্তে আহারাদির পর, কলিকাতার অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নৌকাযোগে বরমা যাত্রা করেন। পরদিন সেখানে মন্দিরে উপাসনা বক্তৃতা কীর্ত্তনাদি করেন। তৎপর দিবস শনিবার পুনরায় চট্টগ্রামে আসিয়া রবিবার ৫ই অক্টোবর কক্স্ বাজার যাত্রা করেন। তথা হইতে মঙ্গলবার তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ঐ দিবস অপরাহ্ণে স্থানীয় সমাজমন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি সান্ধ্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র বসু সকলকে অভ্যর্থিত করেন। জলযোগান্তে সম্মিলনীর শেষ অনুষ্ঠান অতি মধুরভাবে সম্পন্ন হয়।

---

## পরলোকগতা শরৎকুমারী মিত্র।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার ও নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্ম স্বর্গীয় জে এম মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী স্কুলের সর্ব্বজনসম্মানিতা শিক্ষয়িত্রী কুমারী শরৎকুমারী মিত্র গত ৬ই মে রাত্রিতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া বৎসরাধিক কাল ব্রাহ্ম পল্লীতে পৃথক বাড়ী লইয়া বাস করিতেছিলেন। পল্লীবাসীদিগকে এতই ভালবাসিতেন যে, চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করার প্রস্তাব হইলেই বলিতেন, "আমার আর সময় নাই, পল্লী ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।" এখানে যতটা সম্ভব তাঁর চিকিৎসা ও সেবার সুব্যবস্থা হইয়াছিল। পরলোক ও ঈশ্বরের বিধানে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল। শেষ সময়ে তাঁর সেই বিশালদেহ ক্ষুদ্র বালিকার রূপ ধারণ করিয়াছিল; অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রফুল্লমনে পরলোকবাসীদের কথা বলিতেন। শেষ দিন এত যন্ত্রণা হইয়াছিল, এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু যখনই প্রার্থনা করা হইল, স্থিরভাবে প্রসন্নচিত্তে যোগ দিতে লাগিলেন। শ্রীনাথবাবু আসিলেই উপাসনা করিতে বলিতেন। শেষ সময় পর্য্যন্ত জ্ঞান ছিল, কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অভাবে বিদ্যাময়ী স্কুলের ও ব্রাহ্মসমাজের যে গুরুতর ক্ষতি হইল, তাহা সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ যে জীবনকথা বর্ণন করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই :—

১৭বৎসরকাল শরৎকুমারী আমাদের নিকট ছিলেন। তাঁহার যেমন বলিষ্ঠ সুন্দর মূর্ত্তি, তেমনি শিশুর ন্যায় সরল স্বভাব ও স্নেহমমতা ছিল। একদিকে কোমলতা অন্যদিকে তেজস্বিতা তাঁর স্বভাবের বিশিষ্টতা ছিল। গুরুজনে তাঁহার ভক্তি ও বাধ্যতা আদর্শস্থানীয় বলা যায়। তাঁহার ন্যায় সৎসাহস, উৎসাহ ও ধর্ম্মানুরাগ কন্যাদিগের মধ্যে অল্পই দেখিয়াছি। তিনি নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্য জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। সন্তানের জন্য, বিশেষতঃ কুমারী কন্যার জন্য পিতামাতা ও অভিভাবকদের কতই ভাবনা থাকে; কিন্তু শরৎকুমারীর সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।"

ছাত্রীদিগের কল্যাণের জন্য তাঁর কি অসাধারণ প্রচেষ্টাই না ছিল! স্কুলে, বোর্ডিংএ, ছাত্রীদিগের গৃহে গৃহে "মিস্ মিত্রের" নাম সকলের মুখেই শুনা যাইত। অনেকেই তাঁহাকে স্কুলের কর্ত্রী বলিয়া মনে করিত। তিনি ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় কখনও অনুপস্থিত থাকিতেন না। সকল প্রকার সদনুষ্ঠানেই তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখা যাইত। ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রীদিগকে তিনি সমাজে এবং অন্যান্য সভাসমিতিতে লইয়া যাইতেন। তাঁর উৎসাহেই সকলের উৎসাহ হইত। তাঁর মনে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব ছিল না; সাধারণ, নববিধান এবং খৃষ্ট সমাজের উপাসনাদিতেও তিনি শ্রদ্ধার সহিত যোগ দিতেন। কে কি বলিবে, ভাবিতেন না। যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিতেন অম্লানবদনে, নির্ভীক চিত্তে তাহা পালন করিতে যাইয়া তিনি কোন কোন সময়ে অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছেন; কিন্তু তাহাতে একবারও বিচলিত হন নাই। স্কুলের ভিতরে এবং বাহিরে অনেক কঠিন কার্য্যভার তাঁহার উপর পড়িত, তিনি রুগ্নদেহেও শেষ পর্য্যন্ত সে কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। শরৎকুমারী স্কুলহোষ্টেলেই বাস করিতেন, কিন্তু আমাদের দেখিবার জন্য সর্ব্বদাই পল্লীতে আসিতেন, পল্লীর সকলেরই খোঁজ লইয়া যাইতেন; সকলের সুখে দুঃখে তিনি সমভাবে যোগ দিতেন। অনেক দিন অন্ধকার রাত্রে একাকী চলিয়া যাইতেন, অন্যের কষ্ট হ'বে বলিয়া কাহাকেও সঙ্গে লইতেন

না। কোন ভয়ের কথা উপস্থিত হইলে বলিতেন "আমিতো একাকী নই; কোন চিন্তা করিবেন না।" মৃত্যুশয্যায় একদিন তাঁহাকে বলিলাম, "মা! তোমার মনে কি কোন ভয় ভাবনা বা কষ্ট হয়?" তিনি বলিলেন, "কোন ভয় ভাবনা আমার নাই, এখানে যেমন আপনারা আছেন, ওখানে তেমনি অনেকেই আছেন, এইত কতক্ষণ হইল বাবা আমার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, কোন ভয় তোমার নাই, আমরা কাছেই আছি।" একদিন সেবারতা ভগিনীকে বলিলেন, তুমি রাত দিন আমার কাছে থাক কেন? বাড়ীতেও তোমার কর্ত্তব্য আছে। উত্তর হইল, তোমাকে এ অবস্থায় একা ফেলে যেতে পারি না। তিনি বলিলেন, "আমি একা নই, বাবা, ঠাকুমা সর্ব্বদা কাছে আছেন, আজ মাও এসেছিলেন, এখন আমাকে নিয়া যাবেন।"

পরলোক তাঁর কাছে একেবারেই সুস্পষ্ট হইয়াছিল। তাঁর জীবনের প্রধান সম্বলই ছিল প্রার্থনা। তাঁর পিতৃদেব প্রণীত "প্রার্থনা" পুস্তকখানি সর্ব্বদাই কাছে রাখিতেন এবং উহা হইতেই শক্তি ও উৎসাহ লাভ করিতেন। প্রার্থনার বলেই তিনি এমন পুণ্যজীবন যাপন করিয়া গেলেন। "ধর্ম্মবলই বল" এই মহা সত্য তাঁর জীবনে জয়যুক্ত হইল।

## প্রেরিতপত্র

( পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। )

মান্যবর

শ্রীযুক্ত তত্ত্ব কৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন

অনুগ্রহ করিয়া আমার এই পত্রখানি আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিলে নিতান্ত বাধিত হইব।

১। ভক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ইহলোক হইতে প্রস্থানের পর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় তাঁহার একখানি জীবনীসংকলনের জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নানা কারণে তখন আমি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই। পরে তাঁহার অনুরোধ এবং শ্রদ্ধেয় কুমুদনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রেরিত নগেন্দ্রনাথের জীবনীর কিঞ্চিৎ উপকরণ পাইয়া উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব মনে করি। কিন্তু সময় ও সুযোগ অভাবে আমি বহুদিন উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। সপ্তম বৎসর পূর্ব্বে নগেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন। এতদিনেও কোন যোগ্য ব্যক্তি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনন্তকর্ম্মী ত্যাগী এই ভক্ত সাধকের জীবনীপ্রণয়নে হস্তক্ষেপ না করায়, নিতান্ত অযোগ্যতা সত্বেও, অতি সঙ্কোচে অবশেষে আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। এবং যথাসাধ্য শ্রম ও যত্নে সংকলন কার্য্য শেষ করি।

২। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পড়িয়া সংশোধন ও পরামর্শাদি দ্বারা আমার অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে পড়িয়া শুনান হইয়াছে, তিনিও উপযুক্ত পরামর্শ দ্বারা গ্রন্থের উন্নতিসাধনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ। অপর যাঁহারা কোন প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ।

৩। কিন্তু পুস্তকের মুদ্রণের ব্যবস্থা অদ্যাপি হইতে পারে নাই। উক্ত কার্য্যে অন্ততঃ ৫।৬শত টাকা আবশ্যক। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষ যদি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের অনন্তকর্ম্মী অকৃত্রিম সেবকের স্মৃতিরক্ষার জন্য অন্ততঃ দুই শত টাকায় দুই শত পুস্তক লইয়া এই কার্য্যে সহায়তা করেন, তাহা হইলে পুস্তকমুদ্রণের ব্যবস্থা হয়। আমার যে সকল সহৃদয় বন্ধু উক্ত জীবনী প্রকাশে আগ্রহ জানাইয়াছেন, এবং মুদ্রিত হইলে পুস্তক প্রচারের চেষ্টা করিবেন বলিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অথবা অপর কোন সহৃদয় ব্যক্তির বিশেষ সহায়তা ভিন্ন পুস্তক মুদ্রণ সম্ভব নয়। এই কার্য্যে সহৃদয় ব্যক্তিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

গিরিডি, বারগণ্ডা বিনীত

৬।১০।৩০ শ্রীবঙ্কবিহারী কর

## ব্রাহ্মসমাজ

**সভ্যদিগের চাঁদার হার**—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের নিকট নিম্ন লিখিত মর্ম্মে একখানা পত্র প্রেরিত হইতেছে—

শ্রদ্ধেয় ভ্রাতঃ,—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিগত ১১ই সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"যেহেতু বিগত কয়েক বর্ষ হইতে সমাজের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হওয়ায় নানাভাবে সমাজের কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে, অতএব সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধার্য্য হইল যে, সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়দ্বয়কে অনুরোধ করা হউক যেন তাঁহারা সমাজের সমস্ত সভ্যের নিকট যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের বার্ষিক দেয় চাঁদার হার ১৲ টাকা স্থলে অন্যূন ৩৲ টাকা করিয়া দেন, এইরূপ অনুরোধ করিয়া একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করেন।"

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, সমাজের আর্থিক অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। কয়েক বৎসর ধরিয়া, এই ভাবেই সমাজের কার্য্য চলিতেছে। একমাত্র প্রচারফণ্ডেই বৎসরে তিন হইতে চারি হাজার টাকা আয় অপেক্ষা বেশী ব্যয় হইয়া থাকে, মেসেঞ্জারে প্রায় দুই হাজার ও তত্ত্বকৌমুদীতে প্রায় এক হাজার টাকা বেশী ব্যয় হয়। অর্থাভাবে সমাজ হইতে কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদ্য কোন পুস্তকই প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না বলিলেই হয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠানের কার্য্য কিছুতেই বন্ধ রাখা যায় না। নানাভাবে নানাদিক হইতে কার্য্যের আহ্বান আসিতেছে। কিন্তু অর্থাভাবে আমরা সকল দিকে সমান দৃষ্টি দিতে পারিতেছি না। সকল দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে অধিকতর অর্থাগমের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে সভ্যদিগের বার্ষিক দেয় চাঁদার হার বৃদ্ধিই সমাজের আয়বৃদ্ধির একমাত্র উপায়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভা অনেক আলোচনার পর দুই অধিবেশনে সভ্যের নিম্নতম অবশ্য দেয় চাঁদা এক টাকার স্থলে তিন টাকা ধার্য্য করিয়াছেন। এবং আগামী বার্ষিক অধিবেশনে সমাজের সভ্যদের সম্মুখে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া উহা সমাজের নিয়মে পরিণত করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইত্যবসরে আমরা আপনাদের নিকট চাঁদার হার এক টাকা স্থলে অন্যূন তিন টাকা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে কমিটি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছি। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি, সমাজের বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতার বিষয় চিন্তা করিয়া আপনারা সকলেই আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন। অনুগ্রহ করিয়া আপনারা সকলে আপনাদের বার্ষিক দেয় চাঁদার হার বৃদ্ধি করিয়া অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আপনাদের সমাজের অর্থ কৃচ্ছ্রতা ( deficit ) দূর করিয়া দিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। ইতি—

বিনীত নিবেদক
( স্বঃ ) হেমচন্দ্র সরকার
সভাপতি, সাঃ ব্রাঃ সমাজ
( স্বাঃ ) দেবেন্দ্র মোহন বসু
সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সমাজ

**রাজর্ষি রামমোহন স্মৃতি-সভা**—দেওঘর রাজনারায়ণ বসু পাবলিক লাইব্রেরী গৃহে এক স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু বক্তৃতা করেন।

রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে এক স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে মিঃ আর কে রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং মেসার্স এস্ এম্ ভট্টাচার্য্য, আই বি মজুমদার ও এম্ মুখার্জি বক্তৃতা করেন।

ধুবড়ী ব্রহ্মমন্দিরে এক স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসু সভাপতির কার্য্য করেন এবং মিসেস দত্ত, কুমারী লীলা মুখার্জি, কুমারী ইন্দু সেন, শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সরকার প্রবন্ধপাঠ এবং শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত সুখেন্দু দত্ত বক্তৃতা করেন।

বলরামপুরে পরলোকগত সীতানাথ বকসীর নির্দ্দেশানুসারে তথাকার স্কুল গৃহে এক স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রার্থনা ও বক্তৃতা করেন এবং শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল ছায়াচিত্র সাহায্যে "ভারতে ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ" প্রদর্শন করেন।

**শিবনাথ স্মৃতি-সভা**—শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মরণার্থ রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজে ৫ই অক্টোবর বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং শ্রীযুক্ত দেবব্রত চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর রুদ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ধুবড়ী ব্রহ্মমন্দিরে ৩০শে সেপ্টেম্বর স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীমতী সুদেবী মুখোপাধ্যায় সভানেত্রীর কার্য্য এবং কুমারী ইন্দু সেন, শ্রীযুক্ত প্রতুলভানু নাগ, শ্রীযুক্ত অরুণ মুখার্জি, শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন ঘোষ, শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার, শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র দাস বক্তৃতা করেন।

---

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে:—

বিগত ১০ই অক্টোবর মোরাদাবাদ নগরীতে গিরিধি প্রবাসী শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সেনের পত্নী পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ২১শে অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শ্রীরঙ্গ বিহারীলালের কন্যা সতী দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা একান্ত ধৈর্য্যের সহিত বহন করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ২৩শে অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত সুধাকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরোজিনী দেবী একমাত্র পুত্রকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর লাহোর নগরীতে অধ্যাপক মনোহর লালের পিতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই সীতারাম আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে ৫০৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

বিগত ২৫শে অক্টোবর ধুলিয়ান গ্রামে শ্রীযুক্ত আশুতোষ পালের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য ও আশু বাবু প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২৲ ও প্রচার বিভাগে ৩৲ প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

---

**শুভ-বিবাহ**—বিগত ৫ই অক্টোবর জলপাইগুড়ি নগরীতে শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন চন্দের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া রমা ও শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায়ের পুত্র শ্রীমান সুদেবের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

**নামকরণ**—বিগত ২৪শে অক্টোবর, তেজপুরের অন্তর্গত বরজুলী বাগানে শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার মিত্রের প্রথম সন্তানের ( পুত্র ) নামকরণ ও অন্নপ্রাশন ক্রিয়া, উক্ত শিশুর পিতামহ শ্রীযুক্ত প্যারীকান্ত মিত্রের গৃহে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও শিশুর পিতামহ প্রার্থনা করেন। শিশুর নাম অমলকুমার রাখা হইয়াছে। প্যারী বাবু এই উপলক্ষে, শিবনাথ মেমোরিয়ল

ফণ্ডে ৫৲, তেজপুর ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা, ও শিলং ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নব শিশুকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

---

**দান**—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ১৲ দান করিয়াছেন।

এ দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুন।

---

**শারদ ব্রহ্মোৎসব**—স্বর্গীয় রায় প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত বাহাদুরের বাসভবন বেলঘরি "শান্তি নিকেতনে" ১২ই আশ্বিন হইতে ১৪ই আশ্বিন তিন দিবস শারদ ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন। ১২ই আশ্বিন প্রত্যুষে উষাকীর্ত্তন হয়, তৎপর স্বর্গগত রায়বাহাদুরের স্মরণার্থ বিশেষ উপাসনা হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার বাবু তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন ও বরদা বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে মন্দির হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রসন্ন বাবুর দেহভস্ম পারিবারিক স্মৃতিমন্দিরে নীত হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত তড়িৎমোহন গুপ্ত প্রসন্ন বাবুর জীবনের বিশেষত্ব ও শান্তি-নিকেতনস্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন। প্রার্থনান্তে জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার বাবু কর্তৃক দেহভস্ম স্মৃতিমন্দিরে স্থাপন করা হয়। সন্ধ্যার পর পুনঃ উপাসনা হয়। তড়িৎ বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই বেলার উপাসনাও পারলৌকিক ভাবেই সম্পন্ন করা হয়। ১৩ই আশ্বিন প্রত্যুষে উষা কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়। বরদা বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে দুই শতাধিক লোককে আহার করান হয়। সন্ধ্যায় বরদা বাবু কথকতা করেন। ১৪ই আশ্বিন প্রাতঃকালে কীর্ত্তন ও উপাসনান্তে উৎসবের কার্য্য শেষ করা হয়। বরদা বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

---

### সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১। **Theism as Life and Philosophy by Dhirendranath Vedantavagis M. A.**—মূল্য কাপড়ের মলাট ৸৹, কাগজের মলাট ৷৹। ইহাতে ধীরেন্দ্র বাবু পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের মত ও শিক্ষা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। অধিকাংশ স্থলেই তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের লেখা উদ্ধৃত করিয়া তিনি এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তত্ত্বভূষণ মহাশয় নিজেও সমস্ত দেখিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এ কার্য্য যে অতি সুন্দর ভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা পাঠে অনেকেই উপকৃত বোধ করিবেন। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

২। **বণিক**—বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক মাসিক পত্র। ১০ নং বনফিল্ড লেন হইতে এম্ ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। ইহা বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ হইয়া নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ক্রীতদাসের আত্মকাহিনী নামে বুকার ওয়াশিংটনের জীবনী যে ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে তাহা সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকটই সমাদৃত হইবে। মূল্যও অতি সুলভ—৸৹ মাত্র। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

৩। **বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ** (১৯২৯ সাল)। ইহা হইতে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের নানা কার্য্যের বিবরণ জানিতে পারা যায়। ইহা মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

৪। **পূর্ব্ব বাঙ্গালা সম্মিলনীর চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ**—একটু দীর্ঘকাল পরে হইলেও পৃথক পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।

৫। **সংসারধর্ম্ম ও গৃহচিকিৎসা**—শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত। আম্রতলা, পোঃ ছয়ঘরিয়া, জেলা খুলনা হইতে প্রকাশিত। মূল্য কাপড়ের মলাট ৩৲, কাগজের মলাট ২৷৹। ইহাতে সাংসারিক সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তব্য বিষয়ে সংক্ষেপে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। গৃহ চিকিৎসা বিষয়ে একটু বিস্তারিত বিবরণই আছে। অনেকে ইহা হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবেন মনে হয়। স্থানে স্থানে একটু ভাষাগত ভুল লক্ষিত হইল। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধিত হইবে। মূল্য একটু কম হইলে ভাল হইত।

---



ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্তৃক ১৮ই কার্ত্তিক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি·

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ. ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৩শ ভাগ
১৬শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৩৭. ১৮৫২ শক. ব্রাহ্মসংবৎ ১০১
2nd December, 1930.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲


## প্রার্থনা।

হে বিচিত্রকর্ম্মা বিশ্ববিধাতা, তুমি যেমন নানা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া এই জগতকে সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছ, তেমনি বিভিন্ন লোকের দ্বারা বিবিধ উপায়ে তোমার একই মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত করিয়া মানবমণ্ডলীকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর করিতেছ। যদিও তুমি প্রত্যেকের জন্য বিশিষ্ট কার্য্য ও পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, তথাপি পরস্পরের সাহচর্য্যের দ্বারাই সকলে পূর্ণ মঙ্গল ও উন্নতিলাভ করিবে, এরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছ। কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ আমরা সে কথা ভুলিয়া, অনেক সময়ই মনে করি, তুমি আমাদের জন্য যে পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ, তোমার কার্য্যসাধনের সেই একটি মাত্র পথই সকলের জন্যও ব্যবস্থা করিয়াছ, অন্য পথে অন্য উপায়ে কেহ তোমার উদ্দেশ্যসংসাধন করিতে পারে না, উন্নতি ও কল্যাণলাভে সমর্থ হয় না—কেহ কাহারও বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন না করিয়াও যে অপরের নিকট হইতে অনেক শিক্ষা ও সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি তাহা দেখি না, বুঝি না। এই জন্যই আমরা উদার ভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়া সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ি, এবং অহঙ্কারে ডুবিয়া কল্যাণলাভে ও অপরের মঙ্গলসাধনে অসমর্থ হই—সকলকে একই ছাঁচে গড়িবার বৃথা চেষ্টায় শক্তিক্ষয় করিয়া মরি। হে করুণাময় পিতা, তুমি ত তোমার অসীম স্নেহে আমাদের নিকট অতি উদার ধর্ম্মের তত্ত্বই প্রকাশিত করিয়াছ। তবু কেন যে তাহা সকল সময় আমাদের স্মরণে থাকে না, সকল বিষয়ে তাহার অনুসরণ করিতে পারি না, জানি না। তুমি কৃপা করিয়া সকল মোহ-অন্ধকার দূর কর, সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার ও সংকীর্ণতা হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা মুক্ত রাখ। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

---

## সম্পাদকীয়।

**গন্তব্যস্থান এক, পথ বিভিন্ন**—বিভিন্ন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে একই স্থানে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ আছে। কখনও সেগুলি আসিয়া একই রাজবর্ত্মে মিলিত হইয়া, কখনও বা অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াও পৃথক থাকিয়া, গন্তব্যস্থানের একই দ্বারে প্রবেশ করে; আবার, কখনও বা একটু দূরে থাকিয়া ভিন্ন দ্বার দিয়া ভিন্ন দিক হইতে সেখানে উপস্থিত হয়। অনেক সময়ই এই বিভিন্ন পথের যাত্রীদিগের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে শুধু দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয় এমন নহে, একে অন্যের সাহচর্য্য ও বিবিধপ্রকার সহায়তা লাভ করিয়া সহজে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইতেও সমর্থ হয়। সে জন্য যে কাহাকেও নিজের পথ পরিত্যাগ করিয়া অপরের পথে যাইতে হয়, তাহা নহে। আর, সেরূপ পথপরিবর্ত্তন সকল সময় সহজও নয়। অনেক সময়ই নানা খানা খন্দ কাঁটাবন পার হইয়া অনেক কষ্টে তাহা করিতে হয়। তাহাতে যে বৃথা অনেক শক্তি ও সময় নষ্ট হইয়া যায়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং এরূপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই—তাহাতে অকল্যাণ ভিন্ন কল্যাণও নাই। যাহারা এক পথের যাত্রী, তাহাদেরও পরস্পরের মধ্যে অনেক সময় অনেক দূরত্ব থাকিয়া যায়, তাহাদেরও চলনে ও সম্বলে অনেক পার্থক্য আছে,—কেহই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অপরের সঙ্গে এক নয়, প্রত্যেকেরই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তাহাও পরিত্যাগ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই,—সেরূপ কিছু করা সম্ভবপরও নয়, কল্যাণকরও নয়। সকলে যাইয়া গন্তব্যস্থানে মিলিত হইলেই যে সকল পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য চলিয়া যায়, এরূপ মনে করিবারও কোনও কারণ নাই। বিভিন্ন পথাবলম্বী নদীসকল যেমন একই সমুদ্রে পতিত হইয়া, নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া,

আপনাদের পৃথক অস্তিত্ব হারাইয়া, সকলেই এক মহা জলরাশিতে পরিণত হয়, এ ক্ষেত্রে সেরূপ হওয়ার কোনই সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু পার্থক্য থাকে বলিয়াই যে কলহ বিবাদ অমিলও থাকে, অপরকে নিজের পথে আনিবার জন্য, আপনার অনুরূপ করিবার জন্য চেষ্টা যত্ন আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা নহে। পথে থাকিতে অজ্ঞতাবশতঃ অপরকে বিপথগামী মনে করিয়া সে যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিল, তাহাকে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত দেখিয়া নিজের সেই মহাভ্রান্তি হইতে তখন অতি সহজেই মুক্ত হয়,—তাহার আপনার জ্ঞান বুদ্ধির উপর অত্যধিক নির্ভর ও তজ্জনিত অহঙ্কার আর থাকে না।

সংসারে বিপথগামী লোক ও বিরুদ্ধ পথ যে নাই, এমন কথা কেহ বলিবে না। কিন্তু যাহারা প্রকৃত পক্ষে বিপথগামী, অথবা বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়া চলে, তাহারা যে সকলে সকল সময় একই গম্যস্থানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বিপরীত পথে চলে তাহা নহে। স্বাভাবিক অবস্থায় কখনও এরূপ হয় না। তাহাদের অধিকাংশের লক্ষ্যই ভিন্ন, গন্তব্য বিপরীত দিকে। কাজেই বিরুদ্ধ দিকেই তাহাদের গতি। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে কেহ সাময়িক দিক্‌ভ্রান্তিবশতঃ কিছু কালের জন্য আপন লক্ষ্যের বিরোধী পথও অনুসরণ করে, গন্তব্যস্থানের বিরুদ্ধ দিকেও চলে। কিন্তু তাহা হইলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সে ভ্রম দূর হয়, সে আবার গন্তব্যপথেই চলিতে আরম্ভ করে। কিছু পথ চলিলেই, অথবা সূর্য্যোদয়ে রাত্রির অন্ধকার অপসারিত হইলেই, সেই ভ্রান্তি বিদূরিত হয়, দিক্ নির্ণয় সহজ হইয়া যায়। ঠিক ভাবে দিক্ নির্ণীত হইলে, সোজা পথেই হউক আর বাঁকা পথেই হউক, গন্তব্যস্থানে যাইয়া উপস্থিত হওয়া যায়ই, কোনও বাধাই—তাহা যত কঠিনই হউক না কেন—উহা নিবারণ করিতে পারে না। যেখানে কোনও প্রশস্ত পথ নাই, বা জানা নাই, সেখানেও একটা পথ করিয়া লওয়া যায়। কোনও নির্দ্দিষ্ট পথ না থাকা সত্ত্বেও মহাসমুদ্র বা অরণ্যানীর মধ্য দিয়াও মানুষ পথ করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইয়া উপস্থিত হয়। সেখানে কেহই একটা বিশেষ পথ ধরিয়া চলে না, প্রত্যেকেই আপন আপন বিভিন্ন পথে চলে। অথচ সকলেই এক গন্তব্যস্থানেই উপস্থিত হয়।

সকল পথই যে তুল্যরূপে সহজ ও সরল, এমন কথাও নিশ্চয়ই কেহ বলিবে না। কোনটা সোজা, আর কোনটা একটু বাঁকা হইতে পারে। কোনও পথ বাধাবিঘ্নশূন্য সহজগম্য হইতে পারে, আর কোনওটা নানা বাধা বিঘ্নে পূর্ণ দুরতিক্রমণীয়, হইতে পারে। আবার, এক পথই কাহারও পক্ষে অতি সহজ এবং অপরের নিকট অতি কঠিন হইতে পারে। এক স্থান হইতে যাহা সোজা, অন্য স্থান হইতে তাহাই বাঁকা। কাজেই সকলের পক্ষেই যে একই পথ অবলম্বনীয়, বা তুল্য উপযোগী, তাহা কিছুতেই বলা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে সকলের জন্য কোনও পথেরই একটা স্থায়ী নির্দ্দিষ্ট মূল্য স্থির করিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়, তাহার কোন রূপ প্রয়োজনও নাই। যদি বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মূল্যই নির্দ্দেশ করে, তবে তাহাতে কাহারও কিছু যায় আসে না, তাহা লইয়া বিবাদ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। একের নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপরে স্বীকার না করিলেও কোনও ক্ষতি নাই। প্রত্যেকে যখন আপনার নির্দ্দিষ্ট মূল্য অনুসরণ করিয়াই চলিবে, এবং তাহাতেই যখন প্রত্যেকের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, তখন এ বিষয়ে মিল না থাকিবার জন্য কাহারও কোনও অনিষ্টই সাধিত হয় না, বরং মিল করিতে গেলেই ক্ষতি হইবার কথা। প্রত্যেকেই, অপরের অপেক্ষা আপনি নিজে, আপনার প্রয়োজন ভাল করিয়া বুঝিতে পারে। অহংকার বশতঃই মানুষ মনে করে সে অপরের বিষয়ও সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বুঝিতে পারে। ইহা হইতেই যত ভ্রান্তি ও কলহ বিবাদ উপস্থিত হয়।

প্রত্যেকে আপনার সম্বল লইয়াই, নিজের জ্ঞানবুদ্ধি বিচারের আলোক অনুসরণ করিয়াই, পথ চলিতে বাধ্য; তাহাতেই সে সহজে অগ্রসর হইতে পারে, সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। নিশ্চয়ই সে অপরের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিবে, আপনার কোনও ভুল ভ্রান্তি হইল কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, হইলে তাহা সংশোধন করিয়া লইবে। কিন্তু কিছুতেই আপনার সম্বল ও আলোক পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া, অপরের অনুগত হইয়া চলিবে না, তাহাতে কখনও কল্যাণ হয় না,—অনেক সময়ই বিপদে পড়িতে হয়। অপরের সম্বন্ধেও প্রত্যেককে এই নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, এই কথা স্মরণে রাখিয়াই কাজ করিতে হইবে। অপরকে যথোচিত সুপরামর্শ দিতে ও সাহায্য করিতে হইবে বটে, কিন্তু আপনার পথে আনিবার জন্য অযথা চেষ্টা করা কোনও মতেই উচিত হইবে না—নিন্দা তিরস্কার আক্রমণ করা ত নিতান্ত অন্যায়ই হইবে। তাহাতে নিজের ত মহা অনিষ্ট সাধিতই হয়, অপরেরও কোনও কল্যাণ করা যায় না। উৎসাহপ্রদান ও প্রয়োজন হইলে প্রেমের সহিত ভুলপ্রদর্শন দ্বারাই প্রকৃত সাহায্য করা সম্ভবপর। নিন্দা তিরস্কার করিতে যাইয়া ক্রমশঃ অপ্রেম বিদ্বেষের নিম্নভূমিতে না নামিয়া, নিজে আপনার পথে দ্রুত অগ্রসর হইলেই সহজে অপরকে অধিকতর শিক্ষা ও সাহায্য প্রদান করা যায়। নীরব দৃষ্টান্তের দ্বারাই অধিকতর শিক্ষা দেওয়া যায়।

যদিও সাধারণ ভাবে জীবনের সকল ব্যাপার সম্বন্ধেই কথাগুলি সত্য, তথাপি বিশেষভাবে ধর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মসাধনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিষয়টার একটু আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কত বৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহা আমরা সকলেই জানি। পথ বিভিন্ন হইলেও সকল সত্য ধর্ম্মেরই যে লক্ষ্য এক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেও একে অন্যের নিকট হইতে যে অনেক সাহায্য পাইতে পারে, এবং তাহাতে একের অপূর্ণতা অপরের সহায়তায় বিদূরিত হইয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া যে সহজ হয়, সে কথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জগতে ধর্ম্মের নামে যে অনেক অধর্ম্মও প্রচলিত আছে, তাহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। উহা আমাদের আলোচ্য নহে। নানা ভুল ভ্রান্তি

থাকা সত্ত্বেও, সত্যের সঙ্গে অনেক অসত্য মিশ্রিত থাকিলেও, প্রকৃত ধর্ম্মই যাহাদের লক্ষ্য, একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তার দিকেই যাহাদের গতি, শুধু তাহাদের সম্বন্ধেই আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য। এক সময় সকল ধর্ম্মই যে অতি সংকীর্ণ গণ্ডীর সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং বর্ত্তমানে যে তাহাদের সকলেই সে প্রাচীর ভগ্ন করিয়া অনেকটা উদার ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং একে অন্যের নিকট হইতে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করিয়া আপনার পুষ্টিসাধনে যত্ন করিতেছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তথাপি সংকীর্ণতা ও অনুদারতা যে যথেষ্টই রহিয়াছে, বিবাদ বিরোধের যে অবসান হয় নাই, অপ্রেম বিদ্বেষ, একে অন্যকে ছোট করিবার, অপরের উপরে জয়লাভ করিবার, প্রয়াস যে সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই, যে যে-পথেই চলুক না কেন সকলে মিলিয়া পরস্পরের সাহচর্য্যে একই গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হইবার জন্যই ব্যস্ত, তাহাতেই মত্ত ও তৃপ্ত হইয়া চলিবার চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা যে সকলের মধ্যে জাগে নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই পূর্ণ উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল ধর্ম্মাবলম্বীই যে বিভিন্ন মত ও প্রণালী অনুসরণ করিয়াও একই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে, কাহারও পক্ষেই যে আপনার সত্য ও কল্যাণকর পথ পরিত্যাগ করিয়া অপরের পথে যাওয়া আবশ্যক নহে, প্রত্যেকে আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও যে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া, সাহচর্য্যে মিলিত হইয়া, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে পারে, শুধু নিজ সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপরম্পরাগত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে যে কিছুতেই পূর্ণতালাভ করা যায় না, এই মহা তত্ত্ব রাজর্ষি রামমোহনের হৃদয়েই প্রথম উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তিনিই ইহা সর্ব্বপ্রথমে নিজ জীবনে অবলম্বন করিয়াছিলেন, জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি যে উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাও যে কোনও বিশেষ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জন্য কোনও একটি বিশেষ প্রণালীতে মাত্র উপাসনা করিবার জন্য নির্ম্মাণ করেন নাই, সে কথা উক্ত মন্দিরের ট্রাষ্টডিড-পত্র অতি পরিষ্কাররূপেই প্রমাণ করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে যেমন তিনি কোনও বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের উন্নততর ও বিশুদ্ধতর সংস্করণ মাত্র মনে করেন নাই, বলেন নাই, তেমনি কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীই সকলকে অপরিহার্য্যরূপে অবলম্বন করিতে হইবে, এরূপ কোনও আবশ্যকতাও দেখেন নাই, নির্দ্দেশ করেন নাই। এই কথাটা না বুঝিলে, সর্ব্বদা স্মরণে না রাখিলে, প্রমাণিত হইবে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মই গ্রহণ করিতে সমর্থ হই নাই, সত্য ব্রাহ্ম হইতে পারি নাই। সমষ্টিগত ভাবে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ ও ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক ব্রাহ্মসম্বন্ধেই এই কথা সত্য।

আমরা বংশপরম্পরাগত শিক্ষা দীক্ষা প্রকৃতি অনুসারে স্বভাবতঃই আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্ম ও সমাজের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছি, বিশেষভাবে তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কোনও রূপে দূষণীয়ও নয়। কিন্তু আমরা যদি একমাত্র ইহার সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকি, ইহাকেই জগতের সকলের পক্ষে অবলম্বনীয় এক মাত্র পথ বলিয়া মনে করি, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই, উহার উদার উচ্চ ভূমি হইতে বিচ্যুত হইয়াছি—তাহা যে নিতান্তই দূষণীয় ও অনিষ্টকর হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। অপরে যেমন তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের ধর্ম্ম ও সমাজের সঙ্গে এই প্রকার ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকিয়াও, সর্ব্বাংশে আমাদের অনুরূপ না হইয়াও, আমাদের মধ্যে যাহা গ্রহণীয় আছে শুধু তাহা গ্রহণ করিয়াই, সত্য ব্রাহ্ম হইতে পারে, জীবনের পূর্ণতা সাধন করিয়া লইতে পারে, তেমনি আমাদিগকেও অপরের অনেক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতে হইবে, পূর্ণতালাভ করিতে হইবে। ইহা যেমন সমষ্টিগত ভাবে তেমনি ব্যক্তিগত ভাবে সত্য। এ বিষয়ে আমাদের অনেকের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে যথেষ্ট অনুদারতা ও সংকীর্ণতা যে দেখিতে না পাওয়া যায়, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। আমাদের সমষ্টিগত জীবন ইহা হইতে বহু পরিমাণে মুক্ত থাকিলেও, তাহার উপর যে ইহার কোনও প্রভাবই বিস্তার লাভ করে নাই, বা করিবে না, এরূপও বলা যায় না। কাজেই এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে—তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সাধারণ ভাবে আমাদের মত লক্ষ্য ও সাধনপ্রণালী এক হইলেও, তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যের যে যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। এই পার্থক্য যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির, তেমনি সমগ্র সমাজের, পক্ষে অপরিহার্য্য রূপে আবশ্যক ও কল্যাণকর, তাহাও স্বীকার করিতেই হইবে। বাস্তবিক কে যে কোন পথে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এমার্সন সত্যই বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে যখন জীবন আসে তখন তাহা কোনও অভ্যস্ত বা সুপরিচিত পথে আসে না। তাহার মধ্যে কোনও মানুষের পদ-চিহ্ন দেখা যায় না। উহা সম্পূর্ণ নূতন ও অদ্ভুত। প্রত্যেকে যে আপনার আলোক অনুসরণ করিয়াই চলিতে বাধ্য, তাহাতেই যে তাহার উন্নতি ও কল্যাণ, সে কথাও কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। প্রত্যেকে যে আপনি যাহা বুঝিয়াছে ও জানিয়াছে, তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব ও পথ বলিয়া মনে করিবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সর্ব্বদা নূতন সত্য গ্রহণের জন্য হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত রাখিলে এবং ভুল ভ্রান্তি সংশোধনের জন্য প্রস্তুত থাকিলে, ইহা কিছুমাত্র দূষণীয় হইতে পারে না, ইহাতে কোনও প্রকার অনিষ্টের কারণ ঘটে না। কিন্তু যখন মনে করা হয়, ইহার বাহিরে আর কোন সত্য নাই, ইহার মধ্যে কোনও ভুল ভ্রান্তিই লুক্কায়িত থাকিতে পারে না, কোন দিন কাহারও নিকট উন্নততর মহত্তর কিছু প্রকাশিত হইবার কোনও সম্ভাবনাই নাই, সকলকে একমাত্র ইহাই মানিয়া অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, অপর কাহারও সম্বন্ধেও তাহার নিজের নিকট কোনও অংশে ভিন্ন প্রকারের কিছু প্রকাশিত হইতে পারে না, তাহা হইলে উহা যে নিতান্তই অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়,

তাহাতে যে অত্যধিক অহঙ্কার ও সংকীর্ণতাই প্রকাশ পায়, তাহা অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। আমাদের জ্ঞান যতই উন্নত ও বিকশিত হউক না কেন, তাহা যে নিতান্তই সীমা-বিশিষ্ট, অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের অতি ক্ষুদ্র একটু অংশ মাত্রই আমরা আয়ত্ত করিতে পারি, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অনন্ত-স্বরূপ বিশ্বনিয়ন্তার অসংখ্য স্বরূপের প্রত্যেকটির মধ্যে যে অনন্ত সিন্ধু নিহিত রহিয়াছে, সুতরাং তাহার মধ্যে গভীর ভাবে ডুবিলেও পরস্পরের জ্ঞান ও ধারণার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য যে থাকিতে পারে, মূলে কোনও বিরোধ বা অমিল না থাকিলেও যে সর্ব্বাংশে এক হইতে পারে না, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেককে আপনার পথে চলিবার স্বাধীনতা দিতেই হইবে, তাহা না দিলেই অন্যায় হইবে। অজ্ঞতা ও অহঙ্কারের মোহান্ধকারে আবৃত হইয়াই আমরা এই সহজ সত্যটা দেখিতে পাই না। কেহ যখন এ সম্বন্ধে নিঃশেষে কিছু জানিতে ও বুঝিতে পারে না, তখন এ ক্ষেত্রে সকলের নিকট হইতে কিছু না কিছু সাহায্য আমরা প্রত্যেকে পাইতে পারি। এই কথা স্মরণে রাখিয়া চলিলেই আমাদের কল্যাণ, তাহাতেই আমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে। কোনও এক ঋষি বা মহাপুরুষের তত্ত্ব ও ব্যাখ্যাও যে সকল সময় গ্রহণীয় ও কল্যাণকর বিবেচিত হইতে পারে না, একটা দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা সহজে বুঝিতে পারা যাইবে। "অসতো মা সদ্গময়," ইত্যাদি যে মন্ত্র আমরা আমাদের সাধারণ প্রার্থনা রূপে গ্রহণ করিয়াছি, তাহার যে ব্যাখ্যা বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রদত্ত হইয়াছে সেই সঙ্গে যদি আমরা যে অর্থে উহা ব্যবহার করি তাহা তুলনা করি, তবে সহজেই বুঝিতে পারি উভয়ের মধ্যে কি গুরুতর পার্থক্য। কোনও প্রকারেই বৃহদারণ্যকের ব্যাখ্যা কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে না।

এই ক্ষুদ্র আলোচনা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি, বিভিন্ন লোক কত বিভিন্ন পথে একই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে, কত বিভিন্ন সাধন অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে,—আমাদের মিথ্যা অহঙ্কারপ্রসূত অনুদারতা ও সংকীর্ণতা সকলের পক্ষেই কি প্রকার অনিষ্টকর। আমাদের সকলের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হউক, আমরা সতর্ক ও সাবধান হই। আমাদের সকল অহঙ্কার ও অনুদারতা বিদূরিত হউক।

## ব্রহ্মোপাসনা।

আজ বহুদিন পরে "চল ভাই, সবে মিলে যাই, সে পিতার ভবনে" ইত্যাদি সঙ্গীতটি শুনিলাম। কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাদের আলোচনা হইতেছিল, কোথায় গেল সেই ভক্তির যুগ, দীনতা-বোধের যুগ, যেদিন এই সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। অন্তরে যেন সেই আর্ত্ত ভাব, তাঁহার কৃপা ভিন্ন গতি নাই এই ভাব, প্রাপ্ত হই। তাহা ব্যতীত সেই পুরুষোত্তমের চরণে উপনীত হইতে পারি না। অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন পাপ চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল আনন্দের কথাই ভাবিতে হইবে, বলিতে হইবে। এ বিষম ভ্রম।

আক্ষেপের বিষয়, ব্রাহ্মসমাজ এখন আর সেই উপাসকমণ্ডলী নাই। কোথায় গেল সেই দিন যে দিন "ব্রাহ্ম" অর্থই ছিল উপাসক? এখন কয় জন ব্রাহ্মকে উপাসনার স্থলে দেখিতে পাই? এখন ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত উপাসক বেশী নাই। ইহা বড়ই আশঙ্কার কথা।

যে সময় ভক্তিভাব জলপ্লাবনের ন্যায় আসিয়াছিল—কতক নিজ চক্ষে দেখিয়াছি, কতক অন্যের মুখে শুনিয়াছি—দারুণ বেদনাবোধের পর কৃপা বর্ষিত হইল, এই ভাব প্রাণে আসিল যে তিনি ভিন্ন গতি নাই, তাঁহার কৃপা ভিন্ন উপায় নাই, সেই সময় এই সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল—"আমার গতি কি হবে, যদি পাতকী বলিয়ে ত্যজিবে, তবে"। তখন দীনতা ও অনুতাপ আসিয়াছিল; তাহার ফলেই সেই দীনবন্ধুর চরণ হইতে কৃপার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। কেমনে আবার সেই যুগ ফিরিয়া আসে?

ব্রাহ্ম অথচ উপাসক নয়, ইহা অপেক্ষা আশঙ্কার কথা আর নাই। আমাদের নিয়ম আছে, মাঘোৎসবের সময় একদিনে ব্রাহ্ম-সমাজের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা হয়। একদিন প্রার্থনা করিবেন, আর ৩৬৪ দিন কি করিবেন? এই ব্রাহ্মসমাজ কি আমাদের পরিবার নয়? ইহার জন্য প্রতিদিনই প্রার্থনা করিতে হইবে।

এ কথা সত্য যে, অনেক সময় অযাচিত ভাবেই ব্রহ্মের কৃপা আসে। কিন্তু সাধারণ নিয়ম, Ask and its shall be given unto you—প্রার্থনা কর, পাইবে। কোথায় সেই প্রার্থনা? তোমা ভিন্ন গতি নাই, এই ভাব কয় জন ব্রাহ্মের হৃদয়ে আছে? আজ কাতর ভিক্ষার—ব্যাকুলতার—যুগ ফিরিয়া আসুক। 'ব্রাহ্ম' অথচ উপাসক নয়, এই দুর্দ্দিন দূর হউক। আমরা অতি দীন হীন, তাঁহার চরণে মাথা না রাখিতে পারিলে আর গতি নাই, এই ভাব আসুক। ব্রাহ্ম অথচ উপাসকমণ্ডলীর সভ্য নয়, সভ্য থাকিলেও নামে মাত্র, উপাসনায় দেখা যায় না, এই ভাব দূর হউক। যখন ব্যাকুল ক্রন্দনের রব উঠিয়াছে, তখন কৃপাধারা বর্ষিত হইয়াছে, অমৃতধারা আসিয়াছে। যাহারা ব্যাকুল নয়, তাহারাও সেই অমৃতের আস্বাদন পাইয়াছে। এক এক সময় মনে হইয়াছে, অমৃতধারা প্রবাহিত হইতেছে, জিহ্বা যায়া লেহন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। ব্যাকুলতার ফলেই কৃপা বর্ষিত হয়। আর গতি নাই—ব্যক্তিগত ভাবে, সামাজিক ভাবে, গতি নাই—এই ভাব আমাদের সকলের মধ্যে আসুক।

বহুদিন এই সঙ্গীত শুনি নাই, শুনিয়া আনন্দ হইল—"শুনেছি নাকি তাঁর বড় দয়া দুখী তাপী কাঙ্গাল তরে।" সে দিন এক প্রেমাস্পদ ভ্রাতা বলিলেন, আগে এই সঙ্গীতে উৎসব আরম্ভ হইত। তখন আরও একটি সঙ্গীত অনেক সময় শুনিতে পাওয়া

২৩শে মার্চ্চ, ১৯৩০, তারিখে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর বিশেষ উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় কর্ত্তৃক নিবেদিত।

যাইত—"এমন দয়াল নামসুধারসে আমার মন কেন না মজিল রে," "আমি না জানি কোন্ অপরাধে, না মজিল রে।" আমাদের অপরাধেই মন মজে না। সে ব্যাকুলতা আসুক, সে ক্রন্দনের রোল উত্থিত হউক। দীননাথ, দীনবন্ধু, পতিত-পাবন, আমরা তোমার নাম শুনিয়া আসিয়াছি, তুমি সর্ব্বলোক-পরমশরণ, এই নাম শুনিয়া আসিয়াছি, কৃপা করিয়া আমা-দিগকে তোমার অভয়পদের জন্য ব্যাকুল কর। দীনভাবে কাতর প্রাণে তোমার চরণে পড়িবার আকাঙ্ক্ষা দেও। এই কৃপা তাঁহার চরণে সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করি।

এক এক সময় এই প্রশ্ন শুনিয়াছি—"ব্রহ্ম আছেন স্বীকার করি, কিন্তু সেই অসীমের পূজা কিরূপে সম্ভব এবং তাহার আবশ্যকতাই বা কি? আমরা তাঁহার কৃপায় নীতিজ্ঞান পাইয়াছি। লোকের হিতকামনা কর, অভাব মোচন কর, দুঃখ দুর্দ্দশা দূর কর, এইত ধর্ম্ম! পূজার কোনও প্রয়োজন নাই।" এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ধর্ম্ম পান নাই, ব্রাহ্ম নহেন, ব্রহ্মকে জানেন নাই। তাঁহাকে জানা ও পূজা করা একই কথা। পূজা ব্যতীত জানার কোনও সার্থকতা নাই। মানুষের প্রাণ essentially dualistic—মূলতঃ দ্বৈতভাবাপন্ন—আপনাকে লইয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, একজনকে না একজনকে প্রাণ দিতেই হয়। ইহার বিকার দেখা যায়। প্রাণ অন্যকে দিয়াছে—তাহাকে প্রেম বলা যায় না—যাহাতে সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-পিপাসা সম্বন্ধে জ্ঞানী ব্যক্তির কথা—যদি সেই মধুরতার সন্ধানই না পাইলাম, তবে ত মৃত্যু। সেই এক—তিনি মরণাতীত, পাপাতীত, শান্তং শিবং,—আমার অন্তরেই রহিয়াছেন। আর কোনও স্থানে তাঁহাকে ধরিতে না পারি, এখানে ধরিয়াছি যে, তিনি শাসন করিতেছেন, আঘাত দিতেছেন। সেই আঘাত তাঁহার আশীর্ব্বাদ, তাঁহার কৃপা। তিনি অন্তর্য্যামী, অন্তরস্থিত শাসনকর্ত্তা।

একবার একটি ভদ্রলোক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে বলেন, "যাহাতে জগতের হিত তাহাই ধর্ম্ম,—যাহাকে utilatarianism (হিতবাদ) বলে—তাহাই করিব, আর কিছু করিবার প্রয়োজন কি? ইহার মধ্যে ভগবানের স্থান কোথায়?" তিনি এক কথায় তাহার উত্তর দিলেন। অনেক প্রশ্নের এক কথায় উত্তর হয়। লাপ্লাসের এই অহঙ্কার ছিল, জগতের কোন কর্ত্তা নাই, সব আপনিই হইয়াছে। নেপোলীয়ান আকাশের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, Who made all that—এই সমস্ত কে সৃষ্টি করিল? লাহিড়ী মহাশয়ও সেরূপ বলিলেন, "আচ্ছা, রায় বাহাদুর, blush কর কেন?" যখন কোনও অপরাধ করেছ, লজ্জায় মুখ লাল হয় কেন?" আর উত্তর নাই। ধরা পড়িয়াছ এই এখানে। তিনি শাসন করিতেছেন। তাঁহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু পাই পাই, হারাইয়া ফেলি যে! ইংরাজীতে যাহাকে বলে an elusive grasp, ধরিয়া রাখিতে পারি না, হাত ছাড়াইয়া যেন চলিয়া যায়। ইহাই ঘোর দুঃখের বিষয়।

প্রাণে একটা ভাব আসিতেছে—যিনি শাসন করেন, তিনিই পুরস্কার দিবেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে যে শাসন-প্রণালী গঠিত হইল তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া Burke বলিয়াছিলেন—"তোমাদের রাজার দণ্ড দিবার অধিকার আছে, পুরস্কার দিবার অধিকার নাই,"—যিনি রাজা তাঁহার পুরস্কার দিবার অধিকার থাকা নিতান্ত আবশ্যক। বিশ্বপতির অসীম ক্ষমতা, তিনি যেমন দণ্ড দিতে পারেন, সেইরূপ অপরাধ ক্ষমাও করিতে পারেন; তাঁহার প্রকাশ রূপ বচনাতীত আনন্দ দিয়া তিনি পাপদগ্ধ প্রাণকে ভূমানন্দ দান করেন। তিনি দেখা দিয়াছেন, ক্ষীণ আভাস দিয়াছেন। তাঁহার কামনাহরণ রূপ দেখাইয়াছেন; তাঁহাকে দেখিলে আর অন্য রূপ দেখিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাঁহার আত্মহরণ রূপ যখন প্রাণে প্রকাশিত হয়, তখন বলিতে ইচ্ছা হয়, আর কিছু চাহি না, কেবল তোমার চরণে আপনাকে চিরদিনের মত সমর্পণ করিতে চাই। যাঁহারা বলেন যে উপাসনার প্রয়োজন নাই, তাঁহাদিগকে বলি—উপাসনা কর, তখন দেখিবে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা কর কি না।

মাটীর পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলা সহজ। অন্তরে অনেক দেবতা রহিয়াছে, সে সকল দূর করা কঠিন। সেণ্ট পল বলিয়াছেন, this is idolatry—ইহাই পৌত্তলিকতা—সংসারের ক্ষুদ্র বাসনা কামনার সেবা করাই পৌত্তলিকতা। দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, অন্ন কে অন্তরের ক্ষুধা নিবারণ করিবে? যিনি ক্ষুধা দিয়াছেন তিনিই অন্ন দিবেন। "নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে।" সেলী বলিয়াছেন, Love's sad satiety—প্রেমের বিষাদময় ভোগাধিক্যপ্রসূত বিতৃষ্ণা। প্রেমে পাগল হইলাম, যাহাকে চাহিয়াছিলাম পাইলাম, কিন্তু আস্বাদনের পর আর আস্বাদনের ইচ্ছা থাকিল না,—তাহা থাকে না চলিয়া যায়, বিতৃষ্ণা জাগে, অন্য ইচ্ছা, অন্য তৃষ্ণা উপস্থিত হয়। অনন্তস্বরূপ ব্যতীত আর কিছুতেই ইচ্ছা কামনা দূর হয় না, পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

কয়েকদিন্ পূর্ব্বে পাঠ করিয়াছিলাম, Oh God, I see thy glory in the flower that bloometh only for a day—হে ভগবান, যে ফুলটি কেবল একদিনের জন্য ফোটে তাহার মধ্যে তোমার মহিমা দর্শন করি।

জেমস্ ফ্রীম্যান ক্লার্ক পরমপুরুষের রূপের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, that ever floateth before the eye of the mind—যাহা সর্ব্বদা মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া বেড়ায়। ইহারই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, the beauty that the eye hath not seen nor the ear heard of—সেই সৌন্দর্য্য যাহা চক্ষু কখন দেখে নাই, শ্রবণ শোনে নাই। তাঁহাকে জানিলে আর কে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে? অন্ততঃ অনুসন্ধিৎসা হইতেও উপাসনা আরম্ভ কর, দেখ ইহার মধ্যে কি অমূল্য সম্পদ্ আছে। বৈষ্ণব সাধু পরশমণি জলে ফেলিয়া দিয়াছেন শুনিয়া ব্রাহ্মণ সেই ধনের জন্য ব্যাকুল হইলেন যাহা পাইলে পরশমণিও অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়।

নিজের নানা অপরাধ স্বীকার করিয়াও বলি, জানিয়াছি সেই বচনাতীতকে, পরম সুন্দরকে। কেমন করিয়া বচনাতীত সৌন্দর্য্য প্রাণে ফুটিয়া উঠে কেহ বলিতে পারে না। যে ফুলটি

প্রতিদিন দেখিতেছি তাহার মধ্যেই একদিন অপূর্ব্ব সুষমা দর্শন করি, তাঁহার সৌন্দর্য্যের আভাস পাইয়া ডুবিয়া যাই। Jacob Behmen একটা pewter pot—সামান্য চা খাইবার বাটী—তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব জ্যোতির প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার প্রাণ অদৃশ্য রাজ্যে চলিয়া গেল। উপাসনা না করিলে তাহার মূল্য বুঝিতে পারা যায় না।

সকল হৃদয়ে উপাসনার ভাবটি কি প্রকারে জাগে, এইটি মহা চিন্তার বিষয়। ব্রাহ্মসমাজ এক, আর উপাসক মণ্ডলী অন্য, ইহার তুল্য বিপদ নাই।

ক্রমোয়েল মেয়েকে লিখিলেন, "তোমার স্বামীকে যে ভালবাসিবে তাহার মধ্যে খৃষ্টকে দেখিয়া ভালবাসিবে, খৃষ্টের জন্য ভালবাসিবে।" অর্থাৎ তাহার মধ্যে ভগবানেরই প্রকাশ দেখিতে হইবে। ইহা আমাদের যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির প্রসিদ্ধ উক্তিরই অনুরূপ বাক্য।

আমি উপাসনার ব্রত পালন করিতে একদিনও বিরত হইব না, এই নিষ্ঠা আবশ্যক। বোম্বাইয়ের লালশঙ্কর উমিয়শঙ্করের সাদর নিমন্ত্রণে নাসিক নগরে তাঁহার গৃহে গেলাম। তাঁহার নিষ্ঠার কথা শুনুন। তিনি আনন্দে বলিলেন, "আসুন, আমরা সকলে উপাসনা করি।" বাগানে উপাসনা হইল। তাহার পর বলিলেন, "এখন আমার নিজের উপাসনাতে বসিতে হইবে।" এরূপ নিষ্ঠা কোনও মহিলার মধ্যেও দেখিয়াছি। তিনি এখনও জীবিত। প্রাতে পারিবারিক উপাসনা আমি করিলাম। তাহার পর তিনি বলিলেন,"এখন নির্জ্জনে বসিতে হইবে, আমার নিজের উপাসনা করিতে হইবে।

উইলবার ফোর্স প্রথম বয়সে অসাধু জীবনই যাপন করেন। পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিবার পর এক clergyman (ধর্ম-যাজক) এর সঙ্গে ইউরোপে বেড়াইতে গেলেন। সাধুসঙ্গে জীবন পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি ছেলেকে লিখিলেন—"তুমি পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইও না, পড়া শুনা করিবে, অন্যের উপরে উঠিবার জন্য নয়, কর্ত্তব্যের জন্য। It is a besetting sin to wish to be praised by others—অন্যের দ্বারা প্রশংসিত হইবার ইচ্ছা গুরুতর পাপ ইহা আমাদিগকে সর্ব্বদাই ঘেরিয়া রহিয়াছে।"

এই অন্তরমুখী জীবন লাভ করা বড় কঠিন। একটি উপায় উপাসনার ব্রত নিয়মিত পালন করা।

এমার্সন বলিয়াছেন—"The wish to shine (যশস্বী হইবার আকাঙ্ক্ষা) ছাড়িতে হইবে।" দীনতার ভাবে পূর্ণ হইতে হইবে। তিনি শাসন করিতেছেন, এই আশা। শাসন করুন। তাহাতেই অসীম আশা—"এমন দিন কি আমার হবে, তোমার জন্য সকল স'বে? তবে সে অসম্ভব হইলে, করুণা তোমার"।

দয়াল পিতা, আমাদিগকে পৌত্তলিকতা হইতে উদ্ধার কর। তোমার চরণে আমাদের মতি হউক। নিরাশার অন্ধকারে পথ চাহিয়া থাকি। তুমি আশার আলোক দেখাও। বেদনার পর বেদনার মধ্যে তোমার দিকেই চাহিয়া থাকি। প্রেম দেও, বিশ্বাস দেও। হৃদয়ে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার পুণ্য নাম গীত হউক এই আমাদের প্রার্থনা, অন্তরের আকাঙ্ক্ষা।

"কাতরে তোমায় ডাকি দয়াময়, হইয়ে সদয় দেও দরশন;
পুরাও মনোসাধ, ঘুচাও হে বিষাদ, ভক্তি-উপহার করিয়ে গ্রহণ।"

## অমর কথা (১৮)

### জীবন এবং অমরত্বের যোগ

ফুরিয়ে এল রূপের খেলা,
ঘণ্টা বাজে ঐই,
এবার আমি উঠ্‌ব জেগে
সবার বুকে ওই।
ভবের খেলা পাগল দোলা
ক্ষণিক মোহ দোল,
মুক্ত হ'য়ে গাইব আজ,
বোল হরি বোল।
পাপের কথা ফুরিয়ে গেল,
দেহের সাথেই লয়,
বিদায়-দিনে অশ্রুধারা
আপনা মনেই রয়।
ধূলির দেহ ধূলায় গেছে,
সবার সাথে জাগি,
তারই মাঝে বুক ভরেছে
আপন ঘরের লাগি'।

চোখের পরে স'রে গেল
যবনিকা কার,
তারই সাথে নামছে বুকে
মন্দাকিনী-ধার।
তারই সাথে খুলে গেল
যত মোহ ঘোর,
তারই সাথে নিন্দা গ্লানি
উধাও হোল মোর।
লুকিয়ে ছিল যতেক কিছু
দেহের খেলা-ঘরে,
জীবন-কমল উঠ্‌ল ফুটে
নব জীবন বরে।
মুক্ত পাখী চিদাকাশে
আনন্দেতে ধায়,
উঠ্‌ছে জেগে প্রেম-আলোকে
শান্তি মহিমায়।

———•———

সীমার বুকে ওগো বঁধু,
এমন দোলা দোল!

ক্ষুদ্র আমি, কেন তবে
এত মহা রোল ?
খুঁজে মরি দিন রজনী
কিসের তরে হায়,
মনগোপনে অমরধামে
মিল্‌তে সেথা চায়।
জানি সখা, নেবে মোরে
নিত্যচেতন-পুরে,
অমৃত নাম উঠ্‌ল বেজে
সকল সুরে সুরে।
তোমার মাঝে আমার জাগা,
তাইত নেবে ঘরে,
হেসে কেঁদেই আছি জেগে,
নিত্য মিলন তরে।

——•——

নাইক শেষ আদি অন্ত
তোমার করুণ ধারা,
তারই মাঝে নিত্য দোলা,
চিত্ত পাগলপারা।
কে গাইবে তোমার, সখা,
নিত্য পূজার গান ?
দেবলোকে জয়ধ্বনি
আনন্দেরি দান।
দীনের ভাষা হার মেনেছে
দানের মহিমায়,
তোমার আলো হাস্‌ছে বুকে
স্বরগসুষমায়।
চন্দ্র সূর্য্য তারার আলো
হাসে আলোকপাতে,
জ্যোতির্ম্ময় প্রাণ ব্রহ্মে
অমরসত্তা মাতে।

এক একটী বৎসর এক একটী ক্ষণিক মুহূর্ত্তেরই সমাবেশ। এই যে অনন্তকালের ভিতর এই যে জীবনের কালস্রোত দেখ্‌তে দেখ্‌তে চ'লছে। যখন বৎসর চ'লে যায়, কত কাল চ'লে যায়, তখন মনে হয় এইত মুহূর্ত্ত। এই যার বর্ত্তমানতা, এক পলকেই তার তিরোধান, যা গেল অথচ তা ত আর ফি'রে আস্‌বে না।

দিন চলেছে দ্রুত গতিতে, এই একদিন, এই আর একদিন, আর একদিন চলেইছে। অথচ প্রতিমুহূর্ত্ত এক পলকেই শেষ হয়। যাকে সপ্তাহ বলি, মাস বলি, বৎসর বলি, তায় ত ঐ মুহূর্ত্তেরই ভিতর অস্তিত্ব।

যা কিছু দেখি কেবলই পরিবর্ত্তন, অথচ যা কিছু তার প্রাণসত্তা তা ত ঠিকই আছে। হাজার হাজার বৎসর যা ছিল এখনও তাই আছে। যা পরিবর্ত্তনশীল তারও প্রাণসত্তা অপরিবর্ত্তনেই অনুপ্রাণিত। যা কেবলই চঞ্চল গতিশীল প্রকাশ, তারও স্থিতির ভিতরই প্রাণপ্রতিষ্ঠা। আমি কালকে মুহূর্ত্ত, সপ্তাহ, মাসে নামাঙ্কিত করি। এ ত মানবীয় জ্ঞানেরই বিভিন্ন সত্তাদান। বাস্তবিক এ কাল যে অনন্ত অখণ্ড কাল। এই যে ঋতুর পরিবর্ত্তন, এ ত এই সৌরমণ্ডলের বিচিত্র গতিরই বিচিত্র প্রকাশ—এই যে অখণ্ডকাল, অপরিবর্ত্তনীয় কাল।

যত কিছু বস্তুর বিভিন্ন স্বরূপ, সবই কার্য্যকারণসাপেক্ষ, একে একের সঙ্গে যোগ, সবাই একে পরিচিত। এক বিশ্বে সবই এক মণিহারসূত্রে গ্রথিত। দুটি বিভিন্ন ব্যবস্থা নাই, বিভিন্ন সত্তাও নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম্ সেই এক ভূমা জ্ঞানের ভিতরই সকলের স্থিতি। বিভিন্ন সত্তাস্বরূপের ভিতরই এক প্রাণসূত্র। সব একেরই অংশ, সব কিছু স্রষ্টা পাতা বিধাতা সেই এক পুরুষ মহানেরই বিচিত্র ছবি। আবার প্রত্যেক বস্তু অবিনাশী ভাবে পরস্পরে যোগযুক্ত। কালও অনন্ত যখন, তখন এক কালেই স্থিত দুটী জগৎসত্তার স্বাধিত্বসম্ভাবনা কেমন করিয়া হবে ?

আজ যে আনন্দসম্ভোগ, কাল তাহাতে বিভিন্ন ভাব কেমন ক'রে হবে ? যখন এক কালেই সব আবদ্ধ, কেবল রজনীর ঘন অন্ধকারমধ্যে বই ত নয়। যখন শরতে বৃক্ষলতাদির নবপত্র জীর্ণ হ'য়ে ঝ'রে যায়, আর নব বসন্তাগমে সব ফল ফুলে বিকসিত হ'য়ে ওঠে, তখনই কি নব জগতের সৃষ্টি হোল বোল্‌বে ? যা ছিল তাই আছে ও থাক্‌বে। একই প্রাণসত্তায় নব নব বিচিত্র প্রকাশ। যখন বৃক্ষ লতা পত্র জীর্ণ হ'য়ে যায়, যখন তার ধূলিরাশি দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, তখন কি বোলবে, যার অণুপরমাণু এই জগৎবুকেই সৃষ্ট হ'য়েছে, অথচ আজ ধূলিতে পরিণত হ'য়ে সে চির বিনাশের পথে চ'লে গেল ? বৃক্ষরূপে অণুপরমাণুর সমাবেশে হউক, কি ধূলিরূপে ঐ সূর্য্যকিরণলেখার ভিতরই প্রকাশিত হউক, সবই আছে, সবই অবিনাশী। জগৎ-বুক হোতে তার অস্তিত্ব কে লোপ কর্‌বে ? যে প্রাণসত্তা সব কিছুর অন্তরালে আছেন, সেই মহামহিমায় ধূলিরাশি কখনও নব শ্যাম দূর্ব্বাদলে, কখনও ফল ফুলে ফুটে উঠে, আবার বীজে পরিণত হয়, তার প্রাণসত্তা—শীতেও নয়, গ্রীষ্মেও নয়। বসন্তাগমে রবিকর স্রষ্টার বিচিত্র বিধানে সব কিছু সত্তার ভিতর তার জীবনীশক্তি সঞ্চার করে, আর নব নব বৃক্ষ অঙ্কুরিত হোয়ে ওঠে, নব পল্লবে ফল ফুলে নব নব মঞ্জরীর ভিতর বিকসিত হোয়ে ওঠে। সবই সেই এক পুরাতনের প্রাণের খেলা, অথচ সবই চির নবীন সুন্দর। আমাদের দৃশ্য জগতে সব বিভিন্ন স্বরূপ, অথচ সব একেরই জাগ্রত প্রকাশ।

জগতে কিছু নূতন নেই, অথচ কিছু পুরাতনও নেই, কিছুর বিনাশও নেই। যাকে আমরা নূতন পুরাতন বলি, সে আমাদেরই জ্ঞানানুভূতির ব্যবহারিক প্রকাশ, স্বাতন্ত্র্যদান। কেবল পরস্পরের বিভিন্ন সম্বন্ধেই পরিবর্ত্তন। এ ত ক্ষণস্থায়ী—কুসুমদল ঝ'রে পড়ে, শুকিয়ে যায়, ধূলি পরিণতি, আবার বাষ্পে জলে পরিণত! আবার এক একটী মহাদেশ—কত জীবলোকের বসতি—কালে যাকে ধ্বংস হ'য়েছে বলি, ধূলায় পরিণত হ'য়েছে বলি, তাওত সেই একেই স্থিত! ফুলের অণু পরমাণুই হউক,

আর মহাদেশের অণুপরমাণুই হউক, সবই বিশ্ববুকে রচিত ও বিশ্ববুকেই স্থিত। বিশ্বময়ের বিশ্ববুকে যার স্থিতি তার কোথায় গতি সম্ভব? এ কেবল পরস্পর যোগাযোগের বিশেষ সম্বন্ধের ভিতর বিভিন্ন অস্তিত্ব।

একটী ক্ষুদ্র পুষ্প আর ঐ মহাদেশ—একটীকে আমাদের কাছে কত ক্ষুদ্র, আর একটীকে হয়ত কত বিরাট মনে হয়! কিন্তু অনন্ত ভূমা মহানের অখণ্ড বিরাট সত্তার ভিতর তার কতটুকু স্থান? মরজগতে অতি ক্ষুদ্র প্রাণীই হউক বা মহাপরাক্রান্তশালী জীবই হউক, সবই তাঁর কাছে সমান। তাঁর বিশ্ববুকে, তাঁর প্রেমক্রোড়ে সকলেরই স্থান, সবই তাঁর সৃষ্ট জীব।

এমন ভুল যেন না করি, যা আমার সসীম দৃষ্টিতে ক্ষুদ্রজ্ঞানে ধারণা করি তাহাই যেন একমাত্র সত্য মনে না করি। আমরা যেখানে ভেদাভেদ রচনা করি, সেখানে সৃষ্টির বুকে কিছুই তার তথ্য নেই। যা আমাদের কাছে অদৃশ্য, যা এই পৃথিবীতে ধারণা করা গেল না, মনে করি বুঝি তার আর অস্তিত্ব নেই। যে সব অণু পরমাণু অদৃশ্য হ'য়ে আছে, তারই সংযোগ বিয়োগে আবার বিভিন্ন বস্তুসত্তা জেগে ওঠে। বাতাসে জলীয় বাষ্প, আবার বাতাস ও বৃক্ষলতার আদান প্রদানের ভিতর সমস্ত জীবজগৎ তার উপাদান গ্রহণ কোরছে! তাইত সমুদ্র, বিটপী কানন সবই আলো ও বাতাসের সন্তান, আবার সবই ঐ আলোতে বাতাসে মিশিয়ে যাবে, সবই এক।

একমেবাদ্বিতীয়ম্—সবই এমন পরস্পরে গ্রথিত যে পরস্পরকে বাদ দিয়ে কেবল একটীর ধারা আমরা বুঝ্‌তে পারি না। অনন্ত বিশ্বে কোন আজও নেই, কালও নেই,—এ কেবল মরণধর্ম্মশীল মানুষের কথা। আমরা এই পৃথিবীগ্রহে আলো ছায়া শীত গ্রীষ্মের ভিতর ছুটে চলি, আর তাকে কখনও শীত, কখনও গ্রীষ্ম বসন্ত, কখনও দিন রজনী, কত কিছু নামাঙ্কিত করি! অনন্তবুকে আদিও নাই, অন্তও নাই—কেবল কার্য্যকারণ যোগাযোগের সম্বন্ধ। তাকেই আমরা জীবন বলি, কিন্তু সবই সেই একেই প্রতিষ্ঠিত। সবই যেন এক জালে বোনা। কোন অংশের কোন সম্বন্ধ হয়ত থেমে যেতে পারে, কিন্তু সকল সত্তার যে প্রাণশক্তি তার কখনও ধ্বংস হবে না। যার আদি আছে অন্ত আছে মনে করি, যার জন্ম আছে আবার মৃত্যু আছে ভাবি, যার শৈশব আছে জরা আছে দেখি—এ সবই বিশ্ববুকে বিচিত্র সম্বন্ধেরই ভিতর স্রষ্টার বিচিত্র লীলা।

যিনি জগৎপতি তাঁর কাছে কালও অনন্ত, জীবনও অনন্ত, সবই এক। আমাদের কাছেও সেই কথা, তবে কেন বিভিন্ন মনে করি? জগতে এক অমৃতময় দেবতা, আমি মরণান্তেও সে বুকে, এখনও সেই বুকে। আমি মরণান্তেও তাঁর হব, এবং এখনও আমার এ মর-জীবনেরও মালিক বিধাতা সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্।

যেদিন মরণসখার আনন্দঘণ্টা বেজে যাবে, যে দিন দেহের অণুপরমাণু বিশ্লিষ্ট হ'য়ে ধূলায় ও ভস্মে পরিণত হবে, সেদিনও তার বিচিত্র সত্তার ভিতরই তাঁর বুকে নবরূপে জেগে থাকবে। আর, চেতনময়ী বিদেহী আমি, অমৃতময়েই আমার চৈতন্য, আমিও ঐ ধূলিমুষ্টির মতই অনন্ত জাগরণে জেগে থাকব।

আজ আমার যা প্রকাশ কাল নব বস্ত্রধারণে কি অন্যরূপ প্রকাশ আমার? না গো না, যে আমি এই মরণধর্ম্মশীল দেহের ঘরে, সেই আমি মৃত্যুর পরপারে বিদেহী-সত্তার ভিতর নন্দন সাজেও জাগ্রত। দেহধর্ম্ম ত আত্মাকে স্পর্শ করে না। এই ক্ষণিক লীলা যাকে আমরা পার্থিব জীবন বলি, সেই আমি উন্নতলোকে। আমার যোগ্যাযোগ্য অনুযায়ী, পাপপুণ্য কর্ম্মফল অনুসারে তার সুখ দুঃখের স্থান লাভ করে। তাইত ভক্ত বলেছেন, ধর্ম্মই একমাত্র মৃত্যুর পরও অনুগামী হন।

ধন্য তাঁরা যাঁরা ভগবদ্‌সত্তায় জীবিত, ধন্য সে আত্মা, তাঁর সকল পরিশ্রম সার্থক—তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম আজ তাঁকে কোন্ সুখময় অনুভূতি দান ক'রবে কে জানে? কালপ্রবাহও নিত্য সত্তাতেই অখণ্ডযোগযুক্ত। সমস্ত বিশ্ব চরাচর একেই প্রকাশিত, আমিও সেই একের মহামহিমাময় বুকেই বাস করি। কাজেই আমার অনন্ত জীবন।

কাল ও অনন্তসত্তা একই সত্তায় প্রতিষ্ঠিত, কাজেই আমাদের যতকিছু কর্ম্মসাধনা কালপ্রবাহে সবই প্রাণসূত্রে গ্রথিত। সমস্ত একেরই প্রকাশ কালের বুকে। এই আমার জাগরণ এ ত অনন্তে জাগরণ। এই বিশ্ববুকে বাস ক'রেই অনন্তের প্রজা। পিতার গৃহে বসতি, ক্ষুদ্র আমি, আমারও মহানেই জন্ম, আমি অনন্তের ভিতর জাগ্রত। কে আমার সত্তা অস্বীকার ক'রবে? এ অখণ্ড যোগতত্ত্ব, এ আত্মজ্ঞান পরিপূর্ণ মঙ্গলেই সুপরিস্ফুট। যদি আমি বিনাশের পথে যাই, তবে অনন্ত কালপ্রবাহেরই বা অস্তিত্ব কোথায়? একমেবাদ্বিতীয়ম্—তাঁরই অখণ্ড বিধানে বিশ্বপ্রকাশে ভূমার ভিতরই ক্ষুদ্রের প্রকাশ, অথচ অনন্তে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। আজ যিনি আমার জীবন-দেবতা, তিনি অনন্তকালের দেবতা, এ অনন্ত বন্ধনডোর কে ছিন্ন করে?

ধন্য ভগবদ্‌ভক্ত যিনি ভগবদ্‌মহিমায় অনুপ্রাণিত। যাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত, অনন্তকাল তাঁর সে মঙ্গল কর্ম্মসাধনা অনন্তের পথেই নিয়ে যাবে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, যদি কিছু মহত্তর কর্ম্মের উদ্বোধন হ'য়ে থাকে সংসারে, আমাকে তেমনি উচ্চতর পদবী দান করবে।

কত মানুষ পাশবিক বৃত্তির ভিতরেই চরিতার্থতা লাভ ক'রতে চাইল, যত ধর্ম্মভাব, যত কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তারা উপেক্ষাভরে অগ্রাহ্য ক'রেই হয়ত চোল্‌ল। এ জগতে যতদিন থাক খাও দাও উচ্চ প্রাসাদে আনন্দ আরাম লাভ কর, ধনৈশ্বর্য্য সুখ সম্ভোগ দৈহিকতার চরম সুখ সম্ভোগ কর, আর কি চাই? যদি বল আত্মোৎসর্গের কথা, যদি বল সত্যের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনের কথা, তাহা হইলেই হয়ত বলিবে, ও কি বাতুলের কথা! এমনি করিয়া আত্মার পরম অস্তিত্বের কথা ভুলে যায় মানুষ, দৈহিকতা সাংসারিকতাকেই মানুষ জীবনের পরম গৌরবের ধন মনে করে! এর নামই ত আত্মবিনাশ।

এখন ওগো ধনজনগর্ব্বিত মানুষ! বুকে হাত দিয়ে বল ত

তৃপ্ত হ'য়েছ কি না কেবলই অসার তরল আমোদ প্রমোদে? হয়ত কেউ ব'লবেন এ ধর্ম্ম কর্ম্ম দেবসাধন, এ সমস্ত মানুষ তোমাদেরই মনগড়া কথা। এ পার্থিব জীবনে যা আমার প্রয়োজনীয়, যাতে আমার সুখ সুবিধা তারই সত্য মূল্য, যা আমার সাংসারিক ক্ষতি ও পীড়ার কারণ তাহাই বর্জ্জনীয়। এমনি করিয়া সাংসারিক লাভ ক্ষতির ভিতরই তাদের ভাল মন্দ। তবুও ত একদিন আসে সেদিন সকলেই বোঝে, এই এত পরিবর্ত্তন, এত জাতির সংঘর্ষণ, সব কিছুর ভিতর এক অবিনাশী সত্য নিহিত আছে। সকল শাস্ত্রে সকল ধর্ম্মে সত্যের মহিমা ঘোষণা করিতেছে, সকল কালে সকল দেশে সাধু-পূজা চিরদিন হ'য়ে আসছে। যুগ যুগান্তর ধ'রে এই একই সততার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা। ধর্ম্মভাব সাধুতা চিরদিন এই দেহের ঘরেই অনুপ্রাণিত হ'য়ে আছে। যেমন অনাহারে দেহের পতন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই অসাধুতার ভিতরই জীবাত্মার পতন।

যদি সাধুতার কোন মূল্যই নাই সংসারে, যদি সাধু ভাব জীবনে কেবল আকস্মিক ব্যাপার, তাহা হইলে মানব-ইতিহাসে চিরদিন মানুষের কেন তবে অন্যায় অধর্ম্ম ও অমঙ্গলকে এত ভয় ও এত ঘৃণা? তবে কেন মানুষ কুকাজ অধর্ম্ম অন্যায় এত গোপনে গোপনে সম্পন্ন করে?

সততাই, সাধুতাই জীবাত্মার প্রাণ। যে বুঝল না সে অপবিপূর্ণতার ভিতরই চ'লে গেল। মানুষ দেহী হ'য়েও দৈহিকতার ঊর্দ্ধে শাশ্বত লোকে এগিয়ে চলে। তাই ত তার দেবত্ব, তাইত তার অমরত্ব, পশুভাবের ঊর্দ্ধে দেবভাব লাভ করে। যত বড়ই জ্ঞানী গুণী হও না কেন, কর্ম্মচতুরতা লাভ কর না কেন, সাধুতা ও সততা ভিন্ন সবই ব্যর্থ। দেহ-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সব দৈহিকতা শেষ হবে, কিন্তু সাধুতা ও সততা দেহের পরপারে অনন্তকালের সম্বল ও সহায়। যে জীবন পরম ইচ্ছার ভিতর আপনার ইচ্ছা উৎসর্গ ক'রে গেলেন, তাঁর সার্থকতা হয়ত ঐহিকতার ভিতর লাভ হোল না, কিন্তু সে জানে আত্মলোকে সে আত্মোৎসর্গের কি অক্ষয় আনন্দ শান্তি আরাম তার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। আত্মার প্রাণ ধর্ম্ম সাধুতা ও সততায়। সাধুতাই ঐহিকতার ঊর্দ্ধে নিত্য সত্তা দান করে। দেবতার আনন্দবুকেই সাধুতার জন্ম। পৃথিবীতে পার্থিব পদার্থেই পৃথিবীর মানুষের পুরস্কার। কিন্তু সাধুতা ঐহিকতার অতীত নিত্য শাশ্বতের অধিকারী। ভগবদ্‌ভক্তগণ তাই সাংসারিক সুখের জন্য লালায়িত নন, তাঁরা ভগবদ্‌মহিমাতে অনুপ্রাণিত, তাঁতেই সমাহিত। এ অনন্তকাল অনন্তজীবন তাঁরই মঙ্গল বিধান। ধন্য তিনি আমাদের ক্ষুদ্র বুকে তাঁর অসীমের আনন্দ আলো জ্বালিয়ে এসেছেন।

ধন্য আমি, ধন্য তিনি, তাঁতেই গতি, তাঁতেই স্থিতি। কে আমাকে সে প্রেম থেকে বঞ্চিত করিবে? ওগো সখা, তোমার হিমকণ্ঠের মৃত্যুমলিন দেহখানি আমি কত ভালবাসি, তাইত আমি আকুল চোখে চুম্বন করি, আলিঙ্গন করি, তবু জানি দেহাতীত চ'লেছ তুমি আছ অনন্তের বুকে, তুমি দেবতার ধন, তুমি তাঁহাতেই। ধন্য তুমি, দেবত্বের ভিতরই তোমায় চলেছ। যতদিন দেহে ছিলে, কত ক্ষুদ্র অপরাধেই সংসারের দীন মলিনতায় কত ক্ষুব্ধ ব্যথিত হোতে? ধন্য তোমার সেই ঊর্দ্ধমুখীন সাধনার নিষ্ঠা, ধন্য তোমার উদার হৃদয়ের সাধুতা ও সততা। এখন মুক্ত শুদ্ধ তুমি, ধন্য তোমার পুণ্যজ্যোতিসুন্দর ভাগবতী তনু।

কেন ওগো তবে তোমাদের জন্য আত্মার এ ক্রন্দন বিলাপ? ধন্য তোমরা, আমিও একদিন আমার এ ধূলার দেহ ফেলে রেখে অনন্তে উধাও হব। কে জানে কেমন ক'রে আবার পরিচয় হবে, আবার মিলনগানে জেগে উঠব? প্রেম যে ফুরোলো না, প্রেম যে ইহপরলোক এক ক'রে রাখল! প্রেমময় যখন এ প্রেমকুসুম ফোটালেন হৃদয়নিভৃতকুঞ্জে, তখন আর কেমন ক'রে সুগন্ধসৌরভ ফুরিয়ে যাবে? একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ভূমা মহান্‌ চির সত্যেই সকলে আছি, সেই সত্য-সুন্দরেই জাগ্রত।

ধন্য তাঁরা যাঁরা দেবতার নামে জীবন উৎসর্গ করেছেন, ধন্য তাঁদের সাধুতা সততা দেবত্ব ও মহত্ব।

ওগো জন্মমরণবিধাতা! ওগো পতিতপাবন দীনবন্ধো! দেখ আমার জীবনব্যাপী সুকৃতি দুষ্কৃতি। যখন অতীতের দিকে তাকাই, আর ত ভরসা থাকে না,—কত দুর্ব্বলতা, কত পাপ তাপ, কত ভুল, কত দোষ ত্রুটী! কে আমায় ক্ষমা ক'রবে? কত মোহ কত অপরাধ, কত উত্তেজনা, কত তুচ্ছ পরমাদ, দেখ কত প্রেমের অভাব, কত ধৈর্য্যের অভাব! কত অহঙ্কার! কই সে নম্রতা, বিনত ভাব? কে আমাকে রক্ষা করে, কে আমার এই নিরাশকাতর রিক্ত ব্যথিত হৃদয়ে আশার কথা শোনায়?

হে করুণাময়, তুমি একমাত্র আরাম আনন্দ ও আশ্রয়। আমার যা কিছু অসমাপ্ত কর্ম্মসাধন, যা কিছু ব্যর্থ বিফলতা তুমি সব জান। মার্জ্জনা কর, দয়ার ঠাকুর! ঊর্দ্ধে নিয়ে চল, দেখ জীবন ব্যাপিয়া কি নীরস সংগ্রাম, দেখ আমার রক্তাক্ত হৃদয়ের দীন পরাজয়ের সকল বেদন অনুভূতি। ওগো পূর্ণ মঙ্গল সুনির্ম্মল সুন্দর, একবার পূর্ণতার ভিতর নির্ম্মল হই, তোমারই যোগ্য হই। তোমারই ইচ্ছার জয় হউক। একমেবাদ্বিতীয়ম্‌।

---

## পরলোকগত ব্রজমোহন দাসের জীবনের দু' একটি কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাবার প্রখর স্মরণশক্তির কথা আমার বড় পিসীমার কাছে শুনেছি, নিজেও তার কিছু পরিচয় পেয়েছি। শুনেছি বাড়ীতে দুর্গোৎসবের সময়ে যে চণ্ডীপাঠ হতো তা শুনে বাবার প্রায় মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ীতে একজন স্থাপিত দেবতা আছেন। তাঁর নাম ঘোরচণ্ডী, প্রতি মঙ্গলবারে তাঁর পূজো হয়। যে ব্রাহ্মণ পূজো করেন তিনি ।০ আনা পয়সা দক্ষিণা পান। এই ।০ আনা পয়সার দক্ষিণার ব্যবস্থা আমি আমার বাল্যাবধি দেখে আসছি। জানি না কত আগে থেকে এই ব্যবস্থা হ'য়ে রয়েছে। এই দেবতার পাঁচালী রাত্রে পাঠ

করা হয়। বাড়ীর কেউ তা পাঠ করেন, তার জন্ম ব্রাহ্মণের দরকার হয় না। আমি নিজেও ছেলেবেলা তা পাঠ করেছি। একবার আমাদের বাড়ীতে আগুন লেগে ঘর প্রায় সব পুড়ে যায়, ঐ দেবতার পাঁচালীও সেই সঙ্গে যায়। তখন বাবা নাকি আবার পাঁচালী লিখে দেন; কারণ, তাঁর সব মুখস্থ ছিল। আমি বাবার হাতের লেখা পাঁচালীখানা দেখেছি, হয়ত এখনও সেখানা আছে।

আমি যখন উচ্চ প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে হবিগঞ্জ বাবার কাছে গেলাম ও হাইস্কুলে ভর্তি হলাম, তখন কতদিন দেখেছি রাত্রে আমি আমার পড়ার জায়গায় ব'সে পড়্তাম, আর বাবা তাঁর নাম জপ ক'রে কাছে ব'সে থাকতেন। রাত্রে খাওয়া দাওয়া ক'রে যখন তাঁর কাছে শুতে যেতাম, তখন তিনি প্রায়ই বল্তেন, "কি পড়েছ একবার recapitulate কর"। আমি বল্তে গিয়ে কোন জায়গায় আট্‌কে গেলে তিনি ব'লে দিতেন,—আমার পড়া শুনে শুনেই তাঁর মুখস্থ হ'য়ে যেত। ইতিহাসটা তিনি এই ভাবেই আমাকে শিখ্তে সাহায্য করেছিলেন। বল্তে না পারলে কোনদিনই শাসন করেননি, অথচ আমরা ছোটদের পড়াতে গিয়ে কত সহজে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলি!

বাবা অতি সামান্য বেতনে মুন্সেফী আদালতে কেরাণীর কাজে ঢুকেন। ঐজন্য যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাতে এণ্ট্রেন্স পাশ, এফ এ পড়া, লোকও নাকি অনেক ছিলেন, কিন্তু প্রাত-যোগিতা পরীক্ষায় বাবা প্রথম হ'য়ে কাজটা পান। এই অল্প বেতন দিয়ে নিজের বাসার খরচ চালাইতেন, বাড়ীতেও কিছু সাহায্য করতেন। আমার বড় কাকা (৺ রাধামোহন দাস) ও ছোট কাকাকে সঙ্গে রেখে পড়াতেন। আত্মীয়ের ছেলেও দু একটী থাকতেন। বাবার যেরূপ মেধাশক্তি ছিল শুনেছি, তিনি যদি অবস্থার পীড়নে পড়াশুনা ছেড়ে ঐ সামান্য চাকরী না নিতেন, তা'হলে উন্নতিই করতে পারতেন। ঐ চাকরী নেবার পরও তিনি যদি সিলেটের বাহিরে যেতে পারতেন, তা হ'লে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হ'তে পারতেন; কারণ, তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে সেই সময়ে যাঁরা সিলেট ছেড়ে শিলং গিয়েছিলেন, তাঁরাই উচ্চপদে উন্নীত হয়েছিলেন। বাবার কিন্তু সে সুযোগ হলো না। তিনি সিলেট জিলার মধ্যেই সদর, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও করিমগঞ্জে কাজ ক'রে অবসর লন। তিনি এতদূর গেলে বাড়ীঘর দেখা চলে না, ভাইদেরও লেখা পড়া শিক্ষা দিতে পারেন না, তাই দূরে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করেছিলেন; কিন্তু এর জন্ম কোনদিন আপশোষ করতে শুনিনি। বরং নিজের স্বার্থ বলি দিয়েও পরিবাররক্ষা ও ভাইদেরে যে মানুষ করতে পেরেছিলেন, এতেই তাঁর আনন্দ ছিল। তাঁর এই ভাবটা প্রকাশ পেয়েছিল, যেদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে আমাদের কয়টি ভাইকে বলেছিলেন, "বাবারে, ভাই যদি কোন টাকা পয়সা খেয়েও ফেলে দেয়, তা হ'লেও কিছু মনে করো না। সর্ব্বদা মনে রেখো নিজের ভাইই ত খেয়েছে।" তাঁর এই কথার মধ্যে যেমন তাঁর নিঃস্বার্থতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি ভ্রাতৃ-প্রেমের পরিচয়ও পাই। এই ভ্রাতৃপ্রেমের আরো পরিচয় পেয়েছি যখন বাবাকে বলেছি, "বাবা, বাড়ীতে ত আপনাকে দেখবার কেউ নেই, আমরাও চাকরী ছেড়ে এসে বাড়ীতে ব'সে থাকতে পারি না, চলুন, আমাদের কারো কাছে চলুন।" তিনি বলতেন, "যেতে ত ইচ্ছা করে, কিন্তু তোমার ছোটকাকাও এখন অচল, অন্ধপ্রায়, তাকে একা বাড়ী রেখে যেতে ইচ্ছা করে না।" শত অসুবিধা ও কষ্ট স্বীকার ক'রেও বাবা দেশের বাড়ীতে শেষ কালটা কাটিয়ে দিলেন, তবু ভাইকে একলা ফেলে সুখভোগ করতে বাড়ী ছেড়ে এলেন না। হায়! আমাদের মধ্যে সে ভ্রাতৃভাব আছে কি? ভাইদের জন্ম তাঁর ত্যাগ যেমন মধুর, ভাইদেরও তাঁর প্রতি ভক্তি অপূর্ব্ব।

বাবা যে অল্পবেতনে কাজ ক'রে গেছেন, তাতে আমাদের সব ক'টী ভাইএর পড়াশুনা এত সচ্ছন্দে হতো না, যদি না আমার বড় কাকা আমাদের শিক্ষার ভার নিতেন। যে দাদার জন্ম তিনি উচ্চপদে উন্নীত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁর ছেলেদেরে তিনি নিজ ছেলের মতই মানুষ করতে চেষ্টা করেছেন।

বাবা আপন সততা ও চরিত্রগুণে ক্রমে মুন্সেফী আদালতের সেরেস্তাদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন, ও কিছুদিন জজ আদালতের হেড ক্লার্কের কাজও করেছিলেন। সকলেই জানেন, এ সকল পদে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করতে ইচ্ছা করলে খুবই করতে পারেন। বাবার কাছে এ সব স্বপ্নেরও অতীত ছিল। তিনি অতি সতর্কতার সহিত আপন ন্যায্য আয় দিয়ে সংসার চালিয়ে এসেছেন। নিজে মিতব্যয়ী ও বিলাসশূন্য ছিলেন ব'লেই এত অল্প আয়েও ভাল খাওয়া দাওয়া ক'রে গেছেন। বাবা নিজে বাজার ক'রে আনতেন এবং চেষ্টা করতেন যাতে বাজারের সেরা জিনিষটী তিনি কিনে আনতে পারেন। পরবার জিনিষ সামান্য দামের হোক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু খাবার বস্তুটী ভাল হওয়া চাই, এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। বিলাসিতা কি তা যেন তিনি জানতেনই না।

আমি তাঁর প্রথম সন্তান, বাড়ীর সকলেরই অতি আদরের ছিলাম। সুতরাং আমার আব্দার অত্যাচারও ছিল অত্যন্ত বেশী। নিজে বড় হ'য়ে ভাইদের শিক্ষার ভার নেয়ার পর আত্মপরীক্ষা ক'রে দেখেছি, তারা যখন কোন আব্দার করত তখন কত বিরক্ত হতাম। আব্দার কন্যাসম ভাইঝিটী যখন আব্দার করে কত সময় বিরক্ত হই, কিন্তু বাবা ত কোনদিন বিরক্ত হন নি! আমার মনে আছে, আমি হাইস্কুলে যখন পড়তাম তখন কোন ছেলের হাতে ভাল দামী ছাতা দেখে বায়না ধরলাম আমারও একটা চাই। এখন মনে হচ্ছে বাবার তা কিনে দিতে খুবই অসুবিধা হয়েছিল, কিন্তু তবু কিনে দিয়েছিলেন। হায়! আজ যা বুঝি, তখন যদি তা বুঝতাম, তা হ'লে বাবাকে অনেকটা সোয়াস্তি দিতে পারতাম।

বলেছি, বাবা ভাল খেতে চাইতেন। আমার মার পরলোক-গমনের পর তাঁর সে সাধ বড় মিট্‌তো না। কারণ, তাঁর পছন্দ অপছন্দের কথা অন্য কেউ ত বড় জানতেনও না, আর তিনি নিজে অন্য কারো কাছে সে কথা বড় বলতেনও না। ১৯১৯ ইং ১২ই মার্চ্চ আমার মা দেহত্যাগ করেন; তারপর শেষদিন-

পর্য্যন্ত বাবা এটা দাও ওটা দাও করেননি। যা পেতেন তাই খেয়ে ওঠে যেতেন, ভাল না লাগ্‌লে খেতেন না। শুধু যে কটা বছর আমাদের মেজবৌ (আমাদের মেজ ভায়ের স্ত্রী) বেঁচেছিল তাকে, ও আমার কাছে যে কয়দিন ছিলেন আমার স্ত্রীকে, তাঁর আদরের বড় মাকে, মনের কথা বল্‌তেন, যা' খেতে ভালবাস্‌তেন তাই ক'রে দিতে বল্‌তেন। মেজবৌএর অকাল পরলোকগমনে বাবা বড় আঘাত পেয়েছিলেন।

বাবা মাঝে মাঝে 'বৈষ্ণব সেবা' "ব্রাহ্মণ ভোজন", এসব করাতেন। একদিন আমার এক জ্ঞাতি জ্যেঠ্‌তুতো ভাইকে বলেছিলেন, "দেখ, আমি যে লোককে খেতে বলি তাতে স্বার্থ রয়েছে ষোল আনা, এমনি যদি বলি আমি এটা ওটা খেতে চাই, তাহ'লে কেউ দেবেও না, দিলেও বিরক্তির সহিত দেবে। কিন্তু লোক খাওয়াতে হ'লে একটু ভাল আয়োজন ত হবেই, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভাল খেতে পাব।" শুনে আমার এই মনে হয়েছিল যে, ভাল না খেতে পেয়ে বাবা মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখেছেন, তবু কারো কাছে আব্দার ক'রে অবহেলার বেদনার আঘাত সহ্য করেননি।

বাবা এত যে সাদাসিধে ছিলেন, কিন্তু আত্মসম্মানবোধ ছিল বড় প্রখর। এই বোধই তাঁকে অন্যের কাছে হাত পাৎতে দেয়নি। তাই উৎকোচ নেয়া অতি ঘৃণনীয় কাজ মনে ক'রে এসেছেন। উৎকোচগ্রাহীরা ভুলে যায় যে, এই সামান্য অর্থের লোভে আত্মসম্মানরূপ কি অমূল্য ধন তারা হারায়। আবার এই বোধই বাবাকে সামান্য পেন্সনের টাকায় নিজের প্রয়োজনীয় বস্তু কিনে আন্‌বার প্রেরণা দিয়েছিল, তবু সংসারের আয়ের দিকে তাকাতে দেয়নি।

বাবা সুদীর্ঘকাল চাকরী ক'রে গেছেন। ২০ বছর বয়স হবার পূর্ব্বে কাজে ঢুকেছিলেন, আর ১৯১১ ইং হইতে ৫৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। এই দীর্ঘ দিনের কর্ম্মজীবনে বিচিত্রতা না থাকলেও যে তা মাধুর্য্যমণ্ডিত ছিল, তা যাঁরা তাঁকে জান্‌তেন তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন। শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস মহাশয় যখন হবিগঞ্জে মুন্সেফ ছিলেন, বাবা তখন তাঁর অধীনে সেরেস্তাদার ছিলেন। তিন বছর আগে বাবা যখন শিলং আমার কাছে ছিলেন, তখন শ্রদ্ধেয় কুঞ্জবাবু সেখানে বেড়াতে যান। আমার মুখে যখন তিনি শুন্‌লেন বাবা শিলং রয়েছেন, তখন তিনি বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন, ও একদিন গিয়ে দেখেও আসেন; বাবাও তাঁর কথা শুনে তাঁকে দেখ্‌বার জন্য ব্যগ্র হন, ও আমাকে নিয়ে তাঁর বাসায় যান; তখন তিনি বাসায় ছিলেন না। কুঞ্জবাবু যখন আমাকে বল্লেন "আপনার পিতা বড় সাধু লোক", তখন পিতৃগৌরবে আমার বুক ফুলে উঠ্‌ল। ধন্য জগৎপিতা! এমন পিতার সন্তান হবার অধিকার আমায় দিয়েছ!

আমি যখন ভাবি যে, বাবার ত ধনের প্রাচুর্য্য ছিল না, পদ-মর্য্যাদা বা পাণ্ডিত্যও তেমন ছিল না, তবে কিসের জোরে তিনি সকলের চিত্তকে এমন আকর্ষণ কর্‌তে পেরেছিলেন, তখন এই কথাই মনে হয় যে, দারিদ্র্যের আবরণের ভিতর, শুক্তির ভিতর মুক্তার মত, তাঁর ধর্ম্মধন বিরাজিত ছিল, তাই তাঁর চরিত্র এমন চমৎকার মাধুর্য্যের মহিমায় মণ্ডিত হয়েছিল।

বৈষ্ণবগ্রন্থে একটা কথা আছে যে, "কোন দেবের না করিও নিন্দন বন্দন।" বাবা ছিলেন পরম বৈষ্ণব; সেইজন্য এই উপদেশটি অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রে গেছেন, নীরবে আপনার ইষ্টমন্ত্র জপ ক'রে গেছেন। কোনদিন নিজের ধর্ম্মমত কারো কাছে জোর ক'রে গ্রহণ করাবার চেষ্টা করেননি। আমি যখন ব্রাহ্মসমাজের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লাম, তখন বাধাও দেননি বা বিরক্তিও প্রকাশ করেননি। মনে আছে, ভক্তিভাজন শাস্ত্রীমহাশয় যখন বাবাকে বল্লেন, "কৈ, ছেলেকে ত রাখ্‌তে পার্‌লেন না," তখন বাবা হেসে বলেছিলেন, "এ ছেলেকে আপনাকে দিয়ে দিয়েছি।" হায় পিতঃ, তোমার এই উদারতা কি আমাদের আছে? আমরা ত নিজের মতের বিরুদ্ধে কাউকে চল্‌তে দেখ্‌লে রেগে অস্থির হ'য়ে যাই।

মানুষের জীবনে একটা সময় আসে, যখন সে ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক কর্‌তে ভালবাসে। আমার কেতাবী ধর্ম্মজ্ঞান নিয়ে আমিও এক সময় প্রায়ই তর্ক কর্‌তাম। বাবাকে বল্‌তাম যে, তিনি যে দেব-দেবীর পূজা করেন, এসব কিছুই নয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, আমি কোনদিন তাঁকে তর্কে প্রবৃত্ত করাতে পারিনি। পরে মনে হয়েছে, তাঁর সঙ্গে তর্ক কর্‌তে গিয়ে ভাল করিনি, তাতে তিনি প্রাণে ক্লেশ অনুভব করেছেন। কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথা বলেননি। মাঝে মাঝে শুধু এই কথাই বল্‌তেন, "কোন দেবের না করিও নিন্দন বন্দন।" একদিন হেসে হেসে তর্ক থামাবার জন্য বলেছিলেন, "বাপু, তুমিও জান না কোন্‌টা ঠিক, আমিও জানি না কোন্‌টা ঠিক, তবে যদি দেবতা থেকে থাকেন, তা'হলে কিন্তু তুমি ঠকে গেলে।" এমন ভাবে কথাটা বল্লেন যে আর তর্ক করা চল্ল না। বাবার জীবনের দিকে তাকিয়েই আমার তর্কের স্পৃহা অনেকটা দূর হয়েছে।

তিনি যে নিজের মত কারো উপর খাটাতে চাইতেন না, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পেয়েছিলাম আমার মাতৃশ্রাদ্ধের দিন। আমি তখন ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হ'লেও দীক্ষিত হইনি। ক্রমশঃ

---

## ব্রাহ্মসমাজ।

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৮শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদারের শ্বশ্রূমাতা সরস্বতী গুপ্তা ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। বিগত ১লা ডিসেম্বর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য এবং দৌহিত্র শ্রীমান মনোমোহন মজুমদার ও ভ্রাতুষ্পুত্রস্থানীয় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চরিত্র স্মরণ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে বিবিধ প্রতিষ্ঠানে ৭৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ১৬ই নবেম্বর বাগীবন গ্রামে পরলোকগতা জ্ঞানদা

সিংহ রায়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান দেবরপুত্র শ্রীমান সুধাংশুভূষণ সিংহ রায় ও কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা হাজরা কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত অর্পণাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রপাঠ, শ্রীযুক্ত এককড়ি সিংহ রায় জীবনী পাঠ ও কন্যা প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে জামাতা শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন হাজরা "জ্ঞানদা সিংহ রায় স্মৃতিভাণ্ডার" স্থাপনের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে ৩০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করিয়াছেন। ইহার ২০০৲ টাকার সুদ দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবারের সাহায্যার্থ ও ১০০৲ টাকার সুদ বাণীবন ব্রাহ্মসমাজের জন্য ব্যয়িত হইবে। এতদ্ব্যতীত দরিদ্রদিগকে চাউল পয়সা বস্ত্রাদি দান করা হইয়াছিল।

বিগত ২৯শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগতা কণিকা চৌধুরীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান ভ্রাতা শ্রীমান রণজিৎ চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন

বিগত ১৮ই অক্টোবর কুমিল্লা নিবাসী শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র (চট্টগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন সেনের পুত্র) ছয় বৎসর বয়সে সাতদিনের টাইফয়েড জ্বরে পরলোকগমন করিয়াছে। বিগত ১৯শে নভেম্বর সুশীলবাবুর গৃহে তাঁহার পরলোকগত দৌহিত্রের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে সুশীলবাবু কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজে ২ চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজে ১৲ ও কুমিল্লা অভয় আশ্রমে ২৲ দান করিয়াছেন।

গত ১৬ই নভেম্বর কুমিল্লা নগরীতে প্রেমমালা সিংহের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার মেজদিদি কুমারী ক্ষণপ্রভা সিংহ জীবন-স্মৃতিপাঠ ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে পারিবারিক সমাধি-মন্দিরেও প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যায় উপাসনা ও সংগীত হইয়াছে। পরলোকগত আত্মার প্রীত্যর্থে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কাঙ্গালী-বিদায় ফণ্ডে ২৲, দাতব্য বিভাগে ২৲, সাধনাশ্রমে ২৲, মিসন ফণ্ডে ২৲ ও গিরিডি সমাজের কাঙ্গালি বিদায় ফণ্ডে ২৲ সর্ব্বশুদ্ধ ১০৲ দান প্রতিশ্রুত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

**শুভ বিবাহ**—বিগত ২৮শে নভেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া স্মৃতিময়ী ও আজিমগঞ্জ প্রবাসী শ্রীযুক্ত পিয়ারীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

**দান**—পরলোকগত নিশিকান্ত ধরের চতুর্থ বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বিনোদিনী ধর প্রচার বিভাগে ৪৲ দাতব্য বিভাগে ৪৲ অনাথ আশ্রমে ৪৲ বিধবাশ্রমে ৪৲ অনাথ ব্রাহ্মপরিবার ফণ্ডে ৪৲ মোট ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা চিরশান্তি লাভ করুন।

**জাতকর্ম্ম**—বিগত ১৮ই নভেম্বর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রথম পুত্রের একমাস একদিনে শুভ জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান তাঁহার কুমিল্লাস্থ বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। নবজাত সন্তানের কল্যাণ কামনায় সাধারণব্রাহ্মসমাজের মিসন ফণ্ডে ১৲ ও দাতব্য বিভাগে ১ দান করা হইয়াছে।

মঙ্গলময় বিধাতা শিশুকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

**ঊষা-কীর্ত্তন**—আগামী ১লা পৌষ, ১৭ই ডিসেম্বর, বুধবার সিটি স্কুল প্রাঙ্গণ হইতে ঊষা কীর্ত্তন আরম্ভ হইবে। সকলে যোগদান করেন, এই অনুরোধ।



ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ১৮ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৩ম ভাগ
১৭শ সংখ্যা।

১লা পৌষ, বুধবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১
17th December, 1930.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা

হে করুণাময় পিতা, তুমি ত তোমার অসীম স্নেহে আমাদিগকে পাপ তাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিয়া, তোমার পুণ্য ও শান্তিতে মণ্ডিত করিবার জন্য নিয়তই আহ্বান করিতেছ। অন্তরে বাহিরে নানা রূপে নানা ভাবে তোমার স্নেহের ডাক আমাদের নিকট সর্ব্বদাই আসিতেছে। কিন্তু আমরা মোহাভিভূত হইয়া অধিকাংশ সময়ই তাহা শুনিতে পাই না, উদাসীনতা অবহেলা বশতঃ শুনিবার জন্য কোনও চেষ্টা যত্নও করি না। আবার আলস্য ও আরামপ্রিয়তা হেতু অনেক সময় তাহা শুনিয়াও গ্রাহ্য করি না, তোমার শরণাপন্ন হইবার জন্য, তোমাকে অনুসরণ করিবার জন্য, সেরূপ ব্যাকুল হই না। তাই ত দিনের পর দিন আমরা তোমা হইতে দূরেই যাইয়া পড়িতেছি, সংসারের অসার বিষয়েই মত্ত থাকিতেছি। আমাদের শত উদাসীনতা অবহেলা ও বিদ্রোহিতা সত্ত্বেও তুমি ত আমাদিগকে কখনও পরিত্যাগ কর না, ডাকিতে ক্লান্ত হও না। মাঝে মাঝে আবার এমন বিশেষ ভাবে ডাক যে, আমরা আর বধির হইয়া থাকিতে পারি না; এমন আয়োজন কর, যাহার সম্বন্ধে আমরা আর উদাসীন থাকিতে পারি না। তাই তোমার উৎসবের আহ্বান, যত ক্ষীণ স্বরেই হউক না কেন, আমাদের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিতেছে। উৎসবের মধ্যে তোমার যে অপার করুণা আমরা পাপী তাপী হইয়াও প্রাপ্ত হই, তাহার কথা আমরা ভুলিতে পারি না। কিন্তু হে অন্তরদর্শী দেবতা, তুমি ত জান তাহার জন্য যেরূপ ব্যাকুল হইতে হয়, আমাদের তাহা নাই। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের সকল উদাসীনতা মোহ কলুষ দূর কর, আমাদের অন্তর ব্যাকুল করিয়া তোল। এবার উৎসবে নূতন জীবন লাভ করিবার জন্য আমরা সকলে ব্যাকুল হইয়া ছুটি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

## নিবেদন

**দায়ী কে?**—তুমি ত মস্তক উঁচু ক'রে গর্ব্বভরে চ'লে বেড়াচ্ছ, সমাজপতি হ'য়ে কত লোককে শাসন কর্চ্ছো, কত নরনারীকে দোষী ব'লে সমাজবক্ষ হ'তে তাড়িয়ে দিচ্ছ! তারা খেতে পায় না, রোগে ঔষধ পথ্য পায় না, দাঁড়াবার স্থান পায় না! যেখানে যায়, সেখানেই তাড়া খায়! কত পাপে প'ড়ে আছে, কত দুঃখ পেয়েছে, মাথা তুল্‌তে যায়, তুল্‌তে পারে না; তুমিই চেপে ধ'রে রাখ। সত্য, তারা দুঃখী, তারা শত অপরাধে অপরাধী; কিন্তু তাদের এই দুঃখ ও পাপের জন্য দায়ী কে? তুমিই ত তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছ; সে উঠ্‌তে চেয়েছিল, তুমিই ত চাপা দিয়ে রেখেছ; সে যখন পড়্‌তেছিল, তুমিই ত তখন হাতখানা ধর নাই। দুঃখে শোকে যখন কাঁদ্‌তেছিল, তখন একটা সহানুভূতির কথা বল নাই। তার এই দুঃখ, এই পাপ, এই পতনের জন্য দায়ী কে? জানিও, একজন বিধাতা আছেন। মানুষ বিচার করুন না; তিনি বিচারক। তিনি ন্যায়বান; তিনি প্রেমময়; তাঁর বিচারে কে দোষী হবে, কে দায়ী সাব্যস্ত হবে?

---

**এই ত স্বর্গ**—কোথায় তুমি স্বর্গ খুঁজে বেড়াচ্ছ? স্বর্গ কি ঐ আকাশে? স্বর্গ কি ঐ পরলোকে? স্বর্গ কি কোনও লোকাতীত স্থানে? এই যে এখানেই স্বর্গ; যেখানে আমার প্রাণের দেবতা, সেখানেই স্বর্গ। তিনি যে আমাকে আলিঙ্গন ক'রে রয়েছেন। আমি যখন বাহিরে ছিলাম, মুক্ত ভাবে

চারিদিকে ঘু'রে বেড়াতাম, তখনও তিনি আমাকে ঘিরে ছিলেন; তখন আমি স্বর্গেই বাস করতে ছিলাম। আর এখন এই প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে রয়েছি, যেখানে সেখানে যেতে পারি না, এখানেও তিনি আমাকে ক্রোড়ে ক'রে রয়েছেন। আমি এখানেও স্বর্গেই আছি। ইহলোকে তাঁরই প্রেমের আবেষ্টনে রয়েছি, এই-ই আমার স্বর্গ। পরলোকেও তাঁর মধ্যেই বাস করবো, সেখানেও আমার স্বর্গ। তিনি যে আমাকে ঘিরিয়া রয়েছেন। তাই সর্ব্বদা আমি স্বর্গেই আছি। সজনে বন্ধু বান্ধবের মধ্যেই হউক, আর নির্জ্জন বদ্ধ স্থানেই হউক ইহলোকেই হউক, আর পরলোকেই হউক, তিনি ত আমার সঙ্গী; স্বর্গ আমার সর্ব্বত্রই।

---

**কি পাঠ করবো**—পুস্তক পাঠ ক'রে আমরা জ্ঞান লাভ করি; জ্ঞানিগণ ভক্তগণ কত অমূল্য রত্ন গ্রন্থে সঞ্চিত ক'রে রেখেছেন; পাঠ করলে জ্ঞানলাভ হয়; মন উন্নত হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয়। আত্মা ঈশ্বরমুখীন্ হয়। সব স্থানে ত বই পাওয়া যায় না! বই পড়তে যদি নাই পেলাম, জগৎ রয়েছে, প্রকৃতি-গ্রন্থ রয়েছে, তাহা পাঠ কর। লোকের সঙ্গে কথা বল, তাদের মন পাঠ কর। তাদের অভিজ্ঞতা হ'তে জ্ঞান-রত্ন উদ্ধার কর। পৃথিবীর ঘটনাবলী হ'তে জ্ঞানরত্ন উদ্ধার কর। যদি তাতেও বঞ্চিত হও, যদি একাকী নির্জ্জন কারা-জীবন কাটাতে হয়, তাতেই বা ভয় কি? অন্তরদেবতা রয়েছেন; তিনি নিয়ত প্রাণে জেগে আছেন; তাঁর দিকে দৃষ্টি ফিরাও। তিনি প্রাণে কথা বল্‌বেন। কত তত্ত্ব প্রদান করবেন! তাঁর সঙ্গ পেয়ে কৃতার্থ হবে। জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হবে, ভক্তগণ প্রাণে এসে কথা বল্‌বেন; তাঁর বাণী প্রাণে পাঠ ক'রে কৃতার্থ হবে।

---

## সম্পাদকীয়।

**উৎসবের আহ্বান**—স্নেহময় পরম পিতা তাঁহার অসীম প্রেম ও স্নেহে আমাদিগকে নিয়তই অন্তরে বাহিরে নানা ভাবে নানা রূপে তাঁহার নিকট লইবার ও তাঁহার হইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু সংসারের নানা মোহ-কোলাহলে মত্ত থাকিয়া অনেক সময়ই আমরা তাহা শুনিতে পাই না, অথবা শুনিলেও গ্রাহ্য করি না। তাহা কখনও জগতের নানা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সুখ শান্তির মধ্য দিয়া, আবার কখনও বা দুঃখ বেদনা শোক তাপ অনুশোচনার ভিতর দিয়াও আসে। এক আকারে না এক আকারে তাহা প্রতি নিয়তই আসিতেছে—কিছুতেই তাহার বিরাম নাই। তাঁহার অসীম ধৈর্য্য ও স্নেহকে কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারে না। সাধারণ ব্যবস্থায় যাহাদের চৈতন্যোদয় হয় না, মোহনিদ্রা ভাঙ্গে না, তাহাদের জন্য তিনি বিশেষ উপায়ও অবলম্বন করেন। এই বিশেষ ব্যবস্থাও সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্গত, তাহার বাহিরে নয়। জগতের সকল ব্যাপারেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। যে নিয়মে বায়ুমণ্ডলে মৃদু মন্দ হিল্লোল প্রবাহিত হয়, সেই নিয়মেই প্রবল ঝড় ঝঞ্ঝাও উত্থিত হয়। শুধু ডাকে যে নিদ্রিত ব্যক্তির ঘুমের ঘোর দূর হয় না, তাহাকে প্রবল ধাক্কা দিয়াই জাগাইতে হয়।

যখন "ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়", তখন যে "অধর্ম্মের বিনাশসাধন ও ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য" ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া জগতে নূতন ভাবে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, ইহা ত জগতের ইতিহাস উজ্জ্বল ভাবেই প্রমাণ করিতেছে। ইহার জন্য বিশ্ববিধাতার বিশেষ অবতাররূপে জন্ম বা মানবদেহ গ্রহণের কোনও প্রয়োজন হয় না। তাঁহার ধর্ম্মব্যবস্থার সাধারণ নিয়ম অনুসারেই এরূপ ঘটে। কেবল ঐতিহাসিক যুগেই যে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা নহে, বর্ত্তমানেও এরূপ ঘটিতে দেখা যায়। আমাদের উৎসবাদি—বিশেষ ভাবে মাঘোৎসব—ইহার প্রমাণ। এই উৎসবের মধ্যে করুণাময় পরম পিতার অপার দয়া ও প্রেমের জীবন্ত লীলা আমরা সকলেই বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কাজেই মাঘের বহু পূর্ব্ব হইতেই, পৌষ মাসের আগমনেই, স্বভাবতঃ তাহার কথা আমাদের প্রাণে জাগিতেছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় তিনি এবারও আমাদের জন্য উৎসবের ব্যবস্থা করিতেছেন, এবং তাহার জন্য এখন হইতেই প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, ইহা আমরা অনেকেই অনুভব করিতেছি। কিন্তু আমাদের কাহার মধ্যে এই অনুভূতিটা কত দূর গভীর ভাবে জাগিয়াছে, সকলের মধ্যেও জাগিয়াছে কি না, তাহা বলা কঠিন। তবে মোটের উপর তাহা এখনও তেমন যথেষ্ট রূপে গভীর ও ব্যাপক নহে, এ কথা বলিলে বোধ হয় কোনও ক্রমে সত্যের অপলাপ হইবে না। কারণ, সেরূপ কোনও প্রমাণ আমাদের মধ্যে লক্ষিত হইতেছে না, বরং বিরুদ্ধ প্রমাণই অনেক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

শুধু ভাসা ভাসা ভাবে তাঁহার এই আহ্বান শুনিলেই যথেষ্ট হইবে না; আর, অল্প কয়েকজন মাত্র গভীর ভাবে অনুভব করিলেও চলিবে না। প্রত্যেককেই সে আহ্বান হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে শ্রবণ করিতে হইবে। তাহা ব্যতীত তাঁহার ডাকে ছুটিয়া যাইবার আকুল আগ্রহ, ও যথার্থ ভাবে উৎসব সম্ভোগের জন্য যথোচিত আয়োজন করিবার চেষ্টা যত্ন, প্রাণে জাগিবে না। সে ভাব অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে, সম্মিলিত আগ্রহ চেষ্টা যত্নের অভাবে যথোপযুক্ত রূপে প্রবল হইতে পারিবে না, বরং অপরের নিরুৎসাহ নিরুদ্যমের, উদাসীনতা অবহেলার, হাওয়াতে অনেকটা ম্লান হইবে। কাজেই সমাজ মধ্যে এই ভাব যাহাতে প্রবলতর ও গভীরতর হয়, তাহার জন্য প্রত্যেককেই বিশেষ যত্নশীল হইতে হইবে। এ বিষয়ে পরস্পরের সাহায্য ও সহায়তা একান্ত আবশ্যক। নিজের কল্যাণের জন্যও অপরের কথা ভাবিতে হয়, অপরেও যাহাতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে, তাহা করিতে হয়।

যাহারা সহজে শুনিতে পায় না, অথবা শুনিয়াও ভাল করিয়া শোনে না, বা গ্রাহ্য করে না, সহজে যাহাদের ঘুমের ঘোর কাটে

না, চৈতন্যোদয় হয় না, তিনি তাহাদিগকে কিছুতেই পরিত্যাগ করেন না,—যেরূপেই হউক একদিন না একদিন জাগ্রত করেনই,—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই হেতু যে আমাদিগকে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে, সেই দিনের আশায় নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে, এরূপ কথা বোধ হয় কেহই বলিবে না। কেননা, তাহাতে কোনই লাভ নাই, কেবল সময় ও শক্তিক্ষয় এবং দুঃখক্লেশভোগই সার হইবে। সহজে চৈতন্যোদয় না হইলে যে তাহার জন্য কত দুঃখ ক্লেশ লাঞ্ছনাভোগ করিয়া জাগ্রত হইতে হয়, পথে ফিরিতে হয়, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। আলস্য উদাসীনতা অবহেলার ফল অপরিহার্য্য রূপে প্রত্যেককেই ভোগ করিতে হয়, তাহা হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই; মুক্তিলাভের কোনই উপায় নাই। যাহার উদাসীনতা অবহেলা অবাধ্যতা যত বেশী, তাহাকে তত অধিক ও দীর্ঘকাল দণ্ডভোগ করিতে হইবে। তিনি ত আমাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়া, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বলপূর্ব্বক কিছু করেন না। আমরা যাহাতে অনন্যোপায় হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বকই তাঁহার পথে আসি, তাঁহার শরণাপন্ন হই, সেরূপ ব্যবস্থাই তিনি করেন। কাজেই যত শীঘ্র আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই, তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করি, ততই আমাদের মঙ্গল। যখন ফিরিতেই হইবে, তাঁহার কথা শুনিতেই হইবে, তখন বৃথা সময় নষ্ট করা ও দুঃখ ক্লেশ ভোগ করা ঘোর মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। উদাসীনতা অবহেলা আলস্য ত্যাগ করিয়া উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত চেষ্টা যত্ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ, প্রত্যেক কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির একান্ত কর্ত্তব্য। কাজেই যদি এখনও আমরা তাঁহার আহ্বান ভাল করিয়া না শুনিয়া থাকি, অথবা ক্ষীণভাবে শুনিয়াও মোহ-নিদ্রায় মগ্ন থাকি, সেজন্য কোনও আকুলতা অনুভব না করি, তবে আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিশেষ ভাবে চেষ্টা যত্নে নিযুক্ত হইতে হইবে, বৃথা সময় ও শক্তি ক্ষয় করিলে চলিবে না।

এখন প্রশ্ন এই, এ বিষয়ে আমাদের কি চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে? তাহার পূর্ব্বে জিজ্ঞাস্য, কেন আমরা তাঁহার আহ্বান শুনিতে অথবা গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না? ইহার মধ্যে তাঁহার দিকে যে কোনও ত্রুটি আছে, তিনি যে কাহাকেও আহ্বান করেন, অপর কাহাকেও করেন না, অথবা তিনি যে আগ্রহহীন ক্ষীণস্বরে ডাকেন, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। আমরা যে কেহ কখনও অজ্ঞতা ও অবিশ্বাস বশতঃ এরূপ অভিযোগ করিতে পারি না, তাঁহার অসীম প্রেমে সন্দিহান হই না, এরূপ কথা বলিতেছি না। ধীর স্থির ভাবে বিচার করিয়া শান্ত মুহূর্ত্তে কেহ এরূপ অভিযোগ করিতে পারে না, এরূপ অবিশ্বাস অভিযোগের বিন্দুমাত্রও কারণ নাই, শুধু ইহাই আমরা বলিতেছি। ত্রুটি যে সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই দিকে, একমাত্র আমাদের দোষেই যে এরূপ ঘটে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আমরা সংসারের নানা কোলাহলের মধ্যে বিবিধ প্রকার বিষয়ভোগে একান্ত ডুবিয়া থাকি বলিয়াই সে আহ্বান আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারে না; কোনও সময়ে ক্ষীণভাবে তাঁহার ধ্বনি আমাদের কর্ণে একটু আঘাত করিলেও উহা হৃদয়ের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারে না, আমাদের বিষয়মোহঘোর ভাঙ্গিতে সমর্থ হয় না। চিত্ত এক বিষয়ে গভীর ভাবে নিবিষ্ট হইয়া থাকিলে যে সহজে অপর কিছুর দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে না, অপর কিছুর অস্তিত্বই অনুভব করিতে পারে না, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। সে কথা আমরা সকলেই জানি। তাহাতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটুকুও রস পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা ছাড়িয়া যে চিত্ত অন্য কিছুর অনুসন্ধানে অন্য কোনও দিকে ধাবিত হয় না, তাহাও সর্ব্বজনস্বীকৃত। তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, মধুরতর, কিছু পাইলে যে সহজেই সেই দিকে ধাবিত হয়, তাহাও বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু ধাবিত হইলেই যে ইচ্ছা করিবা মাত্র সে মধুরতার আস্বাদ পাওয়া যায়, এরূপ কথা কেহই বলিতে পারে না। তাহা যে সম্পূর্ণরূপেই তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করে, তাঁহার কৃপা ব্যতীত আমাদের চেষ্টা যত্ন দ্বারা লাভ করা সম্ভবপর নহে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তাই বলিয়া যে আমাদের চেষ্টা যত্নের কোনও প্রয়োজনই নাই, কখন তাঁহার কৃপা হইবে সেই প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট ভাবে আলস্য উদাসীনতায়ই কাল কাটাইতে হইবে, এরূপ কথাও কিছুতেই বলা যায় না।

আমরা আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষার দ্বারা দৃষ্টিপরিবর্ত্তনের, বহির্ম্মুখীনতার স্থলে অন্তরমুখীনতা আনয়ন করিবার, প্রয়োজনীয়তাবোধ জন্মাইতে ও তজ্জন্য হৃদয়ের আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে পারি, এবং কিছু পরিমাণে এ বিষয়ে কার্য্যতঃ সফলতা লাভ করাও নিশ্চয়ই সম্ভবপর। এ সম্বন্ধে যাহাদের কোনও পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা আছে, যাহারা পূর্ব্বে উৎসবের মধ্যেই হউক কি অন্য সময়েই হউক তাঁহার কৃপার পরিচয় পাইয়াছে, তাহারা যে সে কথা স্মরণের দ্বারা এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা পাইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যাহাদের সে অভিজ্ঞতা নাই তাহারাও, অপরের সাক্ষ্য পাইয়া, অন্ততঃ অনুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়াও, তাহার সত্যতা পরীক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত হইতে পারে। এরূপভাবে হৃদয়ের উন্মুখীন অবস্থা আনয়ন করিলে, তাঁহার আহ্বান শ্রবণ করা নিশ্চয়ই অনেকটা সহজ হইবে। কিন্তু তাহাতেই যে সকল বাধা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইবে, তাহা বলা যায় না। অনেক সময় চারিদিকের নানা কোলাহল মনকে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়, অথবা সে ধ্বনিকে বহু পরিমাণে ডুবাইয়া ফেলে, সুস্পষ্টরূপে শুনিতে দেয় না। তখন বিশেষভাবে উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে হয়। তখন তাহা শুনিবার জন্য অপর সমুদয় বিষয় হইতে মনকে সবলে আকর্ষণ করিয়া, অন্য সকল প্রকার কোলাহল ও ধ্বনিকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহাদের নীচে ডুবিয়া, সমগ্র মন প্রাণের সহিত ব্যাকুল ভাবে চেষ্টা যত্ন করিতে হয়,—অতি ক্ষীণ ভাবে হইলেও, সেই ধ্বনিটি না ধরিতে পারা পর্য্যন্ত কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে হয় না। একবার তাহা ধরিতে পারিলে, বাছিয়া ও চিনিয়া লইতে পারিলে কিন্তু উহা ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে,—অবশেষে অপর কোনও ধ্বনি যা

কোলাহল, আর শ্রুতই হয় না। তাঁহার আহ্বান সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য—এই রূপই করিতে হয়, এরূপই হইয়া থাকে।

এই উপায়ের কথা বলিয়া দেওয়া যত সহজ, কার্য্যতঃ অবলম্বন করা যে তত সহজ নয়, অনেক কঠিনই, তাহা আমরা ভাল করিয়াই জানি। আমাদের দুর্ব্বলতা ও দীর্ঘকালের বিরুদ্ধ অভ্যাসের কথা যে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা নহে। শুধু আপনার শক্তি ও চেষ্টা যত্নের উপর নির্ভর করিলে ব্যর্থতা অনিবার্য্য, আমাদের অনেকেরই সফলতা লাভ করিবার কোনই আশা ও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে চেষ্টা যত্ন ছাড়িয়া দিতে হইবে, এরূপ কথা নিশ্চয়ই কেহ বলিবে না। তাঁহার করুণা ভিক্ষা করিয়া, তাঁহার শক্তির উপর নির্ভর রাখিয়াই আমাদের সকল চেষ্টা যত্ন করিতে হইবে। এই হেতু প্রার্থনাই যে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্বল ও উপায়, তাহা আর অধিক করিয়া না বলিলেও চলিবে। নিজের ও অপর সকলের জন্ম অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। তাঁহার মধুর আহ্বান শুনিবার পক্ষে আমাদের মধ্যে ও চারিদিকে যে সকল বাধা বিঘ্ন আছে, তাহা যাহাতে সমস্ত বিদূরিত হইয়া যায়, সে সমুদয় হইতে মুক্ত হইয়া যাহাতে আমরা সকলে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর রূপে, গভীর হইতে গভীরতর ভাবে, হৃদয়ে সে বাণী শুনিতে পারি, আকুল প্রাণে, আশান্বিত হৃদয়ে, উৎসবের জন্ম প্রস্তুত হইতে, তাঁহার অসীম প্রেমে পুণ্যে স্নাত হইবার জন্ম ছুটিয়া যাইতে, সমর্থ হই, তাহার জন্ম সরল ব্যাকুল অন্তরে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতে হইবে। সরল অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনা কখনও ব্যর্থ হয় নাই, হইবে না। করুণাময় পিতা কৃপা করিয়া আমাদিগের সকলকে এই ভাবে তাঁহার উৎসবের মধুর আহ্বান ভাল করিয়া শ্রবণ করিতে সমর্থ করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেকের ও সমগ্র সমাজের জীবনে জয়যুক্ত হউক।

## সত্যস্বরূপের আধ্যাত্মিক উপাসনাসাধন, শিক্ষাদান ও প্রচার।

( ৫ )

উপাসনা কিরূপে করণীয়? প্রণালী কি?—এ প্রশ্ন মাঝে মাঝে শোনা যায়। কেও কেও বলেন—ব্রাহ্ম সমাজে ধর্ম্ম-সাধনের কোন প্রণালী নাই! এমন অদ্ভুত কথা বাইরের লোকে বল্লে, ধর্‌বার বিষয় নয়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ভিতরের লোকও এমন কথা বলেন, এই আশ্চর্য্য।

রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, এবং পণ্ডিত শিবনাথ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নেতা এবং আচার্য্যগণ বিশেষরূপে ব্রহ্মোপাসনার এবং ধর্ম্মসাধনের প্রণালী বিবৃত করেছেন। ধর্ম্মসাধনের উপায় ও প্রণালী ব'লে একটা কোন কাজ জিনিস ব্রাহ্মসমাজে নির্দ্দিষ্ট নাই, তা হ'তেও পারে না। জগতের একমাত্র স্রষ্টা পাতা বিধাতারূপে, সৃষ্টিপর্য্যালোচনা ক'রে, পরমাত্মার ধ্যান করা, "ওঁ তৎসৎ" "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বাক্য অবলম্বনে ব্রহ্মের ধ্যান করা, গায়ত্রী অবলম্বনে জগতে এবং আত্মাতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" প্রভৃতি মন্ত্র অবলম্বনে সর্ব্বত্র তাঁকে দেখা, ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মতত্ত্ব মূলক শাস্ত্রবচন পাঠ ও মনন করা, গভীর ধ্যানে মগ্ন হওয়া, ব্যাকুল প্রার্থনা করা, ধর্ম্মবন্ধুগণের সঙ্গে গৃহে এবং মন্দিরে কীর্ত্তন, অধ্যয়ন, আরাধনা, ধ্যান এবং সাধন-প্রসঙ্গ করা,—ইত্যাদি অন্তরঙ্গ সাধনের ইতিহাসই ব্রাহ্মসমাজের সত্য ইতিহাস। এ সব তত্ত্ববিচার নয়, ব্যাকুল আত্মাগণের আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ও সফলতার জীবন্ত সাক্ষ্য।

এই সকল অন্তরঙ্গ সাধনের ক্ষেত্র ও ভূমিরূপে জীবন-সংস্কার, পরিবারসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, সত্য-বিচার, কর্ত্তব্যনির্ণয় ইত্যাদি স্বভাবত ওই ধর্ম্মসাধনের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের ১ম ও ২য় ভাগ, আত্মজীবনী, শ্লোকসংগ্রহ, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, ব্রহ্মগীতোপনিষদ্, True Faith, নবসংহিতা, জীবনবেদ, আচার্য্যের উপদেশ, সেবকের নিবেদন, গৃহধর্ম, শাস্ত্রী মহাশয়ের সাধন-বিষয়ক উপদেশাবলী, আশীষ, সাধনবিন্দু, Brahma Sadhan, প্রভৃতি গ্রন্থ ও ব্যাখ্যানাদিতে ধর্ম্মসাধনের অন্তর ও বাহ্য প্রণালী সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে, এবং সে প্রণালীগুলি এ যুগেই, ব্রাহ্মসমাজেই, সাধিত হয়েছে, এবং এখনও নানা জীবনে সাধিত হয়ে অমৃতময় ফল দান কর্‌ছে।

ব্রাহ্ম হ'তে গেলে যদি এত কাণ্ড কর্‌তে হয়, তবে তো বড় বিপদ দেখ্‌ছি,—এই রকম হ'ল আমাদের অনেকেরই ভাব। কিন্তু ব্রাহ্ম হ'তে গেলে এ সবই চাই। তা না হ'লে উপাসনা হয় না। ভগবানে প্রীতি এবং তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধন মানেই এই সব। "তস্মিন্ প্রীতিঃ তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ"—এই বাক্য উচ্চারণ করা, কিছুই না। এই সব সাধন বাদ দিয়ে, ব্রাহ্ম হওয়ার কোন মানে নাই। ভগবানে ভক্তি, মানবে প্রীতি এবং ভগবানের ইচ্ছার অধীন হয়ে সংসারের কাজ করা—এই হ'ল সার সত্য! এই সত্যকে জীবনে পরিণত কর্‌তে হ'লে উক্ত বিবিধ সাধন অবলম্বন আবশ্যক। কোথায় ভগবান, আর কি তাঁর ইচ্ছা, সে বিষয়ে জ্ঞান নাই, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ কোথায় তা জানি না,—ভগবানে ভক্তি এবং মানবে প্রীতি হচ্ছে কি ক'রে, ভগবানের ইচ্ছার অধীনই বা হওয়া যায় কিরূপে? সত্যস্বরূপের আধ্যাত্মিক উপাসনা—একটা কিছু ক'রে খালাস হওয়া নয়। ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সাধকগণের জীবন তার প্রত্যক্ষ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ব্যক্তিগত জীবনে কু-অভ্যাস, কু-সংস্কার, দুর্নীতি ও পাপ বর্জ্জন, আত্ম সংযম ব্যতীত পবিত্রস্বরূপের প্রতি প্রীতি, তাঁর সাথে যোগ হয় না,—এ দেখে, ঠেকে, সংগ্রাম ক'রে, এ পথে অগ্রসর হ'তে হয়েছে, সকলকেই তা কর্‌তে হবে। পরিবারে অসত্য কুসংস্কার দুর্নীতি পাপ থাক্‌লে সেখানে সত্যস্বরূপের আসন পাতা যায় কি ক'রে? "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য" হয় না, দেখেই, সমান অধিকার স্পষ্ট হয়েছিল, তার ফলে স্ত্রীগণকে শিক্ষাদান শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি। আবার সমাজ বিশুদ্ধ না হ'লে পরিবারে ধর্ম্মসাধন কঠিন—আর [illegible]

সমাজগঠনে মনোযোগ। এ সবই জানা কথা, ইতিহাস। কিন্তু আমাদের এই জ্ঞান এখনও অন্তরকে স্পর্শ করে নাই, জীবনের শক্তিতে পরিণত হয় নাই,—তাই আমরা এ সব কথা বেশ বলি ও শুনি, কিন্তু এ সব দ্বারা আমাদের জীবন নিয়মিত হয় না।

এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মসাধন যেমন বিশাল গভীর ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বরূপে প্রকাশিত ও সাধিত হয়েছে—এমন আর কোথাও হয়েছে কিনা জানি না। নানা জাতির নানা যুগের যত শ্রেষ্ঠ সত্য সাধনা সবই ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হয়েছে এবং হবে—মতে নয়, তত্ত্বহিসাবে নয়, জীবনগত সাধনরূপে। তার ফল যে কি তা সাধকগণের জীবনের পানে তাকালেই স্পষ্ট দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজের জীবনীশক্তি এই সাধনে, সাধননিষ্ঠায়, এবং দুর্ব্বলতা এর অভাবে।

এ সাধন একটা কোন গুরুর মন্ত্র বিশেষ জপ করা বা তাঁর উপদেশ মত বিশেষ প্রণালীতে কিছু করা নয়,—চট ক'রে সারা যায় না, অন্ধভাবে অভ্যাস বশতঃ হয় না, আরাম ক'রে থেকেও হয় না। এ সাধনের জন্য, আধ্যাত্মিক উপাসনার জন্য, মনকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখ্‌তে হয়, হৃদয়কে সর্ব্বদা সরস ও সজীব রাখ্‌তে হয়, ইহাকে সর্ব্বদা প্রস্তুত,—সুদক্ষ সৈনিকের মত প্রস্তুত ও ইচ্ছুক—রাখ্‌তে হয়। তারই জন্য শাস্ত্র, সাধু, ধর্ম্মবন্ধু, পরিবার, সমাজ, সমস্ত সৃষ্টি।

( ক্রমশঃ )

# দ্বিতীয় শতাব্দীর কার্য্য

ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে অতীতের আলোকে ভবিষ্যৎ বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। নর-নারী সাধারণের সমান অধিকার—এই তত্ত্বকে আকার দিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব। কার্য্যক্ষেত্রে ইহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের কাজ। সে কাজ কেবল কয়েকটি বাহিরের সংস্কার সংসিদ্ধ হইলেই হইল না। তাহা হইলে তো লোকে বলিবেই, আমরা জাতিভেদ তুলে দিয়েছি, বিধবা বিবাহ দিচ্ছি, বাল্যবিবাহ উঠে যাচ্ছে, নারীর শিক্ষাবিস্তারে বাধা নাই, ও অবরোধপ্রথা তো অতীতের কথা, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের আর প্রয়োজন নাই।

যদি কথাগুলি সত্য হইত তবে ব্রাহ্মগণ যেমন আনন্দিত হইতেন তেমন আর কেহই নহেন। কিন্তু কথাগুলি সত্য নহে। উহাকেই চলিত ভাষায় বলে, গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি। উহার কোন সংস্কারটাই এমন মূল গাড়িয়া বসে নাই, যে বলা যাইতে পারে—ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ধানে সংস্কারের বিরোধীদল কর্ত্তৃক সমর্থনকারীরা পরাজিত হইয়া দেশ "পুনর্মূষিক" হইয়া পড়িবে না। আইন সত্বেও সেদিন যখন দেখা গেল, আত্মহত্যা "সতী" নামে মানুষের মাথায় পা তুলিয়া দিতেছে এবং যে সকল কাগজে উহা আত্মহত্যা নামে অভিহিত হইয়াছিল তাহাদিগকে অন্যান্য কাগজে শাসন করা হইল, তখন কি করিয়া বিশ্বাস করা যায় যে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন আর নাই? উহা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কথা। মানবজীবনে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ব্রাহ্মসমাজের সকল অনুষ্ঠান। স্বীকারই না হয় করিলাম, যে ঐ সকল সংস্কার কার্য্যের জন্য দেশের সর্ব্বসাধারণ প্রস্তুত হইয়াছেন যেমন ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বসাধারণ এ জন্য হাতে কলমে প্রস্তুত। কিন্তু দেশ কি ব্রাহ্মসমাজের এই আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই সকল সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, যেমন ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছিলেন? নতুবা সব কাজ শাঁস ছেড়ে দিয়ে খোসাচর্ব্বণ। এক এক ক'রে বিচার ক'রে দেখা যায় যে দেশে খোসাচর্ব্বণই চলিতেছে, বস্তু বহু দূরে। জাতিভেদ সম্বন্ধে কিছু কিছু আন্দোলন চলিতেছে বটে—সেও মূলে হাত বড়ই কম দেওয়া হইতেছে—নাম তার অস্পৃশ্যতাপরিহার, মূল জাতিভেদের প্রশ্ন হইতে অনেক দূরে। তাও কিসের জন্য? মানুষ ব'লে মানুষের অধিকার মানুষকে দিবার জন্য কি? না, অস্পৃশ্যকে অস্পৃশ্য ব'লে দূরে রাখ্‌লে হিন্দুর রাষ্ট্রীয় আন্দোলন টেঁকে না এবং মুসলমানের সঙ্গে দাবী দাওয়ায় বেশহ একটু বেগ পেতে হয়। বিধবাবিবাহ দিতে হয়; কেন না, নারীরক্ষা সমিতি আর নারীর সম্মান রক্ষা ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছেন না। পুরুষের ন্যায় নারীরও এ বিষয়ে সমান অধিকার, ইহা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নয়। মেয়ের বিবাহের বয়স বাড়্‌ছে, কেন না, একটী মেয়ের বিবাহ দিতেই যদি বাড়ী বন্দক দিতে হয়, তবে সে বন্দক খালাস কর্‌তে একটু সময় লাগেই। নতুবা যেখানে সুবিধা আছে, ভাল পাত্র পেলে মেয়েকে কেউ ধরে রাখে না। মেয়ের শিক্ষা দিতে হয়, কেন না, বিবাহের বয়স বাড়্‌তেছে। স্বাধীনভাবে বর-নির্ব্বাচনে মেয়ের স্বাভাবিক অধিকার, সেজন্য মেয়ের বিয়ের বয়স বাড়িতেছে না; তেমনই মেয়েও "মানুষ", তারও ছেলেরই মত শিক্ষার অধিকার, সেই জন্য মেয়ে শিক্ষা পাইতেছে না। সুতরাং নানা কারণে, বিশেষভাবে মেয়েরাই বাধা মানিতেছে না, তাই অবরোধও দিন দিনই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—অবরোধ ভাল নয়, সে জন্য নয়, কিন্তু অবরোধে রাখা যায় না, সেই জন্য অবরোধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে।

ব্রাহ্ম সমাজ চেয়েছিলেন, মানবজীবনে ব্রহ্মের প্রকাশ—free Self-realisation in the human soul—সেই আদর্শের দ্বারা যে দেশ এখনও পরিচালিত হইতে শেখে নাই, উপরের দৃষ্টান্তগুলিই তার পরিচয়। যাহার সম্বন্ধে দাবী উপস্থিত হইয়াছে তাহারই বিচার করিলাম, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার তো গভীর অতলে নিমজ্জিত। ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই এই সকল সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেশ তখন সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। এখন বুদ্ধির বিচারে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ইহাতে একটা অনিষ্ট সূচিত হইতেছে। Benjamin Kidd বলেন—When the intellectual development of any section of the race has for the time being, outrun its ethical development, natural selection has apparently weeded that section out like any other unsuitable product".

ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজনতো শেষ হয়ই নাই, দেশকে এই বিনাশের পথে যাওয়া হইতে সতর্ক করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজই একমাত্র আলোকস্তম্ভরূপে দেশের সম্মুখে দণ্ডায়মান। রাজর্ষি রামমোহনকে তাঁর সমসাময়িকেরাই বলিয়াছিলেন, "a man of thousand years." তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সমাজের কাজ একশত বৎসরে শেষ হইয়াছে বলিবার ধৃষ্টতা কোন বুদ্ধিমান লোকের থাকিতে পারে না।

এখন বাহির হইতে ভিতরে আসা যাক্। যদি বাস্তবিকই বাহিরের forms গুলি স্বীকৃত হইয়া থাকে, তবে দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজের কাজ হইবে এগুলির spirit, ইহাদের অন্তর্নিহিত principle প্রচার করা। Good government is no substitute for self-government. আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্ব-অধীনতা—মানুষের জন্মগত অধিকার। ইহা বিসর্জ্জন দিয়া, ভাল খেয়ে ভাল প'রে জীবিত থাকা মৃত্যুরই নামান্তর মাত্র। What doth it avail you if you gain the whole world but lose your own soul? ইহা জরথুষ্ট্রের সময়কার প্রাচীন কথা। প্রাচীন হইলেও এখনও সত্য। কেবল রাষ্ট্রীয় জীবনে নয়, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মূল্যও এই মহা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই বাল্যবিবাহের কথাই ধরি না কেন, ইহার শত গুণকীর্ত্তন কর, যৌবন বিবাহের শত দোষ উদ্ঘাটন কর, কিন্তু ইহা যখন মানব জীবনের এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপারে তার স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাকে নিত্য ব্যবহার্য্য একটা ঘটি বাটিরই মতন ব্যবহার করে, তখন ইহার কোন গুণই গুণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ এই শৈলবেদী হইতেই বাল্যবিবাহ পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছিলেন। তাই, ছয় কন্যার ব্রাহ্ম পিতা, অতি আদরণীয় দুই বরের পিতা দুইটী কন্যার প্রার্থী হইলে, এই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, যে বরেরা কন্যার অনুমতি লাভ না করিলে তিনি কোন কথাই বলিতে পারেন না।

প্রাচীনকালে মানুষ যে সকল সম্বন্ধে আবদ্ধ হইত, এখনও তাহাই হয়। কিন্তু প্রাচীনকালের আদর্শ আর এখন চলিবে না। প্রথম, প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধের কথাই বিচার করা যাক্। প্রাচীনকালের slave ও master—দাস ও প্রভু—সম্বন্ধ এখন সর্ব্বত্র পরিত্যক্ত। এখন Contractual relation—আমি কিছু দি তুমি বিনিময়ে কিছু দাও—এই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত। তবে ৫৲ কি ১০৲ টাকা দিয়া একজন মানুষের মাথা কিনে রেখেছি এরূপ ভাবা, একটা ত্রুটি হলেই অমনি অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠা অন্যায়। বর্ত্তমান আদর্শ পরস্পরের সাহায্যের ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভৃত্য আমার যে সব কাজ ক'রে দেয় তা আমাকে করিতে হ'লে আমার যে আর কোন কাজ করা হয় না—সে আমার কত সময় ও শক্তি উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার অবসর দেয়, ইহা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখিলে—যেমন বহুবার মৈত্রেয় মহাশয়কে করতে দেখে প্রাণে আনন্দ হয়েছে—প্রচলিত তথাকথিত প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধের ভাবটা ভুলে যেয়ে প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধও যে দুইজন 'মানুষের' মধ্যে সম্বন্ধ তাহা লক্ষ্য করিবার অবসর হয়। এইরূপেই ব্রাহ্মধর্ম-নির্দ্দিষ্ট সাম্য—relation of equality প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন মানুষের স্বাধীনতায় অন্যের হাত নাই। ভৃত্যেরও আত্মোন্নতির যথেষ্ট সময় ও অবসর থাকা চাই। এমন সুযোগও থাকা চাই যেখানে প্রভু ও ভৃত্য পরস্পর মানুষভাবে—man and man—এইভাবে মিশিতে পারে। মানুষ সকলেই—এই কথা যেন কখনও ভুলিয়া যাওয়া না হয়। টাকা দিয়া, সাহায্য দিয়া, করুণা দিয়া আত্মাকে কেনা যায় না—স্বাধীনতার মূল্য নাই। স্বাধীনতা হরণ করিয়া আর কিছুতেই তার ক্ষতিপূরণ হয় না।

দ্বিতীয়, ধনী-দরিদ্রের সম্বন্ধ। ধনী যা করে না, দরিদ্র তা করে, করে বলিয়া সমাজ চলে। দরিদ্রের পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে ধনী কিছু দেয়। ধনী দিতে বাধ্য। প্রত্যেক ভারতীয়ের গড়ে আয় ৩০৲ টাকা। যাঁর আয় ৩০০৲ বা ৩০০০৲ তাঁর কি ১০ জন বা ১০০ জনকে ভরণ করা কর্ত্তব্য নয়? নতুবা তিনি বহু-লোকের অন্ন আত্মসাৎ করিলেন। দিয়াই তিনি এই অধর্ম্ম হইতে রক্ষা পান। আমি দেই ব'লে আমি বড়, ইহা মনে করা ভুল। পরিণামে দেখ্‌তে গেলে যেখানেই আমি দেই প্রকাশ্যতঃ অপ্রকাশ্যতঃ আমিও পাই—পাই ব'লেই দেই—এখানেও এই relation of equality যেন কখনও ভুলিয়া না যাই। এই কথা ভু'লে আজ জগৎ বিষম অনর্থের দিকে চলেছে।

দরিদ্রনারায়ণের কথাটা আজ কাল খুবই প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু একমুষ্টি অন্ন দিয়াই কি নারায়ণের দাবী শেষ হয়? যাকে বলি দরিদ্র, তাকে সকল অধিকার হ'তে বঞ্চিত রেখে ঐ নামটার জোরেই তাকে আরও বঞ্চিত করা হচ্ছে। spirit ছেড়ে form—বস্তু ছেড়ে খোসার দিকে যে আমাদের একটা ঝোঁক্, ইহাও তাহারই একটা দৃষ্টান্ত। দরিদ্রের উন্নয়নে, নিম্ন-শ্রেণীর উন্নতিবিধানে যারা হয়তো স্বতঃ পরতঃ পরিপন্থী তাদের মুখেও দরিদ্র-নারায়ণ নাম শুনা যাবে। কিন্তু এ ভাব আর বর্ত্তমান জগতে বেশী দিন টিকিবে না।

যাহা হউক, এই যে অক্ষমকে আমি দেই, সে যে আমাকে কত দেয় তা' কি আমার ধারণার মধ্যে আসে? আমার সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ দাতা ও গ্রহীতা—সুতরাং আমার দান যে গ্রহণ করে সে যে আমাকে কত বড় ক'রে দেয়, তা কি আমি ভাবি? ধর্ম্মশাস্ত্র বলে, দরিদ্রকে দিলে ভগবানকে দেওয়া হয়। সুতরাং এখানে উচ্চ নীচের প্রভেদ চ'লে গেল—কে ধনী, কে দরিদ্র? হে ধনী, তুমি না দিলেই দরিদ্র, দিয়েও তুমি দরিদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতে পার না। দিব্যদৃষ্টিতে মানুষে মানুষে সর্ব্বত্রই সাম্য। অন্তর্নিহিত যে সাম্য এখানে ধরা পড়িল, বাহ্য বৈষম্য দূরীভূত ক'রে সেই সাম্যকে প্রকটিত করাই জনসেবার উদ্দেশ্য। সেই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম জনসেবায় হাত দিয়াছিলেন। ধর্ম্মকে মানুষের সম্বন্ধের মধ্যে দেখে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ না করতে পারলে বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম কোণ ঠ্যাসা হয়ে পড়বে। প্রতি পদে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে তথাকথিত ধর্ম্ম-হীন জনসেবা সেবাহীন ধর্ম্মকে পরাজিত করছে। সেই জন্য Humanism ইহার নিরীশ্বরবাদাত্মক গতি সত্ত্বেও, বিচারের দিক থেকে উহার ভিত্তিহীনতা প্রদর্শন করা সত্ত্বেও, জগতে

স্বাধিকার বিস্তার করিতেছে। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। Unitarianরা Humanismকে আপনার অঙ্গীভূত ক'রে নিচ্ছে ব'লে বৃথা আফ্‌শোষ না করে, যে গুণে Humanism লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে সেই গুণ আহরণ করিতে হইবে,—we must take the wind out of their sail, নতুবা Humanism এগিয়ে যাবেই।

রাশিয়াতে এক ভীষণ বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে—মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে ন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই উহার উদ্দেশ্য। এই গুণে, ইহার শত দোষ সত্ত্বেও, ইহা দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই democratic যুগে, এই সাম্যের যুগে, ইহাকে বেড়া দিয়া ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না, সে বেড়া বৈদ্যুতিক তারের বেড়া হইলেও না। ইহার মধ্যে যে দোষ দেখা যাইতেছে তাহা পরিহার করিয়া ঐ সত্য জিনিষটাকে গ্রহণ সাধন ও প্রচার করিতে হইবে, নতুবা দোষ সমেতই ঐ জিনিষটিকে একদিন জগৎকে গলাধঃকরণ করিতে হইবে। দ্বিতীয় শতাব্দীতে সকল সম্বন্ধের মধ্যে এই সাম্য সাধন ও প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রধান কাজ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ

## ভারত মহিলা সমিতির কর্ত্তব্য।

কি ভাবে আমাদের ভারত মহিলা সমিতি পরিচালিত করিতে চাই, আজ সেই বিষয়ে আলোচনা করিতেই আমরা মিলিত হইয়াছি। সমিতির ৩৩ বৎসর প্রায় পূর্ণ হইতে চলিল। ৪ঠা আগষ্ট সমিতি ৩৪ বৎসরে পদার্পণ করিবে। কিন্তু আজ আমাদিগকে আকুল হইয়া চিন্তা করিতে হইতেছে যে, কি করিয়া সমিতি চালাইব। ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে যখন সমিতিতে প্রবেশ করি, তখন এই আশা ও আনন্দ মনে জাগিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে, নিজ নিজ জীবন গঠন করিব, পরিবার ও সমাজের গুরুতর কর্ত্তব্যসকল পালন করিব; পাড়াপ্রতিবাসী, বঙ্গবাসী, ভারতবাসী সমস্ত দেশবাসী সকলের কল্যাণের জন্ত নিজে পরিবার ও সমাজসহ নিযুক্ত থাকিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিব। সবাই প্রাণে প্রাণে মিলিয়া পরব্রহ্মের পূজা ও প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া জগতের সকল পাপ তাপ, দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে মঙ্গলময়ের ইচ্ছাকেই জয়যুক্ত করিয়া সর্ব্ব দুঃখ হরণ করিব। সকলে এক পিতার সন্তান, একমনপ্রাণতার দ্বারা তাহা জগতে প্রচার করিয়া পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিব, ইহাই একমাত্র উচ্চ আশা ছিল। কিন্তু আজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এবং আমাদের অনেকেরই ৫০ বৎসর গত হইয়া গেল, ব্রাহ্মসমাজের শত বার্ষিক উৎসব সমিতির ৩৩ বাৎসরিক জন্মোৎসবের পরেই আরম্ভ হইবে।

কিন্তু কোথায় আজ আমাদের ভগিনীতে ভগিনীতে একপ্রাণতা, কোথায় এক হৃদয়ে, আমার বলিয়া যাহা মনে করি তাহা পাইয়া, ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণকর কার্য্যে, প্রাণারাম পরব্রহ্মের পূজায় ও সেবায়, নিযুক্ত হইবার জন্ত আকুল চেষ্টা? কিছুই নাই; অথচ ৩৩ বৎসরে, ৫০ বৎসরে, শত বৎসরে, তাঁহার করুণাধারা জীবনে পরিবারে ও সমাজে যত সুখ ও আরাম, সুযোগ ও সুবিধা আনিয়া দিয়াছে, তাহা ভোগ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিতেছি, আনন্দিত হইতেছি।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে দুঃখ দরিদ্রতার মধ্যে আমাদিগকে যেরূপ যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, হয় ত অনেকের এখন তাহা নাই। আর রোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য থাকিলেও, সামাজিক ও পারিবারিক স্বাধীনতার জন্য নিজ বুদ্ধি ও শক্তি প্রয়োগ করিবার সুযোগ হওয়াতে, তাহা তত দুঃখ ও পীড়াদায়ক নহে। নিজের বা পরিবারের যে দুঃখ ও ক্লেশের মধ্যে আমরা যথাশক্তি বুদ্ধি ও শক্তি প্রয়োগ করিতে পারি, তাহা তত কষ্টকর বোধ হয় না। পরম দয়ালু পরমেশ্বরের ইহা এক অমোঘ নিয়ম এই দেখিতে পাইতেছি যে, ইচ্ছাকৃত যে দুঃখ, বরণ করিয়া লই যে দুঃখ, তাহার ভিতরে আনন্দ আছে, শক্তি ও বুদ্ধির চালনাজনিত সুখ আছে। আজ স্বামী পুত্র কন্যার জন্য, তাহাদের শিক্ষা সুখ আরাম পার্থিব উন্নতি এবং সন্তানদের বিবাহ ইত্যাদির জন্য যিনি যাহা করিতে চাহেন, তাহাতে সমস্ত শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করিবার সুবিধা প্রচুর পাইয়াছেন, বাধা কিছু নাই। সকলেই পুত্র কন্যার সুখ আরামের প্রতি, ধন ঐশ্বর্য্যের প্রতি সমগ্র হৃদয়ের দৃষ্টি দেওয়াতে, পুত্র কন্যার জীবনে তাহা আনয়ন করিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের দৃষ্টিও নিজ সুখ ও আরামের প্রতি একাগ্র করিতে পারিয়াছেন। ইহা যে আমাদের সমাজে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত অতি ক্ষুদ্র আকারে দেখিতে পাই মন্দিরে বসিবার সময়ে। মন্দিরে পরে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের বসিবার কথা কেহই একবারও ভাবেন না, যেখানে বসিলে নিজের সুবিধা হয় সেইরূপ স্থানেই বসেন, এবং বসিবার জন্য তাঁহার কল্পিত যে সুবিধা, ইচ্ছাকৃত যে সুবিধা, তাহাই ভোগ করেন; যে কার্য্যের জন্য বসেন তাহাতে মনোযোগ দিবার অনেক অসুবিধাও সহ্য করেন এবং সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকেন। এইরূপ সকল বিষয়ে নিজের মধ্যে, নিজ পরিবারের মধ্যে—তাহাও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে, মাত্র কয়েকটীর মধ্যে—আবদ্ধ করিয়া আমরা আপনাকে অন্য হইতে পৃথক করিয়াছি। আমাদের ব্যবহার, কাজ কর্ম্ম, চলা ফিরার মধ্যে আপনার সুখ আরাম বা তাহার কল্পনার দিকে সমগ্র দৃষ্টি দিবার সাধন যে একান্তই সত্য, তাহা আমাদের নিজ জীবন পরিবার ও সমাজ দ্বারা প্রমাণ হইতেছে।

নিজ সুখের দিকে একাগ্রদৃষ্টি (পরিবার ও সমাজ তাহার মধ্যেই) প্রেম জন্মিবার একান্ত পরিপন্থী। আমরা ব্রাহ্ম মহিলাগণ কি ব্যক্তিগত, কি পারিবারিক, কি সামাজিক ভাবে, সমবেত ভাবে প্রেমের একান্ত পরিপন্থী সাধনায় নিযুক্ত হইয়াই আজ ব্রাহ্মসমাজকে সর্ব্বপ্রকারে শক্তিহীন করিয়াছি। মঙ্গলময়ের কল্যাণকর কার্য্যে

সমিতির ১৯২৮ সালের এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীমতী সুশীলা বসু কর্ত্তৃক নিবেদিত।

সন্তান সন্ততি সহ, আত্মীয় স্বজন সমাজ সহ, আমরা বাক্য কার্য্য, চিন্তায় বাধা দান করিতেছি। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, সত্য সত্যই চিন্তায় বাক্যে কার্য্যে, গার্হস্থ্য কর্ম্মের প্রণালীতে, তাঁহার কল্যাণপ্রদ ইচ্ছায় বাধা দিয়া আজ সমিতির কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে শক্তিসঞ্চয় করিতে, শক্তিসঞ্চার করিতে আশা করিতেছি। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের রাজ্যে এরূপ কার্য্য সম্ভবপর হয় না, এরূপ কার্য্য সফল হয় না, কার্য্যকারী হয় না, স্থায়ী হয় না। মঙ্গলময় পিতা আমাদিগকে যে পারিবারিক ও সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত কর্ত্তব্য তাঁহার ইচ্ছামত পালন করিবার জন্য, বহন করিবার জন্য, চেষ্টিত হইলে, তাঁহার শরণাগত হওয়া, তাঁহার শক্তি-লাভের জন্য ব্যাকুল হওয়া, তাঁহাতে বিশ্বাসী হওয়া, তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করা, ছাড়া অন্য পথ নাই, অন্য উপায় নাই। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম সংসার ও ধর্ম্মকে এক করিয়াছেন; সংসার-ত্যাগ তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ, ইহা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু সে সংসার কি নিজের ইচ্ছামত সংসার, যাহাতে কেবল ভোগ—প্রবল ইচ্ছা, বাসনা, আসক্তি? যাহা ভাল লাগে তাহাতেই নিজকে ছাড়িয়া দেওয়ার সংসার? তাহা কখনও নয়। সে সংসারের কর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর। একটী সামান্য কার্য্যও নিজের ইচ্ছামত করিতে প্রয়াসী হওয়া—এমন কি তাহার কল্পনা পর্য্যন্ত—অপরাধ। সকলে চিন্তা করিয়া দেখুন, তাঁহার ইচ্ছামত ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হইলে, কত ত্যাগ, কত বৈরাগ্য, কত বিশ্বাস, কত ধৈর্য্য, কত সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। নিজের ভাললাগা না লাগা বা নিজের ইচ্ছা দমন করিতেই কত শক্তির প্রয়োজন! সে সব শক্তি কোথা হইতে আসিবে? সেই প্রভু হইতেই আসিবে, যিনি ইচ্ছা জানান।

সন্তান ও ভৃত্যকে সমান দেখা কি আমরা কল্পনা করিতে পারি? ধর্ম্ম হইতেছে নিজের মতলব, নিজের অভিসন্ধিকে তীব্র আঘাত দিয়া প্রতিরোধ করা। আর, আপন মতলব, অভিসন্ধি, ইচ্ছাই যদি সর্ব্বকার্য্যের বা জীবনের নিয়ামক হয়, তবে মিল হইবে কেমন করিয়া? কল্যাণ হইবে কেমন করিয়া? এই জন্যই নিজ আসক্তি অভিরুচিতে যে সন্তানের, যে প্রাণাধিক জনের, কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেছি, তাঁহাদের সহিতও মিলনজনিত শান্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই। ইচ্ছার প্রবলতা দাবানলের ন্যায় আমাদের সমাজের সকলের জীবনকে গ্রাস করিতেছে। এখানে ধর্ম্ম মিলন শান্তি পূজা প্রিয়কার্য্য কিছুই সম্ভবপর নয়। নিজের প্রতি এবং যাহাদের জন্য আমরা শক্তি বুদ্ধি অর্থ ভালবাসা ব্যয় করিয়াছি তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিলেই, এই কথা যে অতি সত্য তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। কেবল ব্রাহ্মসমাজ নয়, হিন্দু সমাজেও যে এই সুখ ও আরামপ্রিয়তা, নিজের ইচ্ছা, ভাললাগা বা না লাগা যে ক্রমশঃ তাহার অধিকার বিস্তার করিতেছে, তাহার জন্য ব্রাহ্ম মহিলা, শিক্ষিতা মহিলা,আমরা দায়ী। যাহা ভাল লাগে, যাহাতে আনন্দ-লাভ হয়, তা-ই কর; তাহাতে যে ভয় করে সে ভীরু কাপুরুষ; ইহাই সামাজিক ভাবে আমাদের মনোগত ভাব। আর যাহারা যাহা ভাললাগে তাহা করে না বলে, তাহারা ভণ্ড। হয় ভণ্ড, না হয় ভীরু কাপুরুষ। সাধু ভক্তি, ব্রহ্মভক্তি, সেবা, এই বদ্ধমূল মনোগত ভাবের মধ্যে জন্মিবার সুযোগ কি পাইতে পারে? আর অধিক বলিতে চাই না। কেবল এই বলিতে চাই, ইহাতে নিজেদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ইচ্ছার মিলন হইতে পারে না, কেবল বিচ্ছেদ, বিদ্বেষ, অমিল, নিন্দা গ্লানি, এই সব জন্মিতে পারে, এবং হইতেছেও তাহাই।

আমরা আজ সমবেতভাবে ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়া লজ্জায় মাটীর সহিত মিশিয়া যাইতেছি। যদিও লজ্জায় অবনত হইতেছি, তবু প্রভুর কৃপায় আশা ছাড়িতে পারিতেছি না। তাই আজ আপনাদের সকলকে সকাতরে একান্ত অনুরোধ করিতেছি, যদি যথার্থই ব্রাহ্মমহিলায়—ভারত মহিলা সমিতির—গৌরব বৃদ্ধি করিতে চান, তবে কোন কার্য্য, কোন চিন্তা, উপরে উপরে ভাসা ভাসা ভাবে করিলে চলিবে না। খুব গভীর ভাবে নিজকে পরীক্ষা করিতে হইবে। সমবেত ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের, ভগিনীতে ভগিনীতে মিলনের, যে বিঘ্ন আমরা উৎপন্ন করিয়াছি, তাহার মূলে প্রবেশ করিতে হইবে। সপ্তাহে সপ্তাহে মিলিবার জন্য এই জন্যই আগ্রহ। গভীরভাবে আত্মচিন্তা ও আত্মপরীক্ষার জন্য আমাদের নিকট এই চারিটি প্রশ্ন উপস্থিত:—

১। নিজ জীবনের উন্নতির পরিপন্থী—ভগবানের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ—কি কি আমরা সঞ্চয় করিয়াছি?

২। পরিবারের উন্নতির পরিপন্থী—ভগবানের অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ—কি কি আমরা সঞ্চয় করিয়াছি?

৩ ও ৪। সমাজ ও দেশ এবং জগতের উন্নতির পরিপন্থী—ভগবানের অভিপ্রায়বিরুদ্ধ—কি কি আমরা সঞ্চয় করিয়াছি?

চারি সপ্তাহে এই চারি বিষয়ের আলোচনাতে আমাদের নিযুক্ত থাকিতে হইবে:—

প্রথম সপ্তাহ—উপাসনা ও আলোচনা—আত্মবিষয়ক।
দ্বিতীয় সপ্তাহ—প্রার্থনা ও আলোচনা—পরিবারবিষয়ক।
তৃতীয় সপ্তাহ—প্রার্থনা ও আলোচনা—সমাজবিষয়ক।
চতুর্থ সপ্তাহ—প্রার্থনা ও আলোচনা—দেশ ও জগৎবিষয়ক।

এই ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহে, মাসের পর মাসে, বৎসরের পর বৎসরে, যদি সকল ভগিনী এক মনে এক প্রাণে এই কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারি, তবে আশা হয়, আমাদের সমবেত শক্তি কল্যাণপ্রদ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, আমাদিগকে আশা ও আনন্দে আপ্লুত করিবে। পরব্রহ্মের ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক, আমাদের আত্মদৃষ্টি, আত্মবোধ, আত্ম-বেদনা জাগ্রত হউক। যাহাতে তাঁহার পরম শুভ অভিপ্রায়ের সহিত অন্তরে বাহিরে সংসারধর্ম্মে যোগ দিতে পারি, তাঁহার অনুগত সেবক ও পুত্র কন্যা হইতে পারি, তিনি এই করুণা করুন।

## পরলোকগত ব্রজমোহন দাসের জীবনের দু' একটি কথা।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

আমি হিন্দুমতে মাতৃশ্রাদ্ধ করব না বলাতে, বাড়ীর আর সকলেই আমাকে নানা ভাবে বোঝাতে লাগলেন, কটু কথা বলতেও ছাড়লেন না। কিন্তু বাবা নিজে কিছু বল্লেন না।

তিনি এখন জান্‌লেন যে বামুনরা জটলা পাকাচ্ছে, আমি শ্রাদ্ধ না কর্‌লে কেউ আমাদের বাড়ী সেদিন খাবে না, অভুক্ত অবস্থায় চ'লে যাবে, তখন তিনি ঘরে ব'সে কাঁদ্‌ছিলেন, তবু আমাকে এসে একবারও বলেন নি যে আমি শ্রাদ্ধ করি। বাবার সে দিনের কান্না দেখে আমি এত বিচলিত হ'য়েছিলাম যে, আমার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে আমি হিন্দুমতে শ্রাদ্ধ কর্‌তে রাজী হ'য়েছিলাম। আমার নিজের এই দুর্ব্বলতার জন্য আজীবন অনুশোচনা হবে; কিন্তু এই ঘটনায় বাবার যে মধুর প্রকৃতি আমার কাছে ফু'টে উঠেছিল, তাতে আমার ধর্ম্মজীবনে যে আলোকরেখাপাত হয়েছে, তার মূল্যও ত কম নয়।

আমাদের পরিবারে আমার বাবা ছাড়া অার কেউ,—আমার কাকারা বা ভাইরা,—হিন্দুর দেবপূজায় বিশ্বাস করেন ব'লে মনে হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে মন্তব্যপ্রকাশ, তাঁহাদের মধ্যে কেউ কোনও দিন কর্‌লেও, বাবা কোন দিন করেননি।

বাবাকে দেখে এই মনে হয়েছে যে, যে নিজের ধর্ম্মমতকে প্রকৃত শ্রদ্ধা করে, সে অপরের মতকেও অবজ্ঞা কর্‌তে পারে না—না মান্‌তে পারে।

শুধু ধর্ম্মবিষয়ে নয়, অন্যান্য সামান্য বিষয়েও তাই। আমি ছেলেবেলা থেকে তামাক ঘৃণা করি, অথচ বাবা খুব তামাক খেতেন। তিনি কোন দিন তামাকের কথা বল্‌তেন না। একদিন দিতে গিয়াছিলাম, তিনি বল্লেন "তুমি ওতে হাত দিলে কেন?" তখনও আমি ছেলে মানুষ।

আমার ধর্ম্মপ্রাণ পিতা পুত্রদের সাংসারিক উন্নতিতে কোন দিন এমন প্রাণ খুলে আনন্দ প্রকাশ করেন নি, আমাদের মধ্যে কোন উচ্চ ধর্ম্মভাব দেখে যেমন করেছেন। আমি ভাল চাকরী পেয়েছি, চাকুরীতে উন্নতি কচ্ছি, এতে কোনদিন মনের আনন্দ তেমন ভাবে প্রকাশ করেননি; কিন্তু যখন কোন সদনুষ্ঠানের জন্য টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি জানিয়েছি সেদিন তাঁর কি আনন্দ! একদিন আমাকে আমার এরূপ কোন প্রতিশ্রুতির কথা শুনে যে চিঠি লিখেছিলেন তার কিয়দংশ পাঠ কচ্ছি:—

"আমাদের আদিপুরুষ ৺ সাধুরাম দাস মহাশয় (কিম্বদন্তি আছে) ভ্রাতাদের জন্য বাড়ীঘর প্রস্তুত করিয়া সকলের সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার অন্যান্য ভ্রাতারা যে কিছু কিছু উপার্জ্জন না করিতেন এমন নহে, তবে অন্য কেহ কিছু করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। তুমি অধিক বেতনভোগী সমর্থ ছেলে, আমি ভরসা করি তুমি ২।১ মাসের বেতন সময় সময় দিয়া সাহায্য করিলে তোমার নিজের ও তোমার ভ্রাতাদের যথেষ্ট উপকার হইবে। আমার এক্ষণে ৭২ বৎসর বয়স হইয়াছে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমি কাহাকেও কোন টাকা পয়সার জন্য লিখি নাই। তোমার ঐ ২৭শে জানুয়ারীর পত্রের মর্ম্মানুসারে বুঝিয়েছি, তুমি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছ, ইহাতে বড়ই প্রীত হইয়াছি।

তুমি শিশু সময়ে অর্থাৎ তোমার ১½ বছর কি ২ বৎসর বয়সের সময় আমাদের পূজ্যপাদ পিতৃব্য ৺ গঙ্গাপ্রসাদ দাস তোমাকে কোলে লইয়া প্রাতে বলিতেন, "ও আমার সাধুরাম দাস" ও বিকালে ঐরূপ কোলে লইয়া বলিতেন "ওরে আমার নবাব শুকুর উল্লা।" এই দুই মহাপুরুষের নাম ধরিয়া ডাকিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মহাপুরুষ সাধুরাম দাস ভ্রাতাদের পরম উপকারী বন্ধু ছিলেন; আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতৃব্যের বাক্যের সার্থকতা হইতেছে, তাই অতি বড় প্রীত হইয়াছি।"

এই পত্রখানা বাবা আমাকে গত বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে লেখেন। তাঁর এই আশীর্ব্বচন আমাকে ধন্য করেছে, আমার সকল শুভ সঙ্কল্পে বল দিয়েছে। আমি কি তাঁর সে যোগ্য সন্তান হ'তে পারব? তবে ঋষিবাক্যে আছে।—

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।

যদি আমার কোন বাক্য বা কার্য্য দিয়ে বাবাকে একটুও প্রীত কর্‌তে পেরে থাকি, তা হ'লেই আমার জীবন অনেকটা সার্থক হয়েছে। কত সময় বাবার অবাধ্য হয়েছি, কিন্তু আমি জানি আমাদের স্নেহশীল পিতা আমাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করেছেন। আজ বিশেষভাবে মনে পড়্‌ছে সেইদিনের কথা, যেদিন আমরা মার মৃত্যুর পর তাঁর ব্যথিত প্রাণে কঠিন কথা ব'লে আরো ব্যথা দিয়েছিলাম। বাবা আমাদের মাকে সঙ্গে ক'রে ১৯১৫ ইংরেজীতে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল সেখান থেকে কুম্ভমেলায় যাবেন। বৃন্দাবন যাবার পরই হঠাৎ মায়ের কলেরা হয় ও তিনি দেহত্যাগ করেন। বাবা এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে বিদেশে এত বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন যে, আমাদের টেলিগ্রামে খবর দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন চিঠিপত্র কয়েকদিন লিখ্‌তে পারেন নি। আমরা তাঁর খবর না পেয়ে চারিদিকে টেলিগ্রাম কর্‌তে থাকি ও কয়েকদিন পর কোলকাতার কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে খবর পাই যে, তিনি কোলকাতায় এসেছেন। যখন তিনি বাড়ী ফির্‌লেন, তখন তাঁর এই শোকসন্তপ্ত প্রাণে আমরা আরো আঘাত কর্‌লাম তাঁকে কত কটু কথা ব'লে! তাঁকে যখন দোষ দিতে লাগ্‌লাম যে তিনি কেন আমাদের খবর না দিয়ে এত উদ্বিগ্নতার মধ্যে রেখেছিলেন, তখন অপরাধীর মত চুপ ক'রে নীরবে সব আঘাত সহ্য করেছিলেন। একটী কথাও বলেন নি। পরে মনে হয়েছে হায়রে, নিজের দিকেই শুধু তাকালাম, তাঁর অন্তরের দিকে চেয়ে ত একবারও দেখ্‌লাম না!

বাবার পরলোকগমনের সংবাদ পেয়ে আমার খুড়তুতো ভাই সরোজ আমাকে লিখেছিল, "জ্যেঠামহাশয়কে কোনদিন অধীর হ'তে আমি দেখিনি।" সে কেন, কেহই বল্‌তে পারে না কোন দিন তাঁকে অধীর হ'তে দেখেছে।

১৯১১ ইংরেজীতে বাবা পেন্সন নেন, ১৯১৩ ইংরেজীতে মা খুব সাংঘাতিক পীড়িত হয়ে পড়েন, বাঁচ্‌বার কোন আশাই ছিল না। আমরা অস্থির হয়ে কত অধীরতাই প্রকাশ করেছি, কিন্তু বাবাকে কেউ অধীর হ'তে দেখেনি। তাঁর দু'টি সন্তান খুব শিশুকালেই মারা যায়, কিন্তু তিনি স্থিরচিত্তে সব সয়েছেন। মার মৃত্যুতেও তাঁর সেই নির্ব্বিকার ভাবই দেখা গিয়েছে।

তাঁর মত ভগবানে নির্ভরশীল লোক কম দেখেছি। কোন

দিন অভাবের জন্য হায় আপশোষ্‌ করেননি, সন্তানদের কি হবে বলেও চিন্তিত হ'তে দেখিনি। বোধ হয় আমাদের জন্ম তিনি তাঁর ইষ্টদেবতার কাছে নিবেদন ক'রেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমাদের ভার দেবতাই নেবেন। একদিন আমি বাবাকে টাকা পয়সার হিসাব করতে দেখে হেসে হেসে বলেছিলাম যে, বাবা যে এখনো টাকা পয়সা নাড়াচাড়া করেন, বোধ হয় তাঁর বিশ্বাস নেই আমাদের উপর। আমরা কি জানি তাঁর ছোট ছেলেকে কিছু দিই না, এইজন্য বুঝি অত হিসাব করেন। তিনি শুনে বল্লেন না বাবা তা নয়, সে বিশ্বাস আমার আছে। তবে তোমরা যে সব টাকা পয়সা আমার হাতে দিয়ে রেখেছ, তার একটা দায়িত্ব ত আছে।" আমি বল্লাম আমরা ত তার হিসাব চাই না। তিনি বল্লেন তোমরা না চাইলেও আমার রাখা উচিত। আমার বিশ্বাস, বাবার প্রার্থনার বলেই—তাঁর নির্ভরশীলতার জন্যই—আমরা সংসারে যেটুকু উন্নতি কর্‌বার করেছি।

আমি কত সময় ভেবেছি বাবা এই শান্ত ভাব কোথা হ'তে পেলেন। তখনই মনে হয়েছে যিনি নির্ব্বিকল্প—যিনি অচঞ্চল, যিনি শান্তম্‌,—সেই দেবতার নামজপে দিবসের অধিকাংশ সময় কাটাতেন ব'লেই এই বল পেয়েছিলেন। নামে যাঁর রুচি আছে তাঁর কি ভয় ভাবনা থাকতে পারে? আমরা বিপদে অধীর হই, কারণ, আমাদের বিশ্বাস সেরূপ দৃঢ় হয়নি। বিশ্বাস দৃঢ় কর্‌বার একমাত্র উপায় সেই নামসাধন। এর অভাবেই আমাদের এই দুর্দ্দশা! দিনান্তে একবারও ভগবচ্চরণে বস্‌ব না, তাঁকে ডাক্‌ব না, তবে বল পাব কোথা হ'তে? আমার প্রিয় ব্রাহ্মসমাজ ধন জন মান তুচ্ছ ক'রে এই পরমব্রহ্ম নাম সার করুক।

আমার মা অতি সামান্য একটু বাংলা লেখাপড়া জান্‌তেন। তিনি সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত সংসারের কাজ ক'রে অবসর মোটেই পেতেন না। তাই বাবা তাঁর জন্য ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন যে, তিনি শুবার আগে বালিশের উপর ইষ্টমন্ত্র কয়েকবার লিখে প্রণাম ক'রে শুবেন। মাকে তাই করতে দেখেছি। মা ত যুক্তাক্ষর ভাল লিখ্‌তে পারতেন না। তাই বোধ হয় খুব সহজ একটী নাম জপ কর্‌বার জন্য দিয়েছিলেন। মা তাই লিখে বালিশের উপর মাথা ছুঁইয়ে তবে শুতেন।

মার দেহত্যাগের পরই বাবা যেন সংসারের সকল মায়া কাটিয়ে পরলোকে আবার মার সঙ্গে মিলিত হবার অপেক্ষায় ব'সে ছিলেন।

শুনেছি অত্যধিক চিন্তা সন্ন্যাস-রোগের একটী কারণ। মার মৃত্যুর পর ১ বছরের মধ্যেই বাবা সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হন। তখন থেকেই তাঁর বা দিক অবশ হ'য়ে যায়। পরে চিকিৎসায় কিছুটা ভাল হয়েছিলেন, তা তাঁর কথাবার্ত্তায় বুঝা যেতো। গেল পূজোর ছুটীতে বাড়ী যাবার জন্য আমাদের সকলকে তিনি লিখেছিলেন। তাঁর কুষ্ঠিতে বুঝি ছিল যে তিনি ৭২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করবেন। তাই সকলকে দেখ্‌তে চেয়েছিলেন। আমরা যে যেখানে ছিলাম প্রায় সকলেই বাড়ী গিয়ে মিলেছিলাম। সেই সময় একদিন বাবার শুবার খাটে অনেক ছারপোকা দেখে আমি বল্লাম যে খাট বের ক'রে এগুলো মারা দরকার। এরা-ত খেয়ে শেষ ক'রে ফেল্লে। আবার বাবা খুব বেশী তামাক খেতেন ব'লে মশারী খাটিয়ে শুতেন না। বল্‌তেন "মশারীর ভিতর ঢুকলে বের হ'তে কষ্ট হয়, যেন মনে হয় সিন্দুকের ভিতর ঢুকেছি।" তাই আমি যখন বল্লাম যে মশারী না খাটালে মশায়ও-ত খেয়ে ফেল্‌বে। তখন তিনি হেসে বল্লেন "খেতে দাও বাবা, আর কতদিন খাবে?" তখনই বুঝ্‌লাম তিনি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই রয়েছেন।

"ওগো দরদি, আমার মন কেন উদাসী হ'তে চায়" এই গানটা বাবা বড় ভাল বাস্‌তেন। গ্রামোফোনে ঐ গানটা বার বার শুনেও তাঁর আশ মিট্‌ত না। তিনি যে বহুদিন থেকে নীরবে স্বরবে তাঁর দরদীর "আয়গো আয়" ডাক শুন্‌ছিলেন, তা'ত আগে টের পাইনি।

আমাদের বাবা আমাদের জন্য ধন সম্পদ কিছু রেখে যান নি। কিন্তু তিনি নিজে যে ধনের জন্য সারা জীবন সাধন ক'রে গেছেন, সেই ধর্ম্মধন আপন জীবনে অর্জ্জন ক'রে রেখে গেছেন। এ এমনি অমূল্যধন যে এর জন্য ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ করতে হয় না। এ'কে ভাগ ক'রে নিতে হয় না। সকলেই এর পূর্ণ অধিকারী হ'তে পারি—যদি তা পেতে চাই।

হে পিতঃ, আশীর্ব্বাদ কর তোমার সন্তানদেরে, তারা তোমার প্রদত্ত ধর্ম্মধনের অধিকারী হোক্‌। তুমি যেমন ন্যায়পথে থেকে আপন চরিত্রবলে সকলের প্রিয় হয়েছিলে, তুমি যেমন সাধনবলে পরম ধনে ধনী হয়েছিলে, আমরা তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে যেন সেই পরম ধন লাভ করতে পারি। তুমি কত কষ্ট ক'রে আমাদেরে প্রতিপালন করেছ, কোন দিন কোন অভাব বোধ করতে দেওনি। যখন যা' বায়না ধরেছি তাই পেয়েছি। তুমি আমাদের এমন স্নেহশীল পিতা ছিলে যে, একদিনও তোমার হাতে কোন শাস্তি পাইনি। তুমি ত এত করেছ, কিন্তু আমরা ত তোমার কিছুই করতে পারিনি! আমরা তোমার উপার্জ্জনক্ষম সন্তান হয়েছি, কিন্তু তোমাকে ত কোন আরাম, কোন সুখ, দিতে পারিনি। তুমি আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করো।

তুমি এলোকে যতদিন ছিলে, তখন ত তোমাকে এত নিকটে পাইনি। আজ যে দেশের ও কালের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে তুমি অন্তরে এসে দেখা দিয়েছ। যত দিন এ লোকে থাক্‌ব, তুমি সকল সময় তোমার সেই সৌম্যমূর্ত্তি নিয়ে আমার অন্তরে প্রকাশিত থেকো, আমার স্মৃতিতে সদা উজ্জ্বল হ'য়ে থেকো।

ঐ দেখ তোমার আদরের 'বড় মা' ও তোমার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিয়ে এসেছে। আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম তুমি লও। তোমার বৈবাহিকেরা, তোমার আরো কত আত্মীয় বন্ধু তোমায় স্মরণ করতে এসেছেন। তুমি সকলের সঙ্গে অন্তর-ক্ষেত্রে মিলিত হও।

তোমার প্রিয়তমা কন্যা, তোমার প্রিয় কনিষ্ঠপুত্র ও অন্যান্য পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রেরা তোমার ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এই সময় দূরে থেকেও আমাদের সঙ্গে একপ্রাণ হ'য়ে তোমাকে স্মরণ করছেন, তুমি তাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ কর।

পরলোকের কোন কিছুই জানি না। কিন্তু বিশ্বাস করি, তুমি সে লোকে তোমার প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হয়েছ, তোমার পিতামাতা, আমার বড় কাকা, আমার পিসীমারা, আমার মাতৃদেবী, ও কাকীমারা তোমার স্নেহের মেজ-বৌ মা এরা সকলে যে সে লোকে রয়েছেন। আজ তুমি তাঁদের সঙ্গে মিলেছ। যাদেরে তুমি এলোকে হারিয়েছিলে আজ দেখ্‌ছ তারা কেউ হারায়নি, তুমি সকলকেই পেয়েছ। আমিও ব'সে রইলাম সেই দিনের আশায় পথ চেয়ে, যে দিন আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হব লোকান্তরে গিয়ে। সে দিন তুমি হাত বাড়িয়ে আমায় নিও।

হে বিশ্বপিতা, তোমাকে যে 'পিতানোঽসি' ব'লে স্বীকার কর্‌ব তার বোধ জন্মাবার জন্যই আমাদেরে জগতে পিতা মাতা দাও। তোমার অখিল পিতৃত্বের বোধ কি আমাদের হতো যদি আমরা এ জগতে পিতার স্নেহের পরিচয় না পেতাম? তোমাকে পিতা ব'লে স্বীকার কর্‌ব, মাতা ব'লে স্বীকার করব, এইজন্যই তুমি আমাদেরে পিতা মাতার স্নেহ দিয়ে থাক।

হে মঙ্গল বিধাতা, তোমার যে মঙ্গল বিধানে পিতামাতার কোলে ব'সে তাঁদের স্নেহরসসুধা পান কর্‌বার সুযোগ পেয়ে আনন্দসাগরে ভাসি, সেই বিধানেই আবার সে ক্রোড় হারিয়ে নিরানন্দে কাঁদি। কাঁদি অবোধ ব'লে, কাঁদি তোমাতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়নি ব'লে। নতুবা তোমার মঙ্গলবিধানে কি কাঁদ্‌তে পারি?

দয়ার ঠাকুর, আজ কাঁদ্‌ব না। আজ তোমার দয়ার কথাই বল্‌ব। আমার পিতার ভয় ছিল তিনি বেশীদিন রোগশয্যায় প'ড়ে থেকে নিজেও কষ্ট পাবেন, লোককেও কষ্ট দিবেন। তুমি তাঁর সে ভয় দূর করেছ। তুমি আমাদেরে এতদিন পিতৃস্নেহে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছ। কতলোক শৈশবে পিতৃমাতৃহারা হ'য়ে কত ক্লেশ পায়! তুমি আমাদের কত দয়া করেছ, তাই এতদিন এই পিতৃস্নেহ সম্ভোগ করেছি। তুমি ধন্য, তোমাকে কৃতজ্ঞ অন্তরে বার বার প্রণিপাত করি।

তুমি আশীর্ব্বাদ কর আমার পিতাকে। তাঁর পবিত্র আত্মা তোমার সঙ্গে নিত্য যুক্ত থেকে তোমার নিত্যধামে নিত্যানন্দ সম্ভোগ করুন। তুমি আশীর্ব্বাদ কর আমাদেরে। আমরা তোমারি মধ্যে পিতাকে দর্শন করি ও শ্রদ্ধার সহিত প্রণিপাত করি। এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসর তোমার প্রকাশে মধুময় হোক্। আমাদের সকলের জীবন মধুময় হোক্, আমাদের সকলের প্রাণ তোমার মধুর স্পর্শে সুন্দর হোক্, শোভন হোক্। আমরা যে অমৃতের সন্তান, এই জ্ঞান আরো পরিস্ফুট হউক। আমরা ধন্য হই।

## ব্রাহ্মসমাজ।

**মাঘোৎসব**—প্রেমময়ের অপার করুণায় আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব পুনরায় সমুপস্থিত। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে একাধিক-শততম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন, এরূপ স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। ব্যকুলহৃদয় বিশ্বাসিগণের সম্মিলনের উপর উৎসবের সফলতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন :—

১লা ও ২রা মাঘ (১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী) বৃহস্পতি ও শুক্রবার—ব্রাহ্মপরিবারসমূহে এবং ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।

৩রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) শনিবার—প্রাতে ঐ। সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।

৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) রবিবার—প্রাতে যুবকদিগের উৎসব উপলক্ষ্যে উপাসনা। অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় যুবকদিগের আলোচনা। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বরাহনগর শ্রমজীবিগণের নগরসংকীর্ত্তন; সায়ংকালে শ্রমজীবিগণের উৎসব উপলক্ষ্যে উপাসনা।

৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতে উপাসনা। সায়ংকালে সঙ্গতসভার উৎসব উপলক্ষ্যে বক্তৃতা।

৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা (মহর্ষির পরলোকগমনের দিন) সায়ংকালে—মহর্ষির স্মৃতিসভা।

৭ই মাঘ (২১শে জানুয়ারী) বুধবার—প্রাতে ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষ্যে উপাসনা। সায়ংকালে ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষ্যে বক্তৃতা।

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা; সায়ংকালে ইংরেজীতে বক্তৃতা।

৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) শুক্রবার—প্রাতে মহিলাদিগের উৎসব ও পুরুষদিগের জন্য সিটিকলেজ-গৃহে পৃথক উপাসনা। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিকসভা [কেবল সভ্যদিগের জন্য]

১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) শনিবার—প্রাতে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষ্যে উপাসনা। অপরাহ্ন ১॥ ঘটিকায় নবদ্বীপ স্মৃতিসভা। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা।

১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) রবিবার—সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রত্যূষে ৫ ঘটিকায় উষাকীর্ত্তন। পূর্ব্বাহ্ন ৭ ঘটিকায় উপাসনা। অপরাহ্ন ১ ঘটিকায় উপাসনা। অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় ইংরাজীতে উপাসনা; অপরাহ্ন ৫॥০ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন; সায়ংকালে উপাসনা।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) সোমবার—প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় আলোচনা। সায়ংকালে বক্তৃতা।

১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় বালকবালিকা সম্মিলন। সন্ধ্যায় হিন্দি বক্তৃতা।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) বুধবার—প্রাতে উপাসনা। অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় রবিবাসরীয় নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব। সায়ংকালে হিন্দিতে বক্তৃতা।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা। সন্ধ্যায় উপাসনা ও শান্তি বচন।

প্রাতে ৭ ঘটিকায় ও সন্ধ্যায় ৬॥ ঘটিকায় কার্য্য আরম্ভ হইবে।

**প্রচার**—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ১৫ই নবেম্বর কলিকাতা হইতে কুমিল্লায় গমন করেন। ১৬ই নবেম্বর প্রাতে স্বর্গীয় গুরুদয়াল সিংহ মহাশয়ের কুমিল্লাস্থ ভবনে তাঁহার সর্ব্ব-কনিষ্ঠা কন্যা প্রেমমালার আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে এবং সায়ংকালে

কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে রবিবাসরীয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৭ই নবেম্বর সিংহ মহাশয়ের বাড়ীতে সমাধিমন্দিরে দুই বেলা উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। ১৮ই নবেম্বর প্রাতঃকালে উক্ত সমাধি মন্দিরে পুনরায় উপাসনা ও সঙ্গীতাদি করেন। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর নবজাত পুত্রের শুভজাতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৯শে নবেম্বর প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে তাঁহার দৌহিত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২০শে নবেম্বর প্রাতে রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহের বাড়ীতে সমাধিমন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রিতে কলিকাতা যাত্রা করেন।

**পরলোকে**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৭ই ডিসেম্বর বরিশাল নগরীতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসুর কন্যা (শ্রীযুক্ত আশাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী) নলিনীবালা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪টী শিশু সন্তান রাখিয়া কলেরা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র অমলচন্দ্র গাঙ্গুলী ৩৬ বৎসর বয়সে পত্নী ও তিনটি শিশু সন্তানকে অনাথ করিয়া অতি শোচনীয় অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। অমলচন্দ্র অতি সেবাপরায়ণ ছিলেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন এবং আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

**শুভ বিবাহ**—বিগত ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত হেমেন্দ্রমোহন বসুর কন্যা কল্যাণীয়া সুলতা ও আসাম লক্ষ্মীপুর নিবাসী পরলোকগত তিলকরাম চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান কমলকৃষ্ণের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১১ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত যামিকুমার ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া রীতিকা ও পরলোকগত হৃদয়মোহন বসুর পুত্র শ্রীমান সুবোধচন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

## বিজ্ঞাপন

আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩০, বুধবার, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে এবং নিম্নলিখিত কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সভ্যগণ এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিলে বাধিত হইব।

### সভায় বিবেচ্য কার্য্যসমূহ।

১। গত বৎসরের বার্ষিক বিবরণী এবং হিসাব পাঠ ও গ্রহণ।

২। আগামী বৎসরের জন্য সমাজের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, আচার্য্য ও কলিকাতা সমাজে প্রতিনিধি নিয়োগ।

৩। আগামী বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনয়ন।

৪। ডাঃ ভি রায় মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিবেন—

"তিনকড়ি বসু প্রচারকাশ্রমের নিয়মাবলী, যাহা গত ১৮ই অক্টোবর তারিখের সাধারণ সভায় গৃহীত হইয়াছে, তাহার নোটিসে নিয়মাবলী চূড়ান্ত গৃহীত বা বর্জ্জিত হইবে এরূপ বুঝা যায় না বলিয়া সেই নিয়মাবলী পুনরায় আলোচনা করিয়া গৃহীত বা বর্জ্জিত হউক"।

এই প্রস্তাব গৃহীত না হইলে, তিনি নিয়মাবলীর ও তাহার মুখবন্ধের স্থানে স্থানে সংশোধনের প্রস্তাব করিবেন।

৫। বিবিধ।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিশ্বাস,
সম্পাদক।

---



ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ৪ঠা পৌষ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ

Registered No 56.

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥


ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রি

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

| ৫৩ ভাগ<br>১৯শ সংখ্যা। | ১লা মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০১<br>15th January, 1931. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵৹<br>অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲ |
|---|---|---|


## প্রার্থনা।

হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়াই তোমার অসীম প্রেমে আমাদিগকে তোমার উৎসবদ্বারে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছ। আমরা তোমার উৎসবমন্দিরে প্রবেশ করিবার কত অযোগ্য তাহা জানিয়াও, তোমার মধুর আহ্বান শুনিয়া যথোচিত আয়োজন করিতে পারি নাই দেখিয়াও, তুমি আমাদিগকে দ্বারে উপস্থিত হইতে দিয়াছ। গৃহে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য হইবে কি না জানি না। আপনাদের দিকে চাহিয়া ত কোনও আশাই হয় না। আমাদের প্রেম পুণ্যাদি সম্বল ত কিছুই নাই। যথোচিত দীনতা ও ব্যাকুলতাও যে নাই! তোমার অশেষ স্নেহ ও দয়ার নিদর্শন পাইয়াও ত তেমন আশা ও কৃতজ্ঞতা লইয়া উপস্থিত হইতে পারি নাই। আমরা অনেকটা বাহিরের স্রোতেই ভাসিয়া আসিয়াছি। আমরা যে আমাদের সম্বলহীনতা অনুভব করিয়া, তোমারই কৃপার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিতে পারিয়াছি, তাহাও ত দেখিতেছি না! তবে আমাদের উপায় কি হইবে? তোমার কৃপা ভিন্ন ত অন্য কোনও সম্বলই দেখিতেছি না। তুমি যদি কৃপা করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছ, তবে তুমিই যাহা প্রয়োজন বিধান করিবে, এই আমাদের একমাত্র আশা। ভিতরে টানিয়া নিতে হয় নিবে, আর যদি বাহিরেই রাখিতে হয়, তাহাই কল্যাণকর হয়, তবে সেরূপই করিবে। আমরা যাহাতে তোমার সকল ব্যবস্থা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতে পারি, সকল অবস্থাতে সম্পূর্ণরূপে তোমারই অনুগত হইয়া চলিতে পারি, তুমি আমাদিগকে সে নির্ভর ও আত্মসমর্পণ প্রদান কর। উৎসবের মধ্যে তোমার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে পূর্ণ হউক।

## নিবেদন।

**স্বামী আমার**—তুমি আমার স্বামী; আমি কত অপরাধ করি, তুমি তাহা ক্ষমা কর। কত বার তোমায় ছেড়ে দূরে চ'লে যাই, তুমি আবার ধ'রে আন। আমি সতীত্ব-ব্রত ভঙ্গ করি, তুমি তবুও এসে প্রেমে আলিঙ্গন কর। আজ চিত্ত অনুতাপে দগ্ধ হতেছে; আজ আমার অপরাধ অনুভব করছি; আজ আমি ফি'রে এসেছি। তুমি আমার সব কেড়ে লও। তুমি যেখানে রাখ সেখানে থাকব, যেভাবে রাখ, তাতেই সুখী হব। আমার কিসে কল্যাণ, তা তুমিই জান; তুমি যে আমার স্বামী, তুমি যে আমার জীবননাথ! আমার নিজের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই; আমার নিজের কোনও ইচ্ছা রাখব না; আমার নিজের সকল বাসনা, সকল সাধ, আজ তোমার চরণে দিব। আমার প্রিয়জনসকল, বন্ধু বান্ধবসকল, তারা আমাকে ভালবাসুক আর উপেক্ষা করুক, সব তোমার নামে গ্রহণ করব। তোমাকে পেলে আমার সব পাওয়া হবে, তোমাকে দেখলে আমার সব দেখা হবে, তোমাতে প্রাণমন সমর্পণ ক'রে, হে স্বামী আমার, আমি কৃতার্থ হব।

**কখন আসবে?**—তুমি যে কখন আসবে, তা ত জানি না; আমি জেগে ব'সে আছি, জীবন মন তোমাকে দিবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে আছি। অশ্রুসলিলে অন্তর ধৌত ক'রে শুদ্ধ হ'য়ে ব'সে আছি। আমার বাসনা কামনা সকল বিসর্জ্জন দিয়ে তোমার জন্য ব'সে আছি; আমার আশা আকাঙ্ক্ষা সব নির্ব্বাণ ক'রে তোমার আশায় ব'সে আছি। তুমি কখন আসবে, তার উপর আমার হাত নাই; যদি যুগ যুগ ধ'রে প্রতীক্ষা করতে হয়, তাতেও রাজী আছি। তুমি

যে আমার স্বামী, আমি কি তোমার ইচ্ছার উপর কিছু বলতে পারি? তবে এই প্রার্থনা, নাথ, যখন ইচ্ছা আসিও, যখন ইচ্ছা এসে প্রাণ মন অধিকার করিও; কিন্তু এক একবার একটু দূর হ'তে আশার আলোক জ্বালিও; এক একবার বিদ্যুৎচমকের মতন দেখা দিও। নতুবা যে আশা রাখ্‌তে পারব না। তবুও বলি, নাথ, যদি বিদ্যুৎচমকও না দেখাও, তবুও তোমার পথপানে চেয়ে থাক্‌ব—যখন তোমার ইচ্ছা আসিও।

**আমারই জন্য**—আমারই জন্য আকাশে সূর্য্য উঠ্‌ছে, চন্দ্র স্নিগ্ধ আলোকে ধরা ভাসিয়ে দিচ্ছে; আমারই জন্য সমীরণ মৃদু মন্দ প্রবাহিত হচ্ছে; আমারই জন্য পর্ব্বত গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে আছে; আমারই জন্য নদ নদী কুল কুল নিনাদে সাগরসম্ভাষণে ছুটছে; আমারই জন্য সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গে আন্দোলিত হচ্ছে; আমারই জন্য ধরা শস্যশালিনী হ'য়ে আছে; আমারই জন্য বনরাজি লতা-পাতা চারিদিক শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ কর্‌ছে; আমারই জন্য নিত্য নূতন ফুল সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ ল'য়ে বরণ কর্‌তে আস্‌ছে; আমারই জন্য কত সুমিষ্ট ফল ল'য়ে প্রকৃতি উপহার দিতে আস্‌ছে। আমারই জন্য এত স্নেহ, এত ভালবাসা সকলে ঢেলে দিচ্ছে। আমি ক্ষুদ্র, আমি মলিন; তবু ত আমারই জন্য এত আয়োজন! আর হে জীবননাথ, তুমি—স্বয়ং তুমি—বিশ্বরাজ হয়েও, তুমি এই নির্জ্জন কক্ষে, এই মলিন অন্তরে প্রেম ঢেলে দিচ্ছ! তুমি স্বয়ং এসে আমাকে তোমার ক'রে নিচ্ছ, আমাকে স্পর্শদানে তুষ্ট কর্‌ছ। কি আর বল্‌ব, প্রভু? তোমার প্রেমেরই জয়।

## সম্পাদকীয়

**উৎসব-দ্বারে**—দেখিতে দেখিতে আমরা উৎসব-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কে কিরূপ আয়োজন লইয়া উপস্থিত হইয়াছি, জানি না। তবে আমাদের অনেকেরই যে যথোচিত আয়োজন কিছু হয় নাই, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কারণ, তাহা হইলে সমগ্র সমাজের মধ্যে যেরূপ সাড়া পড়িয়া যাইত, তাহার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভক্ত সাধক যাঁহারা তাঁহারা অবশ্য তাঁহাদের ভাবে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা যে খুব বেশী, তাহা বলিতে পারি না। আর, তাঁহাদের প্রভাব যে অধিক দূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাও নয়। সে যাহা হউক, যাঁহারা উৎসবের জন্য আকাঙ্ক্ষিত, তাঁহারা সকলেই আপনাদের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার অনুরূপ কিছু না কিছু আয়োজন লইয়া আসিয়াছেন, সন্দেহ নাই। যাঁহারা প্রেম ভক্তি পুণ্যাদি সম্বল লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ধন্য; তাঁহারা প্রেমময় পুণ্যস্বরূপকে দেখিয়া, তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়া, কৃতার্থ হইবেন। তাঁহাদের সে সমস্ত সম্বলের কিছু অংশ যে আমরাও একেবারে না পাইব, এমন নহে। তাহার দ্বারা আমরা সকলেই কিছু না কিছু উপকৃত হইবই। যাঁহারা পাপে মলিন হইয়াও, অনুতাপের তপ্ত অশ্রু লইয়া, ভগ্ন হৃদয় লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাও ধন্য। নিশ্চয়ই তাঁহাদের অশ্রুবারি নিবারিত হইবে, ভগ্ন হৃদয় জোড়া লাগিবে, পাপ মলিনতা দূর হইয়া যাইবে, তাঁহারা শুভ্রতা ও পবিত্রতা লাভ করিবেন। তাঁহাদের অনুতাপাগ্নি আমাদিগকেও একটু না একটু স্পর্শ করিবেই, তাঁহাদের শুভ সাধনার ফল হইতেও আমরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইব না। যাঁহারা শোকে তাপে কাতর হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, শান্তি ও সান্ত্বনার জন্য অনন্যশরণ হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারাও ধন্য। তাঁহারা নিশ্চয়ই শান্তি ও সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবেন। আমরাও যে সে শান্তির কিছুমাত্র অংশভাগী হইব না, তাহা বলিতে পারি না,—সকলেই তাহার কিছু অংশ পাইব।

কিন্তু সর্ব্বাগ্রে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, আমরা যদি মনে করি আমাদের সাধন ভজনের বলেই, প্রেম পুণ্য অনুতাপ আকুলতা ব্যাকুলতার ফলেই, আমরা উৎসব-পতিকে লাভ করিব, উৎসব-মন্দিরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইব, আমাদের আশা ও নির্ভর যদি আমাদের আয়োজন ও সম্বলের উপরই স্থাপিত হয়, তবে আমাদিগকে নিশ্চয়ই ব্যর্থকাম হইয়া দ্বার হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে—ভিতরে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে না, কিছুতেই প্রকৃত উৎসব সম্ভোগ করা, সত্য ভাবে তাঁহাকে জীবনে লাভ করিয়া কৃতার্থ হওয়া, সম্ভবপর হইবে না। কেন না, দীন হীন অকিঞ্চন না হইলে সে দ্বারে প্রবেশ করা যায় না। সেখানে অহঙ্কারীর প্রবেশ একেবারে নিষেধ। সকল দেশের সকল কালের অভিজ্ঞতারই এই সাক্ষ্য। যত বড় সাধকই হউন না কেন, যে পর্য্যন্ত কিছুমাত্র অহঙ্কার থাকে, আপনার শক্তি ও সাধনের উপর বিন্দুপরিমাণও নির্ভর থাকে, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত সিদ্ধি লব্ধ হয় না, সেই পরম দেবতার প্রত্যক্ষ দর্শন হয় না। সাধকপ্রবর বুদ্ধদেবের জীবনে ইহা উজ্জ্বল ভাবে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি অহঙ্কারী হইতেই পারেন না। ভক্তি ও অহঙ্কার পরস্পর বিরোধী, দীনতা ভক্তির সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ। তাই ভক্তপ্রবর চৈতন্য বলিয়াছেন, তৃণের অপেক্ষাও সুনীচ হইয়া, দীনের দীন হইয়া, নাম করিতে হয়। যদি নাম করিবার জন্যই দীনতার একান্ত প্রয়োজন হয়, তবে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে তাহা আরও কত অধিক আবশ্যক হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের ভক্ত আচার্য্য গাহিয়াছেন—"যদি সে ভবনে পশিতে বাসনা, দীনতা-বসন পর রে; (নইলে হবে না,—তৃণের মত দীন না হ'লে হবে না)।" অন্যত্র—

"(হ'য়ে) দীনের দীন, তৃণেরো হীন, হওরে তাঁর কৃপার অধীন,
পাবে পাবে রে হৃদয়-মাঝে স্বর্গধাম।"

"তৃণ হ'তে আপনারে যে নীচ করিতে পারে
সেই প্রভু, পায় যে তোমারে!"

এখানে আমরা যে শুধু অভাবাত্মক সাক্ষ্যই পাইতেছি—অহঙ্কারী হইলে, দীন না হইলে পাওয়া যায়না, সে গৃহে প্রবেশ করা যায় না—তাহা নহে। ভাবাত্মক সাক্ষ্যও রহিয়াছে—দীন হইলে নিশ্চয় পাওয়া যায়। অন্য ধর্ম্মের প্রবক্তাগণও সে আশ্বাসবাণী ঘোষণা করিয়াছেন, সে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। দীনাত্মারা ধন্য, কেন না তাহাদের শূন্যতা বিদূরিত হইয়া পূর্ণতা আসিবে। কাজেই যাঁহারা সত্যভাবে হৃদয়ে অনুভব করিতেছেন যে,তাঁহাদের কোনই আয়োজন হয় নাই, কোনই সম্বল নাই, এবং নিজকে দীন হীন কাঙ্গাল জানিয়া অনন্তোপায় হইয়া, অনন্যগতি ও অনন্য-শরণ হইয়া, সেই দীন-শরণের কৃপার শরণাপন্ন হন, ভিখারী বেশে দ্বারে পড়িয়া থাকিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা ধন্য। তাঁহাদিগকে কখনও নিরাশ হৃদয়ে ফিরিতে হইবে না। তাঁহাদের পূর্ব্বের কোনও সম্বল না থাকিলেও, যদি দ্বারে আসিয়া সত্য ভাবে এই সম্বলহীনতা অনুভব করিয়া, এরূপভাবে দ্বারে পড়িয়া থাকিতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই ঐ দীনতা ও অনন্যশরণতাই পরম সম্বল বলিয়া গণ্য হইবে,—পরম পিতার কৃপায় তাঁহারা গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, দীন হীন ভিখারী যে তাহাকে ধৈর্য্যের সহিতই প্রতীক্ষা করিতে হইবে, অস্থির হইলে চলিবে না। কোন্ সময় কি ভাবে তিনি কাছে ডাকিয়া লইবেন, তাহা তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জানেন। আমার অভীপ্সিত সময়ে ও পথে আসিলেন না বলিয়া যদি অধীর হইয়া চলিয়া যাই, অথবা আশা ও নির্ভর পরিত্যাগ করিয়া নিজের পছন্দ মত উপায় অবলম্বন করিতে ব্যস্ত হই, তবে যে আমরা সেই দীনতা ও অকিঞ্চিনতাই হারাইয়া ফেলিব, অনন্যশরণতাই থাকিবে না, এবং তৎসহ সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আর, তিনি কৃপা করিয়া যাহাই দেন, তাহাই যদি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত না থাকি, তাহা হইলেও চলিবে না। আমি যাহা চাই তাহা পাইলাম না, ভক্ত প্রেমিক সন্তানেরা যাহা পাইয়া আনন্দে বিভোর হইতেছেন তাহা পাইলাম না, বলিয়া যদি তাঁহার দান অগ্রাহ্য করি, তবে যে আমাদের প্রকৃত দীনতা ও অনন্যশরণতা, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান ও প্রেমের উপর অবিচলিত বিশ্বাস ও নির্ভর, রক্ষিত হইল না, এবং এরূপ অবস্থায় যে আমরা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব, তাহা ত সহজেই বুঝিতে পারা যায়, অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

যাহা দেখিতে চাকচিক্যময় তাহাই যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান, প্রবল ভাবের উচ্ছ্বাস, আনন্দ সুখ শান্তি, প্রভৃতিই যে সকল সময় সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বা কল্যাণকর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য, তাহা কিছুতেই বলা যায় না। অনেক সময় দুঃখ বেদনা, তীব্র যাতনা ও অনুতাপ এবং শুষ্কতাও, একান্ত আবশ্যক ও পরম কল্যাণকর বহুমূল্যবান্ সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সংসারে জল ও আগুন, শীতলতা ও উত্তাপ, বর্ষার বারিধারা ও গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রতাপ, সমানভাবেই আবশ্যক—কোনও অবস্থায় একটা কল্যাণকর, অপর অবস্থায় অন্যটা অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। তেমনি শুধু সরসতা ও তাঁহার মধুর প্রকাশই যে ধর্ম্ম-জীবনকে পুষ্ট করে, সুস্থ সুন্দর সবল ও সতেজ করে, তাহা নহে; শুষ্কতা ও বিরহ বিচ্ছেদও অবস্থা বিশেষে আরও প্রকৃষ্টরূপে উক্ত কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। কাজেই উভয় প্রকার ব্যবস্থার মধ্যেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধাতৃত্ব পূর্ণরূপে রহিয়াছে, উভয়ই তাঁহার অপার প্রেমেরই বিধান, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার অনন্ত জ্ঞানে যাহা জানিতে ও বুঝিতে পারেন, আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবিশিষ্ট জ্ঞানের পক্ষে যে তাহা কোনও ক্রমেই সম্ভবপর নহে, সে কথা অধিক করিয়া বলিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা যে বহু সময় অনেক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে নিতান্তই ভুল করি, কল্যাণকে অকল্যাণ ও অকল্যাণকে কল্যাণ বলিয়া ভ্রম করি, প্রকৃত দুঃখকে সুখ বলিয়া বরণ করি, এবং সত্য সুখকে দুঃখ বলিয়া পরিহার করি, তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই,—সকলেই নিজ নিজ জীবনে তাহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি। এই জন্যই তাঁহার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপনার বুদ্ধি বিবেচনা পছন্দকে উচ্চতর স্থান দেওয়া, তাহাদের উপর নির্ভর করা নিতান্তই মূর্খতা। এই হেতু ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—

"(আমি) বাছিয়া ল'ব না তোমারি দান,
তুমি যাহা দেও তাই ভাল।

আমি হেরিব সকলে চির মঙ্গল, অক্ষয় চির সুখ;
(আমার) সব ব্যর্থতা দুখের মাঝে, জাগে ওই প্রেমমুখ।
তোমারি মহা পূর্ণতা মাঝে, ক্ষুদ্র বাসনা মোর,
চিরতরে, নাথ, যাউক ডুবিয়া, ছিঁড়িয়া মায়ার ডোর।"

তাঁহার দান বাছিয়া লইতে গেলে যথার্থ ভাবে উৎসব সম্ভোগ করিবার, উৎসব হইতে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিবার, কোনই সম্ভাবনা নাই। আর, বলা বাহুল্য যে, তাহাতে কেবল অজ্ঞতা, অবিশ্বাস ও প্রেম ভক্তির একান্ত অভাবই প্রকাশ পায়।

আমরা যে অবনত মস্তকে ও কৃতজ্ঞচিত্তে সকল ব্যবস্থাকে তাঁহার প্রেমের দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না, আপনাদের পছন্দ অপছন্দ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার উপর পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে, তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করিতে পারি না, তাহার প্রধান কারণ উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, কোন্ লক্ষ্য লইয়া উৎসবে উপস্থিত হইতে হইবে, উহার সফলতা কোথায়, তৎ সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। উৎসব কথারই অর্থ যে ঊর্দ্ধে জন্ম, উন্নততর জীবনলাভ, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। তাহার সঙ্গে অনেক সময় আনন্দ মিশ্রিত থাকিলেও যে তাহা তাহার অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে, সকল সময় উহা না থাকিতে পারে, অনেক সময় উহার সঙ্গে দুঃখ বেদনাও যুক্ত হইয়া থাকিতে পারে, এই কথাটা ভুলিয়া যাওয়াতে, উৎসবের মধ্যে আমরা এক মাত্র আনন্দই খুঁজিয়া বেড়াই, তাহাকেই প্রধান লক্ষ্য স্থানে রাখি, তাহার দ্বারাই উহার সার্থকতা বিচার করি। উচ্চতর নবতর জীবনে জন্ম, পুরাতন জীবনগতির পরিবর্ত্তন, জীবন-দেবতার ইচ্ছাবিরোধী জীবন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া চলার জীবন ব্যতীত যে কিছুতেই প্রকৃত উৎসব

হইতে পারে না, উহার কোনই সার্থকতা থাকে না, সে কথা আমরা মোটেই মনে রাখি না। যেখানে লক্ষ্যেই ভুল রহিয়াছে, সেখানে প্রকৃত সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমরা যদি প্রচুর পরিমাণে দীর্ঘকালস্থায়ী আনন্দ শান্তিই প্রাপ্ত হই, আর ব্রহ্মানুগত জীবনলাভ না করিতে পারি, তাঁহার ইচ্ছানুগত পথে চলিয়া অনন্ত উন্নতি ও কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ না হই, প্রেম ভক্তিতে বিগলিত হইয়া তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করি, তবে যে কিছুই হইল না, সবই ব্যর্থ হইয়া গেল, জীবনের কোনই সার্থকতা রহিল না! তাই শুধু দীন হীন কাঙ্গালের বেশে, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত দ্বারে পড়িয়া থাকিলেই যথেষ্ট হইল না। যাহা পাই তাহাকেই সন্তুষ্টচিত্তে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিলেই যে হইল, এমনও নহে। যাহা পাই তাহা তাঁহারই দান বলিয়া অনুভব না করিয়াও সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করা যায়। নিজের কার্য্য ও ব্যবস্থাকেও তাঁহারই ব্যবস্থা বলিয়া ভ্রম করা অসম্ভব নহে। কাহার ইচ্ছা অনুসরণ করিতেছি—নিজের না ভগবানের—এবং তাহার গতি কোন্ দিকে—উন্নতি না অবনতি, কল্যাণ না অকল্যাণের দিকে—সে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই এই ভ্রম দূর হইতে পারে, প্রকৃত সত্য সহজে জানা যাইতে পারে। কাজেই নিজের সমস্ত ইচ্ছা অভিরুচি বিসর্জ্জন দিয়া, সর্ব্বপ্রকারে একমাত্র তাঁহার অনুগত হওয়াকেই প্রধান লক্ষ্যস্থানে রাখিতে হইবে। অন্য কিছুকেই লক্ষ্যস্থানে রাখিলে চলিবে না। ইহার জন্য চাই সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন, আত্মসমর্পণ, আত্মত্যাগ।

বীজ না মরিলে যেমন তাহা হইতে অঙ্কুর বহির্গত হয় নয়, নূতন পত্র বাহির হয় না, তেমনি প্রাণ না দিলে নূতন প্রাণ পাওয়া যায় না। আপনাকে কোনও প্রকারে রাখিতে গেলেই আপনাকে হারাইতে হয়। ত্যাগ ভিন্ন অমৃতত্বলাভ করা যায় না,—"একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।" ত্যাগ হইতেই—মৃত্যু হইতেই—নূতন জীবন আরম্ভ হয়। তাই আমাদের ভক্ত আচার্য্য গাহিয়াছেন, "প্রাণ দিলে প্রাণ মিলে বুঝিলে না সার।" ইহাই সার তত্ত্ব। বিদেশী তত্ত্বজ্ঞানিগণও এই কথাই বলিয়াছেন। সকলের একই শিক্ষা—"যদি ত্রাণ পেতে চাও, প্রাণ তাঁরে দেও, সে পদে লুটা'য়ে পড় অমনি।" "ত্রাণ যদি পাবে প্রাণ দিতে হবে।" কিন্তু এই প্রাণ দেওয়া মুখের কথায় হয় না। প্রেম ভিন্ন আত্মদান সম্ভবপর নয়। প্রেমই আত্মবিসর্জ্জনকে সহজ করিয়া দেয়। প্রেমের প্রকৃতিই আত্মবিলোপসাধন। আপনাকে রাখিবার বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা যেখানে আছে, সেখানে প্রেম নাই,—প্রেম থাকিতে পারে না। প্রেম সম্পূর্ণ আত্মবিলোপসাধন না করিয়া কিছুতেই কান্ত হয় না। এই জন্যই ভক্ত আচার্য্য গাহিয়াছেন "ও ভাই সে প্রেমের অনলে নিজে না দহিলে, সে দ্বারে পশিতে পারে না।" প্রেমই হৃদয়ের সকল ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতাকে দগ্ধ করিয়া, শুদ্ধ সুন্দর করিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত করে, তাঁহার অনুগত সন্তান করিয়া দেয়।

প্রেম কিন্তু সর্ব্বগ্রাসী—উহা হৃদয়ের একটি ক্ষুদ্র অংশ অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। হৃদয়ের এক অংশে অপ্রেম বিদ্বেষ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আর অপর অংশে প্রেম বিরাজ করিতেছে, এরূপ কখনও হইতে পারে না। কাজেই যে মানুষকে ভালবাসিতে পারে না, তাহার মধ্যে ভগবানের প্রতি প্রেম থাকা কখনও সম্ভবপর নহে। মানুষকে আমরা সর্ব্বদা চক্ষুর সম্মুখে যেরূপ স্পষ্ট দেখিতে পাই, ভগবানকে কখনও সকল সময় সেরূপ উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাই না; বরং অধিকাংশ সময় তাঁহার বর্ত্তমানতাই অনুভব করি না; এরূপ অবস্থায় মানুষকে ভালবাসা যত সহজ, ভগবৎ-প্রেম লাভ করা কোনও প্রকারেই তত সহজ নয়। মানুষের সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হইয়াই ভগবানের সঙ্গে প্রেম-যোগ লাভ করিতে সমর্থ হই। সকল বৃত্তিই যখন অনুশীলনদ্বারাই বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তখন প্রেমের চালনা ব্যতীত, অপরের সম্বন্ধে বিদ্বেষ ও অপ্রেম পোষণ করিলে, যে প্রেম বৃদ্ধি পাইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কাজেই সর্ব্বাগ্রে পরস্পরের সঙ্গে প্রেমে মিলিতে হইবে, হৃদয় হইতে সকল অপ্রেম বিদ্বেষ দূর করিতে হইবে। সকলে প্রেমে যুক্ত হইয়াই, সকল হৃদয়গুলিকে এক প্রেম-ডোরে বাঁধিয়াই, উৎসব-দ্বারে প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এই জন্যই ভক্ত আচার্য্য গাহিয়াছেন "তাই প্রেম-ডোরে (এক হৃদয় হ'য়ে রে) বাঁধ পরস্পরে, বেঁধে কর রে সত্য সাধনা।"

ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। এই ভাবে উৎসব-দ্বারে পড়িয়া থাকিলে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, উৎসব কখনও বৃথা যাবে না, সর্ব্বপ্রকারেই সাফল্য মণ্ডিত হইবে। করুণাময় পিতা কৃপা করুন, আমরা এইভাবে তাঁহার উৎসব-দ্বারে উপস্থিত হই। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই উৎসবের মধ্যে জয়যুক্ত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

---

## উৎসবে নিবেদন

হে জীবন্ত জাগ্রত দেবতা আমাদের,
জাগাতে নিদ্রিত প্রাণ এই ভারতের,
পাঠাইলে যুগধর্ম্ম জীবন্ত বিধান;—
চমকি' উঠিল সর্ব্ব মানবের প্রাণ,
শুনি' বার্ত্তা উদার এ মহৎ ধর্ম্মের;
কি বস্তু নামিয়া যেন আসিল স্বর্গের!
মহর্ষি ও ভক্ত কর্ম্মী কতই প্রকার,
করিলেন এ ধর্ম্মের সাধন, বিস্তার।
একদিন শক্তি দেখি' এ মহা ধর্ম্মের,
বিস্মিত হলেন লোক দেশ বিদেশের।

২

এ ধর্ম্ম গ্রহণ করি', মোরা কেন হায়,
নিদ্রালু মত্তের মত পড়িয়া রয়েছি?

চতুর্দ্দিকে হেরি আজ নব জাগরণ,
মোহ-ঘুমে আমরা ঘুমাই কি কারণ ?
কোথায় উৎসাহ, আশা, জীবন্ত বিশ্বাস,
বলিষ্ঠ চরিত্র আর ভক্তির উচ্ছ্বাস ?
সাধনে অলসচিত্ত, গৃহে কি নির্জ্জনে,
কয়জন ডুবে থাকি উপাসনা ধ্যানে ?
প্রেমেতে বঞ্চিত দেব, মোরা যেন তাই,
তোমার সুমিষ্ট নামে রস নাহি পাই।
কোথায় তোমার সেবা, আত্মোৎসর্গ মোর ?
সুখের নেশায় যেন হ'য়ে আছি ভোর।
এমন যে প্রিয় ধর্ম্ম, প্রাণের সমাজ,
কতটুকু তার সেবা, করিয়াছি কাজ ?
আজি শুধু স্বার্থে মগ্ন, অর্থ ও বিষয়,
তার মত প্রিয় যেন আর কিছু নয়।

৩

হে উৎসবপতি, তুমি এবার উৎসবে,
জীবন্ত জাগ্রত হ'য়ে দেখা দাও সবে।
ঐশীশক্তি সঞ্চারিয়া জীবনে জীবনে,
জাগাও সবারে তুমি নব জাগরণে।
কহ ডেকে, ব্রাহ্ম, তুমি রয়েছ যেমন,
ও নহে তোমার উচ্চ আদর্শ জীবন।
লক্ষ লক্ষ লোক ধায় সুখ সুখ করি',
তুমিও কি চাবে সুখ দিনরাত ধরি' ?
হে প্রভু, উজ্জ্বল জ্ঞান প্রকাশ' এবার,
বুঝাও জীবন নহে ছেলে খেলাবার।
উচ্চতম লক্ষ্য আছে, আছে মহা কাজ,
চাহিয়া মুখের পানে সমস্ত সমাজ।
কি আছে মহৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসম আর ?
তোমায় পাইলে বাকী কি থাকে পাবার ?
এবার উৎসবে দাও বদলায়ে সব,
তুমি আমাদের হও ঐশ্বর্য্য বিভব।
চরিত্রে তেজস্বী কর, বলিষ্ঠ বিশ্বাসে,
নিকৃষ্ট কিছুই যেন মনে নাহি আসে।
র'বে না লুকায়ে প্রাণে সহস্র সংশয়,
তিল তিল করি' শক্তি করিবে না ক্ষয়।
ধন্য হব প্রতিদিন তব আবির্ভাবে,
উপাসনা, আরাধনা মিষ্ট হ'য়ে যাবে।
সব চেয়ে পাব সুখ বসি' তব কাছে,
কহিব মর্ম্মের কথা যাহা কিছু আছে।
হে সুন্দর, তুমি তব রূপ প্রকাশিয়া,
ভক্তিতে করিবে তৃপ্ত সবাকার হিয়া।
স্বার্থের কুহকজাল আর নাহি র'বে,
যে প্রিয় সমাজে এসে ধন্য হনু সবে,
পাইনু সহস্র সুখ সহস্র প্রকার;
পুড়ি' ধন্য কর্ম্ম, তবু কর্ম্মী নাহি য়ার ;—

আত্মোৎসর্গ করি যেন তাহার সেবায়,
উৎসবে আকাঙ্ক্ষা এই যাচি তোমায়॥

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

---

## বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্য-প্রতিপাদক "সুবিশালমিদং বিশ্বং" ইত্যাদি যে শ্লোকটি রচিত হইয়াছিল, তাহাতে বলা হইয়াছে, "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি।" আমাদের দেশে বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও একটি কথা প্রচলিত আছে—"বিশ্বাসে পাইবে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর"। কিন্তু এই দুই স্থলে 'বিশ্বাস' কথাটা একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষাতে সাক্ষাৎদর্শনমূলক "প্রকৃত বিশ্বাস" এবং শ্রুতি-পরম্পরাগত 'সংস্কার' এই দুইটির পার্থক্য বুঝাইবার জন্য দুইটি ভিন্ন শব্দ নাই। বাঙ্গালাতে এই দুইটি ভাব প্রকাশের জন্যই এক 'বিশ্বাস' কথাটা ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ দ্বিতীয় অর্থেই উহার অধিকতর প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে আমরা অনেক সময় "অন্ধ বিশ্বাস" নামে অভিহিত করি। ইংরাজীতে যদিও সময় সময় অনেকে Faith ও Belief কথা দুইটি একই অর্থে ব্যবহার করেন, তথাপি মূলতঃ উহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্যই রহিয়াছে, তাহারা দুইটি পৃথক ভাব বুঝাইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমরা অনেক সময় এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালাতে "প্রকৃত বিশ্বাস" কথাটা ব্যবহার করি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার "প্রকৃত বিশ্বাস" নামক পুস্তিকাতে বিশ্বাসকে "সাক্ষাৎ দর্শন" বা "অপরোক্ষ জ্ঞান" বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে এই অর্থেই "বিশ্বাস" কথাটা ব্যবহৃত হইয়াছে। দার্শনিক ভাষাতে Faith যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, এখানেও 'বিশ্বাস' সেই অর্থেই প্রয়োগ করা হইয়াছে।

আমরা সকলেই জানি, আত্মা যদিও এক এবং অখণ্ড, তথাপি বিচার ও চিন্তার সাহায্যের জন্য উহার বিভিন্ন কার্য্য অনুসারে আমরা উহাতে জ্ঞান, ভাব বা প্রেম ও ইচ্ছা প্রভৃতি পৃথক পৃথক শক্তি কল্পনা করি; এবং এক জ্ঞান শক্তিকেও আবার তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি—যে শক্তির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে মানসিক সত্যসকল (intellectual truths) জানি তাহাকে Reason, (মন, প্রজ্ঞা বা জ্ঞান), যাহার দ্বারা নৈতিক মূলতত্ত্বসকল (moral principles) প্রত্যক্ষভাবে অবগত হই তাহাকে Conscience (বিবেক), এবং যদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যসকল (spiritual truths) অপরোক্ষভাবে জানিতে পারি তাহাকে Faith (বিশ্বাস—ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় ইহাকেই বিশেষভাবে প্রজ্ঞা বলা হয়) বলিয়া থাকি।

---

১৫ই জুন, ১৯৩০, সায়ংকালীন উপাসনায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু কর্ত্তৃক বিবৃত নিবেদনের মর্ম্ম অবলম্বনে লিখিত।

সুতরাং বিশ্বাসই পরম সত্য সাক্ষাৎভাবে জানিবার আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়। এই জন্যই বলা হয়, বিশ্বাস-নেত্রে তাঁহাকে দর্শন করি। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যেমন জ্ঞান বা বিশ্বাসের দ্বারা আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারি, তেমনি প্রেম ও বিবেকের মধ্য দিয়াও তাঁহাকে অপরোক্ষভাবেই জানা যায়—তাহারাও জ্ঞানের সঙ্গে আত্মার অবিভাজ্য অংশ, মূলতঃ একই বস্তু। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চিন্তা ও আলোচনার সাহায্যের জন্যই আমরা তাহাদিগকে পৃথক বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি। প্রেমের দ্বারাই প্রেম সত্যরূপে সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারা যায়, বিবেকের দ্বারাই সেরূপ নীতি, পুণ্য পবিত্রতা প্রত্যক্ষ করা যায়। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহার দ্বারা প্রেম ও পুণ্য প্রকৃত ভাবে জানা যায় না। তথাপি আমরা জানিবার শক্তিকে জ্ঞান নামেই অভিহিত করিয়া থাকি, কখনও প্রেম বা বিবেক বলি না।

আমরা আত্মার শক্তিকে জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছা, এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া জানিবার শক্তিকে জ্ঞান, অনুভব করিবার শক্তিকে ভাব বা প্রেম এবং কার্য্য করিবার শক্তিকে ইচ্ছা, নাম প্রদান করিয়া থাকি। উহারা যে প্রকৃতপক্ষে তিনটি পৃথক শক্তি নহে, মূলতঃ একই, তাহা আমরা সকলেই জানি। ইহাদের বিভিন্ন কার্য্যের পার্থক্য স্পষ্ট ধারণা করিবার জন্য আমরা তাহাদের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পারম্পর্য্যও নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। আগে জ্ঞান—জানা, পরে ভাব—অনুরাগ বিরাগ, প্রেম বিবেক প্রভৃতি—এবং শেষে ইচ্ছা বা কার্য্য। ইহার কোনও একটি যে অপর দুইটিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে তাহা নহে। অথবা প্রকৃতপক্ষেই একটির অনেক পরে অপরটি উদয় হয়, তাহাও নহে। তাহারা এক অখণ্ড ভাবেই অপরিহার্য্যরূপে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ। যেখানে তাহার কোনওরূপ বিপর্য্যয় দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাকে অস্বাভাবিকই মনে করিতে হইবে। এই জন্যই যদিও আমরা পরব্রহ্মের সঙ্গে জ্ঞানযোগ, প্রেমযোগ বা ভক্তিযোগ ও ইচ্ছাযোগ, এই তিন প্রকার যোগের কথা অনেক সময় বলিয়া থাকি, তথাপি এক সঙ্গে এই তিন প্রকার যোগে যুক্ত না হইতে পারিলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার সঙ্গে সত্য যোগ, প্রত্যক্ষ যোগ সাধিত হয় নাই। কেন না, তাঁহাকে সত্যরূপে প্রত্যক্ষভাবে জানিলাম অথচ ভালবাসিলাম না, অথবা তাঁহাকে সত্যভাবে ভালবাসিলাম তবুও তাঁহার ইচ্ছানুগত হইয়া চলিলাম না, অন্ততঃ তাঁহার ইচ্ছাপালন করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত হইলাম, না, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম না, এরূপ কখনও হইতে পারে না। সেরূপ হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, তাঁহাকে জানাও হয় নাই, ভালবাসাও হয় নাই, সবই মিথ্যা কাল্পনিক। তিনি এমন একজন যে তাঁহাকে সত্যরূপে জানিলে ভাল না বাসিয়াই থাকা যায় না, আর ভালবাসার এমনই প্রকৃতি যে সত্য প্রেম হৃদয়ে জাগিলে প্রেমাস্পদের মনুগত না হইয়া, তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হওয়া যায় না। পুণ্য পবিত্রতা বলিতে ইচ্ছাপালন ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছানুগত হইতে হইলেই, তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলেই, পাপের সঙ্গে মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইবে, কিছুতেই সে বিষয়ে উদাসীন বা নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভবপর হইবে না। বলা বাহুল্য যে, এখানেই ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ, ইহার গাঢ়তায়ই ধর্ম্মজীবনের পূর্ণতা ও গভীরতা। ধর্ম্ম বলিতে এই ত্রিবিধ যোগের অতিরিক্ত কিছুই বুঝায় না। আবার, ইহার কোনও একটিকে ছাড়িয়াও সত্য ধর্ম্ম সম্ভবপর নহে।

ইহা হইতে এই কথাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জীবন-দেবতাকে সত্য ভাবে জানাই ধর্ম্মের মূল। তাঁহাকে সত্যরূপে না জানা পর্য্যন্ত সত্য প্রেমও জাগে না, খাঁটি ইচ্ছাপালনও সম্ভবপর হয় না। সুতরাং ব্রহ্মের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর যাহা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা যে বালুকার উপর রচিত উচ্চ অট্টালিকার ন্যায় অচিরেই ভূমিসাৎ হইবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা সর্ব্বাগ্রে একটু পরিষ্কাররূপে বুঝিতে হইবে। সর্ব্ব প্রথমেই স্মরণ রাখিতে হইবে, তত্ত্বজ্ঞান ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা দর্শন এক কথা নহে। নানারূপেই কোনও বস্তুর স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক বা সমস্ত সত্য তত্ত্ব জানা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে কোনও প্রকার ভুল ভ্রান্তিও না থাকিতে পারে, তথাপি তাহাকে কিছুতেই উক্ত বস্তুর দর্শন বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞান বলা যায় না। তেমনি সাধারণতঃ যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলা হয়, ব্রহ্মসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞান, তাহা যতই সত্য ও নির্ভুল হউক না কেন, নিঃসংশয়িত ও অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, কিছুতেই উহাকে ব্রহ্মদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আমরা সাক্ষাৎভাবে যে জ্ঞান লাভ করি, তাহার মধ্যেও যে অনেক সময় নানা ভুল ভ্রান্তি মিশ্রিত হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমাদের পূর্ব্ব সংস্কার প্রভৃতি নানা কারণেই এরূপ ঘটিতে পারে। সুতরাং তাহাকে যুক্তি তর্ক বিচার ও বিশ্লেষণ দ্বারা নানারূপে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ করিয়া লইবার যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তথাপি ভুলিলে চলিবে না যে, যুক্তি তর্ক, বিচার বিশ্লেষণ ও অনুমানাদির দ্বারা নির্ভুল ভাবে সত্য তত্ত্বনির্ণয় সম্ভবপর হইলেও, উহাদ্বারা সাক্ষাৎ দর্শন হয় না। আর তাহারা সাক্ষাৎ দর্শনের স্থানও অধিকার করিতে পারে না, তাহার একান্ত প্রয়োজনীয়তাকে দূর করিতে পারে না। শুধু সংশয়রাহিত্যই যথেষ্ট নয়, তত্ত্ববিষয়ক ভুল ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইলেই সব হইল না; তাঁহার সংস্পর্শে আসিতে হইবে, তাঁহাকে আস্বাদন করিতে হইবে, তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত, পরিবর্ত্তিত ও চালিত হইতে হইবে। তাই ভক্ত-প্রবর দায়ুদ সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছেন—Oh taste and see that the Lord is good—প্রভু যে মঙ্গলময় তাহা আস্বাদন করিয়া দেখ। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহা না

জানিলে প্রকৃতভাবে জানাই হয় না, তাহার উপর সকল অবস্থায় নির্ভর করা যায় না, বিপদের সময় ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য রাখা যায় না, সকল ঘটনার মধ্যে হৃদয়ে অফুরন্ত আশা পোষণ করা সম্ভবপর হয় না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে ব্রহ্মদর্শনের যে ফল বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অন্ত কোনও প্রকারেই লাভ করা যায় না।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

"সেই পরাৎপরকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থিসকল ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা যে অর্থে কর্ম্মক্ষয়ের কথা বলিয়াছেন আমরা ঠিক সেই অর্থে উহা গ্রহণ করি না। যাহা হউক, সে বিষয়ে এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অন্যত্র

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"

"যাঁহাকে লাভ করিলে অপর কোনও লাভই তাহা হইতে অধিকতর বলিয়া মনে হয় না, যাঁহাতে স্থিত হইলে গুরুতর দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হয় না।" পাশ্চাত্য ঋষি এমার্সন বলিয়াছেন —Ineffable is the union of man and God,—the simplest person who in his integrity worships God becomes God; yet for ever end ever this influx of the better and universal self is new and unsearchable—peopling the lonely places, effacing the scars of our mistakes and disappointments— মানুষের ও ভগবানের মধ্যে যে যোগ তাহা অবর্ণনীয়, অতি সাধারণ বা মূর্খলোকও যদি সত্যভাবে ঈশ্বরের পূজা করে, তবে সে ঈশ্বরই হইয়া যায় (আমাদের শাস্ত্রেও আছে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মীভূত হইয়া যায়—ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অধীকৃত হয়, ইহাই প্রধান কথা); তথাপি এই যে মহত্তর পরমাত্মার প্রকাশ তাহা চিরদিনই নিত্য নূতন ও অচিন্তনীয়—উহা সমস্ত শূন্য স্থানকে পূর্ণ করিয়া ফেলে, আমাদের ভুল ভ্রান্তির ও ব্যর্থতার সমস্ত দাগগুলি মুছিয়া ফেলে।" সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতীত শুধু দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ইহা কোনও ক্রমেই লাভ করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, দ্রষ্টা দার্শনিক হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। দর্শন করিলেই যে তাহা ব্যাখ্যা করিবার শক্তি সকল সময়ই থাকে, তাহা বলা যায় না। দর্শন না করিয়াও একজন অনেক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে। জগতে উভয় প্রকারেরই যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। ব্যাখ্যা করিতে না পারিলেই, সকল তত্ত্বের সুমীমাংসাসাধন করিতে অসমর্থ হইলেই যে দর্শন করা হয় নাই মনে করিতে হইবে, এরূপ কোনও কারণই নাই। দ্রষ্টা যে সকল সময়ই বলিয়া দিতে পারেন, তাঁহাকে কিরূপে দেখা যায়, কিরূপে দেখিতে পাইয়াছেন, এরূপও নহে। তাহা না পারিলেই যে তাঁহার দর্শন মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া যায়, তাহাও নহে। কেন না, কোন্ সময়ে কিরূপে যে তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া যায়, তাহা বলা যায় না, বুঝিতেও পারা যায় না। অথচ সিদ্ধিলাভ না করিয়াও, সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতীতও, একজন সাধন সম্বন্ধে, দর্শন করিবার নানা উপায় সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানিতে ও বলিতে পারে। কিন্তু উপরে সাক্ষাৎ দর্শনের যে ফল বর্ণিত হইয়াছে তাহা অল্পাধিক পরিমাণে প্রত্যেক সাক্ষাৎ দ্রষ্টার জীবনে লক্ষিত হইবেই তাহা না হইয়াই পারে না। অপরে তাহা কদাচ দৃষ্ট হইবে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাক্ষাৎলব্ধ জ্ঞানের মধ্যেও ভুল ভ্রান্তি মিশ্রিত থাকিতে পারে এবং তাহা দূর করিবার জন্য তর্ক বিচার প্রভৃতির প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু তর্ক বিচারাদির দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন নয়। সত্য নির্ণয়ের জন্য তাহাদের যতই প্রয়োজনীয়তা থাকুক না কেন, সত্য পাইতে হইলে কিন্তু সাক্ষাৎভাবেই পাইতে হইবে। আর, ইহাও বলা হইয়াছে যে, সত্য পাইলেই যে সকল সময় তাহার ব্যাখ্যাও করা যায়, এমন নহে। সুতরাং সত্য ব্যাখ্যা করিবার শক্তি অপেক্ষা সত্য পাইবার জন্যই অধিকতর চেষ্টিত হইতে হইবে। অর্থাৎ দার্শনিক প্রকৃতি অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি লাভ করিবার জন্যই আমাদিগকে অধিকতর যত্নশীল থাকিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক সর্ব্বোপরি সত্য নির্ণয় ও সত্য লাভ করিবার জন্যই চেষ্টিত। বৈজ্ঞানিক লব্ধ সত্য বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য ব্যাখ্যাও প্রদান করেন সত্য, কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখেন যে তাঁহার ব্যাখ্যার মধ্যে ভুলও থাকিতে পারে; তিনি সর্ব্বদাই নূতন লব্ধ সত্যের দ্বারা সে ব্যাখ্যাকে পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজন মত সংশোধনও করেন। বৈজ্ঞানিক ইহাও জানেন এবং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, এমন অনেক সত্য রহিয়াছে, তাঁহারা জানিতেও পারিয়াছেন, যাহার কোনও ব্যাখ্যা তাঁহারা দিতে পারেন না। কিন্তু দার্শনিক প্রধানভাবে সকল তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিবার জন্যই নিযুক্ত। প্রত্যেকেই আপনার ভাবে তাঁহার ব্যাখ্যা দেন বলিয়া দার্শনিকদের মধ্যে এত মতভেদ, এমন কি মতবিরোধও দেখা যায়। একই সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যাও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই মনে করেন আপনার ব্যাখ্যাই অভ্রান্ত, অকাট্য যুক্তির উপর স্থাপিত। অথচ প্রত্যেকেই অপরের ব্যাখ্যা ও যুক্তিতে নানা ভুল ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু সত্য সম্বন্ধে কোনও মতভেদই সম্ভবপর নয়, তাহা সেরূপভাবে দেখাও যায় না। এই হেতু অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক যেরূপ বিনয়ী হন, দার্শনিক সেরূপ হন না, বরং কোনও কোনও স্থলে অত্যধিক অহংকারীই হইয়া থাকেন। এই জন্যই বোধ হয় যোগবাশিষ্ঠে বলা হইয়াছে :—

"নানা-দুঃখ-বিকারিণী শুষ্ক তর্কমতানি যে
যান্তি শ্বভ্রং জলানীব, স্বলাভং নাশয়ন্তি তে।"

"যাহারা নানা দুঃখবিকার শুষ্ক তর্ক ও নীরস মত গ্রহণ করে তাহারা জলের ন্যায় গর্ত্তে পতিত হয় এবং স্বীয় পরমার্থলাভকেও বিনাশ করিয়া থাকে।" বাস্তবিক এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক না থাকিলে যে আমরা সাক্ষাৎ দর্শনলাভ অপেক্ষা নানা তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও প্রচার করিবার জন্যই অধিকতর আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত হইব এবং তাহা লইয়াই তুষ্ট হইয়া থাকিব, সেরূপ আশঙ্কার যথেষ্টই কারণ রহিয়াছে। তাহা হইলে যে আমরা প্রকৃত ধর্মলাভে

বঞ্চিত হইয়া বিনাশই প্রাপ্ত হইব, তাহা আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না।

তবে এখন প্রশ্ন এই, কিরূপে সেই সাক্ষাৎদর্শনলাভ করা যায়। তাহার যে কোনও অব্যর্থ প্রণালী আছে তাহা বলা যায় না। কেন না, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের উপর নির্ভর করে না। আমাদের কিছু করিবার আছে সত্য, কিন্তু তাহা করিলেই যে সকল সময় নিশ্চয় তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনলাভ ঘটিবে, এরূপ কথা বলা যায় না। কি করিলে হয় না তাহাই নিশ্চিতরূপে বলা যায়। এই জন্যই বলা হইয়াছে :—

"নায়মাত্মা প্রবচেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন,
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্।"

"অনেক উত্তম বচনদ্বারা, বা মেধাদ্বারা অথবা বহুশ্রবণ-দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। যাঁহাকে তিনি বরণ করেন একমাত্র তাঁহার দ্বারাই তিনি লভ্য। তাহারই নিকট পরমাত্মা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।" এখানে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এই দর্শন প্রধান ভাবে তাঁহারই কৃপার উপর নির্ভর করে, স্বপ্রকাশ দেবতা স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে তাঁহাকে কেহ কোনও প্রকারেই প্রকাশ করিতে পারে না। এখানে একমাত্র তিনিই কর্ত্তা, আর আমরা শুধু গ্রহীতা। যেখানে আমরাই শুধু একমাত্র কর্ত্তা, সেখানে সত্য দর্শন অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে আর সাধন ভজনের বা বিদ্যাবুদ্ধির অথবা তত্ত্ব-জ্ঞানের অহঙ্কার থাকিতে পারে না। দীনতা না আসিয়া যায় না। নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও অজ্ঞতাও পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়—আমরা যে সকল রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারি না, আমাদের বুদ্ধি বিচার দ্বারা যে সকল বিষয়ের মীমাংসাসাধন করা সম্ভবপর নহে, সে সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহই থাকে না। এই তত্ত্বটা বুঝাইবার জন্যই বৃক্ষাবলম্বী তপস্বী ও ধূলাখেলাতে নিযুক্ত পাগলের পৌরাণিক গল্প রচিত হইয়াছিল। ইহাদের কে কত দিনে মুক্তিলাভ করিবে, এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান নারদকে বলিয়াছিলেন যে, তপস্বীর মুক্তি বহু দূরবর্ত্তী—বৃক্ষে যত পত্র আছে তত লক্ষ বৎসর পরে—আর পাগলের মুক্তি অতি নিকটবর্ত্তী, অচিরকাল মধ্যেই তাহা সাধিত হইবে। কেননা, তপস্বীর নির্ভর আপনার সাধনের উপর, আর অপরের নির্ভর ভগবানের উপর। এক জনের মনের ভাব এই যে, তাহার বুদ্ধিতে যাহার মীমাংসা হয় না, ভগবান এমন কিছু করিতে পারেন না ; অপরে জানিয়াছে, তাঁহার শক্তি অনন্ত, তাঁহার পক্ষে সবই সম্ভবপর। এই জন্যই বিশ্বাস কথাটা নির্ভর অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশ্বাসীর আশা ও নির্ভর কিছুতেই ম্লান হয় না। বিশ্বাসী বলিতে অনুগতও বুঝায়। তাঁহার উপর পূর্ণ নির্ভর ব্যতীতও ধর্ম্ম হয় না, আবার আনুগত্য না থাকিলেও ধর্ম্মের কোনও অর্থ থাকে না। সুতরাং সকল দিক দিয়াই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল ভিত্তি, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোনও প্রকারেই প্রকৃত ধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারে না। আমরা সকলে তাঁহার বিশ্বাসী সন্তান ও বিশ্বস্ত দাস হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই।

"তাঁর কাছে খাঁটি হ'য়ে থাক হে তুমি নির্ভয়ে,
বিশ্বাসের দুর্গে ব'সে বল জয় জয় দয়াময়।"

# অমর কথা (২৯)

## মৃত্যুর পরপারের গৌরব মহিমা

আমার জীবন দেবতার ধন,
আমার এ আমি তাঁহারি দান,
ধূসর ধূলিতে পুলকপ্রবাহ
অসীমে গাহিছে মহিমা-গান।
অঙ্গে অঙ্গে জ্যোতির লহরী
ঢালিছে অমর জীবনভাতি,
তাহারি গরবে গেয়ে উঠি তাই,
দেবতার জ্যোতি মাখি' দিবা রাতি।
মৃত্যু-মলিন হিমের জড়তা,
কেমনে ছাইবে চেতন-বুকেতে,
কে ডাকে আমারে মরণের পারে
ছুটেছি অরূপে শান্তি সুখেতে।
তোমার করুণা আশীষ মাঝারে
আমি হে একটি জ্যোতির বিন্দু,
তোমারি বুকেতে হাসি আমি বঁধু,
চেতন-হসিত কনক-ইন্দু।
ওগো প্রাণসখা, তোমার বরেতে
জেগে আছি সুখে, নাহি কিছু ভয় ;
তোমারি আলোকে জ্যোতির প্রকাশে
সব গেল চ'লে, সবই হোল লয়।
এস সবে আজি সখার নামেতে,
যে জন মেরেছ শত দুখ-বাণ,
আজ ধূলি ছেড়ে দেখরে কোথায়
স্বরগেতে বাস দেবতার মান।
বিজয়-সঙ্গীত উঠেছে ভরিয়া,
থেমেছে মরণ-মোহের খেলা,
ত্রিভুবন-পতি, করি গো প্রণতি,
ধন্য তোমারি মহিমা-মেলা।
দেবলোকে যত স্বরগের বালা
ধরেছে পুলকে মোহন তান,
জয় জয় বঁধু, তোমারি হে জয়,
তোমারি করুণা-মহিমা-গান।

---

ইহ পরলোকের প্রজা আমি। কেবল এই রূপের দেশেইত আমার খেলা নয় ; আমার যে আর এক উন্নততর লোকের সঙ্গে অক্ষয় যোগ। তাইত ক্ষণে ক্ষণে সীমার বুকে বাস ক'রেও অসীমে উধাও হ'য়ে যাই। তাইত অনন্তের পিপাসা, তাইত মৃত্যুও আমার প্রিয়ধনদের কেড়ে নিতে পারে না। বুকের ধরে

চেতন-পুরে চিরজাগ্রত হ'য়ে রইলেন। দেহ চ'লে গেল, তবু যোগ ফুরাল না। দেহাতীত শুদ্ধ আত্মা এখনও আত্মপুরে বাস করেন, এখনও নীরব আদান প্রদান বাক্যহীন বাণী। যে বুকে প্রেমময়ের প্রেমলীলা, কে তার বিনাশ করে?

জানি না আমি কোথায় চলেছি মৃত্যুর পরপারে। তবু জানি আমার ভাগ্যবিধাতা আমার বুকে অমৃতবীণা বাজিয়ে এসেছেন; তাইত সকল সুরে সুরে অমৃতগান মেশামিশি হ'য়ে আছে, তাইত আনন্দ-আশ্বাসে জেগে থাকি, তাইত ভাগবতী তনুখানির জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ পূজা করি।

দেহান্তে এ কি ভাগবতী তনুলাভ! জানি না ত সে তেজময় স্বরূপ, তবুও বুঝেছি আত্মার অমরত্বলাভ। দেহাতীত শাশ্বত স্বরূপ চৈতন্যময় আত্মসুন্দর ধ্রুব সত্তা অনন্ত অমর জীবন। যা পার্থিব তা পৃথিবী-বুকেই নব নব রূপে উদ্ভাসিত হোয়ে উঠবে, আর দেবতনু তারও অখণ্ড অস্তিত্ব, উন্নত হোতে উন্নততর লোকেই ছুটে চলবে।

মৃত্যু যেন সুষুপ্তিরই আভাস মাত্র। মৃত্যুর আনন্দ আবেশে সকল বহির্ম্মুখীনতা শান্ত হোয়ে আসে, বাহির হইতে ভিতরে জ্ঞানলোকে জ্যোতির্ম্ময় ধামের নিত্য সত্তা প্রকাশ করে। যেমন নিদ্রার কোমল স্পর্শে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হ'য়ে আসে, যেন মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে আসে, অথচ প্রাণের লীলা চলে, ধমনীতে ধমনীতে রক্তপিণ্ডে আনন্দ জীবন নৃত্যপ্রবাহ চলে। প্রাণের নীরব আনন্দ সাড়া সর্ব্বাঙ্গে প্রাণস্পন্দে ছুটে চলে। অথচ এ কি নিদ্রাবেশ! ও কি সুপ্তিঘোর! আনন্দ বিশ্রাম! দৈহিক জীবনের স্বাস্থ্য আরাম অথচ এই সুপ্তিলীলার ভিতর সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্তির আনন্দ-লীলার ভিতরই প্রতিদিনের কর্ম্ম-সাধনা, নবশক্তি, নব আনন্দ-সূচনা। তেমনই আত্মার বিচিত্র চৈতন্য-সত্তা,—দেহ অবশ হ'য়ে গেল অথচ আত্মা জেগে রইলেন! মানব জীবনে সুপ্তির মহাঘোরের ভিতর এ কি ঐন্দ্রজালিক রহস্য। নিদ্রাই দৈহিক জীবনের প্রাণধারা সঞ্চার করে, কোমল স্নিগ্ধ মাংসল সুস্থ সবল দেহখানি রচনা করে। এ কি অবর্ণনীয় লীলা-মাহাত্ম্য! এই সুপ্তিঘোরের ভিতরই আবার আমার আমি সেই একই চেতনার সুরে জেগে আছে, তার সেই একত্ব স্থায়িত্ব-মহিমা জেগে রইল, তেমনই মৃত্যুর আনন্দ সমাবেশে মহানিদ্রার ভিতর যেদিন সকল বহির্মুখীন ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যাবে, কে জানে আমার আমির মুক্ত প্রকাশের সে কি বিচিত্র উপলব্ধি!

সুপ্তির আবেশের ভিতর তন্দ্রাঘোরে আমার চেতনা স্বপ্নঘোরে কত কি দৃশ্যের অবতারণা করে, আর এক অখণ্ড প্রাণলীলা জাগ্রত হ'য়ে থাকে! তন্দ্রাঘোরেও আমার অন্তরে অন্তরে কত কিছু ধারণা করি, দর্শন করি, চিন্তা করি, সুখ দুঃখের লীলা কানন রচনা করি! তেমনই বুঝি যেদিন এ বহির্মুখীন লীলা শেষ হ'য়ে যাবে, আমার আনন্দ-অস্তিত্বের সে কি নব জাগরণ হবে! আত্মজ্ঞানেই সকল জ্ঞানের মহিমা, আত্মজ্ঞানেই তার নিত্য নূতন কল্পনা, নিত্য নূতন কর্ম্মসাধনা; যদিও স্মৃতির ঘরে সব কথা সুস্পষ্ট হ'য়ে থাকে না, তবু সেই আমি, চির পুরাতন আমি, জেগেই আছি। অধ্যাত্ম-লোকে শান্ত সমাহিত মৌন আত্মার এ কি দেহাতীত শাশ্বত মঙ্গল অস্তিত্ব-সত্তা-উপলব্ধি! এত দেহের ঘরে বাস ক'রেও ত মানুষ শুভমুহূর্ত্তে উপলব্ধি করে, যুগে যুগে সাধু ভক্তের ধন্য আনন্দ-সমাধি।

কি গভীর সুপ্তিঘোর, কি তন্দ্রাবেশ, সকল অবস্থাতেই আমার চেতনাধারা একই ভাবে প্রবাহিত। আমার আমি আত্ম-স্বরূপেই জেগে আছি। জীবাত্মা তার বিচিত্র সত্তার ভিতর যা ক্ষণস্থায়ী তা পরিহার করে, আর সত্যরূপে জাগ্রত হয়। কত সময় হয়ত ভীষণ ব্যাধিতে কত অঙ্গ অবশ হ'য়ে গেল, তবু আমি যে আমি সে আমিই জেগে রইলাম। কত মানুষ স্বপ্নঘোরে ওঠে, চলে, কত কিছু করে, অথচ তার সে চলা, সে দেখা ত তার ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ জ্ঞানক্রিয়া নয়, অথচ জাগ্রত আত্মা কেমন সুনিপুণ সুশৃঙ্খলায় কত ক্রিয়ার আদান প্রদানের ভিতর তার জাগ্রত আত্মারই মহিমা-লীলা প্রকাশ করে। বহির্মুখীন ইন্দ্রিয় ঘুমিয়ে রইল অথচ অন্তর্মুখীন জাগ্রত সত্তার জ্ঞানময় কর্ম্মপ্রবাহ চোল্‌ল। এর সত্য ব্যাখ্যা কে দেবে? আত্মার জাগরণেই দেহের কর্ম্মলীলা; ইন্দ্রিয় জ্ঞান উপলব্ধিও এই আত্মজাগরণেই প্রকাশিত। তাই আমি যেই ঘুমিয়ে পড়ি, আমার ইন্দ্রিয়জ্ঞানও ঘুমিয়ে পড়ে। বহির্জগতের জ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারের বিচিত্র প্রতিষ্ঠার ভিতর আমার জ্ঞানলীলার ভিতর জাগ্রত।

জীবাত্মা দেহেরই আনন্দ-ধন, যেদিন লীলা ফুরিয়ে যায়, জীবাত্মা মুক্ত হ'য়ে চেতনসত্তার ভিতর জেগেই থাকেন। দেহের ঘরে বাস ক'রেও উপলব্ধি কার, যখন আমি সমাহিত হই আমার সকল ইন্দ্রিয় নিস্পন্দ হ'য়ে যায়, কোন বাহ্য জ্ঞান উপলব্ধি আর থাকে না। তাই দেবতার ঘরে বাস ক'রেও বিদেহী হ'য়ে যাই। তাইত মৃত্যুর ভিতরও আমার দেবত্ব অমরত্ব ভগবদ্গরিমা। দেহ পড়ে রইল, ধূলার দেহ ধূলিসাৎ হইল, দৈহিক সংগ্রাম, দৈহিক বেদনা, দৈহিক জ্বালা ফুরিয়ে গেল, আর চেতনময়ী মুক্ত আত্মার কি দেবশক্তি, কি শাশ্বত স্বরূপ! যতই দেহমুক্তি ততই নিত্যানন্দ উপলব্ধি, জরামরণ রহিত শাশ্বত সচ্চিদানন্দ লীলা!

ওগো আমার জীবন-দেবতা! এমনি দেহমুক্ত আত্মার যেদিন উজ্জ্বল স্বরূপ লাভ হবে কেমন ক'রে তোমার কাছে দাঁড়াব? হায়! হায়! এখানে প্রিয়জনেরা কাঁদেন যাঁরা রইলেন দেহে আমার আনন্দ মুক্তিতে আমার মহাজাগরণে, আর আত্মলোকে দেহমুক্ত প্রিয়ধনদের ও কি আনন্দ সমাগম শুভ সম্ভাষণ! সব একাকার। এলোক ওলোকে ভালবাসা সব মেশামিশি হ'য়ে গেল! এ কি জয়গৌরব দিলে! এ দীনাত্মাও তোমারই বরে শুদ্ধ মুক্ত হ'য়ে তোমারই চরণপ্রান্তে আপনাকে নিবেদন করিয়া ধন্য হইল, কৃতার্থ হইল। এবার সত্য শুদ্ধ সত্তার ভিতর কৃতার্থ কর, ধন্য কর। ওগো পূর্ণ মঙ্গল সত্য সুন্দর, তোমারি জয়। ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্। সমাপ্ত।

## পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক।

পিতাঠাকুর সন ১২৭৫ সালে ইংরাজী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ৬ই মাঘ ৬ষ্ঠী তিথিতে হাওড়ার অন্তর্গত আন্দুলগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র, মাতা ভুবনমোহিনী। তাঁহার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা ভগ্নী হরিদাসী, মধ্যম শরৎচন্দ্র, পিতাঠাকুর সর্ব্ব-কনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি পিতামাতার বড় আদরের ছিলেন। অতি শৈশবে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইবার পর হইতে তাঁহার পিতা-মাতা বিশেষ আবদার সহ্য করিতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার কলিকাতায় যাইবার বিশেষ আগ্রহ ছিল; পিতার বিশেষ আগ্রহে তাঁহার পিতা মহাশয় কলিকাতার নিকটস্থ গার্ডেন রিচের বাসায় লইয়া গিয়া তাঁহাকে এক পাঠশালায় প্রবেশ করাইয়া দেন। তখন পিতার বয়স ৬ বৎসর।

সন ১২৮১ সালে খৃষ্টীয় ১৮৭৬ অব্দে তাঁহার পিতৃদেবকে ইহ জীবনের মত হারান। পিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইলেও পিতৃব্য উমেশচন্দ্রের যত্নে ও ভালবাসায় পিতা অভাব ও কষ্ট কিছু জানিতে পারেন নাই।

তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে পিতাঠাকুরকে খিদিরপুর বঙ্গ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইয়া দেন। তাহার প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার পর নানা কারণ প্রযুক্ত বঙ্গ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া গার্ডেনরিচ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। উপযুক্ত শিক্ষকের [illegible] দুঃখে কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল, ও প্রকৃত বন্ধুর অভাবে অনেক সময় তিনি মনোকষ্টে দিন কাটাইতেন।

যখন তিনি খিদিরপুর গার্ডেনরিচ চার্চ্চ মিশনারি এইচ, সি, স্কুলে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার বয়স ১৪ বৎসর ছিল। ১৭ বৎসর বয়সের সময় অর্থাৎ ১২৯২ সালের ৪ঠা মাঘ রবিবার রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ তাঁহার পিতৃব্য উমেশচন্দ্রকে ইহ-জীবনের মত হারান। ইহ-জীবনের মত হারাইয়া নানা অভাব ও অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের মৃত্যু সোনাই গ্রামের বাসায় হইয়াছিল। উমেশ-চন্দ্রের মুখাগ্নিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি পিতাকে সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল।

সন ১২৯১ সালে আড়গোড়ী নিবাসী ৺ অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল। উভয়ে এক দিবস নানা কথোপকথনের পর ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া একখানি পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া-ছিলেন। অবিনাশ বাবু পুস্তক লিখিবার ভারও গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। পুস্তকের কিয়দংশ লেখাও হইয়াছিল। আমাদের সামান্য লেখনীতে জনসাধারণের তাদৃশ উপকার হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প বিবেচনা করিয়া তাঁহারা সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া-ছিলেন। উভয়ে একদিবস দেশের অবস্থার বিষয় আলোচনা করিতে করিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, দিন দিন জ্ঞানের প্রচারের পরিবর্ত্তে সুরাপায়ী অসৎলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। নীতি শিক্ষার পরিবর্ত্তে কুশিক্ষার অশেষ বিস্তার পাইতেছে। এই সকল কারণে সেই দিবস হইতে সভা সমিতি করিয়া দেশীয় লোকদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া উভয়ে নানা চিন্তার পর আন্দুল আত্মোন্নতি সভা নামে ১৮৮৫ অব্দে একসভা স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রথমে সভাকে পাক্ষিক আকারে গঠিত করিয়াছিলেন। পিতা সম্পাদক এবং অবিনাশ বাবু সহকারী সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের সাবেক বাটীর নিম্নগৃহে প্রথমে সভার অধিবেশন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচরণ মিত্র, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ মল্লিক, হীরালাল মল্লিক, বেণীমাধব চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়া-ছিলেন। পরে সভাকে সাপ্তাহিক আকারে পরিণত করেন। ক্রমে বহু স্কুলের ছাত্র সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। সেই সময়ে সাধারণের সুবিধার জন্য মল্লিক বাবুদের বাটীতে সাবেক ইংরাজী স্কুলভবনে সভাকে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। পিতৃব্য উমেশচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে পিতাঠাকুর আন্দুল উচ্চশ্রেণী ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তাঁহার কনিষ্ঠ খুল্লতাত শিবচন্দ্রের সাহায্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তখন শিবচন্দ্র আন্দুল রাজবাটীতে কার্য্য করিতেন। শিবচন্দ্রের বিশেষ চেষ্টায় একটী অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। রাণী দুর্গাসুন্দরী জুবিলী H. C. E স্কুল নামে কৃষ্ণচন্দ্রের দাতব্য চিকিৎসাভবনে আনেন। পিতাঠাকুর তখন জুবিলী স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন। সেই সময় সভার সম্পাদক স্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন। ইহার কিছু পরে ঐ সভা প্রার্থনা সমাজে পরিণত হইয়াছিল। প্রতি রবিবার সন্ধ্যার পর আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রণালী অনুসারে উপাসনা হইত ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখান পাঠ হইত। প্রতি-বৎসর ১২ই পৌষ বিশেষ সমারোহের সহিত উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইত। তাহাতে দেশের অনেক গণ্য মান্য লোক যোগ-দান করিতেন। কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি আসিতেন। পিতাঠাকুর উপাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদকের কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

খুল্লতাত শিবচন্দ্র মহাশয়ের আগ্রহে সন ১২৮৮ সালে ১৬ই আষাঢ় তারিখে পূর্ব্বপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জৈষ্ঠা কন্যার সহিত পিতা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কালের অবিরাম গতির সম্মুখে বাধা দেয় কাহার সাধ্য! সুতরাং গৃহ বিবাদরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধীরে ধীরে সমস্ত বাটীটী অধিকার করিয়াছিল। এই সময় হইতে তাঁহার মনে অশান্তিতে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এই সময় হইতে তিনি সকল বিপদেই ভগবানের উপর নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে উপাসনায় গভীরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। দৈনিক উপা-সনার সহিতও সাধন ভজন আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি এক এক দিন অবিনাশ বাবুর বাটীতে যাইয়া উপাসনা করিতেন। সভার

শ্রাদ্ধবাসরে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মল্লিক কর্ত্তৃক পঠিত

হয়ে ইং ১৮৮৬ খৃঃ একটী পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। সংসারে নানা অভাব হেতু তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার পর বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তাঁহাকে চাকরীর চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। প্রথমে stamp of stationary office এ কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন। তাহার পর আরও ২।৩ টী অফিসে শিক্ষানবীশের কার্য্য করিতে হইয়াছিল। একদিন সভায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন, হোমিও প্যাথিক ঔষধের মূল্য অল্প হইয়াছে চিকিৎসালয় চলিতে পারে। উক্ত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ

## নূতন সঙ্গীত

খট্

( সুর—কি ভয় ভাবনা রে মন, লয়েছি যাঁর আশ্রয় )

জগতের জননী হ'য়ে, আমার ব্যথা বুঝ্‌লে না !
এখনও যদি না লও কোলে, মা ব'লে আর ডাক্‌ব না।
শিশু যদি 'মা' না ডাকে, মায়ের আদর কোথায় থাকে ?
দুঃখ-হরা নামটী তোমার, ভবে কেউ আর বল্‌বে না।
কতই ডাকি 'মা, মা' ব'লে, তুমিও কি বধির হ'লে ?
আমার মতন বধির হ'লে, তোমার জগৎ চল্‌বে না !
শত অপরাধী আমি, মা হ'য়ে ঠেকেছ তুমি,
অকূলে ভাসায়ে দিলেও, অভয় চরণ ছাড়্‌ব না॥

শ্রীশ্রীনাথ চন্দ

## ব্রাহ্মসমাজ।

**মাঘোৎসব**—প্রেমময়ের অপার করুণায় আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব পুনরায় সমুপস্থিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে একাধিক-শততম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবেন, এরূপ স্থির করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে। ব্যাকুলহৃদয় বিশ্বাসিগণের সম্মিলনের উপর উৎসবের সফলতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উৎসবে যোগদান করিবার জন্য সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন :—

১লা ও ২রা মাঘ ( ১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী ) বৃহস্পতি ও শুক্রবার—ব্রাহ্মপরিবারসমূহ এবং ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।

৩রা মাঘ ( ১৭ই জানুয়ারী ) শনিবার—প্রাতে ঐ। সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৪ঠা মাঘ ( ১৮ই জানুয়ারী ) রবিবার—প্রাতে যুবকদিগের উৎসব উপলক্ষে ৭ ঘটিকায় কীর্ত্তন ও ৮ ঘটিকায় উপাসনা। আচার্য্য—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় যুবকদিগের আলোচনা। বিষয়—দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য।

সভাপতি—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বরাহনগর শ্রমজীবিগণের নগরসংকীর্ত্তন। সায়ংকালে শ্রমজীবিগণের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী।

৫ই মাঘ ( ১৯শে জানুয়ারী ) সোমবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায়। সায়ংকালে সঙ্গতসভার উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা। বক্তা—পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ।

৬ই মাঘ ( ২০শে জানুয়ারী ) মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ( মহর্ষির পরলোকগমনের দিন ) সায়ংকালে স্মৃতি-সভা; সভাপতি—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, বক্তা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, ললিতমোহন দাস ও অমিয়কুমার সেন।

৭ই মাঘ ( ২১শে জানুয়ারী ) বুধবার—প্রাতে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা।

৮ই মাঘ ( ২২শে জানুয়ারী ) বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়। সায়ংকালে তত্ত্ববিদ্যা-সভার উৎসব—বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। বেদান্তবাগীশ।

৯ই মাঘ ( ২৩শে জানুয়ারী ) শুক্রবার—প্রাতে মহিলাদিগের উৎসব ও পুরুষদিগের জন্য সিটিকলেজ-গৃহে পৃথক উপাসনা। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিকসভা [ কেবল সভ্যদিগের জন্য ]

১০ই মাঘ ( ২৪শে জানুয়ারী ) শনিবার—প্রাতে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় নবদ্বীপ স্মৃতিসভা, সভাপতি—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়। বক্তা—শ্রীযুক্তা সুশীলা বসু, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ রায়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় নগর সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

১১ই মাঘ ( ২৫শে জানুয়ারী ) রবিবার—**সমস্তদিনব্যাপী উৎসব**। প্রত্যুষে ৫ ঘটিকায় উষাকীর্ত্তন। পূর্ব্বাহ্ণ ৭½ ঘটিকায় উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকায় উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় পাঠ ও ব্যাখ্যা—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায়, ভাই সীতারাম। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় ইংরাজীতে উপাসনা; আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। অপরাহ্ণ ৫ঘটিকায় সংকীর্ত্তন; সায়ংকালে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী ) সোমবার—প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় আলোচনা। সায়ংকালে বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ।

১৩ই মাঘ ( ২৭শে জানুয়ারী ) মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য— পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায়

বালকবালিকা সম্মিলন। সন্ধ্যায় ইংরাজীতে উপাসনা— আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) বুধবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় মেরী কার্পেন্টার হলে রবিবাসরীয় নীতিবিদ্যালয়ের উৎসব। সায়ংকালে ইংরাজীতে বক্তৃতা। বক্তা—রেভাঃ এম সি র‍্যাটার।

১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী। সন্ধ্যায় উপাসনা ও শান্তিবাচন। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস।

প্রাতে ৭ ঘটিকায় ও সন্ধ্যায় ৬॥ ঘটিকায় কার্য্য আরম্ভ হইবে।

---

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১লা জানুয়ারী ধুবড়ী নগরীতে শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকারের পত্নী চারুপ্রভা সরকার ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ৩০শে ডিসেম্বর মান্দ্রাজ নগরীতে রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ বসুর মাতা পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ১১ই জানুয়ারী গিড়নীতে তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

**উৎসব**—নিম্নলিখিত প্রণালীতে নিমতা ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম সাম্বৎসারিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—৩১শে ডিসেম্বর সায়ংকালে উদ্বোধন; আচার্য্য শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য। উপাসনার পর শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল মহাশয় দেবেন্দ্র নাথের জীবন সম্বন্ধে ছায়াচিত্র সংযোগে বক্তৃতা করেন। ১লা জানুয়ারী প্রাতে নগরসংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী শাস্ত্র ব্যাখ্যা ও প্রার্থনা করেন। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে কীর্ত্তন করেন। প্রায় একশত ভিক্ষুককে আহার করান হইয়াছিল।

২৩শে ডিসেম্বর হইতে ২৭শে ডিসেম্বর গিরিধি ব্রাহ্মসমাজের উনপঞ্চাশত্তম বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই উৎসবের কার্য্য ভার প্রধানতঃ গ্রহণ করায় সকলেই বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। তিনি উৎসবে দুই বেলা আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং প্রথম দিন "ধর্ম্মরাজ্য সম্বন্ধেরই রাজ্য" এবং দ্বিতীয় দিন "সুখ ও দুঃখ প্রেমের সহায়" এই বিষয়ে দুটী সুন্দর উপদেশ দিয়াছিলেন এবং "সকল ধর্ম্মের উত্তরাধিকারী" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কবিরের প্রেম-সাধনা বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বাকি কয় বেলা স্থানীয় আচার্য্যগণ আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং একদিন মিঃ ডি এন মুখার্জ্জি "মানব জীবনে বিধাতার লীলা" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

---

**শুভ বিবাহ**—বিগত ১৩ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্যাণীয়া প্রমীলা ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দের পুত্র শ্রীমান বসন্তকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নব দম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

**প্রচার**—গত ২৭শে ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বলরামপুরে পরলোকগত সীতানাথ বক্সীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত বরদা প্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত অপর্ণা চরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নিরুপম ব্যানার্জ্জী ও শ্রীমান সুনীল বাগচী গমন করেন। সায়ংকালে স্কুল বাড়ীতে বরদাবাবু উপাসনা করেন ও নিরুপম বাবু সঙ্গীত করেন। পরদিন প্রত্যূষে গ্রামবাসীদের দ্বারে দ্বারে সকলে মিলিয়া ঊষাকীর্ত্তন করেন। মধ্যাহ্নে বক্সী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার কাছারীবাড়ীতে অপর্ণাবাবু উপাসনা, প্রার্থনা ও শাস্ত্রপাঠ করেন ও নিরুপম বাবু গান করেন অপরাহ্ণ ৩ঘটিকায় স্কুলবাড়ীতে বরদা বাবু কথকতা করেন।



ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ১লা মাঘ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ।

Registered No. 56

# তত্ত্ব-কৌমুদী

অসতো মা সদগময়,
তমসো মা জ্যোতি র্গময়,
মৃত্যোর্ম্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খৃঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৩ ভাগ
২০ম সংখ্যা।

১৬ই মাঘ শুক্রবার, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০২
30th January, 1931.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা

হে করুণাময় পিতা, উৎসবমধ্যে তোমার অপার করুণা অজস্র ধারেই বর্ষিত হইয়াছে। আমরা যে কি পরিমাণে তাহা হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ ও অন্তরে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিয়াছি, তাহা তুমিই ভাল জান। তোমার অসীম প্রেমের কথা নানা ভাবে নানা জনের মুখে শুনিয়াছি, তাহার অনেক পরিচয়ও পাইয়াছি। আমাদের চেষ্টা যত্ন সাধন ভজনের উপর নির্ভর করিয়া যে আমরা উৎসব করিতে পারি না, তোমার যে প্রেম আমাদিগকে চির কল্যাণের পথে লইয়া যাইবার জন্য নিত্য নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহা দেখা ও তাহার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করাতেই যে উৎসব, সে কথা ভাল করিয়া বুঝিতে দিয়াছ। তুমি নিরাশ প্রাণে নব আশার সঞ্চার করিয়াছ। অবসন্ন হৃদয়ে নূতন উৎসাহ জাগাইয়াছ। কিন্তু এই ভাব আমরা কত দিন রক্ষা করিতে পারিব জানি না। হে হৃদয়দর্শী দেবতা, তুমি আমাদের অন্তরের সকল অবস্থাই জান। আমরা জানিয়া বুঝিয়াও সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে আপনাদিগকে অর্পণ করিতে পারি না, সকল সময় সকল অবস্থাতে তোমার প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া চলিতে পারি না, তাহা তুমি জান। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের এই দুর্ব্বলতা দূর কর। যাহাতে তোমার এই জীবন্ত প্রেম আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারি, এবং সকল অবস্থায় তাহাতে নির্ভর করিয়া, তোমার পথে চলিয়া, তোমার কার্য্য করিয়া, ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারি, জীবনকে উৎসবময় করিতে সমর্থ হই, তুমি আমাদিগকে সেই বুদ্ধি ও বল প্রদান কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমারই ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

---

## একাধিক শততম মাঘোৎসব।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও মাঘোৎসবের প্রস্তুতি উপলক্ষে সমস্ত পৌষ মাস প্রতিদিন নগরের বিভিন্ন অংশে দ্বারে দ্বারে ঊষাকীর্ত্তন করিয়া এক বাড়ীতে উপাসনা প্রার্থনাদি করা হইয়াছে। এবার নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন নিরাশার মধ্যে এই কার্য্য আরম্ভ ও পরিচালিত হইয়াছে। একমাত্র করুণাময় পিতার কৃপাতেই কার্য্যটি সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিবস সিটিস্কুল-প্রাঙ্গণে সকলে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রার্থনা করেন, এবং কীর্ত্তনের দল সাধনাশ্রমে উপস্থিত হইলে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনার কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত অমৃত-কুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস ও শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র সঙ্গীত পরিচালনা এবং শ্রীযুক্ত ললিত-মোহন দাস, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখার্জ্জি, ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। দুই দিবস সহরের বাহিরে, নিমতা ও আন্দুল গ্রামে, যাওয়া হইয়াছিল।

করুণাময়ের কৃপায় উৎসবও আশার অতিরিক্ত-রূপেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। নানা বাধা বিঘ্ন ও নিরাশার মধ্যেই আয়োজন আরম্ভ করা হইয়াছিল। তিনি কৃপা করিয়া সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া দিয়াছেন, সকলের প্রাণে নব প্রেরণার সঞ্চার করিয়াছেন। তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নহে। আমরা বাহিরের বিবরণই প্রদান করিতেছি। উপদেশাদির মর্ম্ম হইতে উৎসবের প্রধান ভাব ও শিক্ষা কিছু পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে।

**১লা ও ২রা মাঘ (১৫ই ও ১৬ই জানুয়ারী) বৃহস্পতি ও শুক্রবার—**ব্রাহ্ম পরিবার এবং ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস সমূহে ব্রাহ্মসমাজের

কল্যাণার্থ প্রার্থনার জন্ম নির্দিষ্ট ছিল। যাহার যেদিন যে সময়ে সুবিধা হইয়াছে উপাসনা প্রার্থনাদি করিয়াছেন। অনেক গৃহ এই উপলক্ষে সুসজ্জিতও করা হইয়াছিল।

---

৩রা মাঘ (১৭ই জানুয়ারী) শনিবার—অদ্যকার প্রাতঃকালও উক্ত কার্যের জন্ম নির্দিষ্ট ছিল। সায়ংকালে মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন-সূচক উপাসনা। পূর্ব্বেই মন্দির পতাকা পুষ্পে শোভিত করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার মধ্যেই গৃহ উপাসকগণে পূর্ণ হইয়া যায়। কিছু সময় প্রমত্তভাবে সংকীর্ত্তন হইলে পর, যথা সময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

উৎসবের উপকরণ।

বৎসরান্তে আবার আমাদের প্রিয় মাঘোৎসব উপস্থিত। উৎসব কি? উৎসব এক দিকে নূতন আনন্দ ও নূতন আশাতে পূর্ণ হওয়া; অপর দিকে নূতন ভাবে ঈশ্বরচরণে আত্মসমর্পণ করা, বৎসরান্তে সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে ঈশ্বরচরণে ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি আরও দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লওয়া। এ আনন্দ করিবে কে? এ আত্মসমর্পণ করিবে কে? সকলে মিলিয়া করিব। উৎসব সেই সময়ের নাম, যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সব ভাই বোন একত্র মিলিত হইয়া, এক হৃদয় হইয়া, আনন্দ ও আশাতে প্রাণকে পূর্ণ করেন, এবং নূতনভাবে ঈশ্বরচরণে আত্মসমর্পণ করেন।

হৃদয়ের জাগরণ।

আমাদের এ উৎসব কি লইয়া ও কাহাকে লইয়া? উৎসবের উপকরণ কি কি? উৎসব প্রথমতঃ আমাদের প্রেমময়ী আনন্দময়ী জননীকে লইয়া। তাঁহার নাম আনন্দময়, তাঁহার সঙ্গ আনন্দময়, তাঁহার প্রসঙ্গ আনন্দময়। ভক্তেরা নিত্য এ আনন্দের অনুভবের মধ্যে মগ্ন থাকেন। আমরা কেন সে আনন্দ পাই না? আমাদের হৃদয়টা সব দিন জাগরিত থাকে না ব'লে। উৎসবে হৃদয়টা জাগা চাই। মা যে কেমন, মার ঘরে বাস কর্‌তে পাওয়া যে আমাদের কেমন অমৃতময় অধিকার, তার অনুভবে প্রাণটা ভরপুর হ'য়ে যাওয়া চাই। সংসারে কত সময় এমন দেখা যায় যে যাকে খুব ভালবাসি, যার ভালবাসাতে প্রাণমন ভরপুর হ'য়ে থাক্‌বার কথা, তার সঙ্গে সম্বন্ধটা যেন কিছুদিন ধ'রে ভাল ক'রে আস্বাদন কর্‌তে পার্‌ছি না। হয়তো কাজ কর্ম্মের ব্যস্ততায় ভাল ক'রে কাছে ব'সে ভালবাসার আনন্দটা আস্বাদন করা হচ্ছে না। অথবা হয়তো সংসারের নানা সংঘর্ষণে প'ড়ে মন দুটি পরস্পরের প্রতি ঈষৎ বিমুখ হ'য়ে র'য়েছে। মনে মনে অনুভব করি যে এই অবস্থাটা ঘুচে যাওয়া দরকার, অথচ তাহা ঘুচে যেতে দেরী হচ্ছে। শেষে মন আর মান্‌তে চায় না। হৃদয়ের বেদনা এমন প্রবল হ'য়ে ওঠে যে, সব কাজ কর্ম্ম ফেলে দিয়ে, সব মান অভিমান ভুলে গিয়ে, নত হ'য়ে ও ব্যাকুল হ'য়ে প্রেমের হাতে ধরা দি। তখন আবার সম্বন্ধটা তাজা হ'য়ে প্রবাহিত হ'তে থাকে। ধর্ম্মজীবনেও সেই দশা হয়। আমাদের এমন কত দিন যায়, কত মাস যায়, হয়তো জীবনের কত বৎসরও চ'লে যায়, যার মধ্যে স্নেহময়ী পরম জননীর দিকে ভাল ক'রে মুখ তুলে তাকাই না; তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা ভাল ক'রে অনুভব করি না; তাঁর হাতে ভাল ক'রে আত্মসমর্পণ করি না। মা ব'লে স্নেহের অনুভূতিতে আর্দ্র হ'য়ে গিয়ে তাঁর কোলে বসি না। উৎসবে সেইভাবে বস্‌তে হবে। উৎসবে কি আমরা শুধু বেশী ভাল ভাল গান কীর্ত্তন উপাসনা বক্তৃতা শুনব ব'লে মনে করি? বেশী ভাল অর্চ্চনা বন্দনা হ'লেই কি উৎসব হয়? তা নয়। কোন কোন বাড়ী এমন আছে, যার লোকেদের হৃদয়গুলি তেমন জাগরিত নয়। সেই সব বাড়ীতে যেদিন খুব ধুমধাম হয়, কোনও ভোজ বা সমারোহ হয়, সেই দিনই মানুষগুলির মন খুসীতে পরিপূর্ণ হয়; সেই দিনই তাদের উৎসব হয়। কিন্তু আবার অন্য রকম বাড়ীও আছে। সেখানে মানুষগুলির অন্তরের জীবন অধিক উন্নত, অধিক বিকশিত। তারা ধুমধাম করা কিংবা ভাল খাওয়া দাওয়া করাকেই উৎসব মনে করে না। সে সব বাড়ীতে যেদিন কোনও কারণে পরস্পরের প্রেমের স্পর্শটি অন্তরে ভাল ক'রে জাগে, যেদিন মায়ের পুরাতন মুখখানি স্নেহদীপ্ত হ'য়ে নূতন লাগে, যেদিন পিতার পুরাতন স্নেহ-আশীর্ব্বাদই নূতন ক'রে ভাল লাগে, যেদিন পতি-পত্নীর ভালবাসাতে বা ভাই বোনের ভালবাসাতে কোনও কারণে নূতন স্বাদ আসে,—সেই দিনই মানুষগুলি উৎসব হ'চ্ছে ব'লে অনুভব করে। ব্রাহ্মসমাজ সেই রকম একখানি বাড়ী। এখানে প্রাণস্পর্শই সব চেয়ে বড় কথা। আমাদের প্রেমময়ী জননীকে, স্নেহময় পিতাকে, যাতে খুব ভাল লাগে, তার জন্ম খুব ব্যাকুল হই, এস। তা হ'লেই উৎসবের ভাল আয়োজন হবে। আজ মাঘোৎসবের উদ্বোধনের দিন। এস আজ থেকে সেই সাধনায় লেগে যাই, যাতে মার মুখ খুব ভাল লাগে, মার নাম খুব ভাল লাগে। তাঁর ঘরে বাস করব, তাঁকে দেখব, অথচ প্রাণ আনন্দে নেচে উঠ্‌বে না,—এ অবস্থা নিয়ে আর কিছুতেই থাকা হবে না।

এইজন্য আমরা উৎসবের আরম্ভ থেকে উৎসবের শেষ পর্য্যন্ত বা'র বার ভক্তদের ডাকি। পৃথিবীর সেই সকল বন্ধুদের ডেকে ডেকে আনি, যাঁরা মাকে দেখে দেখে হাস্‌চেন। তাঁদের ডেকে বলি, "ভাই বোন, তোমরা আমাদের কাছে এস; তোমরা এলে আমাদের উৎসব ভাল হবে। তোমাদের প্রাণের হাসির স্রোত, তোমাদের প্রাণের আনন্দের স্রোত, আমাদের আত্মার গায়ে লাগুক্।" মা যে কত মিষ্টি, তা ভক্তদের আনন্দোজ্জ্বল মুখশ্রী দেখে এ সময়ে অনুভব কর্‌তে বড় ইচ্ছা হয়।

পরম জননীর ছবি।

সেই মায়ের মুখ ভাল ক'রে দেখ্‌বে কি, ভাই বোন্? আমার আজ সেই মায়ের ছবি আঁক্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে। ভাই বোন্, তোমরা তোমাদের আশীর্ব্বাদ দিয়ে, তোমাদের আত্মিক সান্নিধ্য ও স্পর্শ দিয়ে, আমাকে এ কাজে সাহায্য কর। একবার

ভাল ক'রে মায়ের মুখের ছবি দেখ্‌তে চাই। আমাদের মা কেমন মা? তাঁর মুখখানি কেমন? তাঁর স্বরূপ কেমন?

প্রথম যে ছবি আমার মনে আস্‌চে, তা হ'ল পতিতের জন্য ব্যাকুল মা। যীশু চল্লিশ দিন নির্জ্জন মরুপ্রান্তরে গিয়ে একা ব'সেছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে যখন তিনি কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন, লোকেরা বলল, এমন কথা তো কেউ আগে বলে নি! লোকেরা বিস্মিত হ'য়ে গেল। তখন সে দেশের লোকেরা জান্‌ত, ঈশ্বর পুণ্যতেজোময়, ঈশ্বর ন্যায়বান্ বিচারক, ঈশ্বর পাপের দণ্ডদাতা ও পুণ্যের পুরস্কারদাতা। ঈশ্বরের যে ছবি তারা তখন দেখ্‌ত, তাতে পুণ্যবান্‌দের মনে উৎসাহ হ'ত বটে, কিন্তু পাপীরা ভয়ে ম'রে যেত। যীশু চল্লিশ দিন একান্তে ব'সে ব'সে কি কি সাধনা ক'রেছিলেন, কি কি তত্ত্ব উপলব্ধি ক'রেছিলেন, সে বিষয়ে জ্ঞানীরা অনেক অনুসন্ধান ক'রেছেন। কিন্তু আমি দেখ্‌তে পাই যে সেই চল্লিশ দিনের মধ্যে যীশুর সাম্‌নে ঈশ্বরের ছবিখানি বদলে গেল। প্রাচীন "বিচারক" ঈশ্বরের মুখখানি, পুণ্যাত্মার প্রতি প্রসন্ন ও পাপীর প্রতি অপ্রসন্ন ঈশ্বরের মুখখানি, যীশুর মনশ্চক্ষে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল। তার জায়গায় উদিত হ'ল আর একখানি মুখ। তাহা পাপীর জন্য করুণায় কোমল; তাহা পতিতের উদ্ধারের জন্য ব্যাকুল; যে হারিয়ে গিয়েছে তাকে খুঁজে আন্‌বার জন্য ব্যাকুল। যীশু চল্লিশ দিনের পর ফিরে এসে যখন এইরূপ ঈশ্বরের কথা মানুষদের কাছে বল্‌তে লাগলেন, তখন লোকেরা অবাক্ হ'য়ে গেল। লোকেরা জান্‌ত, ধর্ম্ম কেবল পাপীদের ভর্ৎসনা কর্‌বার জন্য রয়েছেন; ধার্ম্মিকেরা, পুরোহিতেরা, কেবল পাপীদের দণ্ডের নানা ব্যবস্থা কর্‌বার জন্য রয়েছেন। কিন্তু তাদের কাছে যীশু কি ছবি ধর্‌লেন! ৯৯টি মেষ ঠিক আছে, কিন্তু একটি হারিয়ে গিয়েছে। ৯৯টিকে দাঁড় করিয়ে রেখে মেষপালক সেই একটিকে খুঁজ্‌তে বাহির হ'লেন। তিনি বনে বনে ঘুর্‌চেন, আর তাঁর নিজ কণ্ঠের সেই আওয়াজটি বার বার দিচ্ছেন, যে আওয়াজ সেই হারানো মেষটি চেনে। অবশেষে তার কর্ণে সেই আওয়াজটি পৌঁছিল; সে ফিরিল; সে মেষ-পালকের কাছে এল। তখন আনন্দে তাকে স্কন্ধে তুলে নিয়ে মেষপালক আর ৯৯টির কাছে এলেন। এ কি ছবি! ওগো পাপী, তুমি হারিয়ে গিয়েছ? তবে জেনে রাখ, ঈশ্বর তোমায় খুঁজ্‌ছেন। সেই দেবাদিদেব মহাদেব তোমার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। তোমাকে ফিরে না পাওয়া পর্য্যন্ত তাঁর স্বস্তি নাই। শোন তো তাঁর ডাকটি! অন্তরের কর্ণে তাহা শোন। সেই পরিচিত ডাক, সেই স্নেহের ডাক শুনে ফিরে এস। এ তো সেই পুরাতন "বিচারক" ঈশ্বরের ছবি নয়! এ যে মায়ের মতন স্নেহে ব্যাকুল নূতন ঈশ্বরের ছবি। লোকেরা তাই যীশুর কথা শুনে মুগ্ধ হ'য়ে গেল, অবাক্ হ'য়ে গেল।

যীশু আবার বল্‌লেন, একটি দরিদ্রা নারীর দশটি টাকার মধ্যে একটি টাকা হারিয়ে গিয়েছে। সে ব্যস্ত হ'য়ে তার ঘরের সব স্থানে, সব লুকানো কোণে, অন্বেষণ কর্‌তে লাগ্‌ল। সে প্রতিবেশীদেরও ডেকে আন্‌ল। বল্‌ল, "ওগো, আমার দশটি টাকার মধ্যে একটিকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না; তোমরা এস, তোমরা আমার সেই হারানো ধন খুঁজে এনে দাও।" শেষে যখন খুঁজে পাওয়া গেল, তখন সে আনন্দিত মনে তাকে নিজের অঞ্চলে বাঁধ্‌ল। ঈশ্বর তেম্‌নি ক'রে তাঁর বিপথগামী সন্তানকে খোঁজেন। তাঁর আর নয় জন সাধু সন্তান তো তাঁর কোলেই রয়েছে, তাই ব'লে তিনি কি একজন পাপীকে তাঁর ক্রোড়চ্যুত হ'তে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন? তা কখনও নয়। তিনি যে হারানিধির জন্য মহা অন্বেষণে নিযুক্ত হন! তিনি আপনি খোঁজেন, এবং তিনি তাঁর সাধু ভক্তদের বলেন, তাঁর অন্যান্য পুত্রকন্যাগণকে বলেন, "তোমরাও আমার সঙ্গে খুঁজ্‌তে আরম্ভ কর; আমার হারানিধি আমার অঙ্কলে ফিরে আসা চাইই।"—যীশু ঈশ্বরের এই ছবিখানি নিজের অন্তরে দেখেছিলেন ও মানুষের সম্মুখে ধ'রেছিলেন।

উৎসবে মায়ের এই ছবি দেখ, ভাই বোন্। সংবৎসর কাল আমাদের মধ্যে কত জন কত ধর্ম্মসাধন ক'রেছেন; তাঁরা ধন্য! আমি কিছুই সাধন কর্‌তে পারি নি। ধর্ম্মসাধন কি? মানুষ যে ঈশ্বরকে খোঁজে, সেই খোঁজার নাম হ'ল 'সাধন'। আর ঈশ্বর যে মানুষকে খুঁজ্‌ছেন, তাঁর ব্যাকুল অন্বেষণের বস্তু যে আমরা, এই অনুভূতিতে মগ্ন হওয়ার নাম হ'ল 'উৎসব'। এই মাঘোৎসবে, এস ভাই বোন্, মা যে আমাদের খুঁজ্‌ছেন, তার অনুভূতিতে প্রাণ পূর্ণ করি; হারানিধি-অন্বেষণকারিণী মায়ের ছবি আমাদের প্রাণে আমরা খুব ভাল ক'রে দেখি।

আর একটি ছবি আঁক্‌তে ইচ্ছা কর্‌চে। এক জন মা প্রতিদিন সকাল বেলা তাঁর কোলের শিশু সন্তানটিকে ভাল ক'রে স্তন্যদান করেন; তার পরে সে শিশু তার দাসীর সঙ্গে বেড়াতে বাহিরে চ'লে যায়। একদিন কোন কারণে মা সেই শিশুকে প্রাতঃকালে ভাল ক'রে স্তন্যপান করাতে পারেন নি। কিন্তু দাসী তা না জেনে যথাসময়ে শিশুকে নিয়ে বেড়াতে চ'লে গিয়েছে। সে দু ঘণ্টার কমে আর বাড়ী ফির্‌বে না। সে সময়টাতে মার কি অস্থিরতা! বার বার এ কথা মনে আস্‌চে যে আমার বাছা আজ সকালে ভাল ক'রে স্তন্যপান না ক'রেই বাহিরে চ'লে গিয়েছে, আর বার বার মার চোখ জলে ভ'রে যাচ্চে। এইরূপ স্তন্যদানোৎসুক এবং স্নেহে আতুর কোনও মাতার মূর্ত্তি কি তোমরা কখনও দেখেছ, ভাই বোন্? যদি দেখে থাক, জেনে লও, আমাদের পরম মাতার ছবিটিও ঠিক এইরূপ। হে ব্রাহ্ম, হে ব্রাহ্মিকা, তোমরা যারা প্রতিদিন প্রভাতে মায়ের কাছে বস্‌তে অভ্যস্ত, তোমাদের একটি কথা বলি। যদি কোনও দিন এমন হয় যে সকালের উপাসনাটি ভাল হ'ল না, মনটা যেন ভাল ক'রে মাতৃকোল পেয়ে স্নিগ্ধ হ'ল না, যেন মাতৃস্তন্য ভাল ক'রে পান করা হ'ল না,—তবে সংসারকর্ম্মে বাহির হ'য়ে গিয়ে কি সেদিন বার বার মার কথা মনে হয় না? বার বার তাঁর স্নিগ্ধ স্পর্শ পাবার জন্য মনটা ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে না? কিন্তু তোমরা কি অনুভব কর যে পরম জননীও সারাদিন তোমাদের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে প্রতীক্ষা করেন? সেই স্তন্য-দানোৎসুক স্নেহাতুর হৃদয়ও তোমার জন্য সারাদিন আকুল হ'য়ে

থাকে? "কতক্ষণে আমার বাছা আমার কাছে এসে ভাল ক'রে বস্‌বে", এই ব'লে তিনি ব্যাকুল হ'য়ে তোমাকে বারে বারে খোঁজেন?—উৎসবে এই স্নেহে আতুর মায়ের ছবি দেখ।

আরও একখানি ছবি মনে উদয় হচ্চে। ছয়দিন পূর্ব্বে, অর্থাৎ বিগত রবিবার, আমি কার্য্যোপলক্ষে একটি গ্রামে ছিলাম। সেদিন সকালবেলা সেই গ্রামের একটি পথ দিয়ে বেড়াতে বাহির হ'লাম। আমি নির্জ্জন প্রকৃতির সঙ্গ বড় ভালবাসি। শালবন আবার আমার বিশেষ প্রিয়। সেই গ্রামে বেড়াতে বেড়াতে একটি শালবনে উপস্থিত হ'লাম। আর বেড়ান হ'ল না। ব্রহ্মসঙ্গ ও প্রিয় আত্মাগণের সঙ্গ লাভের জন্য মন উৎসুক হ'ল, তাই সেখানেই ব'সে গেলাম। খানিকক্ষণ তথায় ব'সে, করুণাময়ের করুণাতে কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ ক'রে, যখন উঠে আস্‌ব, তখন মনে মনে এই চিন্তা এল,—"মানুষেরা পৃথিবীর বহু অরণ্য কেটে ফেলে দিয়ে গ্রাম ও নগর পত্তন করচে, রাজপথ ও রেলপথ বিস্তার করচে, কত হাট বাজার বসাচ্চে। মানুষেরা তাদের খাওয়া-পরা চলা-ফেরা কেনা-বেচাকে যত প্রয়োজন মনে করে, নির্জ্জন বনে এসে ব্রহ্মসঙ্গ করাকে তো তত প্রয়োজন মনে করে না; তাই অরণ্যকে মানুষ লুপ্ত ক'রে দিচ্চে। কিন্তু ব্রহ্মসহবাস মানুষের পক্ষে কত বড় ও কত সত্য প্রয়োজন! হায়, মানুষ তার এই সত্য প্রয়োজনকে, এই শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনকে মনে রাখে না।"—মনে মনে এই চিন্তা নিয়ে উঠে আস্‌বার উদ্যোগ কর্‌চি, এমন সময়ে অন্তরে যেন পরমজননীর এই বাণী শুনতে পেলাম,—"এই শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন কি শুধু তোমাদের প্রয়োজন ব'লে মনে কর? এ যে আমারও প্রয়োজন! সংসারের হৃদয়বান্ মানুষেরা যখন এক খানি বাড়ী তৈয়ারী করে, তখন তারা কি শুধু ইহাই ভাবে যে আমাদের লোকগুলি কোথায় ব'সে আহার করবে, কোথায় তাদের জন্য রন্ধন হবে, কোথায় তাদের ভাণ্ডার-ঘর হবে? শুধু কি ঐ সকলের জন্যই ব্যবস্থা রাখে? সেই গৃহের মাতা ভাবেন যে আমি আমার সন্তানদের নিয়ে নিবিড় হ'য়ে কোথায় বস্‌ব, তার জন্য একটু স্থান চাই। পতি পত্নী ভাবেন যে কোথায় নিরুদ্বেগে আমরা পরস্পরকে সঙ্গদান কর্‌ব, তার জন্য একটু স্থান চাই। আমি তোমাদের জননী, আমি তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র দিয়েছি, হাট বাজার দিয়েছি, ঘর বাড়ী দিয়েছি, শিক্ষায়তন সকল দিয়েছি। তাহার দ্বারা তোমাদের নগর গ্রাম পূর্ণ হ'য়েছে। কিন্তু আমি মায়ের মতন তোমাদিগকে নিয়ে কোথায় একা বস্‌ব, কোথায় ব'সে তোমাদিগকে নিজ স্নিগ্ধ সঙ্গদান করব, তার জন্য **আমারই** হৃদয় ব্যাকুল। তোমাদের নিয়ে নিবিড় ভাবে ব'সে নিজ সঙ্গ দান করা,—এ যে **আমারই** প্রয়োজন! এ যে আমার নিত্য শাশ্বত প্রয়োজন! এরই জন্য আমি পৃথিবীতে কত গিরি, কত অরণ্য রেখেছি। এরই জন্য আকাশ অগণ্য তারকায় খচিত। এরই জন্য পূর্ণিমার রাত্রি স্নিগ্ধ, সুন্দর। এরই জন্য এই শালবন। তুমি জেনে রাখ, এইরূপ নিবিড় নির্জ্জনতায় আমার সঙ্গ লাভ করা তোমার যত প্রয়োজন, তোমাকে নিজ সঙ্গ দান করা আমার ততোধিক প্রয়োজন"।—বন্ধুগণ, মাঘোৎসবে নিজ সঙ্গদানের জন্য উৎসুক জননীর এই ছবি আমরা দেখি, এস।

পূজ্যগণ।

উৎসবের আর এক উপকরণ, আমাদের পূজ্যগণের চরিত্র, ও আমাদের হৃদয়ে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি। আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ-বাড়ীখানি যাঁহাদের চরিত্র-জ্যোতিতে জল্ জল্ করচে, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি-উজ্জ্বল দৃষ্টিতে আজ তাকাই। যাঁদের জীবন ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে ভগবান্ তাঁর কৃপার বিধান আমাদের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত করলেন, সেই রাজর্ষি রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি আমাদের হৃদয় আজ ভক্তিতে পরিপূর্ণ হোক্। আমরা অনেকে তাঁদের দেখি নাই। কেহ কেহ আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথকে দেখেছি। আমি বলি,—যে যাঁকে দেখেছ, যে যাঁর মধ্যে ব্রহ্মগত চরিত্রের এক অংশও দেখ্‌তে পেয়েছ, তাঁকেই স্মরণ কর, শ্রদ্ধাতে মাথা নত কর, মনে মনে প্রণাম কর। আমার চারিদিকে আমার শ্রদ্ধার যোগ্য মানুষ কে কে আছেন,—এই ব'লে যদি কোনও দিন অন্বেষণ না ক'রে থাকি, উৎসবে সে অন্বেষণ করতেই হবে। আমরা জানি, সাধুভক্তি উৎসবের একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু তাহা কোন্ প্রকারের সাধুভক্তি? এক রকম passive সাধুভক্তি আছে, তাহা শুধু অতীতের দিকে তাকায়, এবং ঘটনাসূত্রে অথবা অধ্যয়নসূত্রে কোনও সাধুভক্তের কথা জানিতে পারিলে তাঁহার প্রতি ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে। এইরূপ passive সাধুভক্তি উৎসবের উপযুক্ত উপকরণ নহে। উৎসব করিতে চাও? তবে শ্রদ্ধাভক্তিকে active কর, অন্বেষণে তৎপর কর। তোমার চারিদিকে, তোমার সঙ্গী ও সমসাময়িক মনুষ্যগণের মধ্যে, চরিত্রের কত মহত্ত্ব, ব্যবহারের কত উদারতা, দুঃখ বিপদে কত সহিষ্ণুতা, কঠিন কর্ত্তব্যে কত দৃঢ়তা, প্রতিদিন প্রকাশিত হ'চ্চে! বৎসরের আর সব দিন যদি তা না দেখে থাক, এ উৎসবের সময় তা দেখ্‌তে হবে। এই অন্বেষণ-পরায়ণ শ্রদ্ধাই উৎসবের উপযুক্ত মনোভাব। "প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর কাছে আমার কি শিখ্‌বার আছে, তাঁর মধ্যে এমন কি আছে, যাতে আমার মস্তক নত হ'য়ে আসে", এই ব'লে যদি সারা বৎসর অন্বেষণ না ক'রে থাক, এ উৎসবের সময় সে অন্বেষণ করতেই হবে। হৃদয় শ্রদ্ধাতে অবনত না হ'লে, প্রাণ শ্রদ্ধাভক্তিরসে সিক্ত ও স্নিগ্ধ না হ'লে, উৎসব সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাভক্তির স্রোতে হৃদয় ভেসে যাবে, মন্দির ভেসে যাবে, তবে উৎসব সম্ভব হবে। উৎসবে আমরা প্রতিদিন শ্রদ্ধাভক্তির চক্ষু খুলে রাখ্‌ব। সকল ভাই বোন্‌কে শ্রদ্ধা করব। বিশেষতঃ আমাদের অগ্রণীদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ব যে এ ব্রাহ্মসমাজ কাদের সমাজ। দেখ্‌ব যে ইহা ভক্তের সমাজ, ত্যাগীর সমাজ, যোগীর সমাজ, তপস্বীর সমাজ, সাধনবীর কর্ম্মবীর চরিত্রবীরগণের সমাজ।

মণ্ডলীর ভাই বোন্।

তার পরে উৎসবে আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজের ভাই বোন্‌দের কথা মনে ভাব্‌লেও মন ভ'রে ওঠে। সত্য বটে, সারা বছরে

আমাদের মধ্যে অনেক মতভেদ ঘটে, কাজ করতে গিয়ে অনেক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, একে অন্যের মনের অভিপ্রায়কে অনেক ভুল বুঝি; অনেক দুঃখ পাই, অনেক দুঃখ দিই। ব্রাহ্মসমাজ মতের ও কার্য্যের স্বাধীনতাকে সম্মান করেন ব'লে মতের ভিন্নতা ও পরামর্শের ভিন্নতা এখানে অনিবার্য্য। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ তো শুধু একটি কার্য্যের প্রতিষ্ঠানমাত্র নয়। ইহা যে একটী মণ্ডলী, একটী ধর্ম্মপরিবার,—উৎসবে এই অনুভূতিকে উজ্জ্বল ক'রে নিতে হবে, এই ভাবটিকে প্রধান স্থানে রাখতে হবে। আজ পিছনে প'ড়ে থাক আমাদের সব কাজ, সব পরামর্শ, সব মতামত। আমরা যে এক পিতা মাতার ঘরে বাস করি ও বর্দ্ধিত হই, সেই পরম পিতার পরম মাতার স্নেহ যে আমাদের সকলেরই জন্য একভাবে প্রবাহিত, ইহা অনুভব করবার সময় এই উৎসব। এস, ভাই বোন্, সব ভেদাভেদ ভুলে যাই। এস, আমি আগে সকলের কাছে ক্ষমা চাই। ভাই বোন্, আমার সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে আমার পক্ষে উৎসব সম্ভব ক'রে দাও। এস, সকলে ক্ষমা চাই ও ক্ষমা দিই। যার প্রতি যার মন ভাল ছিল না, আজ মন ভাল কর। আজ পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাও। আজ বুকে ধ'রে বল, "তুমি আমার ভাই, তুমি আমার বোন। তুমি হাসিমুখে আমার পাশে না দাঁড়ালে যে আমার উৎসব হয় না!" সুদূর সাগরতীর হ'তে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু হরকান্ত বসু মহাশয় আমাকে লিখে পাঠিয়েছেন, "পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান, এস ভাই আজ প্রাণে প্রাণে আর রেখো না রে ব্যবধান,"—এই সঙ্গীতটি অথবা তার ভাবটি যেন মাঘোৎসবের উদ্বোধনের দিনে ব্যবহার করা হয়। তাঁর এ অনুরোধ আমার মনের কথার সঙ্গে ঠিক্ মিলে গিয়েছে। এস, ভাই বোন্, আজ সব ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে অনুভব করি যে আমরা সকলে এক। এই ব্রাহ্মসমাজ-বাড়ীর সব ভাই বোন্ যে-সময়ে বিশেষভাবে অনুভব করবেন যে আমরা সুখে দুঃখে এক, জীবনের মহত্ত্বের আদর্শে এক, পাপপুণ্যের সংগ্রামে এক, ঈশ্বরচরণে বিশ্বস্ত থাকবার সংগ্রামে এক, দয়ালের করুণার দয়ালের নামসুধার আস্বাদনে এক, অনুতাপের অশ্রুজলে এক,—এমন একটি বিশেষ সময় থাকা বড়ই আবশ্যক। যখন কাজ কর্ম্ম হ'তে উত্থিত সকল উত্তাপ সকল বিভিন্নতা ভুলে গিয়ে আমরা শুধু এই একতার অনুভূতিতে প্রাণকে ডুবিয়ে ভিজিয়ে রাখব, এমন একটা বিশেষ সময় থাকা চাই। সে সময় এই উৎসব।

জীবনের সুখ দুঃখ।

তার পরে, আমাদের জীবনের সুখদুঃখগুলি উৎসবের খুব ভাল উপকরণ। আমি যে বৎসর ব্রাহ্মসমাজে প্রথম আসি, কলিকাতায় এসে এই পবিত্র মন্দিরে যেবার প্রথম মাঘোৎসবের প্রবাহের মধ্যে বসি, সেবারকার উৎসবের একটি ঘটনা আমার মনে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হ'য়ে র'য়েছে। মফঃসল হ'তে আগত একজন বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্ম ১১ই মাঘের প্রাতঃকালীন উপাসনার পর দাঁড়িয়ে এই ব'লে সাক্ষ্য দিলেন যে, "আমার বারোটি পুত্র একে একে পৃথিবী ছেড়ে চ'লে গিয়েছে। শোকের শেল যেন আমার বুকে বারোটি ছিদ্র ক'রে দিয়েছিল। এখন দয়াময় তাঁর অমৃতরসে সেই বারোটি ছিদ্র পূর্ণ ক'রে দিয়েছেন।" একচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে উৎসবমন্দিরে যখন এই সাক্ষ্য আমি শ্রবণ করি, তখন আমি ১৫ বৎসরের বালক। কিন্তু আমার পরবর্ত্তী জীবনে বহু শোক দুঃখের ভিতরে আমি অনুভব করলাম যে সে সাক্ষ্য অতি সত্য। সেই অমৃতস্বরূপ আমাদের শোক দুঃখের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে তাঁর কি পবিত্র কি অমৃতময় স্পর্শ দান করছেন! আমাদের প্রত্যেক পরিবারে, ও ব্রাহ্মসমাজে আমাদের এই মিলিত ধর্ম্ম-পরিবারে, সেই অমৃতস্বরূপ আমাদের শোক দুঃখের মধ্য দিয়ে আমাদের হৃদয়গুলিকে কত স্নিগ্ধ সান্ত্বনা, কত পবিত্র অনুপ্রাণন, কত মধুময় অনুভূতি দান করছেন! ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে মানব-জীবনের দুঃখ শোক সকলকে আমরা কি পবিত্র চক্ষে দর্শন করবার ও কি উন্নত ভাবে গ্রহণ করবার অধিকার পেয়েছি! জীবনের সেই সব দুঃখ শোককে আমরা এ উৎসবে সেই দয়াময়ের পরম প্রসাদ ব'লে আস্বাদন করব।

জীবনের সুখসকলও উৎসবের বড় ভাল উপকরণ। আমি তো প্রথমেই ব'লেছি, তিনি আনন্দময়ী মা, এবং মাকে ভাল লাগাই হ'ল উৎসব। আমাদের জীবনে তিনি কত আনন্দ কত সুখ দিয়েছেন। উষার আলোকে রঞ্জিত পূর্ব্বাকাশ অমনই কত সুন্দর! আবার তার মধ্যে তাঁর প্রেমমুখের আভা দেখবার জন্য চক্ষুটি যখন পাই, তখন তা আরও কত মধুময়! জীবনে ও জগতে তাঁর দেওয়া যত আনন্দ, জ্ঞানে প্রেমে মহৎ কর্ম্মে তাঁর দেওয়া যত আনন্দ, একত্রে তাঁর নাম-গানে তাঁর প্রেমাস্বাদনে যত আনন্দ, সাধু ভক্তগণের ও উন্নত-হৃদয় শ্রেষ্ঠ মানবগণের মহৎ ভাব ও আকাঙ্ক্ষা সকলকে অন্তরে গ্রহণ ক'রে যত আনন্দ,—এই সব আনন্দের অনুভূতি এ উৎসবে উজ্জ্বল ক'রে নিতে হবে। সকল আনন্দের মধ্যে আনন্দদাতা তিনি, আনন্দস্বরূপ তিনি। কিন্তু তিনি মানব-জীবনে আনন্দ দেন কেন? কেবল ভোগের জন্য নয়। তাঁকে দেখবার জন্য আমাদের নব নব চক্ষু খুলে যাবে ব'লে, আমাদের হৃদয়গুলি কোমল হবে ও কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হবে ব'লে, আমাদের অন্তরগুলি মানব-জগতের মহৎ অনুপ্রাণনসকল সহজে গ্রহণ করতে শিখবে ব'লে, তিনি আনন্দ দেন। সেই দর্শনশক্তি, সেই কোমলতা, সেই কৃতজ্ঞতায় বিগলিত ভাব, সেই নিয়ত গ্রহণোৎসুক ভাব, জীবনের আনন্দসকলকে অবলম্বন ক'রে এ উৎসবের মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হোক্।

সংগ্রাম ও অনুতাপ।

তার পরে আমাদের জীবনসংগ্রামও উৎসবের অতি শ্রেষ্ঠ উপকরণ। ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনি, এস, উৎসবে জীবন-সংগ্রামের কথা পরস্পরের কাছে বলি ও স্বীকার করি। আমাদের সাংসারিক অবস্থা আজকাল কিরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে! আমাদের পরিবারগুলিতে গ্রাসাচ্ছাদনের অর্থ যোগানো কি দিন দিন কঠিন হ'য়ে উঠ্ছে? উদ্বেগে দিনে স্বস্তি নাই, রাত্রিতে নিদ্রা

নাই? ভবিষ্যদ্বংশীয়দের অবস্থা কি হবে তা ভেবে ভেবে মনে শান্তি নাই? এ অবস্থার মধ্যে আমাদের কর্ত্তব্য কি? বার বার আমরা আমাদের মন্ত্র জপ করব,—"প্রভু, আমরা তোমারি"। বার বার আমরা আমাদের পুত্র কন্যাদের বলব, "আমরা সবাই সেই পরম প্রভুর কাছে বিশ্বস্ত থাকব"। জীবনে এর চেয়ে বড় অধিকার আর কি আছে? যদি সেই পরম প্রভু একদিন ডাক দিয়ে বলেন, "যারা আমার লোক, যারা খাঁটি মানুষ, তারা এখন থেকে আর ভদ্র সাজে ভদ্রের কাজে থাকতে পারবে না, তাদের মুটে-মজুরের কাজে নামতে হবে",—তবে আমরা তৎক্ষণাৎ বলব, দ্বিধাশূন্য অন্তরে বলব, আনন্দে বলব, "হাঁ প্রভু, আমরা প্রস্তুত! আমরা তোমার কাছে খাঁটি থাকব, আমাদের ছেলে মেয়েরা তোমার কাছে খাঁটি থাকবে। আর যা হয় হোক্।" আমরা এ উৎসবের মধ্যে তাঁর কাছে এই উত্তরটি দিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করি, এস।

আমাদের অনুতাপও আমাদের উৎসবের অতি শ্রেষ্ঠ উপকরণ। জীবনের মহৎ লক্ষ্যের কথা যখন চিন্তা করি, জীবনের সেই পরম প্রভু আমাদের কাছে কি আশা করেন, জগৎ ব্রাহ্মগণের নিকটে কি আশা করে, তাহা যখন চিন্তা করি, তখন আমাদের মধ্যে কার মন নিজের অবস্থা দেখে ঘোর বিষাদে পূর্ণ হয় না? অনুতাপে জর্জ্জরিত হয় না? এ অনুতাপ উৎসবের সময়ে আমাদের প্রাণকে উদ্বেলিত করুক, অস্থির করুক। সত্য অনুতাপ আত্মার স্বাস্থ্যের লক্ষণ, আত্মার বীর্য্যের প্রকাশ; এবং সুখাসক্তি ও তৎপ্রসূত দুঃখভীরুতা, ত্যাগভীরুতা, অনুতাপ-বিমুখতা,—এ সব আত্মার রোগের লক্ষণ, আত্মার নির্ব্বীর্য্য অবস্থার প্রকাশ। যেখানে সত্য ধর্ম্মজীবন আছে, সেখানেই ধর্ম্মোৎসবে অনুতাপ এক প্রবল অগ্নির আকারে প্রকাশ পায়। সেখানেই অনুতাপের স্রোত এসে মানুষের হৃদয়গুলিকে গলিয়ে ব্রহ্মচরণে প্রবাহিত এবং নব সঙ্কল্পে উদ্বেলিত ক'রে তোলে। কয়েক দিন হ'ল পূজনীয় হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় মেসেঞ্জার পত্রিকায় আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রতি বৎসর মাঘোৎসবে ব্রাহ্ম-সমাজকে অনুতাপের জন্য আহ্বান করতেন। তাঁর সেই ধ্বনি যেন এখনও আমাদের কর্ণে বাজ্‌চে। এখানে কি কেউ এমন আছেন, যিনি উৎসবে অনুতাপের কথা শুনতে চান না? তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, মায়ের দয়া আর এমন ক'রে কোথায় দেখা যায়, অনুতাপে যেমন? অন্তরের যত ঘা ফোড়া তিনি সারিয়েছেন, যত গভীর পাপের ব্যাধি তিনি আরাম ক'রে দিয়েছেন, তার স্মরণেও যে প্রাণ উথ্‌লে ওঠে! তাঁর আদেশে অন্তরের এক একটি উদ্দাম বাসনা উৎপাটিত করতে গিয়ে আত্মা ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত হ'য়েছে; আবার তাঁরই দয়াতে সেই ক্ষত আরাম হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও অন্তরের সেই ক্ষত-চিহ্নের উপরে কতবার মার দয়ার আলো পড়ে, আর সে সকল আমাদের আত্মার অঙ্গে উজ্জ্বল রেখার মত উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। জীবনে ঐ গুলিই তো মার দয়ার সব চেয়ে বড় চিহ্ন। আমার তো সে গুলিকে স্মরণ করতে, স্পর্শ করতে, পরম জননীর দিকে তুলে ধরতে, বড় ভাল লাগে। আমার তো মনে হয় যে সে-সকলের স্মৃতি প্রত্যেক আত্মার পক্ষে চিরস্মরণীয় অমৃতময় কাহিনী। ধার্ম্মিকের কাছে প্রেম যেমন চির-সজীব ও চির-নূতন, অনুতাপও তেমনি চির-সজীব ও চির নূতন হ'য়ে যায়। অনুতাপের মধ্য দিয়েও তিনি মার দয়া নিত্য নব ভাবে আস্বাদন করেন।

### ব্রাহ্মসমাজের সংগ্রাম।

অনেকের মুখে শুন্‌তে পাই, ব্রাহ্মসমাজের এখন দুর্ব্বলতার দিন। এর কাজ আর তেমন অগ্রসর হচ্চে না। এর বার্ত্তা শুন্‌তে আর মানুষের তেমন আগ্রহ নাই। দেশ এখন স্বাধীনতার সংগ্রামে নিযুক্ত। তার কথা ছাড়া আর কোন কথা মানুষ শুন্‌তে চায় না। মানুষ যা শুন্‌তে চায়, সে কথা তো ব্রাহ্ম-সমাজ বলে না। ইত্যাদি। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে যদি দুর্দ্দিনই এসে থাকে, ভাই, তবে তা কি আমরা উৎসবের সময়ে ভুলে থাকব? যদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এখন মন্দগতির দিন এসে থাকে, অথবা যদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এখন অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভবই হ'য়ে গিয়ে থাকে, তবে সে কথা ভুলে গিয়ে কি আমরা উৎসব করব? তা কখনও নয়। ব্রাহ্মসমাজের জীবনের সব অবস্থাতে, ইহার সতেজ দিনে ও ইহার নিস্তেজ দিনে, আমরা সমভাবে আমাদের পরম প্রভুর দিকে তাকিয়ে আমাদের কর্ত্তব্য ক'রে যাব। যখন পথ তিমিরাচ্ছন্ন, যখন চারিদিকে ঝড়ঝঞ্ঝা, তখনই তো বিশ্বস্ততার পরিচয় দিবার দিন! এ যুগে এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কি মানুষকে ঈশ্বরের চরণে ডাকবার আর প্রয়োজন নাই? শোক-দুঃখে, এবং ততোধিক নিদারুণ পাপ-দুঃখে, কি মানুষের জন্য ঈশ্বরের নামের শান্তির প্রয়োজন আর নাই? দেশের জন্য যত শ্রম ও সংগ্রাম, তার মধ্যে কি সত্যের পবিত্রতার ও মনুষ্যত্বের আদর্শ-সকলকে উচ্চ ক'রে তুলে ধরবার প্রয়োজন এখন আর নাই?—ব্রাহ্মসমাজের কাজ এমন কাজ, যে জগতের কোনও যুগে কোনও দিনে তাহা নিষ্প্রয়োজন হ'য়ে যাবে না।

যদি তুমি বল যে "চারিদিকে অপর একটি প্রবল আন্দোলন ঝড়ের মত' বহিয়া চলিয়াছে; লোকচিত্ত অস্থির; কেহ আমাদের কথা শুনিতে চাহে না; এ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়," তবে আমি বলি, এ অবস্থাতেও আমাদের কিছু কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য আমরা বুঝিয়া লই। যাঁরা পদ্মা নদীতে নৌকায় গমনাগমন ক'রেছেন, তাঁরা জানেন, এমন এক এক সময় আসে, যখন তিন চারি দিন ধ'রে অবিশ্রাম প্রবল ঝড় বৃষ্টি হ'তে থাকে। আমি ছোট বেলায় একবার নৌকাতে এমন এক অবস্থার মধ্যে প'ড়েছিলাম। প্রবল বিপরীত বায়ু; অবিশ্রাম ঝড় বৃষ্টি; তিন চারি দিন নৌকাতে সকলে কেবল চুপ ক'রে ব'সে আছি। সে বিপরীত বাত্যার ভিতরে নৌকা চালানো অসম্ভব। তীরে বড় বড় খুঁটি পুঁতে, তার সঙ্গে মোটা মোটা কাছি দিয়ে নৌকাখানিকে বেঁধে রাখা হ'য়েছে। এ অবস্থাতেও নৌকা খুব দুলচে, তাই বার বার খুঁটিগুলি আল্‌গা হ'য়ে যাচ্চে। বার বার নৌকার মাঝিরা ও বয়স্ক আরোহীরা

গিয়ে গিয়ে সে খুঁটিতে ঘা মেরে মেরে তাকে আবার শক্ত ক'রে পুঁতে দিয়ে আস্‌চেন। সেই দৃশ্য চোখের সামনে আসে, আর মনে মনে ভাবি, আমাদের ব্রাহ্মসমাজ-তরীখানি যদি এখন প্রবল বিপরীত ঝড়ের জন্ত অগ্রসর হ'তে একেবারেই না পারে, তবু তো আমাদের কর্ত্তব্য র'য়েছে। হে ব্রাহ্মসমাজ, অগ্রসর হ'তে পারচ না? আচ্ছা, বার বার বিশ্বাসের খুঁটিকে শক্ত ক'রে লও তো! যত দিন না ঝড় কেটে যায়, যত দিন না আবার চল্‌তে পথ পাও, এই কাজটি কর তো! এই উৎসব তার জন্ত বড় ভাল সময়। উৎসবে অনেক ভাই বোন্ একত্র হয়েছি। এস, সকলে মিলে বিশ্বাসের খুঁটিতে ঘা দিয়ে দিয়ে তাকে শক্ত করি। "যে জন্ত ব্রাহ্মসমাজ আহূত, যে জন্ত আমরা আহূত, সে মন্ত্র কখনও ভুলব না; আমাদের মহৎ লক্ষ্য, মহৎ আদর্শ ভুলে আর কখনও জীবন যাপন করব না; শিথিল হাতে ব্রহ্মনামের পতাকা আর কখনও ধরব না", —এই প্রতিজ্ঞা এই উৎসবে সকলে মিলে করি, এস।

আত্মসমর্পণ।

আমি প্রথমেই ব'লেছি, উৎসব সেই সময়ের নাম, যখন ব্রাহ্মসমাজের সব ভাই বোন মিলে দয়াময়ী মার চরণে নূতন ক'রে আত্মসমর্পণ করেন। উৎসব যেন সমগ্র সমাজের নব দীক্ষা গ্রহণ। উৎসব সেই সময়ের নাম, যখন দয়াময়ী মা আমাদের বিশেষ ক'রে অন্বেষণ করেন। "তিনি বিশেষ ক'রে অন্বেষণ করেন", ইহা কি সত্য? হাঁ, ইহা সত্য ব'লে আমি বিশ্বাস করি। সন্তানের যখন মাকে বেশী দরকার হয়, মার প্রাণ তখন বেশী ব্যাকুল না হ'য়েই পারে না। উৎসবটা কেবল আমাদের ব্যাকুলতার সময় নয়; এটা মারও বিশেষ ব্যাকুলতার সময়। উৎসব সেই সময়, যখন সেই মেষপালকের কণ্ঠধ্বনি ব্রাহ্মসমাজে ঘন ঘন ধ্বনিত হয়, যখন খুব উচ্চ স্বরে তিনি ডাকেন,—"কোথায় রে আমার হারানো মেষ, কত কাল আর দূরে থাকবি, আয়, কাছে আয়!" চল ভাই বোন্, চল যাই। তিনি খুঁজ্‌চেন, কেন আর দূরে প'ড়ে থাকি? তাঁর কোল থেকে খ'সে প'ড়ে কেন পাপের নর্দ্দামায় প'ড়ে লোটাচ্ছি? তিনি যে বড় খুঁজ্‌চেন! চল তাঁর কোলে আবার উঠি, তাঁর অঞ্চলে স্থান পাই। চল সেই অপব্যয়ী পুত্রের মত বলি, I will arise and go to my father, আমি পিতার কাছে যাবই, পিতার হাতে ধরা দিবই, আর দূরে থাকব না, আর তাঁর স্নেহকে ব্যথা দিব না, আর অপরাধী হ'য়ে বিদ্রোহী হ'য়ে তাঁর প্রেমকে আঘাত করব না। সেই পরম করুণাময় এই উৎসবের মধ্য দিয়ে আমাদের সকলকে ডাকুন, আমরাও সকলে তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করি।

**৪ঠা মাঘ (১৮ই জানুয়ারী) রবিবার**—প্রাতে ও মধ্যাহ্নে যুবকদিগের উৎসব। যুবকগণ উপাসনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনেক ক্ষণ কীর্ত্তন করেন। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যকৃত "চেতোদর্পণমার্জ্জনং" প্রভৃতি অষ্ট "শিক্ষা-শ্লোকের" ব্যাখ্যা করিয়া উদ্বোধন করেন এবং তৎপরে আরাধনান্তর নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ দেন:—

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে যোহনের সু-সমাচারের ১৪-১৭ অধ্যায় একটী অতি উপাদেয় বস্তু। এস্থলে লিখিত আছে যিশু শত্রুগণকর্ত্তৃক ধৃত হইবার পূর্ব্ব দিন শিষ্যদিগকে একটী দীর্ঘ উপদেশ দেন এবং উপাসনান্তে একটী দীর্ঘ প্রার্থনা করেন। এই উপদেশ ও প্রার্থনায় অতি গভীর তত্ত্বসকল বিবৃত হইয়াছে। উপদেশের একটী অংশের বঙ্গানুবাদ এই:—"শান্তিদাতা অর্থাৎ পবিত্রাত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইবেন, তিনি তোমাদিগকে সমুদয় বিষয় শিক্ষা দিবেন এবং আমি যাহা কিছু বলিয়াছি সে সমুদায় তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবেন।" (১৬।২৬) খ্রীষ্টীয় মতে ঈশ্বরের প্রকাশ ত্রিবিধ,—(১) পিতৃরূপে, অর্থাৎ স্রষ্টা ও পাতৃরূপে, (২) পুত্ররূপে, অর্থাৎ জীবের জীবনরূপে, এবং (৩) পবিত্রাত্মারূপে, অর্থাৎ সাধকের নিকট সাক্ষাৎ অনুপ্রাণনরূপে,—যে অনুপ্রাণনে সাধক ব্রহ্মের সহিত নিজের ভেদাভেদ দেখিয়া মুক্তির আস্বাদন পান। যিশু শিষ্যদিগকে বলিলেন,—"আমি চলিয়া যাইতেছি, ইহাতে তোমরা বিষণ্ণ হইও না; আমি চলিয়া না গেলে পবিত্রাত্মা আসিবেন না।" কথাটীর মর্ম্ম এই যে যত দিন সাধক কোন মহাপুরুষের অত্যধিক প্রভাবের অধীন থাকেন তত দিন তিনি সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের অনুপ্রাণন লাভ করেন না। কথিত আছে যিশুর স্বর্গারোহণের পর তদীয় শিষ্যগণ সমবেত হইয়া অতি ব্যাকুল ভাবে উপাসনাদি করিতে লাগিলেন এবং এই সমবেত সাধনের ফলেই তাঁহাদের মধ্যে পবিত্রাত্মা অবতীর্ণ হইলেন। ফলতঃ ঘননিবিষ্ট ধর্ম্মমণ্ডলীই পবিত্রাত্মার আবির্ভাব ও লীলার ক্ষেত্র। খ্রীষ্টীয় দার্শনিক হেগেলের "ধর্ম্ম-দর্শন" নামক পুস্তক হইতে একটী স্থল আমি বঙ্গানুবাদের সহিত পাঠ করিতেছি:—"তৃতীয় স্তর (অর্থাৎ পবিত্রাত্মারূপে ঈশ্বরের প্রকাশ) দেখিতে পাওয়া যায় অন্তঃপ্রকোষ্ঠে,—ধর্ম্ম-মণ্ডলীতে। এই মণ্ডলী প্রথমে ইহ জগতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ইহা স্বর্গপর্য্যন্ত উত্থিত হয়। (এই মণ্ডলীর স্বর্গীয় রূপের তো কথাই নাই) ইহার পার্থিব রূপেই ঈশ্বরের কৃপা, কর্ত্তৃত্ব এবং আবির্ভাব প্রভৃতরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।" (তৃতীয় খণ্ড, ৩ পৃ)

আমাদের যৌবনকালে আমরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এরূপ ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রভাব যথেষ্ট অনুভব করিয়াছি। এই অনুভব শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার ফল। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা না থাকিলে বাহ্যিক ভাবে ধর্ম্মমণ্ডলীভুক্ত থাকিলেও ইহার প্রভাব অনুভব করা যায় না। আমরা সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা, সঙ্গত, ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতরূপে যোগ দিতাম। আমাদের বিশেষ প্রয়োজনের জন্ত আমরা একটী "ছোট সঙ্গত" স্থাপন করিয়াছিলাম। আমরা বিশেষ বিশেষ সাধন ও ব্রত গ্রহণ করিয়া সঙ্গতের দিনে পরস্পরকে আপনাপন চেষ্টার ফলের কথা বলিতাম। এই ছোট সঙ্গতের দ্বারা প্রত্যেক সভ্যের জীবন বিশেষরূপে প্রভাবিত হইয়াছিল।

অনেকেই পরিণত বয়সে সমাজের নেতৃস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। আমরা আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎ পরিচালনার আকাঙ্ক্ষী হওয়াতে তিনি আমাদিগকে একত্র বাস করিতে পরামর্শ দেন। এই পরামর্শের ফলেই "ব্রাহ্মনিকেতন" স্থাপিত হয় এবং তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম যুবক বিশেষরূপে উপকৃত হন। স্বয়ং কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার অনুপস্থিতে তাঁহার অনুবর্ত্তী কোন প্রচারক এই নিকেতনের শিক্ষাদানকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তখন ব্রাহ্মসমাজে খ্রীষ্টীয় ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব প্রবল ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রভাবে অনুতাপ, প্রার্থনা, চরিত্রসংশোধন এবং পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কার সাধিত হইত। বৈষ্ণব প্রভাবে গভীর আরাধনা, প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সাধুভক্তি, এই সকল ধর্ম্মলক্ষণ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এমন এক সময় আসিল যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত ধর্ম্মে আমি আর সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকিতে পারিলাম না। চিন্তামূলক সংশয়ে আমার ধর্ম্মবিশ্বাস টলিয়া গেল। সমাজের নেতৃগণের সহিত আলোচনা এবং সমাজের তখনকার সাহিত্য সমগ্ররূপে অধ্যয়ন করিয়াও আমার সংশয়ের উত্তর পাইলাম না। তখন আমি বহু বৎসর পর্য্যন্ত চিন্তা ও আগ্রহের সহিত পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শন অধ্যয়ন করিলাম এবং এই চিন্তা ও অধ্যয়নের ফলে আমার বিশ্বাস বিচারমূলক ভিত্তির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। আমি দেখিলাম, ব্রাহ্মসমাজ খ্রীষ্টীয় ও বৈষ্ণব প্রভাব স্থূলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন,—এই দুটী ধর্ম্মের পশ্চাতে যে দুটী গভীর দর্শন আছে সেদিকে দৃষ্টি করেন নাই। দেখিলাম খ্রীষ্টধর্ম্মের পশ্চাতে যে ব্রহ্মবাদী দর্শন আছে তাহার ধারা প্লেটো, আরিষ্টটল, এমন কি তাঁহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী পারমেনাইডিসের সময় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তেমনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের গুরুপরম্পরা উপনিষদের ঋষিগণ, এমন কি ঋগ্বেদের সময় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রূপে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুটী গুরুকুলের শিক্ষালাভ করিয়া আমি দেখিলাম ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত হইয়াও আমি দুটী প্রশস্ততর মণ্ডলীভুক্ত। যাহা হউক, এখন বর্ত্তমান ব্রাহ্ম যুবকদের কথা বলি। শুনিতে পাই তাঁহাদের অনেকেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দেহাক্রান্ত। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহারেও তাহা প্রকাশ পায়। ইহাতে দুঃখ বা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সংশয় না আসিলে অন্ধ বিশ্বাস জ্ঞানমূলক বিশ্বাসে পরিণত হয় না। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের মূল আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা। এই ঐকান্তিকতার অভাবই দুঃখের বিষয়। আমি অনেক যুবকের হাতে জ্ঞানমূলক ধর্ম্মপুস্তক তুলিয়া দিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা ঐ সকল বই না পড়িয়া বা ২।৪ পাতা পড়িয়াই ফেলিয়া রাখেন। চেষ্টা ও শ্রম করিয়া বিশ্বাসলাভের আগ্রহ ও দৃঢ়তা তাঁহাদের নাই। বিশ্বাস হারাইয়া যে তাঁহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন সেই বোধ তাঁহাদের নাই। আমি বাল্যকাল ও প্রথম যৌবনের ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়া কি যে বিপন্ন ও যন্ত্রণাগ্রস্ত হইয়াছিলাম তাহা কথায় বর্ণনা করিতে পারি না। তাহার কারণ এই যে প্রথম বয়সে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সরল বিশ্বাস এবং নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ যে উপাসনাদি করিয়াছিলাম তাহার রসাস্বাদন জিহ্বায় লাগিয়া ছিল। সেই আস্বাদন পুনরায় পাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম এবং এই ব্যাকুলতাই পরবর্ত্তী জ্ঞানসাধনে আগ্রহ ও দৃঢ়তা আনিয়া দিল। আমার বোধ হয় বর্ত্তমান যুবক যুবতীদের অনেকেই এই রসাস্বাদন পান নাই। ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা না থাকাতে তাঁহারা সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করেন নাই, সুতরাং এই যোগের উপকারিতাও লাভ করেন নাই। ঘরে থাকিয়াও ঘরের প্রতি গাঢ় প্রীতি নাই, এই বহির্মুখী ভাব,—যাহাকে আধ্যাত্মিক যাযাবরতা বলা যায়—সমাজে অতিশয় প্রবল। ইহাই বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক হীনতার প্রধান কারণ। ধর্ম্মমণ্ডলীকে ঈশ্বরের জীবন্ত বিধান জানিয়া শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত ইহার সঙ্গে যুক্ত হইতে হয়। এই শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা দ্বিবিধ,—(১) নেতাদের বাক্য ও সাধু দৃষ্টান্তের প্রতি আস্থা, (২) তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালীর প্রতি আস্থা। সংশয় ও বিচার আসিবার পূর্ব্বে নেতৃগণের বাক্য শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে হয় এবং তাঁহাদের জীবনের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হয়। স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ও বিচারশক্তির উদয় হইলে চিন্তারাজ্যের মহাজনদিগের চিন্তাপ্রণালী শ্রদ্ধা ও বিচারের সহিত অধ্যয়ন করিতে হয়। ব্রাহ্মসমাজ একটী ক্ষুদ্র মণ্ডলী হইলেও আধ্যাত্মিক ভাবে ইহা অন্ততঃ দুটী অতি বৃহৎ ও প্রাচীন মণ্ডলীর সহিত সংযুক্ত, ইহা আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। সমাজের এই পবিত্র গুরুপরম্পরা—apostolic succession—স্বীকার করিয়া শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত ইহার সঙ্গে যুক্ত থাকিলে পবিত্রাত্মার অনুপ্রাণনধারা আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিবে, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

---

মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজন। অনন্তর অপরাহ্ণ ২ ঘটিকায় "দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য" বিষয়ে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস সভাপতির কার্য্য করেন। সভার প্রারম্ভে গত বৎসরের সভাপতি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের আশীর্ব্বচন পঠিত হয়। তৎপর সভাপতি তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলে, শ্রীমতী হেমলতা দেবী, শ্রীমতী লাবণ্যলেখা চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী মুখোপাধ্যায়, কুমারী লীলা মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দাস, শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমান ভূপেন্দ্রমোহন মিত্র বক্তৃতা ও লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করেন।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বিডনস্কোয়ার হইতে বরাহনগর শ্রমজীবিগণের নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। সকলে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু প্রার্থনা করেন এবং গায়কগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে বিডন ষ্ট্রীট, রাজা গুরুদাস ষ্ট্রীট, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, বলরাম দে ষ্ট্রীট, জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট, বারাণসি ঘোষ ষ্ট্রীট, শিমলা ষ্ট্রীট, ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে কিছু সময় কীর্ত্তন চলিতে থাকে; পরে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

উৎসব সমাগত। উপাসনাই উৎসব। সকলে মিলে উপাসনা।

পৌত্তলিকতা ছাড়া যখন অন্য ধর্ম্ম ছিল না, তখন রামমোহন ব্রহ্মোপাসনার সমাচার নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর প্রতিপক্ষ বল্লেন, উপাসনা মাত্রই ভ্রান্ত—তখন দেবোপাসনা ছেড়ে ব্রহ্মোপাসনায় লাভ কি? রামমোহন বল্লেন, দেবোপাসনা যদি ভ্রান্ত হয় তাতে হানি নাই, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা ইহ পারত্রিক সকল কল্যাণের আকর। ঠিকই, ভারতের সকল অকল্যাণ ব্রহ্মোপাসনার অভাব হ'তে উৎপন্ন। ভ্রান্ত ব্রহ্মবাদ সকল অনিষ্টের মূল। ভ্রান্ত ব্রহ্মবাদ হ'তে ভ্রান্ত মুক্তিবাদ। ভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরুবাদ মানুষের পরম পুরুষার্থের পরিপন্থী। এ সকলই বন্ধন রূপে মানুষকে নিপীড়িত করছিল; ব্রহ্মোপাসনা মানুষকে এ সকলের হাত হ'তে নিষ্কৃতি দিয়েছে। আপনারা শুনেছেন যখন ঝড় উঠে তখন নৌকার খুঁটি শক্ত ক'রে ধরতে হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে সব খুঁটি দিয়েছেন আমাদিগকে সে গুলিকে সযত্নে ধ'রে থাকতে হবে। প্রতিকূল বাতাস চারিদিকে। আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন না যে এখন এ দেশে নানা স্থানে ১৮টি "পূর্ণ ব্রহ্ম" বিরাজ করছেন। আপনাদের "একমেবাদ্বিতীয়মের" পূজাকে, ব্রহ্মের উৎসবকে উড়িয়ে দিবার আয়োজন সর্ব্বত্র। তাই "খুঁটি"র তত্ত্ব আলোচনা করতে চাই। তার মধ্যে ৪টি তত্ত্ব আজ আলোচ্য। সে ৪টিই দেশের পক্ষে নূতন—ঐ নামের জিনিষ দেশে আছে, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের "তত্ত্ব" নূতন।

এ দেশে যে ব্রহ্মবাদটি প্রচলিত আছে, তার ব্রহ্ম অজ্ঞেয়, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়। তার পূজা হয় না, তাই তো পুতুলপূজা; জানে সকলে উহা মিথ্যা, মিথ্যা জেনেও পূজা। সে ব্রহ্ম নিয়ে উৎসব হয় না। উপনিষদ্‌কে ভুলে এই ভ্রান্ত ব্রহ্মবাদ নিয়ে দেশ দুর্গতিতে গিয়েছে—তাই রামমোহনের এত লাঞ্ছনা। এই ব্রহ্ম নিয়ে যে মুক্তির কল্পনা ও তার সাধনা, তা মানুষকে এই শূন্য ব্রহ্মে নিয়ে যাবার বিনাশের পথ দেখিয়েছে—এমন কি প্রাচীন ভক্তিবাদীরাও এই ভ্রান্ত পথের পথিক। আর শাস্ত্র তো কেতাব, এবং গুরু—যিনি একটা কথা দেন, যা তোতাপাখীর মতন আওড়াইলেই সিদ্ধি—শতকের সঙ্গে সুদের হিসাব কর আর নাম জপ কর। এই তো সাধারণ ব্যবস্থা। শতকরা একজনও ইহার ব্যতিক্রম আছে কি না তা জানি না। যদি থাকে, তবে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের খুঁটির অনুসন্ধান পেয়েছেন।

**গুরুর** কথাই প্রথম বলি। গুরু কে?

> অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া
> চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।
> অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
> তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শিষ্যের বিত্তাপহারক গুরু তো অনেক, সন্তাপহারক কৈ? সন্তাপ যায় কিসে? "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী"। গুরুই দেখিয়ে দেন, আবার যিনি দেখিয়ে দেন তিনিই গুরু। গুরু কি কেবল একটী মানুষে আবদ্ধ? প্রহ্লাদ বলেছেন—"শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ"। তিনি সর্ব্ব ভূতের অন্তরাত্মা, সকলের মধ্য দিয়াই তিনি উপদেশ দিতে পারেন। যদি অধ্যাত্ম দৃষ্টি খুলে তবে সকলেই পথ দেখায়। বাউলেরা বলেন—

> তুই কারে গুরু বলে প্রণাম কর্ব্বি মন!
> তোর অথিক গুরু পথিক গুরু গুরু অগণন।
> গুরু তোর বরণ-ডালা, গুরু তোর মরণ-জ্বালা,
> গুরু তোর হৃদয়-ব্যথা যে ঝুড়ায় দু'নয়ন॥

অভিজ্ঞতায় না পেলে তা সত্য হয় না, তা সন্তাপহারী ব্রহ্মের কাছে নিয়ে যায় না। কর্ত্তাভজাদের কথা আছে—"যাহা নাহি দেখিয়াছ আপন নয়নে, প্রত্যয় না ক'রো তাহা গুরুর বচনে"। আবার অনুভূতি জাগ্রত হ'লে গুরু ছাড়া কেবল "বচনে"ই কাজ হয়। লালা বাবুর "বেলা গেল, বাসনা পোড়াবি কখন" শুনেই কাজ হ'য়ে গেল। কেবল কি মানুষের কথায়ই কাজ হয়? গাছপালা পশুপক্ষীও গুরুর কাজ করে। সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বত্র হ'তেই উপদেশ দেন। Wordsworth বলেছেন—

> One impulse from a vernal wood
> May teach you more of man,
> Of moral evil and good
> Than all the sages can.

Lord Morley যদিও Wordsworth এর একজন ভক্ত, তবুও তিনি বলেছেন—ও কল্পনার খেলা, গাছ কি নৈতিক উপদেশ দিতে পারে? দৃষ্টি না খুল্‌লে দেখা যায় না। চোখ্ না থাকলে দৃশ্য জগৎ 'নাস্তি'তে পরিণত হয়। যদি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে শিখে থাক, তবে যাও তার কাছে, তোমার এই সৌন্দর্য্যানুভূতিই তোমার আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে জাগ্রত ক'রে দিবে। প্রবুদ্ধ আত্মা সর্ব্বভূতেই গুরূপদেশ প্রাপ্ত হয়। অপ্রবুদ্ধ আত্মা এক মানুষকে গুরু ধ'রে ভগবানের সর্ব্বপ্রধান দান, স্বাধীনতা হারায়, বিনাশের পথে যায়।

**শাস্ত্র**, দ্বিতীয় কথা। "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্" শাস্ত্র সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কথা আর নাই। দেশের উচ্চতম ধর্ম্মের শাস্ত্রবাদও এই—"তত্রাপরা ঋগ্বেদো সামবেদো—পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইহা হইতেই সূত্র হইয়াছিল—"মোক্ষপ্রতিপাদকং শাস্ত্রম্"। মোক্ষ হয় কিসে? 'তমেববিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি'—ব্রহ্মকে জান্‌লেই মুক্তি, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, সুতরাং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং। মুখে না মান্‌লেও কাজে সকলে উহাই মানে। উহা বিশ্বজনীন অনুভূতিলব্ধ সত্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম উহা সূত্রাকারে পরিণত করেছেন মাত্র। কেতাবে লেখা আছে ব'লে মানুষ সত্য ব'লে মানে না, সত্য ব'লেই কেতাবে লেখা হয়। সত্য ব'লে মানে ব'লেই কেতাব মান্য হয়। যীশু, বুদ্ধ, কৃষ্ণ বলেছেন ব'লে সত্য নয়,সত্য ব'লেই তাঁরা ব'লেছেন বা তাঁদের মুখে দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ গীতা বলেছেন বা যীশু sermon দিয়েছেন—এ কথা তো ঐতিহাসিক সমালোচনায় টেঁকে না। তাই ব'লে, গীতা বাইবেলে যে 'সত্য' আছে তা নাখোচ্ হয় না; কেন না, "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্"।

**মোক্ষ** কি? মোক্ষ আত্মার একটা অবস্থা। ব্রহ্মজ্ঞানে

আত্মা লোপ পায় না, লয় হয় না। মোক্ষ বিনাশ নয়। যারা শূন্য ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাদেরই সিদ্ধি নির্ব্বাণ। এই ভ্রান্ত মোক্ষবাদ ও ভ্রান্ত ব্রহ্মবাদ এক সূত্রে গ্রথিত। ব্রহ্ম যখন অবিনাশী এবং জীব যখন ব্রহ্মে চির অবস্থিত, তখন কোন অবস্থাতেই "জীবত্ব" লোপ পাবে না। কেবল ব্রহ্মের বিনাশের সঙ্গেই জীবের বিনাশ সম্ভব। জীব যখন ব্রহ্মের অংশ, জীব নষ্ট হ'লে ব্রহ্মের হানি হয়, সুতরাং তাহা অসম্ভব। মোক্ষ ব'লে যদি কিছু থাকে, মুক্তিই যদি ধর্ম্ম সাধনের উদ্দেশ্য হয়, তবে তার অর্থ ব্রহ্মের জ্ঞান প্রেম পুণ্যলাভে বর্দ্ধিত হয়ে জীব অনন্তকাল ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হবে—অনন্তকাল ব্রহ্মশক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র থাকবে—কিন্তু "ফুরাবে না তুমি ফুরাব না আমি"। সুতরাং গুরু ও শাস্ত্রের ন্যায় ব্রাহ্মের মুক্তিও অনন্ত। ইহা আশা করি যে এক দিন পাপ অপ্রেম হ'তে পূর্ণ রূপেই মুক্তি পাব, কিন্তু ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হবার, ব্রহ্মপ্রেমসিন্ধুনীরে সন্তরণ করার, জীবে ও জগতে ব্রহ্মলীলারস সম্ভোগ করার বিরাম কখনও হবে না। কেননা, ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও শান্তির আধার। দেশে যে মায়াবাদীর শূন্যগর্ভ ব্রহ্মের কথা শুনি তা সম্পূর্ণ অলীক। জগৎ ও জীব মিথ্যা নয়, ব্রহ্মের মধ্যে অনন্ত কাল বর্ত্তমান। যুগাচার্য্য যে বলেছেন, জগৎ ব্রহ্মস্বরূপের অভিব্যক্তি—ইহা সত্য কথা। সুতরাং ভক্তিসাধনে ব্রহ্মকে ছেড়ে কোন নিম্নতর কাল্পনিক বস্তুর উপাসনা করতে হবে না। তিনি পিতা, মাতা, বন্ধু, স্বামীরূপে সর্ব্বভাবে আমাদিগকে গ্রহণ করছেন এবং প্রতি জনের সঙ্গে লীলা করছেন। কেবল আমরা তাঁকে চাই তা নয়, সেরূপ সাধন মায়াবাদীরও সম্ভব, কিন্তু তিনিও আমাদিগকে ডাকেন। এই কথা অস্বীকার করতে যেয়ে মায়াবাদী "যমেবৈষ বৃণুতে" এই শ্লোকের বিকৃত ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই দেশে ব্রহ্মোৎসব ইতি পূর্ব্বে হয় নাই। ব্রহ্মই আমাদের ডেকেছেন, ডাকছেন—ইহাই ব্রহ্মোৎসব। ঋষিদের ধর্ম্ম এই সবে সাধিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। বৌদ্ধ বিপ্লবের পরে কত বিপ্লব গেল, কত উপাস্যের স্থাপনা হ'ল, কিন্তু ঋষিদের ধর্ম্ম কোথায়ও স্থান পেয়ে বসে নাই। রামমোহন দেশকে ঋষিদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন—এই বেদবাহ্য দেশ রামমোহনের প্রয়াসে বেদগ্রাহ্য হয়েছে। ঋষিপূজ্য ব্রহ্মকে নিয়ে উৎসবের সূচনা এই প্রথম। শতবর্ষ পূর্ব্বে ইহার সূচনা হয়েছিল। এইখানে ঋষিদের তপস্যার সিদ্ধি। ঋষিরাও এখানে আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মোৎসবে যোগ দিচ্ছেন—কি আনন্দ, আনন্দে প্রাণ পুলকিত, বাক্য বন্ধ।

**৫ই মাঘ (১৯শে জানুয়ারী) সোমবার—**

অদ্য ছাত্র সমাজের উৎসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

একজন ব্রাহ্মণ প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিতেন—শীত গ্রীষ্ম, বর্ষা বাদল কিছুতেই তাঁর এ গঙ্গাস্নানের বাধা হতো না। তিনি বলতেন,—"গঙ্গাস্নানটা না করলে কি চলে? দিন রাত কত মিথ্যা প্রবঞ্চনা করি, কত কলুষিত কার্য্য করি! আঃ, এই গঙ্গাজলে ডুব দিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হই।" এই যে ব্রাহ্মণের কথা ও মনের ভাব, ইহা শুনিয়া আজ কালকার দিনে সকলেই বলবেন, তাও কি হয়? পাপকর্ম্ম, পাপচিন্তা হইতে কি গঙ্গাস্নান দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায়? অথচ এই ব্রাহ্মণের মনে যে ভাবটি ছিল, অনেকের মনেই প্রচ্ছন্নভাবে সেই ভাবটা রহিয়াছে। অনেকেই মনে করেন, ধর্ম্ম অনুষ্ঠান, বারমাসে তের পার্ব্বণ, ধর্ম্মোৎসব, ব্রাহ্মণে দান প্রভৃতি বাহিরের ধর্ম্মাচরণ করলেই ধর্ম্ম লাভ হয়; তার সঙ্গে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করলে দোষ কি? ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই ঐ সকল পাপ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। আর একটু সূক্ষ্মভাবে যারা দেখেন, তারা মনে করেন, না, এ সব প্রাচীনকাল হইতে আগত অনুষ্ঠানাদি দ্বারা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় না, দুঃখীর দুঃখ বিমোচন কর, দেশের কল্যাণ কর! তাহাতেই তোমার কল্যাণ; বরং দেশের ও দশের কল্যাণ করতে যেয়ে যদি মিথ্যা পথ অবলম্বন করতে হয়, বিবেকের বাণী অগ্রাহ্য করতে হয়, তাহাতেই বা দোষ কি? আবার, কেহ কেহ বলিবেন, ঈশ্বরের নাম করলেই মুক্তি, ঈশ্বরের নাম ক'রে যাও, সঙ্কীর্ত্তন কর, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ কর, পাপের জন্য চিন্তা করিও না। আবার, আজকাল অনেকে কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন সন্ন্যাসী গুরু গ্রহণ করিতেছেন; গুরুর কাছে মন্ত্র নেন, আর মনে করেন, জীবন-গতি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই; যে ভাবে চলিতেছি সেই ভাবে চলি, গুরুর নির্দ্দেশ মত মন্ত্রজপ ও প্রক্রিয়া করিলেই চলিবে, গুরুর কৃপাতেই মুক্তিলাভ করিব।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে যে ধর্ম্ম এসেছে, তার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহা নীতিমূলক। বরং ঈশ্বরের উপাসনা না করলেও অন্ততঃ কতক পরিমাণে নীতিমান্ হওয়া যায়; কিন্তু নীতি ছাড়া ধর্ম্ম হইতেই পারে না। নীতির ভিত্তির উপর ধর্ম্মজীবন গঠন করতে হবে। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে সম্পূর্ণরূপে নীতিমান্ হ'য়ে তার পর ঈশ্বরের অর্চ্চনা আরম্ভ করবে, তাঁর ধ্যান আরম্ভ করবে, নরসেবা আরম্ভ করবে, তা হয় না। মনের কুপ্রবৃত্তি-গুলিকে, বাসনা কামনাগুলিকে সংযত করিতে হইলেও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার প্রয়োজন; ধর্ম্মসাধন আরম্ভ করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রবৃত্তিকুলকে সংযত করব, বাসনা কামনাগুলিকে নিয়মিত করব, সত্য প্রেম ও পবিত্রতার পথে চলব, এই প্রতিজ্ঞা ল'য়ে নিষ্ঠার সহিত ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। না হ'লে প্রবৃত্তির পথেও চলব, মিথ্যা পথ অবলম্বন করব, প্রয়োজন হ'লে প্রবঞ্চনা দ্বারা অর্থোপার্জ্জনও করব, এই সকল পরিত্যাগের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না, অথচ কতকগুলি অনুষ্ঠান, আচার, আচরণ অথবা পূজা অর্চ্চনা, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন ক'রেই, মনে করব পাপের ক্ষমা পেয়েছি, ধর্ম্মলাভ হচ্ছে, ইহা ঠিক পথ নয়।

আমরা সত্যস্বরূপ পবিত্রস্বরূপ প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করি; সুতরাং আমাদের জীবন সত্য প্রেম ও পবিত্রতাতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যেমন আমরা ঈশ্বরের প্রীতি সাধন করব, তাঁর

নামকীর্ত্তন, তাঁর অর্চনা বন্দনা, তাঁর ধ্যান কর্‌ব, তেমনি দেখ্‌তে হবে আমাদের জীবনে সত্য প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ মূর্ত্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে কিনা; প্রতিদিন আমাদিগকে অন্তর পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে হবে, আমরা বাক্যে, ভাবে, চিন্তা ও কার্য্যে সত্য অনুসরণ ক'রে চল্‌ছি কিনা, আমাদের চিত্ত প্রেমপূর্ণ হচ্ছে কি না, লোকের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি হচ্ছে কি না, যে আমার অনিষ্ট করে তার প্রতিও অনুরাগ ও সহানুভূতি রক্ষা কর্‌তে পার্‌ছি কি না, আমাদের চিত্ত পবিত্র হচ্ছে কি না, কুচিন্তা ও কুবাসনা হ'তে মুক্ত থাক্‌তে পার্‌ছি কি না, আমাদের অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা কর্‌তে পার্‌ছি কি না, চিত্তে সংযম সাধন হচ্ছে কি না, পাপচিন্তা পাপবাসনা দূর হচ্ছে কি না। আমরা অনেক সময় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করি, সাধুগণের জীবন চরিত্র অধ্যয়ন করি, ধর্ম্মের প্রসঙ্গ করি, ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা ও ব্যাখ্যা করি, ব্রহ্মদর্শন কি, ব্রহ্মগত প্রাণ হওয়া কি, তাতে আত্মসমর্পণ কি, এই সকল ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ অঙ্গের কথা বলি; ধর্ম্মসঙ্গীত করিতে যাইয়া, সম্ভোগের সঙ্গীত, বিরহের সঙ্গীত, ঈশ্বরের সঙ্গে সখ্য ভাবে লীলা করার সঙ্গীত করিয়া তৃপ্তি লাভ করি। ইহা দোষের নয়; ইহাতে কল্যাণ আছে, ধর্ম্মজীবনের উন্নতি হয়, আদর্শের প্রসার হয়। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও সকল সময়ে সত্য রক্ষা করিয়া চলি না। লোকের প্রতি অনুরাগ রক্ষা কর্‌তে পারি না। চিত্ত শুদ্ধ বাসনাবর্জ্জিত ভাবে রাখ্‌তে পারি না। এইদিকে যেন অনেকের দৃষ্টিই নাই। অথচ যাহাকে আমরা জীবনের অতি নিম্নস্তরের কথা বলি, তাহা না হইলে উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মসাধন একেবারে অসম্ভব। অবশ্য, ঈশ্বরের কৃপার বন্যা যখন আসে তখন এক মুহূর্ত্তেও মানুষের মনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হ'য়ে যেতে পারে, তাঁর প্রেমতরঙ্গে সকল পাপ ভেসে যেতে পারে। কিন্তু সাধনপথে যাঁরা চল্‌তে চান, তাঁহাদিগকে যেমন একদিকে পূজা অর্চনা, কীর্ত্তন বন্দন কর্‌তে হবে, অপর দিকে নীতির পথে চল্‌তে হবে, জীবনের ভাব চিন্তা বাক্য ও কার্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে, সত্য প্রেম পবিত্রতার পথে দিন দিন অগ্রসর হ'তে হবে; অসত্য, অপ্রেম ও অপবিত্র ভাব চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য হইতে সর্ব্বদা মুক্ত থাকিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে হবে।

জন কি ব্যাপটিষ্ট বলিয়াছিলেন, Repent ye, for the kingdom of Heaven is at hand. তোমরা কৃত পাপের জন্য অনুতাপ কর, স্বর্গরাজ্য আসিতেছে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও ব্রাহ্মসমাজে অনুতাপের অশ্রুজল প্রবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁর নিজের জীবনবেদেই আরম্ভ হয় পাপবোধ ও প্রার্থনাতে। আত্মচিন্তাপ্রসূত পাপবোধ, তজ্জনিত অনুতাপের অশ্রুপ্রবাহ এবং পরিত্রাণের উপায় প্রার্থনা—কাতর প্রার্থনা। তাঁর এই ভাব ব্রাহ্মসমাজে সংক্রামিত হইয়াছিল। বিবেক conscience সেই সময়ে ব্রাহ্ম জীবনের নিয়ামক ছিল। কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন, এক সময়ে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ প্রত্যেক কর্ম্মে ও চিন্তায় বিবেকের দোহাই দিত। বিবেক মানব হৃদয়ে ঈশ্বরের বাণী, বিবেক যাহা বলিবে তদনুসারেই চলিতে হইবে। ইংরেজী শিক্ষিত লোক মিথ্যা বলে না, মিথ্যা আচরণ করে না, ইহাই সেই সময়ের লোকের ধারণা ছিল। ব্রাহ্মগণ যা বলেন, পাছে তা করিতে না পারেন, অথবা যা বলেন তা ঠিক সত্য না হয়, সেজন্য প্রত্যেক কথার পর "বোধ হয়" বলিতেন। বিবেক অনুসারে চলিতে না পারিলে অনুতাপ আসিত, কাঁদিয়া আকুল হতেন এবং ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেন। নীতিকে জীবনের ভিত্তি করিয়া জীবনপথে—ধর্ম্ম-সাধনে—অগ্রসর হইতেন।

সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসক আমরা; আমাদের জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমাদের চিন্তা ও ভাব সত্য হইবে, আমাদের বাক্য সত্য হইবে, আমাদের কার্য্য সত্য হইবে। সত্য ভাব ও চিন্তা অনুসারে বাক্য ও কার্য্য নিয়মিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর সাহিত্যিক এই সত্যের এক রকম বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন; তাঁরা যেন বলেন, আমাদের মনে যে সকল ভাব ও চিন্তা জাগে তদনুসারেই কাজ কর্‌তে হবে, তাহাই সত্য-সাধনা। কিন্তু তাহা ত ঠিক নহে। আমরা Pyschology ও Ethics, Science ও Art এর যে পার্থক্য আছে, তাহা ত একেবারে ভুলিয়া যেতে পারি না। মানুষ কত রকম বিচার করে সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু সকল বিচার ও সিদ্ধান্তই ত ঠিক ন্যায়-শাস্ত্রানুমোদিত হয় না। মানুষ কত রকম অঙ্কন করে, রেখা টানে; সব অঙ্কনই ছবিতে পরিণত হয় না, চিত্রবিদ্যা বলা যায় না; সব রকম ধ্বনিকেই সঙ্গীত বলা যায় না। সেইরূপ সব রকম মনের ভাব ও চিন্তাকে সত্য চিন্তা বলা যায় না। তাই ঋষি বলিয়াছেন, শ্রেয় ও প্রেয় এই দুই প্রকার ভাব ও দুই প্রকার কার্য্য আছে। মানুষ তুমি কোন্ ভাব মনে পোষণ কর্‌বে, কোন্ ভাবের অনুসরণ কর্‌বে? জীবনের সন্ধিস্থলে দুই প্রকার ভাব ও কর্ম্মক্ষেত্র এসে সম্মুখে দাঁড়ায়—এই প্রেয়, এই শ্রেয়,—মানুষ তুমি বাছিয়া লও, কোন্ পথে তুমি চলিবে। শ্রেয় ভাব, শ্রেয় চিন্তা, শ্রেয় বাক্য, শ্রেয় কার্য্য কি বরণ করিয়া অমৃতের পথে যাবে, না, প্রেয় ভাব, প্রেয় চিন্তা, প্রেয় বাক্য, প্রেয় কার্য্য অনুসরণ করিয়া মৃত্যুকে ডেকে আন্‌বে? সকল চিন্তা শ্রেয় চিন্তা নয়। মানুষের দুর্ব্বলতার সময় কত কুচিন্তা মনে আস্‌তে পারে, কত প্রলোভন আস্‌তে পারে, সেই সব চিন্তা ও ভাব পোষণ করা এবং তাঁর অনুসরণ ক'রে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াতে সত্যের সন্ধান করা হলো না। তুমি রাস্তা দিয়া চলে যাচ্ছ, দোকানে কত জিনিষ সাজান রয়েছে, তোমার তাহাতে প্রলোভন এল, আর তুমি সেই মনের ভাব অনুসরণ করে ঐ জিনিষ গ্রহণ কর্‌তে উদ্যত হইলে—ইহাই কি সত্যের অনুসরণ? তোমার ঐ অশ্রেয় ভাবকে সংযত কর্‌তে হবে। একজনের ব্যবহারে তোমার ক্রোধ উপস্থিত হলো, তাহাকে হত্যা কর্‌বার তোমার ইচ্ছা জাগিল, অমনি কি সে ভাব অনুসারে কার্য্য কর্‌বে? ইহাই কি সত্য সাধনা? না, সেই ভাবকে সংযত করিবে? সেইরূপ কত প্রকার কলুষিত চিন্তা মনে আস্‌তে পারে, তাহার প্রশ্রয় দিতে হবে না, তদনুসারে কাজ কর্‌তে হবে না; তাহা সংযত কর্‌তে হবে। চিন্তা ও ভাব খাঁটি হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-অনুমোদিত হবে, বিবেক-অনুমোদিত হবে। সত্য শাশ্বত, চিরন্তন; ইহা

ভগবানেরই স্বরূপ; আমাদের মনে যে সকল ভাব ও চিন্তা আস্‌বে তাহা সকলই শ্রেয় না হইতে পারে। শ্রেয় চিন্তা ও ভাব যাতে আসে, আমাদের ভাব ও চিন্তা যাহাতে শাশ্বত সত্যের অনুরূপ হয়, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও নীতির অনুরূপ হয়, তাহাই কর্‌তে হবে। আমাদের কার্য্য ও বাক্য সত্য হইবে, সত্য চিন্তা ও ভাবের সহিত কার্য্য ও বাক্যের সামঞ্জস্য থাকিবে। সুতরাং আমাদের বাক্য ও কার্য্যের দায়ীত্ব আছে। আমরা যে বাক্য বলিব, তাহা সত্য হইবে। এবং যে বাক্য বলিব, তদনুসারে কার্য্যও করিব। বাক্য রক্ষা না করা যে অপরাধ, অনেকেরই তাহা স্মরণ থাকে না! তাই লোকের কথার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করা কঠিন হইয়া উঠে। যার যে সময়ে যেখানে যাওয়া উচিত ছিল, সে তখন সেখানে গেল না, যার যে সময়ে যে কাজটি করার কথা ছিল, তাহা সে সে সময়ে কর্‌ল না; ইহাতে যে তত্তৎ ব্যক্তির কেবল অপরাধ হয়, তাহা নয়; অনেক কার্য্যের ব্যাঘাত হয়; লোকের উপর কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। অনেকে মনে করেন, বড় বড় কাজে কথা ঠিক রাখ্‌লেই চল্‌ল; ছোট ছোট বিষয়ে তারা অবহেলা করেন; ইহা ঠিক নয়। সত্য অবলম্বন করিতে হইবে জীবনের প্রতি পদে, প্রতি খুঁটি-নাটিতে; প্রথমে ত কোন মতেই যাহা সত্য নয় তাহা বলিবে না; এমন ভাবেও বলিবে না, যাতে লোকের মনে মিথ্যা ধারণা জন্মে। যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্য্যকে সত্য কথাই বলিয়াছিলেন—"অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ!" কিন্তু "ইতি গজঃ"টি আস্তে বলিয়াছিলেন ইচ্ছা ক'রে, যে দ্রোণাচার্য্যের মনে মিথ্যা ধারণা জন্মিল। এই অপরাধে যুধিষ্ঠিরকে নরক দর্শন কর্‌তে হলো। সত্য রক্ষা কর্‌তে যেয়ে দশরথকে প্রাণসম পুত্র রামকে নির্ব্বাসন কর্‌তে হ'লো। সত্য রক্ষা কর্‌তে গিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে সর্ব্বস্ব উত্তমর্ণের হাতে অর্পণ কর্‌তে হলো। প্রথমে চিন্তা ও ভাব সত্য, খাঁটি কর্‌তে হবে; অবিশুদ্ধ ভাব মনে জাগ্‌লে, তাহা সংযত কর্‌তে হবে; অবিশুদ্ধ ভাব অনুসারে যদি প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকি, যদি কোনও সঙ্কল্প ক'রে থাকি, যখন মনান্তর হবে, প্রকৃত সত্য দেখ্‌তে পাব, তখনও যে সেই অবিশুদ্ধ ভাবের প্রেরণায় সংকল্প—অন্যায় সংকল্প, শ্রেয়ের বিরোধী সংকল্প—পালন কর্‌তে হবে, তা নয়। ক্রোধের সময়ে যদি বলি আমি একজনের অনিষ্ট কর্‌ব, তাহা হ'লে, তাহা যে কর্‌তেই হবে, তা নয়। কারণ, ঐ অনিষ্টের চিন্তাটা প্রকৃত সত্য নহে, উহা শাশ্বত সত্যের অনুসারে হয় নাই, উহা পরম দেবতার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু প্রকৃত ভাবে সত্যের অনুসরণ করে যে কথা বল্‌ব তদনুসারেই কার্য্য কর্‌তে হবে। যদি কোনও কাজ কর্‌বে ব'লে থাক, কোথাও যাবে ব'লে থাক, তাহা কর্‌তেই হবে। হয় ত অনেক অসুবিধা উপস্থিত হয়েছে, তোমার নিজের অনেক ক্ষতি হবে; তবুও সত্য রক্ষা কর্‌তে হবে। যেখানে যে সময়ে উপস্থিত থাকার কথা আছে, শত অসুবিধা সত্ত্বেও সেখানে সেই সময়ে যেতে হবে; যাকে যে কথা দিয়াছ, তাহা আপনার অনিষ্ট ক'রেও রক্ষা কর্‌তে হবে। দেনা পাওনায় খাঁটি থাক্‌তে হবে। অপরের কাছে তোমার ঋণ আছে, নিজে অসুবিধায় প'ড়েও তাহা শোধ কর্‌তে হবে। তুমি কোনও প্রতিষ্ঠানে চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছ; ইহাও তোমার ঋণ—নিজে অসুবিধায় প'ড়েও, চাহিতে না এলেও, সেই ঋণ—চাঁদার ঋণ—পরিশোধ কর্‌তে হবে। একজনকে সাহায্য কর্‌বে বলেছ; তখন হয় ত তোমার নিজের আর্থিক অবস্থা ততটা ভাল নাই, কিন্তু যখন সাহায্য কর্‌বে বলেছ, তখন তাহা কর্‌তেই হবে; নিজে অসুবিধায় প'ড়ে, কষ্টে প'ড়েও তোমার কথা রক্ষা কর্‌তে হবে। আমরা অনেক সময় ভৃত্যদের মিথ্যা কথা মিথ্যা আচরণে বিরক্ত হই; ধোবা কথা রাখে না, দরজি ঠিক সময়ে জামা তৈয়ার ক'রে দেয় না। যাদের সঙ্গে দৈনন্দিন কার্য্যের সম্বন্ধ তারা কথামত কাজ করে না ব'লে দুঃখিত হই, বিরক্ত হই; ইহাতে কাজের অনেক ক্ষতি হয়। কিন্তু যাহারা শিক্ষিত ব'লে পরিচিত তাহারাই কি কথা ও কার্য্যে খাঁটি পথে সকল সময়ে চলেন? তারাও কি যে কাজটি যে সময়ে কর্‌বেন বলেন, তাহা করেন? যেখানে যখন যাবেন, বলেন, তাহা যান? একবার স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় খুব অসুস্থ হ'য়ে ডাক্তার নীলরতন সরকারের তৎকালীন হ্যারিসন্ রোডস্থ বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় তাঁকে দেখ্‌তে যান। বর্ত্তমান সময়ের যুবকদের, ছাত্রদের কথা উঠ্‌ল; বর্ত্তমান সময়ে যুবকদের মধ্যে যেরূপ সেবার ভাব জাগ্রত হয়েছে, তখন বর্দ্ধমানের জলপ্লাবনে যেরূপ কষ্ট ক'রে ছেলেরা সাহায্য করেছে, তাহা উল্লেখ ক'রে কৃষ্ণকুমার বাবু বলিলেন, দেশের ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ। তখন অশ্বিনীবাবু বলিলেন, এরা খুব সেবা কর্‌তেছে, তা ঠিক, কিন্তু মিথ্যুকের দল, মিথ্যুকের দল দ্বারা দেশের কল্যাণ হয় না। ছেলেরা কলেজে proxy দেয়, এবং অন্য ভাবে যে মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা আচরণ করে, তাহাতে অশ্বিনীবাবুর চিত্ত খুবই ব্যথিত ছিল; তাই তিনি ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, যে কোনও রকমে, সত্য মিথ্যা লক্ষ্য না ক'রে, দেশের বুঝি কল্যাণসাধন করা যায়, দেশের কল্যাণের জন্য মিথ্যা পথও অবলম্বন করা যায়। মিথ্যা দ্বারা আপাততঃ কোনও বিশেষ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করা হয় ত যেতে পারে। কিন্তু তাতে পরিণামে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হয় না। দেশের উন্নতি বল্‌তে কেবল বিদেশীর শাসন ও শোষণ হ'তে দেশকে মুক্ত করা বুঝায় না,—দেশবাসীকে সত্যে প্রেমে পবিত্রতাতে যদি প্রতিষ্ঠিত না করা যায়, তবে দেশের প্রকৃত উন্নতি হবে না, প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা যাবে না। সুতরাং দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করেন যাঁরা, তাঁহাদিগকে বলি, দেশবাসীকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর। বিবেকের বাণী, ঈশ্বরের বাণী, নিত্য শাশ্বত, চিরন্তন, সত্য যাহা তাহা অনুসরণ করিয়া চল্‌বার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান কর; সত্য পথ অবলম্বন ক'রে দেশের কল্যাণ সাধন কর। সাধারণের কাজেই হউক, পারিবারিক জীবনেই হউক, ব্যক্তিগত ব্যাপারেই হউক, সত্য—খাঁটি সত্য, নিছক সত্য, অবিমিশ্র সত্য, শাশ্বত সত্য—অবলম্বন করে চল্‌তে হবে। প্রতি পদে আত্মপরীক্ষা দ্বারা সত্য, নির্ভয় ও সত্য

অনুসরণ করতে হবে। সেই জন্যই বলি, দশজনের সঙ্গে ব্যবহারে, দশ রকম কার্য্যে, আমাদিগকে খাঁটি পথেই চলতে হবে—বাক্য সত্য হবে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে, কার্য্য আদর্শ অনুসারে হবে। অনেকে সত্য আদর্শ প্রাণে পেয়েছেন, উচ্চ ভাব প্রাণে জাগ্রত হয়েছে, কিন্তু আচার আচরণে সে আদর্শ ও ভাবের অনুসরণ করার সাহস নাই। ধর্ম্মের যে নূতন আদর্শ এসেছে, সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক উপাসনাই যে জীবনের লক্ষ্য, দেশের কার্য্যে পারিবারিক অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত জীবনে, সকল ভেদজ্ঞান ও কুসংস্কার বর্জ্জিত হ'য়ে চলাই যে শ্রেয়, অনেকে তাহা জানেন। কিন্তু জানিয়াও তদনুরূপ কার্য্য করেন না; দুইটা জীবন অনেকে যাপন করেন। একটা মতগত জীবন, একটা কার্য্যগত জীবন। একটা ভিতরের জীবন, একটা বাহিরের জীবন; একটা ব্যক্তিগত জীবন, একটা সামাজিক জীবন। এই দুইরূপ জীবন যাপন করা সত্যসেবকের চলে না। জীবন এক শাশ্বত সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে। যে আদর্শ পেয়েছি, জীবনের প্রতি পদে, প্রতি কার্য্যে, প্রতি ভাবে, ও চিন্তায় তদনুরূপ হ'তে হবে। সত্য, খাঁটি সত্য অবলম্বন ক'রে চলতে হবে। অবশ্য এজন্য সংগ্রাম আছে। অনেক উত্থান পতন আছে, অনেক সময় ইচ্ছাসত্ত্বেও প্রতিকূল ঘটনার সংগ্রামে জয়লাভ করা কঠিন হয়। তবুও সংগ্রাম ত চাই; আদর্শ অনুসারে কাজ করতে পারি নাই, বলে দুঃখ হওয়া চাই; আবার চেষ্টা ও সাধনা করা চাই। তুমি যদি খুঁটী গেড়ে ব'সে থাক আর অগ্রসর হব না, এখানে থেকে যতটুকু পারা যায়, তাহা করব; তাহা হ'লে ঠিক সত্যের সন্ধান করা হ'ল না। সত্য পথে চলতে, সত্য কথা বলতে, অনেক সাহসের প্রয়োজন; অনেক সময় অনেক ত্যাগের প্রয়োজন, স্বার্থনাশের প্রয়োজন। হয় ত অনেক স্বার্থের হানি হবে,—রাজার হালে ছিলে, ভিখারী হ'তে হবে; হয়ত পিতামাতার বক্ষ হইতে তাড়িত হইতে হবে, স্নেহের বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে যাবে, সমাজ রুষ্ট হবে, দেশবাসিগণ নিন্দা করবে, তবুও সত্য, খাঁটি সত্য অবলম্বন ক'রে চলতে হবে। তাই শাস্ত্রী মহাশয় কবিতা লিখেছিলেন,

কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা,
যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন প্রাণ মানরে,
পিতাকে ধরিয়া র'ব পর্ব্বত সমান রে।

সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দিকে চেয়ে, তাঁর উপর নির্ভর ক'রে, তাঁকে জীবনের কাণ্ডারী ক'রে জীবন-তরণী সত্যের স্রোতে ছেড়ে দিতে হবে, প্রতি বাক্যে, চিন্তা ভাব ও কার্য্যে, সত্যের পথে চলতে হবে,—তাতে দুঃখ আসুক, সুখ আসুক, প্রশংসা আসুক, নিন্দা আসুক, ভয় নাই,—সত্য অবলম্বন ক'রে চ'লে যেতে হবে।

যিশুখৃষ্ট বলেছিলেন, (সে কথা এখান থেকে অনেকবার বলা হয়েছে) যদি তুমি নৈবেদ্য লইয়া ঈশ্বরের বেদীর নিকট উপস্থিত হইয়া থাক, আর তখন যদি মনে পড়ে যে কারও সঙ্গে তোমার অমিলন আছে, তবে ঐ নৈবেদ্য রেখে আগে তার সঙ্গে মিলন ক'রে এস, তবে নৈবেদ্য গৃহীত হবে। একথাটী ধর্ম-জীবনের পথে কতটা যে সত্য, তাহা ক্রমে অনুভব করিতেছি। প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের পূজা করতে হ'লে, হৃদয়ে প্রেম চাই, মানবের প্রতি, তাঁর সন্তানগণের প্রতি, প্রেম চাই; হৃদয়দ্বার সকলকে গ্রহণ করবার জন্য উন্মুক্ত থাকা চাই। তোমার হৃদয় সরস ও প্রশস্ত থাকবে; বাক্য প্রীতিপূর্ণ হবে, ব্যবহার মিষ্ট হবে। অনেকে মনে করেন যে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে, বিবেকানুমোদিত পথে চলতে হলে, কঠিন হওয়া প্রয়োজন; বাস্তবিক যিনি প্রকৃত ধর্ম্মপথে চলতে চান, তাঁকে কঠিন ও কোমল দুই প্রকৃতিই অবলম্বন করতে হবে। তাই, রামচরিত্র বর্ণনা করতে যেয়ে উত্তর রামচরিতের কবি বলিয়াছেন :—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহপি বিজ্ঞাতুমর্হতি।

শ্রেষ্ঠলোকদের চিত্ত, একদিকে বজ্র হইতেও কঠিন অপরদিকে কুসুম হইতেও কোমল, এর রহস্য ভেদ কে করতে পারে?

প্রতিদিনের কাজে কত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, কত অপ্রিয় ঘটনা ঘটে, কত বাধা বিঘ্ন আসে, চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়। উত্তেজনার কারণ সংঘটিত হয়, তার ভিতরে চিত্ত স্থির রেখে বাক্য ও ব্যবহার মিষ্ট করতে হবে; মানুষকে স্নেহ দান করতে হবে; মিষ্ট ব্যবহার করতে হবে, অত্যাচারিত যে তাকে রক্ষা করতে হবে, পীড়িতের সেবা করতে হবে। প্রেম কেবল দিয়াই সুখী। অপরের কাছে কিছু প্রত্যাশা না করিয়া ভালবাসা বিলাইয়া যেতে হবে। একজনকে ভালবাসতে যদি নাও পার, অন্ততঃ তার প্রতি অপ্রেম পোষণ করবে না; কারও প্রতি বিরূপ হওয়া চলে না। যে তোমাকে ভালবাসে, আদর করে, যে তোমার অনুগত, তাকেই যে কেবল ভালবাসবে, তা নয়। যে তোমার অনিষ্ট করে, যে তোমাকে অপমান করে, উপেক্ষা করে, তোমার প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম দেয়, তাহাকেও ভাল বাসতে হবে, তাহারও কল্যাণচিন্তা কল্যাণচেষ্টা করতে হবে—তুমি অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে গিয়াছ, তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তোমাকে গরল অর্পণ করেছে; তবুও তাকে আলিঙ্গন করতে হবে। তা যদি না পার, তবে প্রেমের আরম্ভই হয় নাই। যে ভালবাসে, আদর করে, উপকার করে, তার প্রতি ভালবাসা ত দুর্ব্বৃত্ত লোক যারা, তারাও প্রকাশ ক'রে থাকে। যে হস্ত তোমাকে আঘাত করে, সে হস্ত চুম্বন করতে হবে, যে দূরে ঠেলে ফেলে তাকেও বক্ষে ধারণ করতে হবে। যে অপরাধ করেছে, তাকেও ক্ষমা করতে হবে। যে বিপথে গিয়াছে, তাকেও প্রেমে টেনে আনতে হবে। অবশ্য পাপের প্রতি কঠোর ভাব থাকাই প্রয়োজন; যে অন্যায় করেছে, তার অন্যায়ের সমর্থন করতে হবে না, তাকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে না; তার ব্যবহারের কঠোর বিচার করতে হবে। কিন্তু সেই লোককে ত বাঁচাতে হবে; তাহাকে প্রেমে আলিঙ্গন ক'রে বলতে হবে, ও ভাই, ও পথে যেও না; তার জন্য ক্রন্দন করতে হবে, তার জন্য প্রার্থনা করতে হবে; সে হয় ত তোমার কথা শুনবে না, সে হয় ত ফিরেও তাকাবে না; তবুও অন্ততঃ তার জন্য ব্যথিত হৃদয়ে ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা জানাতে হবে;

কতদিন ধ'রে প্রার্থনা করতে হবে জানি না। মণিকা মাতা কতকাল ক্রন্দন ও প্রার্থনার পর ছেলেকে ফিরিয়ে পেয়েছিলেন। আমাদের জীবনেও দেখি, প্রিয়জন, আপনার জন বিপথে গেল; প্রাণ ভেঙ্গে পড়ে; কি করব ঈশ্বরের চরণে কাতর প্রার্থনা ছাড়া উপায় নাই। তাকে হৃদয় হ'তে দূরে ফেলব না, ব্যথিত চিত্তে তার জন্য ঈশ্বর চরণে অশ্রুপাত করব। মানুষকে আমরা কত সময়ে ভুল বিচার করি; বাহিরের অনুষ্ঠান ও আচরণ দেখে সকল সময়ে সুবিচার করা যায় না। কত জনের অন্তরে কত মহৎ ভাব রয়েছে, কত জন নীরবে লোকচক্ষুর অগোচরে পুণ্য ভাব পোষণ করিতেছেন, পুণ্য কার্য্য করিতেছেন! আমরা বাহির থেকে কি বুঝিব? সুতরাং আমাদের মনকে কঠিন না ক'রে সর্ব্বদা লোকের প্রতি উদার ভাবে দৃষ্টি করতে হবে, উদার ভাবে তাদের কাজ দেখতে হবে। আমরা কেবল যে দুঃখীর সঙ্গে সমবেদনা করব, তা নয়; যে সুখী, যে সম্পন্ন, যে কৃতকার্য্যতা লাভ করেছে, তার সঙ্গে আনন্দ করতে হবে। দুঃখী যে, অকৃতকার্য্য হয়েছে যে, বিপদে পড়েছে যে, তার সঙ্গে সহানুভূতি করা সহজ। কিন্তু এই দুঃখ দুর্দ্দশায় পড়েছিল, দৈন্যে কষ্ট পেতেছিল, আজ সে উন্নতি লাভ করেছে, সুখের মুখ দেখেছে, তার সঙ্গে যে প্রাণ ভরে আনন্দ করা, ইহা অনেক সময়ে কঠিন। অপরের উন্নতিতে অনেক সময় ঈর্ষা আসে। প্রকৃত প্রেম যার জেগেছে, সে যেমন দুঃখীর সহিত ক্রন্দন করবে, তেমনি সুখীর সুখে আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করবে। সকলের সঙ্গেই মিষ্ট বাক্য, মিষ্ট ব্যবহার করতে হবে; চোখের চাহনিটি প্রেমপূর্ণ হবে; যে বিপদে পড়েছে, তার পশ্চাতে যেয়ে দাঁড়াতে হবে, যে উঠতে পারে না, তাকে তুলে ধরতে হবে। যে ব্যথিত তার ব্যথার ব্যথী হ'তে হবে। আবার যে আনন্দ করছেন, তার আনন্দের ভাগী হ'তে হবে। প্রেমের দেবতা কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না; যে বিপথে গিয়াছে, তাকেও তিনি বিনাশ করেন না; তাকেও নানা দুর্ঘটনার ভিতর দিয়া টেনে আনেন, তাকেও প্রেমভরে তিনি ডাকেন। সেই প্রেমস্বরূপের উপাসক যাঁরা, তাঁরা কি কাহাকেও অপ্রেম করতে পারে। হৃদয়ে প্রেম ল'য়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে হবে, কারও প্রতি অপ্রেম ভাব, ক্রোধ প্রকাশ করা ধর্ম্মসাধনের অন্তরায়, মনুষ্যত্ব ফুটিবার বাধা। তাই মানুষকে যেমন একদিকে ভাবে চিন্তায়, বাক্যে কার্য্যে সত্য অনুসরণ ক'রে চলতে হবে, তেমনি অপর দিকে প্রেম বিতরণ করতে হবে। তার চিন্তা ভাব প্রেমপূর্ণ হবে, দৃষ্টি কোমল হবে, ব্যবহার মধুর হবে, বাক্য মিষ্ট হবে; অপ্রিয় সত্যও মিষ্টভাবে, স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে বলতে হবে। ক্রোধ হিংসা পরশ্রী-কাতরতা প্রেমের পথের বাধা। তাহা জানিয়া মনকে সর্ব্বদা স্নেহপূর্ণ রাখতে হবে।

চিত্ত সর্ব্বদা পবিত্রভাবে পূর্ণ রাখতে হবে। ভগবান্ শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং; তিনি পুণ্যময়; তাঁর চরণে এসেছে যাঁরা তাদিগকে নির্ম্মল হ'তে হবে, শুদ্ধতা লাভ করতে হবে। চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য পবিত্র হবে। Blessed are the pure in heart for they shall see God—শুদ্ধ চরিত্র লোকেরা ধন্য, কারণ, তাঁহারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবেন। মলিন দর্পণে কিছুই সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। মলিন চিত্তে ভগবানের মুখ দেখা যায় না। এই শুদ্ধতাসাধনের জন্য খুব চেষ্টার প্রয়োজন। কেবল বাক্য ও কার্য্যে শুদ্ধ থাকলে ত চলবে না। মনে কত কলুষিত ভাব আসে; কোন সূত্র অবলম্বন ক'রে কোন মলিন ভাব প্রবেশ করে; সুতরাং সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হবে। Watch and pray—জাগ্রত থেকে ভগবানের চরণে প্রার্থনা কর। কেবলই যে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যই মনকে অশুদ্ধ করে তা নয়; কারও প্রতি ক্রোধের ভাব, কারও অনিষ্টচিন্তা, কারও প্রতি অপ্রেম, কারও অকল্যাণে সুখ, কল্যাণে দুঃখ, এই সকলই বিকৃত ভাব; এই সকল ভাব হ'তে মনকে দূরে রাখতে হবে। যদি প্রকৃত প্রেম আসে, তবে সকল অবিশুদ্ধ ভাব,কলঙ্ক-কালিমা চ'লে যাবে।

আমাদের দেশে এই জন্যই প্রাচীনকালে ছাত্রজীবনেই ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল। সকল রকম বিলাসিতা বর্জ্জন ক'রে, দূষিত নৃত্য গীত পরিত্যাগ ক'রে, চিত্তকে সকল কলুষিত চিন্তা হ'তে মুক্ত রেখে জীবনের ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইত। ব্রাহ্মসমাজেও এইজন্য মানুষকে কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদ হইতে বিরত থাকিতে, তরল সঙ্গীত গান করা, ও শোনা হইতে বিরত থাকিতে, তরল আলাপ আলোচনা না করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ গ্রন্থে ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলাম, পাপ রূপ পিশাচ কখন কোন দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া মনোমন্দিরে প্রবেশ করিবে, কে বলিতে পারে? শয়তান কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া ইভ্‌কে প্রলুব্ধ করিবে, কে জানে? কলি কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া পবিত্র চরিত্রগণের মন অধিকার করিবে, কে জানে? সুতরাং জীবনকে পবিত্র রাখিতে হইলে, ছেলেবেলা হইতেই সংযম সাধন প্রয়োজন। আর চিত্ত পবিত্র না হ'লে, ভগবানের অরূপ রূপ হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না।

সুতরাং ধর্ম্মসাধনের পথে অগ্রসর হ'তে হ'লে বিবেককে জাগ্রত করা চাই, নীতির পথে চলবার চেষ্টা চাই, জীবনের প্রতি চিন্তা ও ভাবে, প্রতি বাক্যে, প্রতি কার্য্যে সত্য প্রেম ও পবিত্রতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। একথা বলিতেছি না, যে আগে সম্পূর্ণরূপে সত্যনিষ্ঠ হও, প্রেমে হৃদয় পূর্ণ কর, পবিত্র-চিত্ত হও, তার পর ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নামকীর্ত্তন, তাঁর ধ্যান ধারণাতে নিযুক্ত হবে। সেরূপ হয় না; মনকে শুদ্ধ রাখতে হ'লে, হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত করতে হ'লে, কঠোর পরীক্ষার স্থলেও সত্য পথ ধ'রে চলতে হ'লে, ভগবানের করুণার প্রয়োজন। তাঁর চরণে ব'সেই ত বল ভিক্ষা করতে হবে। সুতরাং চরিত্র উন্নতির চেষ্টা, নীতির সাধনা, ও ঈশ্বরোপাসনা একসঙ্গেই চলবে। কিন্তু দৃষ্টি থাকা চাই, জীবনের খুঁটি-নাটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা চাই; জীবনকে প্রতিদিন পরীক্ষা করা চাই। হয় ত চেষ্টা সত্ত্বেও কতবার প'ড়ে যাবে, কতবার আদর্শচ্যুত হবে; তখন—তখন তাঁর চরণে বল ভিক্ষা ক'রে আবার উঠে দাঁড়াবে। যতবার পড়বে, ততবার উঠে দাঁড়াবে। এই নৈতিক জীবনের উপরই ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সত্য প্রেম পবিত্রতা,

ইহা তুচ্ছ করিও না; জীবনের সত্য ব্যবহার, প্রেমপূর্ণ ব্যবহার, চিত্তের শুদ্ধতা, ইহাই জীবনের, ধর্ম্মজীবনের, মূল সূত্র। বাহিরের অনুষ্ঠানেই পাপ দূর হয় না; ঈশ্বরের নাম কর্‌লাম, অসত্য পথেও চল্‌লাম, লোকের প্রতি অপ্রেম ব্যবহার কর্‌লাম, মনে পাপ চিন্তাও পোষণ কর্‌লাম, তা হয় না। কোনও গুরুর মন্ত্রবলে, অস্বাভাবিক ভাবে ধর্ম্মলাভ হ'য়ে গেল, তা হয় না। তুমি জীবনপথে যেরূপ চলিতেছিলে, সেইরূপই চলিতেছ, মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিতেছ, অপবিত্র ভাব পোষণ করিতেছ, লোককে ঘৃণা করিতেছ, জীবনের পথ পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেছ না, অথচ কোনও যাদুমন্ত্রবলে, ধর্ম্ম লাভ করিবে, তাহা হয় না। ঈশ্বরের কৃপা চাই—ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্‌। কিন্তু তোমার দিক দিয়াও সাধন চাই, সংগ্রাম করা চাই; সত্য প্রেম পবিত্রতার উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে প্রাণপণে চেষ্টা করা চাই।

জীবনের প্রতি ভাব চিন্তা বাক্য ও কার্য্য সত্য, প্রেমপূর্ণ, পবিত্র হওয়া চাই; সেই ভাবে জীবন গঠন কর্‌বার জন্ম চেষ্টা চাই, প্রার্থনা চাই। ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের কথা বল্‌লেই কেবল চলে না, নৈতিক জীবন উন্নত কর্‌তে হবে, বিবেককে সজাগ ও উজ্জ্বল রাখ্‌তে হবে, হৃদয় প্রশস্ত কর্‌তে হবে, সত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে। এই বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। পরমেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন।

সায়ংকালে "সাধনায় নারীর অধিকার" বিষয়ে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মধ্য যুগের কতকগুলি ভক্তবাণী ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সভাপতিরূপে প্রার্থনা করেন। ক্রমশঃ

## ব্রাহ্মসমাজ।

**কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভা**—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ বর্ত্তমান বৎসরের জন্ম কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন:—

সভাপতি—ডাঃ হেমচন্দ্র সরকার, এম এ, ডি-ডি, সম্পাদক—ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু, এম এ, পি-এইচ্-ডি, সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার সেন, এম এ, শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য, এম এ, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ, কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু, এম এ, বার-এ্যাট্-ল।

অধ্যক্ষ সভা—সহর—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, পণ্ডিত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, কুমারী শকুন্তলা রাও, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত, শ্রীযুক্ত প্রফুল চন্দ্র সোম, শ্রীযুক্ত [illegible], শ্রীযুক্ত [illegible] রায়, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী সুশীলা বসু, ডাঃ শিশির কুমার মিত্র, ডাঃ বনোয়ারি লাল চৌধুরী, ডাঃ ফকিরচন্দ্র সাধু খাঁ, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র আতর্থী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার, ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ, শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন দত্ত, শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল, শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাঃ সুরেন্দ্র কুমার চন্দ, শ্রীযুক্ত অজিত কুমার দাস গুপ্ত, ডাঃ শরৎ কুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অনিমেষ দাসগুপ্ত, ডাঃ প্রশান্তকুমার ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র মোহন মিত্র, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত অমৃত কুমার দত্ত। মফঃস্বল—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী—বরিশাল, ভাই সীতারাম—শিয়াল কোট সিটি, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত—ঢাকা, শ্রীযুক্ত অমলকুমার সিদ্ধান্ত—লাহোর, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বল—লাহোর, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর—কটক, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ—ময়মনসিংহ, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়—কটক, কাজি আব্‌দাল গাফ্‌ফার—খুলনা, শ্রীযুক্ত পরেশনাথ সেন—গিরিডি, শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী চৌধুরী—দেরাদুন, ডাঃ ভি রায়—গিরিডি, মিঃ জি বি ত্রিবেদী—বোম্বাই, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র—ব্যাঙ্গালোর, শ্রীযুক্ত লালমোহন চট্টোপাধ্যায়—শোনপুর, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস—তমলুক, শ্রীমতী শান্তিময়ী দত্ত—মৌলমেন, শ্রীযুক্ত মধুসূদন জানা—কাঁথি, শ্রীযুক্ত ভি জি বৈদ্য—বোম্বাই, ডাঃ গিরিশচন্দ্র দাস—লক্ষ্ণৌ, মিঃ জ্ঞানাঙ্কুর দে,—বাঁকুড়া, শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত—গিরিডি, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায়—চন্দননগর, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ নন্দী—কুমিল্লা, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চৌধুরী—পাটনা, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী—রেঙ্গুন, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ—গিরিডি, শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ দাস—ডিব্রুগড়, শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত—বহরমপুর, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র—ফরিদপুর।

প্রতিনিধি—শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষাল—বাণীবন ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার বসু—মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত শিশির কুমার দত্ত—কাওরাইদ ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত—গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্ত—রাঁচি ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র—টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস—চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,—বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত কালীমোহন বসু—কালীঘাট ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র মোহন মিত্র—নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন জানা—কাঁথি ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত ভবতারণ ভড়—উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত রায়—মৌসমাই ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী—মোরাই ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র—ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ—পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র চৌধুরী—বরমা ব্রাহ্মসমাজ, রায় শরৎ চন্দ্র দাস বাহাদুর—ধুব্‌ড়ী ব্রাহ্মসমাজ, শ্রীযুক্ত জয়মঙ্গল রথ—গঞ্জাম জেলা ব্রাহ্মসমাজ।

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২১সে অগ্রহায়ণ কাওড়াদির অন্তর্গত প্রসাদপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র আচার্য্যের পত্নী প্রতিভা আচার্য্য দুইটি শিশু কন্যা ও একটি শিশু পুত্র রাখিয়া ২৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ১লা পৌষ তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৬ই জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ব্যানার্জ্জির পুত্র শরৎচন্দ্র অতি শোচনীয় অবস্থাতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিগত ১৬ই জানুয়ারী তাঁহার আদ্য-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ১১ই জানুয়ারী ধুবড়ী নগরীতে পরলোকগতা চারুপ্রভা সরকারের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, স্বামী শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার প্রার্থনা ও কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী সরকার জীবনীপাঠ করেন। এই উপলক্ষে পুত্র কন্যাদ্বয় ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ২০৲ ও সাধনাশ্রমে ৫৲ দান করিয়াছেন। ( ভুল সংশোধন—পরলোক গমনের তারিখ ১লা জানুয়ারী স্থলে ৩১শে ডিসেম্বর এবং বয়স ৫৬ স্থলে ৫৩ বৎসর হইবে )।

বিগত ২৫শে জানুয়ারী জেমসেদপুর নগরীতে বাবু হীরালাল সরকার অল্প কয়েকদিনের অসুখে পরলোকগমন করিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ ঘটে। কয়েকদিন পূর্ব্বে ভ্রাতৃবধূ পরলোক গমন করিয়াছেন। পরিবারের উপর শোকের পর শোক যাইতেছে।

বিগত ২৫শে জানুয়ারী তেজপুর নগরীতে পরলোকগত গুরুনাথ দত্তের পত্নী স্বর্ণলতা দত্ত পরলোকগমন করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন এবং আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

---

**নূতন ডাক্তার**—শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অজয়কৃষ্ণ শেষ এম বি পরীক্ষাতে ধাত্রীবিদ্যাতে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

---

**শুভ বিবাহ**—বিগত ১লা মাঘ ( ১৫ই জানুয়ারী ) কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দের কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া নির্ম্মলনলিনী ও পরলোকগত নবগোপাল দত্তের পুত্র শ্রীমান দেবপ্রসাদের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে বরের মাতা শ্রীযুক্তা শারদামঞ্জরী দত্ত নিম্নলিখিত দান প্রতিশ্রুত হইয়াছেন:— আসাম নওগাঁ ব্রহ্ম-মন্দির নির্ম্মাণ ফণ্ড ২০৲ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার বিভাগ ১০৲, শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ ৫৲ ও শিলং ব্রাহ্মসমাজ

বিগত ৭ই মাঘ ( ২১শে জানুয়ারী ) কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত তড়িৎমোহন গুপ্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া বীণাপাণি ও শ্রীযুক্ত শশিকুমার দাস গুপ্তের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান হীরেন্দ্রকুমারের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে তড়িৎ বাবু প্রচার বিভাগে ৩৲ ও মাঘোৎসব ফণ্ডে ২৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ১৫ই মাঘ কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত ললিতমোহন বসুর কন্যা ( ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসুর পৌত্রী ) কল্যাণীয়া সুলেখা ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী করের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সতীশচন্দ্রের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।



---

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ২রা ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ।

Registered No. 56

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত

৩/ ৫৪ ভাগ
২১।২২শ সংখ্যা।

১লা ও ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০২
13th and 28th February, 1931.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা

হে মঙ্গলময় জীবনবিধাতা, তুমি প্রতিনিয়ত জীবন্তভাবে আমাদের কল্যাণ বিধান করিতেছ। তাই উৎসবের মধ্যে কত নূতন প্রেরণা দিয়াছ, প্রাণে কত নূতন সংকল্প জাগাইয়াছ! আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীকে ভাঙ্গিয়া দিয়া, আমাদিগকে দেশ কালাতীত বৃহত্তর মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া আমাদের গুরুতর দায়িত্বকে কত বৰ্দ্ধিত করিয়া দিয়াছ! আমরা ত আপনাদের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ লইয়াই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকি এবং বৃহত্তর জীবন হইতে বঞ্চিত হইয়া আপনাদিগকে ক্ষুদ্রই করিয়া ফেলি। আপনাকে খুঁজিতে যাইয়া যে আপনাকে হারাইয়া ফেলি,—আপনাকে না দিলে যে আমাকেও পাই না, তোমাকেও পাই না,—তাহা ত ভুলিয়াই থাকি। এবার তুমি বুঝিতে দিয়াছ, আপরের মধ্যে এবং তোমার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া না দিলে আর প্রকৃত কল্যাণ নাই। হে হৃদয়দর্শী দেবতা, তুমি জান তাহা আমাদের পক্ষে কত কঠিন,—আমরা কত দুর্ব্বল। এই বন্ধুর পথে তুমি আমাদিগকে হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছ, সকল অবস্থার মধ্যে তোমার জীবন্ত প্রেম ও মঙ্গল-বিধাতৃত্ব আমাদের কল্যাণসাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছে, উৎসবের মধ্যে কৃপা করিয়া এই বিশ্বাস তুমি প্রাণে দিয়াছ। তুমি একদিন আমাদের সমস্ত দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিবে, এই আশা তুমি প্রাণে জাগাইয়াছ। তাই উৎসবান্তে আমরা তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি আমাদের সমস্ত উদাসীনতা অবহেলা, ত্রুটি দুর্ব্বলতা, ক্ষুদ্রতা মলিনতা দূর করিয়া দেও। আমরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হইয়া চলি, তোমারই একান্ত বাধ্য সন্তান ও দাসানুদাস হইয়া যাই। আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে সর্ব্বোপরি তোমারই কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হউক।

## একাধিক শততম মাঘোৎসব।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

**৬ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার**—অদ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুদিন। প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় মহর্ষির জীবন হইতে আমরা কি আলোক লাভ করিতে পারি, তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজের উপরে কিছু কালের জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ও তৎপ্রবর্ত্তিত তত্ত্ববোধিনী সভার প্রভাব প্রবলভাবে পতিত হইয়াছিল। সে যুগকে "তত্ত্ববোধিনী সভার যুগ" বলা যাইতে পারে। তাহার পূর্ব্ব যুগ ছিল হিন্দু কলেজের যুগ; তাহার পরবর্ত্তী যুগ কেশবচন্দ্রের যুগ; এই উভয়ের মধ্যস্থলে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবের যুগটি বিদ্যমান ছিল। আমি এ স্থলে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস নয়, কিন্তু বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজের পরিবর্ত্তনসকলের ইতিহাস আলোচনা করিতেছি।

হিন্দু কলেজের শিক্ষার ফলে, বিশেষতঃ মহামতি ডিরোজিওর প্রভাবে বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজে একটি প্রবল অগ্রগতির ভাব সঞ্চারিত হইল। যাহা কিছু প্রাচীন ও যাহা কিছু দেশীয়, তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া, নূতনের দিকে এবং বিদেশীয় জ্ঞান ভাব ও রীতিনীতির দিকে একটি প্রবল ঝোঁক দেশে আসিয়া পড়িল। এই অগ্রগতির দ্বারা দেশ যে সকল উপকার লাভ করিয়াছিল, তাহা আমি কখনও অস্বীকার করি না। কিন্তু তাহার প্রধান গতিটি কোন্ দিকে ছিল, তাহা একবার চিন্তা করিতে বলি। কোনও গতিশীল বস্তুর দ্বারা কল্যাণ লাভ করিতে হইলে, তাহাতে যেমন একদিকে গতিবেগ সঞ্চার করিতে হয়, তেমনি

আবার তার দিঙ্‌নির্দ্দেশেরও ব্যবস্থা করিতে হয়। যেমন একদিকে momentum বা driving force সঞ্চার করিতে হয়, তেমনি আবার তাহার directionও স্থির করিয়া দিতে হয়। রেল গাড়ীর জন্য ষ্টীম চাই, এঞ্জিন চাই; কিন্তু আবার ঠিক মত লাইনও পাতা চাই, এবং ঠিক লাইনের দিকে তাহাকে চালাইয়া দিবার জন্য পয়েন্ট্‌স্‌ম্যান চাই। দেবেন্দ্রনাথ যেন ঐ দুই যুগের মধ্যবর্ত্তী পয়েন্ট্‌স্‌ম্যান। তাঁহার পূর্ব্বেও একটি প্রবল ভাব-বাষ্প ও তৎসম্ভূত গতিবেগের যুগ, অর্থাৎ হিন্দু কলেজের যুগ; তাঁহার পরেও একটি প্রবল ভাব-বাষ্প ও গতিবেগের যুগ, অর্থাৎ কেশবচন্দ্রের যুগ। কিন্তু দুইয়ের মাঝখানে দেবেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান না থাকিলে প্রথম যুগের সেই উদ্দাম গতিবেগ দ্বিতীয় যুগে কল্যাণের অভিমুখে পরিচালিত হইত না। প্রথম যুগের নিরীশ্বরবাদের স্থানে দ্বিতীয় যুগে আমরা দেখি ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি। প্রথম যুগের যথেচ্ছাচারের স্থানে দেখি বিবেকের অধীনতা। প্রথম যুগে দেশের প্রতি যে বিমুখ ভাবটি ছিল, তাহার স্থানে দেখি দেশের প্রতি প্রবল অনুরাগ। প্রথম যুগের বিপ্লববাদের স্থানে দেখি গঠনমূলক সংস্কারকার্য্য। এই দিক্‌পরিবর্ত্তন যাঁহার প্রভাব বশতঃ সংঘটিত হইল, যিনি সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া শিক্ষিত জনগণের প্রবলবেগে ধাবিত মনোবৃত্তিকে এক রেখা হইতে অন্য রেখায় পরিচালিত করিয়া দিলেন, তিনি দেবেন্দ্রনাথ।

আজকাল দেশের দিকে তাকাইলে অনেক সময়ে মনে হয়, আমরা বোধ হয় উদ্দাম ছুটি ও প্রবল গতিবেগের কথাই কেবল ভাবি; কোন্ দিকে চলা হইতেছে, সেই কথা তত ভাবি না। কিন্তু যাঁহারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ চাহেন, তাঁহাদের সর্ব্বদাই এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। বিশেষতঃ যে যুগে গতিবেগ যত অধিক প্রবল, সেই যুগে দিঙ্‌নিরূপণের জন্য তত অধিক সতর্কতার প্রয়োজন। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ দায়িত্ব আছে। আমাদের কথা শুনিতে লোকের ভাল লাগুক্ বা না লাগুক্, আমাদের কাজ, দেশের সকল গতিবেগকে কল্যাণের পথটি নিত্য দেখাইয়া দেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, আজ আমি দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের শ্রদ্ধার ভাবটির প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। তাঁহার ধর্ম্মজীবনে শ্রদ্ধার ভাবটি কিরূপ প্রবল ছিল, তাহা আমি বহুবার আপনাদের কাছে নিবেদন করিয়াছি। তাঁহার কর্ম্মজীবনও সেই শ্রদ্ধার ভাবে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার সকল কর্ম্মে ধীরগতি ছিল। তিনি যে কাজটি অবলম্বন করিতেন, অগ্রে ঈশ্বরচরণে বসিয়া তাহার সঙ্কল্পটি অন্তরে ধারণ করিতেন; এবং পরে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার সময় অনুক্ষণ আপনাকে সেই পূর্ণস্বরূপের দৃষ্টির অধীন বলিয়া অনুভব করিতেন। এই কারণে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের প্রত্যেকটি অঙ্গ যাহাতে নিখুঁত হয়, সুন্দর হয়, যাহাতে সেই পূর্ণস্বরূপের সম্মুখে উপস্থিত করিবার যোগ্য হয়, সেই জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল থাকিত। আমার মনে হয়, তিনি তাঁহার রচনার মধ্যে প্রত্যেকটি বাক্য ও প্রত্যেকটি শব্দ সন্নিবিষ্ট করিবার সময়ে সেই পূর্ণস্বরূপের সম্মুখে তাহা ধরিতেন। এমন কি, প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ ও ভাবব্যঞ্জনা ও ধ্বনি পর্য্যন্ত সেই পূর্ণস্বরূপ পরমসুন্দরের মনোমত করিয়া লইবার জন্য তিনি যত্ন করিতেন। তাই তাঁহার রচনা আমাদের হৃদয় মন ও শ্রবণ সকলকেই যুগপৎ তৃপ্ত করে।

উত্তর বংশীয়দিগের নিকটে মহর্ষির সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান দান বোধ হয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থখানি। এ গ্রন্থখানি কিরূপে ও কত সময়ে রচিত হইয়াছে? দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন ১৮৩৭ সালে। এগারো বৎসর কাল সেই উপনিষদ্‌-মন্ত্রসকল অন্তরে ধারণ আলোড়ন ও আস্বাদন করিয়া, ১৮৪৮ সালে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মন্ত্রসকল নিজ অন্তর হইতে নিঃসৃত করেন। তৎপরে আবার এগারো বৎসরে পরে তিনি সমগ্র গ্রন্থ (টীকা বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য সহিত) প্রকাশ করেন। এই শেষোক্ত এগারো বৎসরে তিনি দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়ন করেন, এবং বন্ধুগণের সহায়তায় টীকা তাৎপর্য্য ও বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করেন। তাৎপর্য্য প্রভৃতির যে যে অংশ তাঁহার স্বরচিত নহে, তাহারও প্রত্যেকটি বাক্য তিনি ঐরূপ ঈশ্বরের আলোকে বসিয়া বার বার আলোচনা করিয়া অবশেষে গ্রহণ সংশোধন অথবা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কার্য্য এইরূপ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাযুক্ত শ্রমের ফল।

"ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা" গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিবার জন্য তিনি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে অর্থসাহায্য করিতেন। কিন্তু তিনি কি শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ করিবার জন্য রাজনারায়ণ বাবুকে ত্বরা দিতেন? তাহা না করিয়া ঠিক তাহার বিপরীত কথাই বলিতেন। রাজনারায়ণ বাবুকে এই বিষয়ে পত্র লিখিতে গিয়া তিনি এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন, কোনও শ্রেষ্ঠ কার্য্যই তাড়াতাড়ি করিতে গেলে ভাল হয় না; তুমি যথেষ্ট সময় লইবে, এবং ধীরে ধীরে ও ভাল করিয়া কাজটি সম্পন্ন করিবে। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রত্যেকটি প্রবন্ধের ভাব ভাষা ও মুদ্রণ প্রভৃতি সাবধানে দেখিয়া দিতেন। সেই পূর্ণ-স্বরূপের বার্ত্তাবহ বলিয়া এই পত্রিকার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয়ের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি ছিল। দেবেন্দ্রনাথ আপনার এই শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিশ্রমের প্রচুর ফললাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অনেকগুলি ব্রাহ্মসমাজের জন্মদাতা হইয়াছিলেন; এক দেবেন্দ্রনাথের বাণীকে যেন শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দেশমধ্যে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছিলেন; ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নানা দূর দূর স্থানে অবস্থিত ব্যাকুল মানুষ-গুলিকে একসূত্রে বন্ধন করিয়াছিলেন; এবং যাঁহারা নিরাকারের উপাসনা করিতে জানিতেন না, তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিবার একটি পদ্ধতি ধরাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা মহাপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাযুক্ত পরিশ্রমের ফল।

তেমনি, সেই যুগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অনুরাগী পাঠক ছিলেন কাহারা? তাঁহারাও সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত মানুষ। তাঁহারা এই পত্রিকাখানির জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। প্রাপ্তিমাত্র তাঁহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না। তাঁহাদের আত্মা

পত্রিকায় প্রকাশিত সত্য সকলকে ধীরে ধীরে আলোচনা করিতে, আত্মস্থ করিতে, পরিপাক করিতে, আত্মার রসরক্তে পরিণত করিয়া লইতে, উন্মুখ ও প্রস্তুত থাকিত।

আজকালকার যুগে অজস্র পুস্তক মাসিক পত্রিকা ও সংবাদ-পত্র চারিদিকে প্রকাশিত হইতেছে। লেখক, প্রকাশক, পাঠক, —কাহারও অন্তরে শ্রদ্ধার ভাব উদিত হয় না। বিধাতার যে নিয়মে এক প্রাণ হইতে অন্য প্রাণে দেবভাবসকল সংক্রান্ত হয়, সে নিয়মের খেলা তাহাতে নাই। এই আদর্শ-বিহীন শ্রদ্ধাস্পর্শ-বিহীন অজস্র পুস্তক পত্রিকা প্রকাশে জনসমাজের কল্যাণ হয় বলিয়া মনে হয় না।

যাঁহাদের উপরে লেখার মধ্য দিয়া মানবাত্মার সেবা করিবার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহারাও কি বর্ত্তমান যুগে ঐ শ্রদ্ধাযুক্ত কর্ম্মের আদর্শটি মনে রাখেন? তাঁহারা কি দেবেন্দ্র-নাথের ন্যায়, অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনার সহিত প্রত্যেকটি বাক্য ও প্রত্যেক শব্দকে নিঃসৃত করেন?

আমরা আজকাল ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকাগুলি যে ভাবে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া থাকি, তাহার কথা ভাবিলে অন্তরে গভীর ক্ষোভের উদয় হয়। তাহার পশ্চাতে শ্রদ্ধাযুক্ত চিন্তা ও পরিশ্রমের চিহ্ন কত অল্প! তাহাতে কত ভুল চুক, কত অসংলগ্ন অপাঠ্য অংশ, কত দিক দিয়া কত অপূর্ণতা! আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে, দ্রুত বহু কাজ করা আমাদের আদর্শ নয়; কিন্তু শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, ধীরভাবে, ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে অল্প কাজ করাই শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি।

তৃতীয়তঃ, মহর্ষির ধর্ম্মজীবনের বিশেষ শিক্ষাটির কথা আজ আমরা একবার চিন্তা করি। মাঘোৎসবের প্রস্তুতির জন্য আমরা কয়েকজন যখন কয়েকদিন ধরিয়া সায়ংকালে এই মন্দিরে সমবেত হইতাম, তখন আমরা অনুভব করিতেছিলাম যে নীরবে ব্রহ্মসহবাসে কালযাপনের অভ্যাসটি আমরা সাধন করিতেছি না, অথবা ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিতেছি; এবং সেই জন্য আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম অনেক পরিমাণে শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। আজকাল মানুষের জীবন ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। অল্প সময়ে অধিক কাজ সমাপন করিবার নানা উপায় সভ্য জগতে প্রতিদিন উদ্ভাবন করা হইতেছে। বহির্জগতে দ্রুত ভ্রমণের নানা আয়োজন হওয়াতে দেশে দেশে যাতায়াতের কত সুবিধা হইয়াছে। এক দেশের পণ্য, এক দেশের জ্ঞান ও চিন্তা, অপর দেশে কত সহজে ব্যাপ্ত হইতেছে। বহির্জগতে যেমন দ্রুত ভ্রমণশক্তি হইতে অনেক সুবিধা উৎপন্ন হয়, অন্তর্জগতেও কিয়ৎপরিমাণে তাহা হয়, ইহা আমি প্রথমেই স্বীকার করিয়া লই। দেশে দেশে যুগে যুগে আবির্ভূত সমুদয় বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস, জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম, এবং নানা ধর্ম্ম বিধান,—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদা ভাবের সত্যের ও আদর্শের বিনিময় হউক, ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন। এই কারণে, অপর যে-কোনও ধর্ম্মাবলম্বী মানুষ অপেক্ষা, ব্রাহ্মকে জ্ঞানরাজ্য হইতে, ভাবরাজ্য হইতে, সাধনরাজ্য হইতে, অনেক অধিক সঞ্চয় ও সংগ্রহ করিতে হয়; জগতের উন্নতির প্রচেষ্টা-সকলের সঙ্গে অধিক পরিমাণে যোগ রক্ষা করিতে হয়। দ্রুত ভ্রমণ ও দ্রুত আয়ত্তীকরণ,—ইহাই যদি এ যুগের লক্ষণ হয়, তবে ধর্ম্মজগতে ব্রাহ্ম যেন তাহার প্রতিনিধি।

কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে দ্রুত ভ্রমণ ও দ্রুত আয়ত্তীকরণই সব নয়। ধর্ম্মরাজ্যে কত তত্ত্ব জানিলাম, কত কাজ করিলাম, তাহাই সকলের চেয়ে বড় কথা নয়। একটি তুলনা ব্যবহার করিয়া বলা যায়, ধর্ম্মতরীতে আরোহণ করিয়া কত শীঘ্র শীঘ্র কয়টি ঘাট পার হইয়া আসিলাম, তাহা তত বড় কথা নয়; কয়টি ঘাটে নামিয়া অবগাহন করিলাম, ডুব দিলাম, তাহা অপেক্ষাকৃত বড় কথা।

অবগাহনকারী মানুষটি জলের মধ্যে নিজ দেহকে নিষ্ক্রিয় (passive) অবস্থায় অনেকক্ষণ রাখে। জলকে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেহের তাপ প্রশমিত করিতে অধিকার দেয়; রোমকূপে, স্নায়ুমণ্ডলীতে, ও দেহের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরমাণ রক্তধারায়, জলের স্পর্শকে সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতে দেয়; তবে তাহার স্নান সার্থক হয়। অধ্যাত্ম জীবনের গভীরতম ব্যাপারসকলও ইহার অনুরূপ। হে মানব, তুমি যদি ভাবিয়া থাক যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে মননই তোমার একমাত্র কর্ত্তব্য, অর্থাৎ যদি ভাবিয়া থাক যে কেবল তত্ত্বচিন্তা, স্বরূপচিন্তা, ধ্যান-ধারণা, অধ্যয়ন, আরাধনা, বন্দনা, প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া (activity) দ্বারাই তুমি ব্রহ্ম-উপাসনা করিবে ও ব্রহ্মসাহচর্য্য লাভ করিবে, তবে তুমি ধর্ম্মের বড় কথাটাই ভুলিয়া গেলে। ব্রহ্মের স্পর্শসুধা আত্মার অঙ্গে ভাল করিয়া লাগাইতে হইলে, আপনাকে নিষ্ক্রিয় ও পিপাসু (passive, receptive) অবস্থায় অনেকক্ষণ তাঁহার কাছে ফেলিয়া রাখিতে হয়। যে-নীরবতার মধ্য দিয়া জীবনের গভীরতম অনুভূতিসকল চেতনায় ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়, যে আপাত-নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়া আত্মার অণু পরমাণুতে গভীরতম ক্রিয়াসকল সংঘটিত হয়,—তাহাকে এ যুগে আমরা সচরাচর অবহেলা করিয়া চলি। আমাদের ধর্ম্মজীবন যে শুষ্ক থাকে, উপাসনা করিয়াও আমরা যে স্নিগ্ধ হই না, শীতল হই না, তাহার কারণ অনেক পরিমাণে ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

ঈশ্বরের স্বরূপ, বিধান, কীর্ত্তি, লীলা, আদেশ,—ধর্ম্মসাধকের নিকটে আপাততঃ কেবল এ সকলই সাধনের বিষয় বলিয়া, অধিগত করিবার বিষয় বলিয়া, প্রতিভাত হইতে পারে। এ সকলকে আমরা চিন্তার দ্বারা ধারণ করি, অথবা মননের দ্বারা অনুভব করি, অথবা ইচ্ছার দ্বারা পালন করি। কিন্তু তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার বিধান, তাঁহার কীর্ত্তি ও লীলা, তাঁহার আদেশ,—এ সকল অপেক্ষাও গভীরতর বিষয়,—তাঁহার সঙ্গ, তাঁহার personalityর স্পর্শ। এক আত্মার সঙ্গে আর এক আত্মার সংস্পর্শ বোধ হয় নীরবতার মধ্য দিয়াই অধিক হয়; ইহা বোধ হয়, হৃদয়ের নিষ্ক্রিয় (passive) আত্মদানের মধ্য দিয়াই অধিক হয়; ইহা বোধ হয়, নীরবে কাছে কাছে বসিয়া থাকার মধ্য দিয়াই অধিক হয়। "তুমি আমার কাছে আছ" শুধু এই অনুভূতিটুকুর মধ্যে বহুক্ষণ ডুবিয়া থাকিয়াই অধিক হয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মার সংস্পর্শ বিষয়েও এই কথা।*

সেই পরম পুরুষ আমাদের জন্য কি কি করেন? তিনি যত কিছু করেন, নিজ সঙ্গদান তার মধ্যে প্রধান। কিন্তু মানুষ তাঁর দেওয়া সেই সঙ্গ প্রার্থনা করে কই? গ্রহণ করে কই? তাহাকে আদর করে কই?

মানুষ যখন ক্রিয়াশীল, যখন সে চিন্তা করে, মীমাংসা করে, কার্য্য করে, তখন সে সেই পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বরের সহকর্ম্মী। তখন সে সেই পরমপ্রভুর পরিচালনা লাভ করিবার ও তাঁহার আদেশবাণী শ্রবণ করিবার অধিকারী হয়। কিন্তু তিনি মানুষকে ইহার অতিরিক্ত আরও কিছু লাভ করিবার অধিকারী করিয়াছেন। মানুষকে তিনি নিজ প্রগাঢ় সঙ্গ, নিজ মধুময় নীরব সান্নিধ্য আস্বাদন করিবার অধিকারও দান করিয়াছেন। সে অধিকার কি আমরা বুঝি ও গ্রহণ করি?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব ছিল এই নীরব ব্রহ্মসঙ্গ-আস্বাদনে। তিনি সকল সময়ে, বিশেষতঃ ঊষায় ও সন্ধ্যায়, নীরবে ব্রহ্মসহবাসে নিমজ্জিত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। তিনি 'ঈশাবাস্যম্' মন্ত্র সাধন করিয়াছিলেন। চারিদিকে যাহা কিছু আছে, সে সমুদয়কে তিনি ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া দেখিতেন; এবং সেই আচ্ছাদনকারী বেষ্টনকারী ব্রহ্মের মধ্যে তিনি আপনাকে প্রতিদিন বহুক্ষণ নিমগ্ন রাখিতেন। সূর্য্যোদয়ের অনেকক্ষণ পূর্ব্বে উঠিয়া মহর্ষিদেব পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া বসিতেন। কখনও বাড়ীতে, কখনও বাগানে, কখনও গিরি শৃঙ্গে, কখনও নৌকাতে, প্রভাতে এই ভাবে তিনি বসিতেন। ধীরে ধীরে আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে রাত্রির অন্ধকার অপসারিত হইত; ধীরে ধীরে পূর্ব্বাকাশে একটু আলোক আভা দেখা দিত। মহর্ষির মুদিত নয়নে সে আলোর আভা পড়িবার পূর্ব্বেই, পূর্ব্ব দিগন্তসীমার তরুরাজিতে পাখীদের চোখের পর্দ্দায় সে আলো পড়িত; তাহারা জাগিয়া কলরব করিতে আরম্ভ করিত। পূর্ব্ব দিগন্তসীমা হইতে পাখীদের সেই অস্ফুট কলধ্বনি আসিয়া অগ্রে মহর্ষির কর্ণে পৌঁছিত, পরে সূর্য্যকিরণ আসিয়া তাঁহার চক্ষুকে স্পর্শ করিত। তিনি এই অবস্থায় দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতেন। কখনও চক্ষু মুদিয়া, কখনও বা চক্ষু মেলিয়া বসিয়া থাকিতেন। কখনও একবারে নীরব থাকিতেন, কখনও বা দু একটি মৃদু বাক্য তাঁহার মুখ হইতে স্খলিত হইত। এই ভাবে প্রতি প্রভাতে দীর্ঘ সময় ব্রহ্মসঙ্গের মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত রাখিতে তিনি ভালবাসিতেন।

মহর্ষিদেব চন্দ্র দেখিতে ভালবাসিতেন। কত পূর্ণিমা রাত্রি মহর্ষির কেবল চাঁদের দিকে তাকাইয়াই কাটিয়া গিয়াছে। একবার সেই ছবিটি মনে মনে অঙ্কিত করি। ঊর্দ্ধে আকাশে জ্যোৎস্নাময় পূর্ণচন্দ্র; নিম্নে ভক্তের প্রেমোজ্জ্বল মুখচন্দ্র। তাঁহার বাহিরের চক্ষু আকাশের চন্দ্রে লগ্ন; তাঁহার অন্তরের চক্ষু হৃদয়ের প্রেমচন্দ্রে লগ্ন। এই অবস্থাতেই সমস্ত রজনী অতিবাহিত হইয়া গেল। বল দেখি ভাই বোন্, মহর্ষি তখন কি করিতেন? তিনি কি সেই কয়েক ঘণ্টা ক্রমাগত উপাসনায় যাপন করিতেন? অথবা, তিনি কি সেই সময়ের মধ্যে একের পর এক নূতন নূতন নানা তত্ত্ব লাভ করিতে থাকিতেন? আমরা কি এরূপ ভাবিব যে, এক এক ঘণ্টায় এক একটি সুন্দর ও উজ্জ্বল সত্য অন্তরে লাভ করিয়া পাঁচ ঘণ্টায় সেরূপ পাঁচটি সত্য লাভ করিবেন বলিয়া মহর্ষি সারা রাত্রি সে স্থানে বসিয়া থাকিতেন? তাহা নয়। ক্রমাগত অর্চ্চনা বন্দনা করিয়া নয়, ক্রমাগত নব নব উজ্জ্বল তত্ত্ব বা ভাব লাভ করিয়া নয়; কিন্তু ক্রমাগত বহুক্ষণ নীরবে প্রিয় প্রাণেশ্বরের সঙ্গরসে আত্মাকে নিমজ্জিত রাখিয়া, মহর্ষি সেই রাত্রিকে সার্থক করিতেন। রসনাকে স্তব্ধ করিয়া, মননশক্তিকেও স্তব্ধ করিয়া, আত্মার সর্ব্বাঙ্গকে ব্রহ্মস্নানে স্নিগ্ধ করিয়া, আত্মার রোমে রোমে ব্রহ্ম-প্রেমরস শোষণ করিয়া, তিনি সেই রাত্রিকে সার্থক করিতেন।

হায় হায়, আমরা কি আমাদের তুচ্ছ মননশক্তিকেই এত বড় বিবেচনা করি যে তাহার পথ দিয়া না গেলে আর ব্রহ্মকে স্পর্শ করিবার আমাদের কোনও উপায় নাই বলিয়া, এবং ব্রহ্মেরও আমাদিগকে স্পর্শ করিবার অন্য কোন পথ নাই বলিয়া মনে করি? ইহা অতি গুরুতর ভ্রান্তি, ইহা অতি মারাত্মক অন্ধতা! বরং বলিতে পারা যায়, প্রেমরাজ্যের সকলের চেয়ে বড় প্রণালী হইল, নীরবে কাছে কাছে বসিয়া থাকা। প্রেমরাজ্যের সকলের চেয়ে বড় ব্যাপার,—সঙ্গসুধাদান ও সঙ্গসুধাপান।

'ঈশাবাস্যম্' মন্ত্রের সাধক দেবেন্দ্রনাথ শুধু যে আকাশের চন্দ্র তারায় অথবা পৃথিবীর গিরি-সাগর প্রভৃতি বিশাল পদার্থেই ব্রহ্মসঙ্গ আস্বাদন করিতেন, তাহা নহে। প্রতিদিন যে ফলগুলি তাঁহার ভোজনের জন্য বাজার হইতে আনীত হইত, সে সকলকেও তিনি ব্রহ্মসঙ্গ আস্বাদনের উপায় করিয়া লইয়াছিলেন। কমলালেবু, কলা, নাশপাতি আপেল প্রভৃতি ঝুড়িতে করিয়া তাঁহার সম্মুখে কিছুক্ষণ রাখা হইত। তিনি একটি একটি করিয়া তুলিয়া তুলিয়া দেখিতেন; তাহাদের আঘ্রাণ লইতেন, স্পর্শ করিতেন। তাহাদের সুন্দর আকৃতিতে, বর্ণে, গন্ধে, স্পর্শে, ব্রহ্মের সৌন্দর্য্য, ব্রহ্মের প্রেম-সৌরভ আস্বাদন করিয়া, তার পর সেগুলিকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিতেন। প্রেম-অনুভূতির জন্য যাঁর মন উৎসুক, তিনি ডুবিবার কত পথ দেখিতে পান!

আমরা এ মাঘোৎসবে মহর্ষির জীবনের শিক্ষাসকল শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরে গ্রহণ করি। ধর্ম্মের এক কাজ হইতে আর এক কাজে ছুটাছুটি করিয়া, এমন কি উপাসনা হইতে উপাসনায়, কীর্ত্তন হইতে কীর্ত্তনে ছুটাছুটি করিয়াও আমরা কত বঞ্চিত থাকি! আমরা যেন নীরবে শান্তভাবে ব্রহ্মসহবাসে নিমগ্ন হইতে শিক্ষা করি। আমাদের কার্য্য-সকল কত ত্রুটিতে, কত অসম্পূর্ণতায় দূষিত! আমরা ধীরভাবে ও পূর্ণস্বরূপের প্রসন্ন দৃষ্টির যোগ্য করিয়া আমাদের কাজগুলি করিতে শিক্ষা করি। আমরা প্রবল উত্তেজনা ও প্রখর গতিবেগ অপেক্ষা পরব্রহ্মের নির্দ্দিষ্ট পথে চলাকেই অধিক মূল্য দিতে শিক্ষা করি।

সায়ংকালে স্মৃতি-সভা। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় সভাপতির কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস বক্তৃতা করেন। মহর্ষির জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়।

ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্ম মন্দিরেও মহর্ষির স্মৃতিসভা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পরলোকগতা চপলা ঘোষের ডায়েরী হইতে মহর্ষি-সন্দর্শনের একটি বর্ণনা পাঠ করেন ; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"১৯শে জানুয়ারী ১৮৯৪, ৭ই মাঘ। কলিকাতা সাধনাশ্রম। হিন্দুসমাজের আত্মীয়গণকে ছাড়িয়া কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আসিবার একদিন পরেই অদ্য আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখিতে যাইবার অধিকার পাইলাম। তথায় গিয়া একজন তাঁহাকে প্রণাম করিবার পরেই আমি প্রণাম করিলাম। আমি প্রণাম করিয়া উঠিবার পর মহর্ষি আমাকে বলিলেন, 'প্রতিদিন প্রাতঃকালে আগে এই কথা বলিয়া প্রণাম করিও,—ওঁ ব্রহ্ম। ব্রহ্মণে নমঃ। তাহার পর উপাসনাদি করিও।' আমি বলিলাম 'আমার যখন হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস চলিয়া গেল, তখন আমি অনেকদিন কেবল কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলাম। সেই সময়ে একদিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আপনার একটি বক্তৃতা পড়িলাম। তাহার পর হইতে প্রাণের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য আমার বিশ্বাস-চক্ষু অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমশঃ বিশ্বাসের দ্বারা আমি আবার আমার ঈশ্বরকে আমার প্রাণের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইলাম।' মহর্ষি বলিলেন, 'তোমার মঙ্গল হউক। তুমি আমার কি বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলে?' আমি বলিলাম, "আপনার বক্তৃতাতে ছিল,—রে নির্ব্বোধ মানুষ, তুমি জান না যে তোমার প্রাণের মধ্যে তোমার ঈশ্বর আছেন ! তুমি কোথা তাঁর অন্বেষণ করিতে যাও ?' মহর্ষি এই কথা শুনিয়া যেন বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, 'দেখ তো, তুমি আসিবামাত্র আমি তোমাকে বীজমন্ত্র দিয়াছি। ওঃ কি আশ্চর্য্য !' আমি বলিলাম, 'আমি অতি অজ্ঞান ; আমাকে দয়া করিয়া ধর্ম্মের পথ কিছু বুঝাইয়া দিন।' তিনি বলিলেন, 'কি বলিব ? একেবারে তো সব কথা বুঝান যায় না। ক্রমে ক্রমে আপনি বুঝিবে,'—এই বলিয়া তিনি তিনটি দৃষ্টান্ত দিলেন।

বলিলেন, 'চাষা যেমন কৃষিকার্য্য করে, কিন্তু তাহার বৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকে না,—সেই প্রকার তোমার যাহা করিবার তুমি কর ; তাঁহার করুণাবারি বর্ষিত হইবেই হইবে।'

আর বলিলেন, 'পিপড়া যেমন চিনির গন্ধ পাইয়া ক্রমে ক্রমে চলিতে থাকে, অনেক পরিশ্রমের পর তবে চিনি লাভ হয়, তোমাদেরও তাহাই হইবে। ব্যাকুল প্রাণে ডাকিতে থাক, তাঁহার অমৃতবারি নিশ্চয়ই আসিবে, হৃদয়ক্ষেত্রে ফললাভ হইবে

আবার বলিলেন, 'মাতার ক্রোড়ে যখন সন্তান জন্মে, তখন তাহার ক্ষুধা পাইলে সে মাতার দুগ্ধ খায় বটে, কিন্তু তখনও মাকে চেনে না। এই প্রকারে দুগ্ধ খাইতে খাইতে একদিন মাকে চিনে ফেলে ; অমনি সে হাসে, এবং মাও অমনি হাসিয়া ফেলেন। তেমনি, তোমরাও একদিন তাঁহাকে চিনিবে। অমনি তোমরাও হাসিবে, তিনিও হাসিবেন। সব আনন্দময় হইয়া যাইবে।' শেষে বলিলেন, 'কিছুই বুঝাইতে হইবে না। প্রাণ ব্যাকুল হইলে তিনি আপনি সব বুঝাইয়া দিবেন। তোমার প্রাণ ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, তাই না তুমি আমার কাছে আসিয়াছ ? তোমার মঙ্গল হইবে। তিনিই তোমাকে সব বুঝাইয়া দিবেন।"

**৭ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) বুধবার—**

প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

"He prayeth best, who loveth best
All things, both great and small."

Coleridge.

—সেই উৎকৃষ্ট প্রার্থনা করে, যে ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলকে নিরতিশয় ভালবাসে।

"If a man says, I love God, and hateth his brother, he is a liar : for he that loveth not his brother whom he hath seen cannot love God whom he hath not seen.

John the Evangelist.

যদি কেহ বলে, আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি, অথচ যদি সে তার ভ্রাতাকে ঘৃণা করে, তাহা হইলে সে মিথ্যাবাদী ; কারণ, যে ভ্রাতাকে সে দেখিয়াছে তাহাকে যে ভালবাসে না, যে-ঈশ্বরকে সে দেখে নাই তাঁহাকে সে ভালবাসিতে পারে না।

ভগবৎ-পূজা ও ভগবৎ-প্রেম যদি জীব-প্রেমে—মানব-প্রেমে—স্ফুরিত না হয়, তা হ'লে বুঝতে হবে ভগবানের পূজা এবং তাঁহাতে প্রেম হয় নাই। জীব-প্রেম ভগবৎ-প্রেমের—ধর্ম্মের

"ধর্ম্মং চর। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি।
ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

—ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকলের পক্ষে মধু স্বরূপ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে মহর্ষি এই উপনিষদ্-উক্তি উদ্ধার ক'রে তার ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কর্ত্তব্যসাধনের নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই সংজ্ঞা অতি ব্যাপক। মানুষ ধর্ম্মলাভের জন্য যতপ্রকার সাধন উদ্ভাবন ও অবলম্বন করেছে, তার সমস্তই এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। মহর্ষি কতকগুলি কর্ত্তব্যের উল্লেখ করেছেন, যথা, আপনার প্রতি কর্ত্তব্য, পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, স্ত্রীপুত্র, প্রতিবাসী ও বন্ধুবর্গ এবং প্রভু ও দীনদরিদ্র প্রভৃতির প্রতি কর্ত্তব্য, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য। তিনি আরো লিখেছেন, যে দেশে, যে কালে, যে অবস্থাতে, যে কর্ম্ম করা আমাদের কর্ত্তব্য, ঠিক সেই দেশে, সেই কালে, সেই অবস্থাতে সেই কর্ম্ম করবার আদেশ আমাদের প্রত্যেকের শুভবুদ্ধিতে ঈশ্বর অনুক্ষণ প্রেরণ করছেন ; আমরা তাঁর সেই সকল আদেশের নিতান্ত বশবর্ত্তী হ'য়ে সত্যপথে, ধর্ম্মপথে, কল্যাণপথে পদবিক্ষেপ ক'রে চললে ছিন্নশিরা হ'লেও তাঁর অমৃতনিকেতনে জীবন ল'য়ে উপনীত হ'তে পারি।

মহর্ষির এই ব্যাখ্যায় কর্ত্তব্যের একটা চূড়ান্ত (exhaustive) তালিকা দেওয়া হয় নাই, ইহা দেওয়া সম্ভবপরও নয়। কতিপয় প্রধান প্রধান কর্ত্তব্যের উল্লেখ দ্বারা তিনি সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যের কথাই ইঙ্গিত করেছেন। জীবনের যত সম্বন্ধ—আর আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত কার সহিতই না সম্বন্ধ আছে—এই সমুদয় সম্বন্ধকে স্বীকার এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কর্ত্তব্যের যথোচিত সাধন—এই হ'লো ধর্ম্ম। এই যে সমুদয় সম্বন্ধ, ইহার ভিত্তি, ইহার প্রতিষ্ঠাভূমি, ইহার বন্ধনসূত্র কি? সেইটী কি বস্তু যাহার দ্বারা এক প্রাণ অন্য প্রাণের সহিত ভগবৎ-প্রেরণায় এইরূপ অবশ্যপ্রতিপাল্য কর্ত্তব্য ও তাহার সাধনের সম্বন্ধে সংযুক্ত ও গ্রথিত হয়? সে কি বস্তু যাহার প্রভাবে এই কর্ত্তব্যময় জীবনে কর্ত্তব্যসাধনে ব্রতী হ'য়ে মানুষ আত্মসমর্পন ও আত্মবিলোপ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, বরং ইহাকেই জীবনের পরম পুরুষার্থ ও পূর্ণ সার্থকতা মনে করে? আমরা সকলেই জানি প্রেমই সেই বন্ধনসূত্র, প্রেমই সেই পরম বস্তু। এই যে ব্রহ্মাণ্ড, ইহা একটা প্রেমের পণ্যবীথিকা—প্রেমের একটা বিরাট মেলা। ইহার মধ্যে যত সম্বন্ধ, যত আদান প্রদান, প্রাণে প্রাণে যত বিনিময়, যত ধ্বনি প্রতিধ্বনি, ইহার সমস্তই প্রেমসূত্রবাহী।

ব্রহ্ম সঙ্গীতে আছে—

"গ্রহ ডাকিয়া গ্রহে মিলন মাগে,
অণু অণুরে ডাকে চির অনুরাগে,
হৃদয় হৃদয়ে ডাকে প্রেম-সোহাগে,
অখিল নিখিল ভরা এ কি আহ্বান-রব?
ওহে জগত-কারণ, এ কি নিয়ম তব?
এ কি মহোৎসব, এ কি মিলন নব?"

"জগতের পুরোহিত তুমি, তোমার এ জগত-মাঝারে,
এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।
ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি, গলাগলি অরুণে উষায়,
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে, তারাটি তারার পানে চায়।"

এই যে প্রেমের হাট বসেছে, এই প্রেমের হাটে আমাদের চিরবসতি। আমরা সব প্রেমের বণিক, প্রেমের জহুরি, প্রেমের পশারি। প্রেমই আমাদের পণ্য। এই প্রেম ব্রহ্মেরই স্বরূপ। ব্রহ্ম প্রেমময়, প্রেমরূপে তাঁহাকে সর্ব্বত্র সর্ব্ব সম্বন্ধে দর্শন, ব্যষ্টি-ও-সমষ্টিরূপী প্রেমময়ের নিকট আত্মসমর্পণ, প্রেমপণ্যের বিনিময়, প্রেমের আহরণ, ধারণ ও বিতরণ,—এক কথায় প্রেমের সাধন ও অনুশীলন—এই হ'লো ধর্ম্ম, উচ্চাঙ্গ ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট লক্ষণ, সর্ব্ব ধর্ম্মের সার নিষ্কর্ষ। ইহাই "সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।" ইহাতেই মানবজীবনের চিরসরসতা ও চিরনবীনতা, মানবাত্মার চির-অভ্যুদয়, চিরবসন্ত, চিরযৌবন।

এমন সময় ছিল যখন ধর্ম্ম অতি সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইত। বিধিনিষেধের পালন, শাস্ত্রানুযায়ী নিয়ম অবলম্বন, জপ-তপ-হোম ব্রত-উপবাস, কল্পিত দেবদেবীর অর্চ্চনা, অবতার পূজা, শাস্ত্রের অভ্রান্ততা স্বীকার প্রভৃতিকে প্রধানতঃ ধর্ম্ম বলা হইত। ইহাতে কত সঙ্কীর্ণতা ছিল, প্রেমের প্রসার কত ক্ষুন্ন হইত! ইহাতে নরনারীর অধিকারভেদ ও অস্পৃশ্যতা ছিল; ইহাতে ম্লেচ্ছ ছিল, কাফের ছিল, হিদেন ছিল; ধর্ম্মে ধর্ম্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিরোধ, রেষারেষি, মারামারি, কাটাকাটি, ধর্ম্মের নামে, অধর্ম্মের, অপ্রেমের অবাধ প্রশ্রয় ছিল। এই কথা বলাতে অবশ্য এইরূপ ভাববার কোন কারণ নাই যে প্রাচীন ধর্ম্মগুলিতে বুঝি প্রেমের কথা বাদ পড়েছে; পরন্তু ইহা ঠিক যে প্রেমের অনেক অমূল্য অনুশাসন ও তত্ত্বের কথা সর্ব্ব ধর্ম্মেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু অনাবিল মুক্ত প্রেমকে ধর্ম্মের মূলসূত্র ও সর্ব্বোচ্চ সাধন ব'লে কোথাও গ্রহণ করা হয় নাই। সেই জন্য কোন প্রাচীন ধর্ম্মই সর্ব্বজনীনতার বহুল দাবী দাওয়া সত্ত্বেও উক্ত পদবীতে অধিরোহণের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে, সমুদয় প্রাচীন যুগধর্ম্মের মিলনক্ষেত্ররূপ এই ত্রিবেণীসঙ্গমে প্রেমের গঙ্গোত্রী হ'তে উৎসারিত যুগধর্ম্মরূপী ব্রাহ্মধর্ম্ম সূতিকাগৃহ হ'তেই বিশ্বজনীন ধর্ম্মরূপে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে।

"অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মহাবাক্যের ঘোষণা জগতে যুগান্তর উপস্থিত ও মানবের অশেষ কল্যাণসাধন করেছিল। কিন্তু ধর্ম্মাবহ প্রেমস্বরূপের সহিত সাক্ষাৎ যোগের ও তাহার অনুশীলনের অভাবে অভাবাত্মক অহিংসাধর্ম্ম ভাবাত্মক প্রেমধর্ম্মরূপে বিকশিত হওয়ার অনুকূল ভূমি প্রাপ্ত হলো না, সংসারবিমুখ হ'য়ে চৈত্য ও বিহারে আবদ্ধ হ'য়ে শূন্যবাদের দিকে প্রস্থিত হ'লো। প্রেমসাধনের আরেকটী মহাবাক্য উচ্চারিত হয়েছিল, Fatherhood of God and brotherhood of man (ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব)। কিন্তু এই উক্তির মধ্যে মানবকে যে ঈশ্বরের পুত্র ব'লে স্বীকার করা হয়েছে এই পুত্রত্ব কার্য্যতঃ একজনের অনন্যসাধারণ অধিকারিত্বে আবদ্ধ হওয়াতে ইহাও পঙ্গু হ'য়ে গেল। "জীবে দয়া, নামে রুচি" এই অপর মহাবাক্যের 'দয়া'তে 'প্রেমে'র পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হ'লো না,—প্রেম দয়ার গ্রামে আবদ্ধ থাকার সীমা স্বীকার করে না। অপর এক ধর্ম্মের প্রেমসাধন কেবল মাত্র বিশ্বাসী দলে, সমধর্ম্মীদের মধ্যে অবরুদ্ধ হ'য়ে খর্ব্বতাপ্রাপ্ত হলো। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেমসাধন কোনরূপ গণ্ডী মানে না; ইহার কেন্দ্র সর্ব্বত্র, পরিধি কোথাও নাই। প্রেমই ইহার মৌলিক বৈশিষ্ট্য। "প্রীতিঃ পরমসাধনম্," "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ"—এই ইহার মূলসূত্র।

প্রেমের ধর্ম্মই এই, সে স্বতঃই স্ফুরণ চায়। আর ইহার স্ফুরণ ও বিনিময়ে যে আনন্দ সে আনন্দের তুলনা নাই। মানবই হউক আর ইতর প্রাণীই হউক সকলেই এই আনন্দের জন্য লোলুপ, ইহাকে উপভোগ করার জন্য একান্ত প্রয়াসী।

একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য পল্লীতে পাঁচ সাত ঘর মাত্র মানুষের বাস। এর প্রত্যেক ঘরের গৃহস্থ দৈনিক ভোজনের পূর্ব্বে একখানি কলাপাতে আহার্য্য দ্রব্যাদি বেঁধে পথের ধারে বাইরের চালের ছাইচে টাঙ্গিয়ে রাখে, যাতে অভুক্ত পান্থ সেটা পেড়ে খেতে পারে, তাকে যেন কারো নিকট যাচ্ঞা করতে না হয়। কি প্রেম! সভ্যতাভিমানী গৃহস্থকে তার হীনতা স্বীকার ক'রে লজ্জায় মাথা হেঁট করতে হয়।

ইতর প্রাণীর মধ্যেও প্রেমের এই একই স্বভাব দেখতে

পাওয়া যায়। পশু পক্ষী প্রভৃতিতে যখন আমরা ইহার স্ফুরণ দেখি তখন তাকে instinct,—স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, প্রকৃতির তাড়না, ইত্যাদি বলি; কিন্তু যে নামেই অভিহিত করি না কেন বস্তু একই। এমন দেখা গিয়াছে—একটা জাহাজে আগুন লেগেছে, আরোহিগণ য'র যার প্রাণ নিয়ে পলায়ন করছে, এর মধ্যে একটা ইঁদুর কিন্তু একাকী পলায়ন না ক'রে তার অন্ধ বৃদ্ধ পিতাকে পিঠে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। দেখা গিয়াছে—একটা ঘরে আগুন লেগেছে, ঘরের লোকগুলো আপন আপন প্রাণ বাঁচাবার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে বেরিয়ে পড়ছে, এই সময়ে বাড়ীর কুকুরটা কিন্তু উন্নত মনুষ্য-জীবের ন্যায় আত্মরক্ষার চিন্তায় আকুল না হ'য়ে—ঘরে একটি শিশু ছিল—সে ছুটে যেয়ে ধূমায়িত প্রজ্বলিত হুতাশনকে অগ্রাহ্য ক'রে সেই শিশুটির বিছানার কাঁথার দুদিক গুটিয়ে কামড়ে ধ'রে বেরিয়ে আসছে। স্বচক্ষে দেখেছি ময়ূরভঞ্জের শালবনের প্রান্তদেশে একটা বৃক্ষের কোটরে একটা অন্ধ অশক্ত চিলপক্ষী ব'সে ছিল; দেখা গেল পার্শ্ববর্ত্তী উন্নত জীব মানুষগুলো তার খোঁজ খবর নিচ্ছে না, কিন্তু অপর পাখী—শুধু চিল জাতীয় নয়, অন্য জাতীয় পাখীও—তাহার খোরাক যোগাচ্ছে। দেশ বিদেশের সাহিত্যে ইতর প্রাণীর প্রেমবৃত্তির স্ফুরণের এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। প্রেমের প্রসার সর্ব্বত্র। ইহার স্ফুরণ অবাধ।

এ দেশের দর্শন ব্রহ্মকে "প্রাণস্য প্রাণম্," "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" —প্রাণের প্রাণ, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা—এইরূপে উপলব্ধি ক'রে জীবকে বিভুর অনুপ্রকাশ ব'লে স্বীকার করেছিল, এবং "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত"—আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে —এইরূপ নির্দ্দেশ ক'রে প্রেম-ধর্ম্মের সত্য সূত্রপাত করেছিল। "সর্ব্বত্র" তদীক্ষণম্—সর্ব্বত্র তাঁহাকে দর্শন—এই সত্যে উপনীত হয়ে, "প্রিয়োঽসি মে." "ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি"—জীব, তুমি আমার প্রিয়,তুমি আমার একান্ত বাঞ্ছিত—অন্তরে ভগবানের এই প্রেমবাণী শ্রবণ ক'রে এদেশের মানুষ সঞ্জীবন প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল। হিন্দু যখন তর্পণের সময় সমগ্র বিশ্বের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্বীকার ও পাপী পুণ্যাত্মা এবং শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে ত্রিভুবন-বাসী সকলের তৃপ্তিকামনায় অর্ঘ্য প্রদান করে, তখন তাহার প্রেমের কি বিপুল সম্প্রসারণের, তাহার প্রেমপরিবারের কি বিশাল বিস্তৃতির দৃষ্টান্তই না আমরা দেখতে পাই! এ দেশের ঋষির নীলপতঙ্গ ও লোহিতাক্ষ শুকাদিতে একই আত্মার স্পন্দন দর্শন ক'রে ইহাদের সহিত এক বংশসম্ভূত ব'লে জ্ঞাতিত্ব স্বীকারের কথা যখন স্মরণ হয়, তখন প্রেমশিক্ষার ও প্রেম-সাধনের আয়োজন-উপকরণের ষোলকলা পূর্ণ দেখে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এমন সম্পদসম্ভার থাকা সত্ত্বেও প্রেমসাধন বিশ্বতোমুখ হ'লো না; প্রেম-ধর্ম্মের বিশেষ পরিপন্থী ব্যতিরেকী প্রণালীর "নেতি নেতি" অবলম্বন ক'রে এদেশের ধর্ম্মের একধারা জড়জগৎ ও জীবজগৎকে মায়ার বিজৃম্ভণ ব'লে—মিথ্যা ব'লে—উড়িয়ে দিয়ে, অর্থাৎ সমষ্টি-একত্বকে ছেড়ে ব্যষ্টি-একত্বের, রিক্ত-একত্বের, পরিণামে শুষ্ক-একত্বের কুক্ষিতে যেয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হ'লো। ধর্ম্মের অপর একধারা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন বিরোধী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হ'য়ে পড়ল এবং সম্প্রদায় বিশেষে প্রেমসাধনের অনির্ব্বচনীয় উৎকর্ষ এবং তদ্দ্বারা এক সময়ে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হ'য়ে থাকলেও ইহার জীব-প্রেম বিশ্ব-মানবে বিস্তৃত হ'য়ে বিশ্বজনীন আকার ধারণ করতে পারল না এবং ইহার ভগবৎপ্রেম বা ভক্তিও সাম্প্রদায়িক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হ'য়ে রইল। এই সম্প্রদায়ভুক্ত প্রেমিকগণের প্রেমের অত্যধিক উচ্ছ্বাসে জ্ঞানালোক আচ্ছন্ন হওয়াতে কালক্রমে ইহা নীতির সীমা লঙ্ঘন ক'রে উন্মার্গগামী হ'লো, ইহা কাহারও অবিদিত নহে।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এই সমুদয় সাধনসম্পদের উত্তরাধিকারী হ'য়ে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ে অভিনব আকারে বিশ্বজনীন প্রেমের ধর্ম্মরূপে অবতীর্ণ হয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতি-পাদক শ্লোকে জগতের নিকট এই ঘোষণা করা হয়েছে—

"সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥"

"প্রীতিঃ পরমসাধনম্"।—ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রীতিকেই—ব্রহ্মপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমকেই—পরম সাধন, মূল ও সর্ব্বোচ্চ সাধনরূপে গ্রহণ করেছে, যা অন্য ধর্ম্মে কখনো করা হয় নাই। "তস্মিন্ প্রীতি-স্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ"—প্রেমের অন্তঃসাধন ও বহিঃসাধন—এই হ'লো ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাসনা। এমন কথা কখনো কোন ধর্ম্ম বলে নাই।

যখন ব্রহ্মপ্রেম মানব-অন্তরে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠে, তখন "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু", সর্ব্ব ভূতে আত্মদৃষ্টি খু'লে যায়। যে ব্রহ্মপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিক সে-ই সত্যিকার প্রেমিক, সে-ই স্বজন ও পরিবারবর্গ প্রভৃতিকে সত্যিকার ভালবাসা দিতে পারে। ব্রহ্ম-প্রেম ও বিশ্বপ্রেমের অবর্ত্তমানে আপনার জনের প্রতি যে ভালবাসা, সে ভালবাসা প্রেম নয়, সে ভালবাসা মোহ।

"আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি",—সর্ব্বগত আত্মার অনুরোধেই সকল প্রিয় হয়—এই হ'লো প্রেমসাধনের মূলমন্ত্র। মহাত্মা শাক্যসিংহ যখন প্রিয়তমা পত্নীকে জন্মের মত পরিত্যাগ ক'রে জগতের উদ্ধারের জন্য গৃহ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'য়েছিলেন, তখন মর্ম্মভেদী চিরবিদায়ের মুহূর্ত্তে পত্নীকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন—

"I loved thee most
Because I loved so well all living souls."

—আমি বিশ্বের সকল জীবকে এত ভাল বেসেছি ব'লেই তোমাকে অত্যন্ত ভাল বেসেছি। ব্রহ্মপ্রেমিক ও বিশ্বপ্রেমিকই প্রকৃত পক্ষে প্রেমিক পদবাচ্য।

এই যে প্রেমের আদর্শ—বিশ্বজনীন অনাবিল প্রেমের আদর্শ —ইহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের—পূর্ণাঙ্গ প্রেমধর্ম্মের—আদর্শ।

এই প্রেমধর্ম্মের দর্শন, এই দর্শনের পরিপোষক নব্য বেদান্ত

এবং ইহার বিকাশ ও অনুশীলনের জন্য নব সাধন—এই সমস্তের ইতোমধ্যেই সূত্রপাত হয়েছে।

এখন সমগ্র দেশ ও জগতের সমক্ষে এই উচ্চতম, গভীরতম প্রেমধর্ম্মের পরীক্ষার সময় উপস্থিত হ'য়েছে। ইহার জীবনের এই দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহা এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করছে। ব্রাহ্মগণের ইহাতে যে গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে তার গভীর অনুধাবন ও উপলব্ধি হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়"—প্রেমিক চূড়ামণি চৈতন্যের সম্বন্ধে যে কথা এখন ব্রাহ্মদের প্রতি সেই উক্তির আদর্শ পালনের অনুজ্ঞা এসেছে। "ব্রাহ্ম কাহারে কয়?" এই প্রশ্নের উত্তর বৈষ্ণবধর্ম্মের মহা বাণীর অনুযায়ী—'যাহারে দেখিলে হয় ব্রহ্মপ্রেমোদয়'—এইরূপ যখন হবে তখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনের পূর্ণ সার্থকতা হবে। এখন এই আদর্শ নিয়ে ব্রাহ্মকে প্রেমসাধন ও কর্ম্মজগতে বিচরণের পথে প্রস্থিত ও অগ্রসর হ'তে হবে। যে এইরূপ প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হবে না সে মৃত হ'য়ে থাকবে, যার প্রেমচক্ষু এইরূপ দৃষ্টিতে খুলবে না সে দিবাকানা হ'য়ে হাৎড়িয়ে পথ খুঁজে কৃপাপাত্রের ন্যায় চলবে। আমরা মৃত না জীবিত, অন্ধ না চক্ষুমান্, ইহার পরীক্ষার সময় এসেছে।

যুগাচার্য্য রাজর্ষি রামমোহনের জীবনে এই বিশ্বজনীন প্রেমধর্ম্ম কিরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল তাহা প্রত্যেক ব্রাহ্মের অন্তরে অক্ষয়রূপে মুদ্রিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। সুদূর স্পেন্ দেশে যখন স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হ'লো তখন তিনি এমনই আনন্দিত হয়েছিলেন যে এই কলিকাতা সহরের টাউন্ হলে তিনি এখানকার য়ুরোপীয়গণকে একটি ভোজ দিয়েছিলেন। ইটালীদেশ স্বাধীনতার যুদ্ধে পরাস্ত হ'লে তিনি শয্যাগত হ'য়ে পড়েছিলেন এবং একটা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নাই। আফ্রিকার উপকূলে এক জাহাজের মাস্তুলে ফ্রান্সের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন দেখে তিনি আনন্দে অধীর হয়ে রুগ্নদেহে তাহাকে অভিবাদন করতে যেয়ে পায়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর বিশাল হৃদয়ে বিশ্বজনীন প্রেম কি উদার আকার ধারণ করেছিল! মহর্ষি তাঁর সাধনলব্ধ অধ্যাত্ম-সম্পদ্ নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারলেন না, প্রেমের তাড়নায় পর্ব্বতশিখর হ'তে গঙ্গোত্রী-নির্ঝরের ন্যায় প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের জন্য নেমে এলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সাধনলব্ধ "প্রেমে বিশালতা"র কথা কতবার যে তাঁর কণ্ঠে জীবন্ত ভাবে উচ্চারিত হ'তে শুনেছি, মনে হয় এখনো যেন তাহা কর্ণে নিনাদিত হচ্ছে। "জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, কর্ত্তব্য-জ্ঞানে দৃঢ়তা, চরিত্রে সংযম, মানবে প্রেম, সাধুজনে শ্রদ্ধা, ও ঈশ্বরে ভক্তি"—এই কথা বলতে বলতে তাঁর সমগ্র সত্তা যেন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌ত। মৃত ও জীবিত আরো কত সাধক সাধিকার জীবনে প্রেমধর্ম্মের মূর্ত্তি আমরা দেখেছি ও দেখ্‌ছি। এই সকল জীবন্ত দৃষ্টান্ত দে'খেও যদি ব্রাহ্মসমাজ জড়ভরতের ন্যায় অসাড় হ'য়ে প'ড়ে থাকে তা হ'লে ইহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়, ব্রাহ্মধর্ম্ম উপধর্ম্মে পরিণত হবে। আমি শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বল্‌ছি—ইহা আমাদের সকলেরই (গভীর) চিন্তার বিষয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি (আমাদের জীবনে) পরিবর্ত্তন আনয়ন না করে, তবে ইহার কাজ হ'লো না। মানুষের হৃদয় যদি না বদ্‌লায় তবে ধর্ম্মের শক্তি কি? যাহা ছিলাম তাই যদি রইলাম তবে এই (ধর্ম্মের) স্বর্গীয় অগ্নি হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে কি করল? তণ্ডুল যদি বলে আমি জলের সঙ্গে মিশে আগুনের উপর ছিলাম, অথচ সে যদি তণ্ডুলই থাকে, তবে সে কথাতে কে বিশ্বাস করবে? লোকে বলবে ও মিথ্যা কথা, যদি আগুনের উপর থাক্‌তে তা হ'লে আর তণ্ডুল থাক্‌তে পারতে না, তুমি ভাত হ'য়ে যেতে। তেমনি (আমরা যদি বলি) (প্রেমময়) ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলাম, আমি তাঁকে প্রাণে পেয়েছি, অথচ (প্রেমের দিক্ দিয়ে) হৃদয়ে ও জীবনে পরিবর্ত্তন না দেখা যায় তা হ'লে কে বিশ্বাস করবে? সকলেই বলবে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক, (প্রেমময়) ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করলে (প্রেম সম্বন্ধে) তোমার এই দশা!

আমাদের কি গুরুতর দায়িত্ব! আমাদের পরীক্ষার দিন এসেছে। উৎসবে প্রেমময়ের নিমন্ত্রণে এসেছি। আমরা কি এই দায়িত্ব, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই মহান্ আদর্শ—বিশ্বজনীন প্রেমের আদর্শ—চক্ষের সম্মুখে রে'খে সকল জড়তা ছেড়ে গাত্রোত্থান করব না? আমরা কি বিশ্বপ্রেমের উন্মাদনা ল'য়ে নবজাগরণে জাগ্রত হব না? উৎসবের প্রেমনিমন্ত্রণ কি বৃথা হ'য়ে যাবে?

বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে—

"চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে, তা আছে মোর গায়ে।"

কলঙ্কী আমরা কি কলঙ্কী হ'য়েও প্রেমের আলোক ছড়িয়ে দিব না?

"কে লইবে মোর কার্য্য, কহে সন্ধ্যা রবি,
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যে টুকু সাধ্য করিব তা আমি।"

মাটির প্রদীপের ন্যায় ক্ষুদ্র হ'লেও আমরা কি প্রেমময়ের সহকর্ম্মী হ'য়ে যে টুকু সাধ্য প্রেমের আলোক ছড়াবার জন্য প্রয়াসী হব না?

এই উৎসবক্ষেত্রে প্রেমসাধনের দৃঢ় সঙ্কল্প আমাদের অন্তরে জাগুক, আমরা প্রেমের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে বিশ্বের দরবারের সম্মুখে দাঁড়াই। ধর্ম্মাবহ ভগবান আমাদের সহায় হউন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেমধর্ম্মরূপে জগতে জয়যুক্ত হউক।

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

সায়ংকালে সঙ্গত সভায় উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ "অধ্যাত্ম জগৎ ও আধ্যাত্মিক জীবন" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

---

৮ই মাঘ (২২শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার—প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার স্থলে

শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনি মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইতে অষ্টম ব্যাখ্যানটী (দ্বা সুপর্ণা সযুজা ইত্যাদি শীর্ষক) উপদেশরূপে পাঠ করেন।

সায়ংকালে তত্ত্ববিদ্যা-সভার উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "প্রাচীন ও নবীন" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন

---

**৯ই মাঘ (২৩শে জানুয়ারী) শুক্রবার**—প্রাতে মহিলাদিগের উৎসব। তাহাতে শ্রীমতী শারদামঞ্জরী দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম পাওয়া গেলে পরে প্রকাশিত হইবে। সিটি কলেজ গৃহে পুরুষদিগের জন্য পৃথক উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম হস্তগত হইলে পরে প্রকাশিত হইবে।

সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে স্থায়ী সভাপতির অনুপস্থিতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উপাসনান্তে বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ ও হিসাব পঠিত ও আলোচনান্তে গৃহীত হয়। ইহার পর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পঠিত হয়। তৎপর আগামী বর্ষের কর্ম্মচারীবর্গ ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণ নিযুক্ত হইলে অবশিষ্ট কার্য্যের জন্য সভা স্থগিত হয়।

**১০ই মাঘ (২৪শে জানুয়ারী) শনিবার**—প্রাতে কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর উৎসব। "ব্রহ্মনাম সার করিয়ে" ইত্যাদি কীর্ত্তনের পর যথা সময়ে "চল ভাই, সবে মিলে যাই" ইত্যাদি প্রথম সঙ্গীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন সঙ্গীতান্তে তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন:—

আজ উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক উৎসব। এক বৃহত্তর উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে রহিয়াছি, অনুভব করিতেছি এখানে যাহারা উপস্থিত আছেন, শুধু তাঁহাদের লইয়া নহে, যাহারা পরলোকে গিয়াছেন তাঁহারাও আমাদের মধ্যে আছেন। মাঘোৎসবের সূচনা হইতে অনুভব করিতেছি, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর যাহারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাঁহারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিব না। সকলেই যে একই সঙ্গীগণের সঙ্গ অনুভব করিতেছেন; তাহা নহে। কিন্তু সকলেই অনুভব করিবেন; এমন অনেক উপাসক আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন যাহারা পূর্ব্বে আমাদের সহিত এই উৎসব-মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন। মঙ্গলময় বিধাতার বিধানে আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া রহিয়াছি। দুই এক জন বিদেশীয় বন্ধুর নাম করিতে পারি। ডাক্তার সাণ্ডার্লাণ্ড এই উৎসবে একবার আমাদের এখানে উপস্থিত ছিলেন। মিস্ কলেট কখনও উপস্থিত না থাকিলেও, উৎসবের বিবরণ আমাদিগের সহিত পাঠ করিতেন; তৎসম্বন্ধে পত্রাদি লিখিতেন তিনিও আমাদের সঙ্গে আছেন। কার্ল হেমারগ্রেণ আমাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি অমৃত লোকে রহিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ করি না। এইভাবে ইহলোক-পরলোকের, নিকটের দূরের, অনেকের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া বৃহত্তর উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে রহিয়াছি, অনুভব করিতেছি। প্রাণের নিগূঢ় স্থান হইতে তাঁহাদের সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছি। কে কিরূপ বেদনা লইয়া গিয়াছেন, জানি না। তাঁহাদের সকল বেদনা পরমেশ্বরের কৃপায় দূর হউক! এই ভাব গভীর হইতে গভীরতর হউক যে আমরা শুধু এই মণ্ডলীতেই আবদ্ধ নই। কত শ্রদ্ধেয় বন্ধু, প্রিয়বন্ধু হারাইয়াছি। আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্যগণ, যাঁহাদের উপদেশ স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা বল পাই, আলোক পাই, তাঁহারা আমাদের সঙ্গে আছেন, এই ভাব আমাদের মধ্যে প্রবল হউক। পরম পিতার প্রকাশে আমাদের দুঃখদৈন্য দূর হউক!

হে অখিলশরণ অখিলগুরু, তুমি আমাদের নিকট এই ভাবে প্রকাশিত হও যাহাতে আমাদের উপাসকমণ্ডলীর যাঁহারা অমৃত-লোকে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তোমার মধ্যে দেখিতে পাই। ধন্যবাদ করি তোমাকে যে স্বার্থপর জীবন আর যাপন করিতে পারি না। সকলের বেদনাতে আমরা ব্যথিত। যাঁহারা আমাদের উপদেষ্টা ছিলেন তাঁহারা অন্য লোক হইতে আশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করি। তুমি সর্ব্বলোক-পরম-শরণ, সকলের বেদনা তোমার কৃপায় দূর হউক! ইহলোক-পরলোকের ভেদ দূর করিয়া দেও, সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হই। উপাসনা তোমার দান! তোমার কৃপা ব্যতীত মলিন চিত্ত কিছুতেই শুদ্ধ হয় না। তোমার কৃপাস্রোত প্রাণে প্রবাহিত হউক, হৃদয় হইতে সকল মেঘ বিদূরিত হউক,—তোমার চারু জ্যোতিতে অন্তর বাহির আলোকিত হউক। তোমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

"তব শুভ সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব হৃদয়স্বামী"—ইত্যাদি দ্বিতীয় সঙ্গীতের পর আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনা হয়। অনন্তর "পাপী হৃদয় মাতালে রে, সৎস্বরূপের বন্যা এসেছে। যখন আঁখি কাঁদেতছিল শুষ্ক হৃদয় লইয়া রে, কে যেন হৃদয়মাঝে বলল আমি আছি রে"। ইত্যাদি তৃতীয় সঙ্গীতের পর, আচার্য্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন:—

"For man it is a weary way to God, but a wearier far to any demigod"—"a being at once more and less than ordinary men", "a being who puts forth a stronger fascination over the earth because expending none of his strength in yearning towards heaven." মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার পথ অতি ক্লেশকর। কিন্তু সাধারণ লোক অপেক্ষা প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে আরও অধিক দুর্গম ও ক্লেশকর। প্রতিভাশালী ব্যক্তি সাধারণ লোক অপেক্ষা বড়ও বটে,

আবার ছোটও বটে, কারণ তিনি স্বর্গের পথে অগ্রসর হইবার আকাঙ্ক্ষায় নিজের কিছুমাত্র শক্তি ব্যয় করেন না বলিয়াই জগতের উপর একটা প্রবলতর আকর্ষণী শক্তি লাভ করেন।

সেদিন বলিয়াছিলাম,—যুবক যুবতীদিগকে বলিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহারা প্রাচীন তাঁহাদিগকে কিছু বলি এরূপ যোগ্যতা আমার নাই—আমরা ভুলিয়া যাইতেছি "বিনা দুঃখে হয় না সাধন, সেই যোগিজনার বাঞ্ছিত চরণ রে"। অনেক সাধন, অনেক দুঃখ ক্লেশ বহনের পরই তাঁহাকে পাওয়া যায়। সুখশয্যায় শয়ন করিয়া কেহ কখনও তাঁহাকে পায় নাই। যখন দেখি দুঃখ বেদনাতে বিমুখতা, আমোদ প্রমোদে মত্ততা অতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তখন প্রাণ নিরাশায় পূর্ণ হইয়া উঠে। প্রাচীন যাঁহারা তাঁহারা বেশী দিন ইহলোকে থাকিবেন না। তাঁহারা চলিয়া গেলে কে তাঁহাদের স্থান পূরণ করিবে? বড় চিন্তার কথা।

এ কথা অতি সত্য For man it is a weary way to God—মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিবার পথ অতি বন্ধুর। পথ চলিতে চলিতে পা রক্তাক্ত হইবে, অনেক রাত্রি হইবে, শ্রান্ত ক্লান্ত হইতে হইবে, এই তাঁহার বিধান—তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যথা না পাইলে সাধনের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও ব্যস্ততা আসে না। হৃদয়ের ব্যথাই ব্যাকুলতা আনিয়া দেয়। 'বিনা দুঃখে হয় না সাধন।' যে সুখ তোমাকে ভুলাইয়া রাখে তাহা কিরূপে তোমাকে সেই পরম ধনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত করিবে, সাধনে নিযুক্ত করিবে?

দেবেন্দ্রনাথের কথা—"এখন আমি ভূলোকেও নাই; দ্যুলোকেও নাই; সেই পরম লোকে রহিয়াছি, ঈশ্বরের মহিমার মধ্যেই স্থিতি করিতেছি।"—এই অবস্থা তিনি সহজে পান নাই। তিনি বলিয়াছেন কি কঠোর সাধনের পর ব্রহ্মের দর্শন পাইলেন। তাঁহার জীবন আলোকস্তম্ভের মত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। একদিন ভক্তিভাজন নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—"ঘোর শুষ্কতার সময় কি করা যায়?" এই উত্তর পাইলেন, "যখন তাঁহাকে পাই আনন্দে ডাকি, যখন না পাই কাঁদি, আর কি করিব?" তিনি বলিয়াছেন, "অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে পাইয়াছি।" আমাদের খেদ নাই, বেদনা নাই, আমরা কি সহজেই পাইব? দিনের পর দিন ব্যথা লইয়া চলিয়াছি। কেবল নিজের ব্যথা নয়, অপরের ব্যথায়ও ব্যথিত হইতেছি, বেদনার ভার বহন করিতেছি।

টমাস্ এ কেম্পিস্ বলিয়াছেন, "তুমি অপরকে যাইয়া সান্ত্বনা দেও, বিপদের সময় নিজে অন্ধকার দেখ। নিজে সান্ত্বনা না পাইলে অপরকে কিরূপে সান্ত্বনা দিবে?"

এক মহারাজার সঙ্গে দার্জিলিংএ আলাপ হইয়াছিল। কিছুদিন পরে জানিলাম হঠাৎ সেই পরিবারের উপর মহা বজ্রাঘাত হইল—যুবরাজ বিবাহের ৬ মাস পরে পরলোকে চলিয়া গেলেন। শোকে সকলের প্রাণ অভিভূত হইয়া পড়িল। এই সংবাদ পাইয়া আমি কিরূপ ব্যথা পাইলাম বলিতে পারি না। তখন "ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের" পীল ক্যাস্‌ল্ নামক কবিতা স্মরণ হইল—Not without hope we suffer and we mourn—আমরা একেবারে নিরাশার আঁধারে ডুবিয়া দুঃখ শোক ভোগ করি না, দুঃখ শোকের মধ্যেও আশার আলোক পাই। সায়ংকালে পারিবারিক উপাসনাতে সেই কবিতাটি সকলকে পড়িয়া শুনাইলাম—

Farewell farewell the heart that lives alone,
······at distance from the Kind,
······Not without hope we suffer and we mourn.

যে হৃদয় জগতের লোককে ভুলিয়া একাকী বাস করে, তাহাকে বিদায়—আমরা দুঃখ শোকের মধ্যে শান্তি লাভের আশা হইতে বঞ্চিত নহি।

এই যে সাধুজনের উক্তি, এই পুণ্যস্রোত, আমাদের কল্যাণের জন্য বহু যুগ হইতে প্রবাহিত হইতেছে। যাঁহারা শোক পান নাই, ক্লেশ পান নাই, তাঁহাদের কথার মূল্য নাই। কবি লোয়েল দারুন শোক যাতনা সহ্য করিয়াছিলেন; তিনি উপদেশ দিতেছেন—সকল বেদনা যাইবে, যাঁহাদের বেদনার অন্ত ছিল না, তাঁহারাও সকল ভুলিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়াছেন। মাডাম গিয়ঁ কি কষ্টেই না দিন কাটাইয়াছেন! ৭ বৎসর ঘোর যাতনাতে কাটাইয়াছিলেন। সে অবস্থায় বলিতেছেন—"আমার বাড়ী নাই, ঘর নাই, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াই। এরূপ নিরাশ্রয়তা অনুভব করিতাম যে বলিতে পারি না"। বহু বৎসর এইভাবে কাটিয়া গিয়াছে। শেষে একটু বুঝিতে পারিতেছি, "কেহ যার নাই, পথ যার গেহ, তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ"। মাডাম গিয়ঁর সেই অসহনীয় দুঃখের দিন চলিয়া গেল, উপাস্য দেবতার প্রকাশমন্দিরে স্থান পাইয়া তিনি ভূমানন্দ লাভ করিলেন। সমুদ্রে নৌকা ডুবিতেছে, সে সময় তাঁহার মন আনন্দে পূর্ণ। তিনি তাঁহার পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ীতে যাইতেছেন, বরফে গাড়ীর চাকা ডুবিয়া গেল, দারুণ শীতে শরীর কাঁপিতেছে, গাড়ী চলিতে পারে না, মৃত্যু আসন্ন, সেই সময়ে তাঁহাদের দুজনেরই মন আনন্দে পূর্ণ। কি আশ্চর্য্য! কিন্তু এরূপ অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে কি দারুণ বেদনাই পাইয়াছেন! পরিবারের সকলেই বিরূপ। শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত; তিনি সন্তানদেরও বিরাগভাজন হইলেন। তাঁহার স্বামীর সুন্দর ফুলের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল "বাগান কেমন দেখিলে?" তিনি বলিলেন "আমি উপাস্য দেবতার চিন্তাতে নিমগ্ন ছিলাম, তোমার বাগান দেখিবার অবসর পাই নাই।" তাহাতে স্বামী বিরক্ত হইলেন! অতি সুন্দরী ছিলেন, বসন্তরোগে সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গেল। এইরূপ নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিয়ত নিষ্ঠার সহিত সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া ভূমানন্দের অধিকারী হইলেন।

ডাক্তার সাণ্ডার্ল্যাণ্ড তাঁহার "Because Men are not Stones" গ্রন্থে ঋষিদের "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং" কথারই যেন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বাহিরের কিছু দেখিয়া আনন্দ পাইলে উহা বিদেশ, একমাত্র আত্মাই স্বদেশ। সেখানেই স্থায়ী আনন্দ। "মন, চল নিজ

নিকেতনে,সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে ?" গত বৎসর কঠিন পীড়া হইল, অসহ্য যাতনা। তাহাতে উপদেশ পাইলাম, ভগবচ্চরণে ত এখনও সেরূপ আশ্রয় পাইলাম না, তাঁর নামে ত সেরূপ শান্তি পাই না, আমার শরীরের সুস্থতার উপর শান্তি নির্ভর করিতেছে। তাঁহার নামে শরীরের গ্লানি ভুলিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমার দারিদ্র্য অনুভব করিয়া অন্তরে অভয়-পদলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। আর কিছুতেই আমার শান্তি নাই।

ভক্তিভাজন নবদ্বীপচন্দ্র কি যাতনা দীর্ঘকাল ভোগ করিয়াছেন! তিনি বলিয়াছেন, বেশীক্ষণ ব্যথা থাকে না। নাম করিতে করিতে ব্যথা ভুলিয়া যাইতেন। আমি জানি শরীরের অসহ্য বেদনাতে লোকে শোকও ভুলিয়া গিয়াছে। হস্‌পিটালগুলির কথা অনেক সময় স্মরণ করি, কত রোগী কি অসহ্য রোগযাতনাই সহ্য করিতেছে! তাহাদের জন্য প্রার্থনা করি। নবদ্বীপচন্দ্র বলিয়াছেন, "তাঁহাকে পাইতে গেলে cross (দুঃখ ক্লেশ) ত সহ্য করিতেই হয়, ইহা আর কি cross, আরও কত দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তাঁহার অসীম কৃপাও রহিয়াছে। তাঁহার কৃপা কে বা দেখে, কে বা শোনে?" আর্ত্তভাবেই ডাকতে ডাকতে চলিয়াছি, ভক্তিধন লাভ করিতে পারি নাই। এই কথা স্মরণ করিয়া আশা পাই—"For man it is a weary way to God." বড় বন্ধুর পথ। বড় কষ্ট পাইতে হইবে, চল; এই পথেই চলিতে হইবে। কার্লাইল তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "সার্টর রেসার্টাস্" গ্রন্থে ব্রহ্মপিপাসু ব্যক্তির যাতনা ও সংগ্রামের অপূর্ব্ব বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অনেক দিন অতি কষ্টে পথ চলিয়া, ঘোর নিরাশার অন্ধকারে বহুদিন কাটাইয়া, পরমপিতার অভয়বাণী শুনিলেন, Everlasting yea—চিরন্তন সত্য লাভ করিলেন—বিশ্বাসের ভূমি পাইলেন। তিনি যে দুঃখ ক্লেশে কত বিক্ষত হইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, আমাদিগকেও সেই ভাবেই পথ চলিতে হইবে।

ভক্তিভাজন নবদ্বীপচন্দ্র বলিলেন—"প্রাণে যে ক্লেশ আছে, তাহা সেবারূপে গ্রহণ কর। ভাল কাজ করিতে গেলে কষ্ট পাইতে হয়।" এই সকল উপদেশ স্মরণ রাখিতে হইবে, সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—"It is a weary way to God"—ভগবানের নিকট পৌঁছিবার পথ বড়ই শ্রান্তিজনক, ক্লেশকর, বন্ধুর। নাহি অন্য গতি। বেদনার মধ্যে পড়িয়াই ডাকিতে হইবে। কখনও কখনও এরূপ হইয়াছে যে, তাঁহার কাছে যাই নাই, তিনি নিজেই আসিয়া বলিয়াছেন—ভয় করিও না। "He giveth his beloved sleep," তিনিই পরা শান্তি দেন। এক এক সময়ে সে শান্তির আভাস পাইয়াছি। সহিষ্ণুতার সহিত তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে, সংগ্রামের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। আনন্দ ভাব-ভক্তি অপেক্ষা সহিষ্ণুতারই অধিক প্রয়োজন। "Thou wilt not keep thy frown for ever"—তুমি চিরদিন অপ্রসন্ন থাকিবে না। মার্টিনো এই উপদেশ দিয়াছেন—ধরিয়া থাক। মীরাবাই বলিয়াছেন "হরিসে লাগি রহরে ভাই।" গীতার ও "Imitation of Christ" এর উপদেশ—যেন তোমার ধর্ম্মজ্ঞান লাভ একেবারেই হয় নাই, এই ভাবে পথ চল। সকলের প্রাণে এই প্রার্থনা আসুক —"যেন আমরা বন্ধুর পথে যাইতে ভয় না পাই, যেন তোমার মুখের দিকে চাহিয়া সকল দুঃখ বহন করিতে পারি। সেই পথ জগৎকে দেখাও সকলে যেন তোমার নিকটে যাইতে পারে। যদি আমার জন্য স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, আর জগতের সকল পাপীতাপী পড়িয়া থাকে, আমি বলিব, আমি সকলকে ফেলিয়া একা স্বর্গ যাইতে চাই না। আমি নিজে পাপী বলিয়া অন্যের পাপ যাতনা বুঝিতে পারি। তোমার প্রেমের রাজ্য সকল জীবনে, সকল দেশে, ইহলোকে পরলোকে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহ পরলোকবাসী সকলকে তোমার প্রেমমুখ দেখাও, তোমার অভয় পদে আশ্রয় দেও।"

"তোমার অভয়পদ সর্ব্বস্বসার, আমি জেনেছি এবার" ইত্যাদি সংগীত হইয়া এই বেলার উৎসব শেষ হইল।

---

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিসভার অধিবেশন। তাহাতে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় সভাপতির কার্য্য এবং শ্রীমতী সুশীলা বসু, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্র নাথ রায় বক্তৃতা করেন। পরলোকগত আচার্য্য ও প্রচারক মহাশয়ের জীবন ও শিক্ষা নানাদিক হইতেই আলোচিত হয়।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় হেদুয়া হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। সকলে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস প্রার্থনা করেন এবং তিন দলে বিভক্ত হইয়া পৃথক পৃথক গান গাহিয়া সকলে পথে বাহির হন। প্রথমে বালিকাগণ, তাহাদের পশ্চাতে কিছু দূরে বালকগণ এবং সর্ব্বশেষে মূল কীর্ত্তনের দল প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হন। তাঁহারা মাণিকতলা ষ্ট্রীট, মাণিকতলা স্পার, আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট, বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইয়া কিছু সময় পর পর মন্দিরে পৌঁছিলে প্রত্যেকে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে কীর্ত্তন করেন। তাহাতে মন্দিরস্থিত সকলেও বিশেষ ভাবে কীর্ত্তন শুনিবার সুবিধা প্রাপ্ত হন। অনন্তর রাত্রিকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

রাজা রামমোহন রায় যখন ইংলণ্ডের ইউনিটেরিয়ান ভজনালয়ে গমন করিয়া উপাসনা করিতেন তখন চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ প্লাবিত হইত। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "আপনি এত ক্রন্দন করেন কেন," তিনি বলিতেন, "এ দেশের নরনারী কেমন একসঙ্গে মিলিত হইয়া ভগবানের গুণগান করিয়া তাঁহার পূজা করেন। আর আমার দেশের ভাই বোনেরা তাহা করে না! তাই ক্রন্দন করি"। তাঁহার দেশের নরনারী একসঙ্গে মিলিত হইয়া যে ভগবানের পূজা করে না, এজন্য তিনি কি ঘোর যাতনা, গভীর বেদনাই না অনুভব করিতেন! আমাদের প্রাণে কি তেমন গভীর দুঃখ হয়? কবে আমাদের দেশের সকল নরনারী একত্র হইয়া অনন্তকালের আত্মার বিশ্বপতির পূজা করিবে? রাজার

হৃদয় আশাতে পূর্ণ ছিল, তিনি ভগবানের দয়াতে বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার নিন্দা গ্লানির ত শেষ ছিল না। তবু বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া বলিতেন, "আজ লোকে আমার নিন্দা করিতেছে, কিন্তু এমন দিন আসিবে যেদিন ইহাদের বংশধরগণ, আমি যাহা করিয়া গেলাম তাহার অনুসরণ করিবে।" শত বৎসর পরে আমরা কি দেখিতেছি? রাজার আশা কি পূর্ণ হয় নাই?

রাজা যখন ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন, তখন তাঁহার অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে একজন মাত্র ব্রাহ্মসমাজকে ধরিয়া ছিলেন। রাজার প্রস্থানের ১০ বৎসর পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম মন্দিরের মধ্যে আচার্য্যকে বেদীতে উপবেশন করাইয়া বলিয়াছিলেন, "অদ্য এই শুভক্ষণে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সকলে আপনার নিকট উপনীত হইয়াছি। যাহাতে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পর ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্ম্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয়, এবং পাপ মোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন।"

দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ২১জন যুবক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, "রাজার প্রার্থনা আজ সফল হইতে চলিল, কিন্তু তিনি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া গেলেন না!"

প্রার্থনার ফল অব্যর্থ। আজ না হয়, কাল তাহা ফলিবেই ফলিবে। মহর্ষি, তাঁহার দীক্ষার কিছুদিন পরে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "হে পরমাত্মন! আমাদের এই বঙ্গভূমিকে উজ্জ্বল কর। তোমার এই সকল দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদান কর। এই হীন পরাধীন দেশের আর কেহই সহায় নাই—ইহা নানা ক্লেশে নানা বিপত্তিতে দিন দিন আবৃত্ত হইতেছে—দিনরাত্রি ইহার ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তুমি এ দেশকে উদ্ধার কর। পরমাত্মন্! ধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়া ইহার সকল সন্তাপ হরণ কর। তোমার করুণাবারি প্রতি আত্মাতে প্রেরণ কর—পিতামাতার মত তুমি আপনাকে প্রকাশ কর; আর আমরা সকলে তোমার আরাধনা করি। এমন দিন কবে উপস্থিত হইবে যে বঙ্গভূমির সকল সন্তানেরা এক আত্মা হইয়া তোমার উপাসনা করিতে থাকিবে। আমাদের ক্ষুদ্র যত্নে ইহার কিছুই সিদ্ধ হয় না; হে সিদ্ধিদাতা, তোমার প্রসাদ বিতরণ কর।"

ভাই, বোন! জিজ্ঞাসা করি, রাজার অশ্রু কি বৃথা হইয়াছে? মহর্ষির প্রার্থনা কি ফলবতী হয় নাই? মাতা পুত্র কন্যার রোগের সময় যাহা করেন আর কেহই তাহা পারে না। যখন আর সকলেই নিরাশ হয়, মাতা কিন্তু তখন মাথার উপরে ধূনাচিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য অবিরত প্রার্থনা করেন। সে কি ব্যাকুলতা! রাজা তাঁহার দেশের এই মৃতকল্প অবস্থা দর্শন করিয়া মাথার উপরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। আর চক্ষের জলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া কি দুঃখই না ভোগ করিয়া গিয়াছেন! মহর্ষিও প্রাণে সেই যাতনা অনুভব করিয়া কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মহীন হইলে মানুষ কি মহাদুঃখে পতিত হয়! তিনি ছাড়া যে আমাদের আর কেহই নাই, তিনি দয়া না করিলে কেহই আমাদের ধর্ম্মহীনতার দুঃখ দূর করিতে পারে না।

করুণাময় প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তিনি মানবের কত প্রার্থনায় সাড়া দিয়াছেন! যুগে যুগে তিনি মানবকে কত প্রকার দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন! আজ এক যুগের কথা স্মরণ হইতেছে। দেশে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইল। ধনিগণ তাঁহাদের সর্ব্বস্ব দান করিয়াও দুর্ভিক্ষের দমন করিতে পারিলেন না। সহস্র সহস্র নর নারীর আকুল ক্রন্দন বিধাতার নিকট পঁহুছিল। এক নারী সকলের সমক্ষে দণ্ডায়মানা হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি নিরন্নদের আহারের ভার গ্রহণ করিলাম।" নারীরা কিছু করিতে পারে না, সেকালে সকলেরই এই ধারণা ছিল। তাই পুরুষেরা বলিলেন "পুরুষেরা যাহা পারিল না, নারী কি তাহা করিতে পারে?" অপূর্ব্ব সাহস ও বিশ্বাসের সহিত তিনি বলিলেন, "দেখিতেছ না, দয়ারূপে তিনি হৃদয়ে হৃদয়ে আবির্ভূত; হৃদয়ে হৃদয়ে তিনি প্রাণরূপে বিরাজমান, তবে কেন আমি পারিব না?" তিনি এই ব্রত গ্রহণ করিয়া সকলের প্রাণরক্ষা করিলেন। আর এক দৃশ্য প্রাণে জাগিতেছে, দুর্ভিক্ষপীড়িতা মাতা, কোড়ে দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান; অনাহারে শীর্ণা, বক্ষের দুগ্ধধারা বিশুষ্ক। শিশুটী মাতৃদুগ্ধাভাবে মৃতপ্রায়। মাতা ও সন্তান পথের পার্শ্বে পড়িয়া ছিল। এক নারী যাইবার সময় উহাদিগকে দেখিলেন, অমনি বক্ষ হইতে মাংসপিণ্ড কর্ত্তন করিয়া তাহারই রসে শিশুকে রক্ষা করিলেন। কতই করুণা হইতেছে বরষণ তোমার। তবে কেন নিরাশ হই? আর ভয় নাই; ব্রহ্মের পূজাই জীবনের সম্বল করি। এই ব্রহ্মোপাসনাতেই কি না সম্ভব হইয়াছে?

অতি অল্পদিনের কথা, এক নারী তাঁহার স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন। স্বামী অন্য নারীকে পুনরায় বিবাহ করিলেন। ইহা অপেক্ষা নারীজীবনের অধিকতর দুঃখ আর নাই। স্বামী কর্ত্তৃক কি অপমানিতাই না হইলেন! কিন্তু ঈশ্বর যে সকলের জন্য সর্ব্বদা রহিয়াছেন। তিনি এই নারীকে এক ব্রাহ্ম পরিবারে আশ্রয় দিলেন, তাঁহাকে ব্রহ্মোপাসিকা করিলেন। নারী সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। ভগবান তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন। তিনিই তাঁহার স্বামী হইলেন। তাঁহার সব সন্তাপ দূরীভূত হইল।

আর এক নারী কুলীনের স্ত্রী। তাঁহার স্বামীর বহু বিবাহ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্বামী শুনিয়াছিলেন যে কলিকাতায় স্ত্রী বিক্রয় করিয়া টাকা উপার্জ্জন করা যায়। সেই প্রলোভনে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "চল, তোমাকে কালীঘাটে লইয়া গিয়া গঙ্গাস্নান করাইয়া আনি।" স্বামী তাঁহাকে কলিকাতায় আনিলেন। স্ত্রী যখন স্বামীর অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন, তখন কাতর প্রাণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। এক সহৃদয় ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। তিনি সকল দুঃখ ও দুর্দ্দশা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন।

ভগবান দয়াময়। সমস্ত দুঃখ অবসানের জন্য তিনি যে নিত্য বর্ত্তমান। প্রার্থনা পূর্ণ অন্তরে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়াই তাঁহার সাক্ষাৎ পূজা।

জগৎবাসী সকলে দেখুন কিরূপে সংসারের সকল প্রকার শোক হইতে উদ্ধারের একমাত্র পথই এই উপাসনা। সন্তপ্ত স্বামী শ্মশানে স্ত্রীকে বিদায় দিয়া গৃহে ফিরিলেন, দেখিলেন তাঁহার শূন্য গৃহ প্রেমময়ের দ্বারা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রী, সংসারের আশ্রয়স্বরূপ স্বামীকে হারাইয়া সমস্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া গৃহে ফিরিলেন, দেখিলেন গৃহ তাঁহারই জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। পূর্ব্বে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী সহমৃতা হইতেন। স্বামীকে হারাইয়া সব হারাইতেন। ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা তাহার মহা প্রতীকার হইল। গৃহে গৃহে যে মঙ্গলময়ী জননী ক্রোড় পাতিয়া রহিয়াছেন। সন্তান চলিয়া গেল, মাতার কি ক্লেশ! গৃহে আসিলেন, দয়াময়ী কি বাণী অন্তরে দিলেন, অমনি দগ্ধ প্রাণ শীতল হইয়া গেল।

আমাদের দেশে ভগবানের প্রকাশকে লোকে কল্পনার কথা বলিয়া মনে করিত; নবযুগে তাঁহার প্রকাশ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। কেবল কি আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজের দুই একজন ভাই ভগিনী মাথার উপরে অগ্নি জ্বালাইয়া প্রার্থনা করিলেন! তাহা তো নয়, দেশের কত ভাই বোন, এই ভাবে প্রার্থনা করিয়াছেন; তাহার ফলও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু সকলের হৃদয় ভেদিয়া ত প্রার্থনা ওঠে নাই। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ হইতে এই ধ্বনি উত্থিত হওয়া যে চাই। আজ যে দেশময় এই প্রার্থনা উত্থিত হওয়া আবশ্যক, "আমাদের দেশকে উজ্জ্বল কর, জাগ্রত কর, দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত কর।" জগতের সমস্ত দুঃখ দৈন্যের জন্য ক্রন্দন চাই, আত্মাকে তাঁহার সমীপে উৎসর্গ করা চাই। তাঁহারই কল্যাণ ইচ্ছায় সমস্ত পূর্ণ হইয়া যাইবে। ব্রাহ্ম সমাজ দেশকে উন্নত করিবার জন্য দেশের পাপ তাপ দূর করিবার জন্য কত অশ্রু ত্যাগ করেছেন। আমাদের সম্মুখে শুভ দিন উপস্থিত। তাঁহার নিকটে আত্ম-সমর্পণ করিবার দিন আগত। সমগ্র দেশের, সমগ্র সমাজের, সমগ্র জগতের সকলের উদ্ধার হউক, এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া ক্রন্দন করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইবার দিন উপস্থিত। রজনী প্রভাতে মহোৎসবে প্রবেশ করিবার জন্য সকলে জাগ্রত হই। ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা করি। তাহা হইলেই এই মাঘোৎসব সার্থক হইবে। কত মহিষকে বলিরূপে তাঁহার চরণে পতিত হইতে হইবে। তাহা হইলেই পাপাসুর নিপাতিত হইবে। তাহা হইলেই আমাদের উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত হইবে।

এস ভাই বোন, এই ভাবে আমরা আজ প্রস্তুত হইয়া ১১ই মাঘের উৎসব-মন্দিরে প্রবেশ করি। তিনি যে মানবের কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করেন। আমরা দয়াময়ের চরণে আত্ম-সমর্পণ করি। তাঁহারই দয়ায় আমাদের দুঃখ রজনীর অবসান হইবে। পূর্ব্ব পুরুষগণ চক্ষের জলে সিক্ত করিয়া যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা সুশীতল ছায়াদানকারী মহা মহীরুহে পরিণত হইবে। ভারতের নরনারী কোটি প্রাণে মহা মহিমা-ময়ের পূজা করিয়া ভারতবর্ষকে ধর্মক্ষেত্র করিবে।

**১১ই মাঘ (২৫শে জানুয়ারী) রবিবার**—অদ্য উৎসবের প্রধান দিন—সর্ব্বদিনব্যাপী উৎসবের ব্যবস্থা ছিল। যুবকগণ রাত্রি জাগিয়া মন্দির পত্র পুষ্পে সুসজ্জিত করেন। ভোর হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই ব্যাকুলপ্রাণ উপাসক-গণ আসিয়া মন্দির পূর্ণ করিতে থাকেন এবং সংগীত ও সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অনন্তর যথা সময়ে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। "জাগো পুরবাসি, ভগবত-প্রেমপিয়াসী" ইত্যাদি প্রথম সঙ্গীতের পর তিনি নিম্ন লিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন:—

ভারতের প্রাচীন ব্রহ্ম নব ভারতে নূতন ধারায় উৎসব প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। আজ দ্বার উন্মুক্ত হইল। তাঁহার আদেশেই আজ উৎসব আরম্ভ হইল। প্রাচীন ভারত ব্রহ্ম-প্রেরণা প্রাণে লাভ করিয়া উৎসবমন্দির দর্শন করিয়াছিল। কালক্রমে দেশবাসী সেই মহান্ মন্দিরের পথ বিস্মৃত হইল। তাহার ফলে ভারত কেবল বাহিরের সম্পদে হীন হয় নাই, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশেও দীন হইয়া গেল। আজ কৃপাময় কৃপা করিয়া সেই দৈন্য দূর করিবার জন্য নব ব্রহ্মোৎসবে আমাদিগকে নিযুক্ত করিতেছেন। প্রাচীন ভারতে ভগীরথ পূর্ব্ব পুরুষদিগের উদ্ধারের জন্য গঙ্গাকে মর্ত্তে প্রবাহিত করিয়া-ছিলেন। নবযুগের ভগীরথ স্বার্থশূন্য হইয়া জগৎবাসীর উদ্ধারের জন্য সেই স্বর্গীয় স্রোত মর্ত্তে প্রবাহিত করিয়াছেন। প্রাচীন গঙ্গাতীরে আর সামগান হয় না। সে গঙ্গা আর পাপমোচনে সমর্থ নয়। আজ আর সে দ্বারকা নাই, তাহা শত্রুদ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত। সে প্রয়াগও নাই। অক্ষয়বটও কারা-প্রাচীরে আবদ্ধ। কাশী নাই, সেখানকার বিশ্বেশ্বরও নীরব। আজ তাই দয়াময় দয়া করিয়া নূতন ধারার সৃষ্টি করিয়াছেন।

যখন একে একে রাজ্যের সমস্ত দুর্গ পরহস্তগত হয়, তখন রাজ্যের রাজকোষ যেখানে, তাহার মধ্যে সমস্ত সৈন্য সজ্ঘবদ্ধ হয়। ভারতের বাহিরের ধন রত্নের আর তেমন আদর নাই। শ্রেষ্ঠ রত্নই ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। আজ আর বাহিরের ধূলায় আবদ্ধ হইয়া থাকিও না। তোমাদের যেখানে রাজকোষ সেখানে সমবেত হও। বাহিরের উৎসব অনেক করিয়াছ; সেখানে তো কোন আনন্দ পাও নাই। তাই আজ মায়ের ছেলে মায়ের ঘরে এস। আজ সেই মন্দিরের সন্ধান কর।

এই যে শুনিলে জগতের মাতা তোমাদের আহ্বান করিয়াছেন, তোমাদের সকলকে ডাকিয়াছেন। ভাই বোন, আজ অনুসন্ধান কর দেখি অন্তরের মধ্যে, মাতা তোমাদের ডাকিয়াছেন কি না। অন্য লোকের মুখে শুনিলে চলিবে না, আজ হৃদয় তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ কর। তিনি যে আমার ভাই বোনকে ডেকেছেন তাহা আমি তাহাদের মুখচ্ছবি দেখিয়া বুঝিতেছি। দুঃখী তাপী যাহারা, মলিন বসনে দেহ আবৃত যাহাদের, তাহারা আজ আর মনে করিও না যে বাহিরের অভাবে তোমরা দুঃখী। মনে কর, অনন্ত সম্পদশালিনী মায়ের

সন্তান তোমরা। দুঃখী তো নও। আকাঙ্ক্ষা করেছ বর্ষের পরে মায়ের মন্দিরে তাঁর নাম ক'রে নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইবে। একবার ভাব দেখি তাই, সেই সফলতার পথ কোন্ দিকে আছে।

দেশ ও কালের ব্যবধানের মধ্যে যে ভাষা আমরা গ'ড়ে তুলেছি, অবর্ণনীয় রাজ্যের ভাষার সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। সেই জন্য আমাদের ভাষায় রূপক ও উপমা দেখা যায়। King David বলিলেন, "my shepherd" (আমার রক্ষক ও প্রতিপালক)। তিনিই তো আমাকে অন্ন পান দান করেন, তিনি আমাকে রক্ষা করেন, রৌদ্রে শীতলছায়া দানে আমাকে স্নিগ্ধ করেন। যদি কাহারও মনে হয় যে ইহা রূপকমাত্র বা কল্পনা, তাহা হইলে তিনি প্রতারিত হইবেন। সত্য কথা যে ভাষার মধ্যে লুক্কায়িত সে ধারায় যদি নিমগ্ন না হও, তাহা হইলে সমগ্র উপাসনার শেষেও শূন্য হৃদয় লইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কাল্পনিক ধারণা নিয়ে সার বস্তু পাওয়া যায় না। সঙ্গীতের স্বরলহরীর মধ্যে যে বার্ত্তা নামিয়া আসিল তাহা তোমাকে সতর্ক হইয়া বুঝিতে হইবে। তিনি তোমাকে ডেকেছেন। পূর্ব্বে কি কখনও ইহা অনুভব করেছ? না করিলেও আজ নূতন ক'রে অনুভব কর; ইহাতেও লাভ হইবে।

তিনি ডাকেন, সকলেই তাহা শ্রবণ করে,—সাধু ও অসাধু কেহই বঞ্চিত হয় না। St. Paul যখন প্রথম তাহা শ্রবণ করেন, তখন তিনি সাধু ছিলেন না। St. Francisও তাহাই।

মহর্ষি যখন শুনেছিলেন তখন তিনি অনুসন্ধিৎসু মাত্র। এব্রাহেম বিশ্বাসী ভৃত্য মাত্র। মূসা, দায়ুদ নরপতি ও মহম্মদ অধিক পরিমাণে শ্রবণ করিয়াছিলেন। রাবেয়া, মীরাবাই প্রভৃতি কত নর নারীর আর নাম করিব? প্রাচীন সাধু কি ভাবে শুনিয়াছিলেন তাহাই বলিতেছি। ইহুদী ভাববাদী স্যামুয়েল বাল্যকালে দেবতার ভৃত্য হইয়া দেবকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ১৪।১৫ বৎসর, সেই সময় একদিন রাত্রে নিদ্রাযোগে শুনিলেন, কে যেন ডাকিতেছে। জাগিয়া বলিলেন, 'এই যে আমি আছি!" অশরীরী বাণী যে আসে, এই অভিজ্ঞতা তিনি প্রথম লাভ করিলেন। আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "বোধ হয় স্বপ্ন।" পরক্ষণে নিদ্রিত হইয়াও সেই ডাক শুনিয়া বলিলেন, "এই যে আছি।" পুনরায় আচার্য্যকে জানাইলেন। আচার্য্য নিজে সাধু, তিনি বুঝিলেন, তৎপরে বলিলেন, "এবার যদি শুনিতে পাও তো বলিও, Speak my Lord, your servant heareth. বল প্রভু, তোমার ভৃত্য শ্রবণ করিতেছে। বিনা প্রয়োজনে তো তিনি কাহাকেও ডাকেন না। অবহিত হইয়া তাঁহার কথা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হও। সংসারে এ ব্যাপার তো অসম্ভব নয়। মা ডাকিবেন, পুত্রও ডাকিবে, ইহাতেই উভয়ের মিলন হইবে।

যাহার মধ্যে সামগ্রী অধিক সে আকর্ষণ করে, আর যাহার মধ্যে কম সে আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর সামগ্রী অধিক, তাই সে সকলকে নিজের কাছে টানে। উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাক কোন মুহূর্ত্তে তিনি আকর্ষণ করিবেন। এই প্রতীক্ষা করার নামই ব্রহ্মপূজা। আশা এই যে, সেই কৃপাসিন্ধুর একবিন্দু পাইব। কিন্তু প্রেম ভিন্ন তো কিছুই সম্ভব হয় না।

উৎসব করিতে আসিয়াছ! যদি সৌভাগ্যশালী হও তো মায়ের কোলে উঠিয়া তৃপ্ত হইবে। মায়ের ডাকের উপর নির্ভর কর। আজ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ বলিয়া আরম্ভ কর। জননী কৃপা করিয়া যদি স্পর্শ করেন, তবেই উৎসব সার্থক।

আর একটী কথা স্মরণ করিতে হইবে। ইস্পাত দেখিয়াছ, চুম্বকের স্পর্শে ইস্পাতও চুম্বক হইয়া যায়। যখন ইস্পাতের সমস্ত পরমাণুগুলি একমুখী হইয়া উঠে, তখনই ইস্পাত চুম্বকের ধর্ম্ম লাভ করে। আমাদের সব মনগুলি তো ভগবৎমুখী হইয়া ছিল না। এখনও সময় আছে। দয়াময় আপনাকে বিলাইয়া দিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছেন। অতএব এখন আমরা সকলে একমুখীন হইয়া উঠি। আমরা ধন জন চাহিতে আসি নাই, তাহার সুখ ও শান্তি তো অনেক দেখিয়াছি। সম্মান লাভ করিলে কি হয় তাহা জানি। বিদ্যা, পদ, মান তো কিছুই আমাদের লক্ষ্য নহে। পরা সম্পদই আমাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয়। তিনিই তো পরা সম্পদ, তাঁহার পাদপদ্মই তো সর্ব্ব রত্নসার। সেই মাতৃচরণ আজ বরণ করিয়া লও। হৃদয়কে কোমল কর। স্বার্থপরতাকে মন হইতে বিদূরিত কর। মনে করিও না যে আমরা মাত্র এই মন্দিরে উপস্থিত কয়েকজন মিলিয়া মাতৃ পূজা করিতে আসিয়াছি। তাহা নহে। যাহারা আসিয়াছে, যাহারা আসে নাই, যাঁহারা কোন বিদ্বেষবুদ্ধি বশতঃ আসেন নাই, যাঁহারা রুগ্ন হইয়া আসিতে পারেন নাই, যাঁহারা রোগীর সেবা কার্য্যে ব্রত থাকায় আসিতে অক্ষম হইয়াছেন—সকলের সঙ্গে মিলিয়া সকলকে ডাকিয়া তাঁহার চরণ ধরিব। আর একটী কার্য্য করিতে হইবে। যাঁহাদের সঙ্গে কতদিন একত্রে এই মন্দিরে মাতৃনাম উচ্চারণ করিয়াছি, তাঁহাদের অনেকেই আজ বিদেহী। তাঁহাদের ডাকিয়া আজ পাশে বসাই। উপাসনার সময় তাঁহাদের আনন্দাশ্রু দেখিয়া উপাসনা মধুর হইয়া যাইত। এই সমাজের সর্ব্বজনপরিচিত কুসুমতুল্য আত্মা আজ বিশেষ ভাবে দুইজনকে মনে পড়িতেছে। আজন্মব্রহ্মচারী ভ্রাতা মহেশচন্দ্র ও মুকুন্দানন্দ। মহেশচন্দ্র এখানে ব্রহ্মতেই মগ্ন ছিলেন। ভাই মুকুন্দানন্দ ব্রহ্মকেই জীবনের সার করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই আমাদের পার্শ্বে আছেন, তাহা বিশ্বাস করি। কর্ম্মী ভক্ত ভাই প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত, ভাই শশিভূষণ মজুমদার, তোমরা কোন ব্রহ্মোৎসবই ফাঁক দাও নাই। আজ আমাদের সঙ্গে থাক, আরও দুইজন ভক্ত—যাঁহাদের সঙ্গে এই মন্দিরে একত্রে উপাসনার সুযোগ হয় নাই—সেই ভাই প্রমথলাল সেন ও প্যারীমোহন চৌধুরী, তোমরা আজ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হও। নীরব কর্ম্মী ভাই লক্ষীনারায়ণ চৌধুরী, ব্রহ্মগতপ্রাণ ছিলে তুমি। অতি অল্প দিন হইল আমাদের তুমি ছাড়িয়া গিয়াছ। তুমিও আমাদের সঙ্গে মাতৃপূজায় মিলিত হও। আজ এই আসনে উপবেশন করিয়াছি। হে আচার্য্য শিবনাথ, তোমায় ডাকিতেছি। এই বেদী তো

তোমারই প্রাপ্য। সকলের কথার মধ্যে তো তোমারই কথা। তুমিই তো আমার দীক্ষাগুরু, এই মন্দিরই তো আমার দীক্ষা-ক্ষেত্র। এসো তুমি, আবার আমাদিগকে তোমার সঙ্গে একত্রে অনুপ্রাণিত কর। পূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনাকে হীন চক্ষে দেখিতাম। ইহার দিকে দৃক্‌পাতও করিতাম না। মন্দিরের নিকটেই বাস করিয়াও ইহার মধ্যে প্রবেশ করি নাই। জানি না কেন একদিন কৃতূহলী হইয়া প্রবেশ করিলাম। হে শিবনাথ, তুমিই বেদী হইতে উপদেশ প্রদান করিতেছিলে। তখনও ব্রাহ্মদিগকে অনাচারী, নরনারীর অবাধ মিশ্রণের পক্ষপাতী, খাদ্যাখাদ্য-বিচারের বিরোধী, বলিয়াই মনে করিতাম। পাঁচ মিনিট মাত্র তোমার উপদেশ শুনিয়া জানি না কি কথা হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া গেল। অমনি লোকচক্ষুর অন্তরালেই ধর্ম্মে দীক্ষা হইল। তাই আজ এই পূজার সময় তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। তুমি আমাদের সম্মুখে উপবেশন কর। তোমার মধ্য দিয়া আমরা আমাদের পিতাকে দেখি। এই মন্দিরের সমস্তই যে তোমার অতি প্রিয়। তুমি ইহাকে সমুজ্জল দেখিয়া যাইতে পার নাই। আজ তুমি আমাদের সঙ্গে এস। আরও কত আচার্য্যের কথাই আমাদের মনে উদিত হইতেছে। আজ সকলকে সঙ্গে লইয়া এস, আমরা ব্রহ্মোৎসবে প্রবৃত্ত হই। যাহা আমাদের পক্ষে কল্যাণ, আমাদের দেশের পক্ষে কল্যাণ, সেই ব্রহ্ম পূজায় আমরা সকলে প্রবৃত্ত হই।

"তিমির দুয়ার খোলো, এস এস নীরব চরণে ইত্যাদি" দ্বিতীয় সঙ্গীতের পর আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনা। অনন্তর "আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ" ইত্যাদি তৃতীয় সঙ্গীত অন্তে তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন :—

আজ উপদেশপ্রদানের দিন নয়। প্রকৃত উপদেষ্টাও সহজে পাওয়া যায় না। আমি আজ কেবল লীলারসতরঙ্গের দুই একটী কথাই বলিতে চাই। যে দয়াময়ীর কথা বলিলাম, তিনি যে এখনও মানবের অন্তরে কথা বলেন, তাহার পরিচয় আমরাও কিছু পাইয়া থাকি। অদ্যকার উপাসনার ভার গ্রহণ করিব বলিয়া যখন অঙ্গীকার করিলাম, তখন অধিক চিন্তা না করিয়া আমার মনে উদিত হইল, এই যে মানুষ ধর্ম্ম লইয়া বাদানুবাদ করে, তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করে, অথচ তাহার হৃদয় অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে প্রতিষ্ঠিত হইবার মত ভূমি তাহার নাই। তখন আমার মনে হইল যে, এমন কিছু আলোচনা করিব যাহাতে মনে বিশ্বাস উৎপন্ন হয়, ও ধর্ম্মকে প্রাণ অপেক্ষা নিশ্চিত বলিয়া মনে হয়। সেই সময় তত্ত্বকৌমুদীর এক সংখ্যাতে "বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল" এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। তাহার পর উদ্বোধনের দিন আচার্য্যের মুখে শুনিলাম, নদীতে ঝড় তুফানের সময় নৌকা খুঁটির সঙ্গে যেমন বার বার শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়, তেমনি বিশ্বাসের খুঁটিও সুদৃঢ় করিয়া লইতে হইবে।

আজ বিশ্বাসের আলোচনা করাই আবশ্যক। লীলারসের মধ্য দিয়াই বিশ্বাসের দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহুদীদিগের ধর্ম্মমন্দিরের কথা আলোচনা করিলে ইহার কিছু আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের মন্দির তিনটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রথমটী সাধারণ পূজার স্থান। ইহা পবিত্র স্থান, ইহাতে Show bread অর্থাৎ নৈবেদ্য ইত্যাদি এবং কয়েকটী ধূপদান ও বাতি-দান আছে। দ্বিতীয়টী Most Holy অর্থাৎ অতি পবিত্র স্থান, ইহা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগে Noah's ark এর একটী প্রতিমূর্ত্তি এবং মিশর দেশ হইতে ছয় লক্ষ বন্দীকে উদ্ধার করিয়া আনয়ন করিবার সময় মিশররাজকে যাহাদ্বারা নানা অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করা হইয়াছিল, সেই Aron's rod আছে। দ্বিতীয় ভাগে Egyptএর বিস্তীর্ণ প্রান্তর অতিক্রম কালে যখন ইহুদীগণ অনাহারে দারুণ ক্লেশ পাইতেছিল সেই সময় ঈশ্বরের করুণাধারারূপে যে ম্যানা (এক প্রকার শস্যকণা) বর্ষিত হইয়াছিল, তাহারই প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ কয়েকটী ম্যানা স্বর্ণ পাত্রে তথায় রাখা হইত। তৎপরে তাহার পশ্চাতে তৃতীয় প্রকোষ্ঠে স্বর্ণ সিংহাসন, তাহার উপরে কয়েকজন দেবদূত, কিন্তু কোন মূর্ত্তি তাহাতে নাই। ইহার মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম কি ও তাহার বিশ্বাসের একটু আভাস পাই। প্রথম প্রকোষ্ঠটী ধর্ম্মের বহিরঙ্গ মাত্র; তাহা অতিক্রম করিয়া যাহা পাই তাহা দেখিবার ও উপভোগ করিবার বিষয়। ভগবান প্রতি জাতিতে লীলা করিতেছেন। সেই জাতির মধ্যে তিনি যাহা করিয়াছেন বা সেই জাতি তাঁহার লীলার যে পরিচয় পাইয়াছে, তাহার সমস্ত নিদর্শন তাহাদের মন্দিরের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে।

যখন পৃথিবী পাপে ভারাক্রান্ত তখন বিধাতা সেই পৃথিবী ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়া, দুই এক জন সাধু পুরুষকে রক্ষা করিবার জন্য, তাহাদিগকে একটী নৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে বস বাস করিতে উপদেশ দিলেন। জাতির ইতিহাসে ভগবান যে দয়া প্রকাশ করেন, তাঁহার সুসন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যে কত রকম ব্যবস্থা করেন, তাহা ঐ ark ও rod দেখিয়া বুঝা যায়। Aron's rod ইহুদীদিগের কি না করিয়াছে! ইহা সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিল, আর ইজ্‌রেলগণও শুষ্ক জমিতে সাগর পার হইয়া গেল। তাহার পর ৪০দিন আহারের কিছুই নাই, অথচ ভগবান তাহাদের আহার যোগাইতেছেন। ভগবানের এই করুণার লীলার বিষয় প্রাণে সদা জাগ্রত রাখিবার জন্য মন্দিরের মধ্যে এই ব্যবস্থা তাহারা করিয়া রাখিয়াছেন। যাহারা এই দয়া স্মরণ করিয়া তাহা সম্ভোগ করিতে পারে তাহারাই তাঁহার সিংহাসনে উপস্থিত হইতে পারে। তাহা না হইলে সমস্তই শূন্য বোধ হয়। যদি তাঁহার করুণাকে আমরা আমাদের সম্মুখে সর্ব্বদা রাখিতে পারি, তাহা হইলে এই শূন্য সিংহাসনও পূর্ণ হইয়া উঠে। যাহা জাতি সম্বন্ধে সত্য, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেও সত্য।

উদাহরণস্বরূপ মহম্মদের জীবন আলোচনা করা যাক্। যখন সত্যস্বরূপের উপাসনা করার জন্য তাঁহার সঙ্গীরা নিপীড়িত, তখন তিনি অতি বিষন্ন হইলেন এবং চিন্তা করিলেন, আমার ধর্ম্ম কি সত্য নয়? যাহা প্রচার করিতেছি, ইহা কি ঈশ্বরের

প্রেরণা নয়? তবে আমরা এরূপ নিপীড়িত হইতেছি কেন? সেই সময় তাঁহার প্রাণে তিনি এই বাণী শ্রবণ করিলেন,—মহম্মদ, তোমার যখন জন্ম হইল, তুমি পিতার মুখ দেখ নাই, তুমি ধাত্রীগৃহ হইতে বাহির হইবার কিছুদিন পরেই মাতৃহীন হইলে, পিতামহও দুই এক বৎসরের মধ্যে পরলোকে গমন করিলেন, তোমার পিতৃব্যের ক্রোড়েও অধিক দিন স্থান পাও নাই। এই সকল ব্যাপারে কে তোমায় রক্ষা করিয়াছিল? তুমি দরিদ্র ছিলে, প্রভূত সম্পদের অধীশ্বর হইলে। কে তোমায় তাহা দান করিল? তুমি প্রচারক হইয়া নানা ভ্রমে পতিত হইয়াছিলে। কে তোমাকে সংশোধন করিল। সেই সকল বিষয় চিন্তা কর।

মানুষ যখন বিশ্বাসে হীন হইয়া পড়ে, ভগবান তখন তাহার সম্মুখে ভাগবৎ ধারণ করেন। সে ভাগবতের ব্যাখ্যার জন্য কাহারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রত্যেকের জীবনকে বেদ বলিয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আদিষ্ট হইলেন—ভগবান লীলাময় হইয়া যে লীলা করেন তাহাই তুমি লিখ।

ভাই বোন, পরের জীবনের অভিজ্ঞতা তেমন দৃঢ় হয় না। নিজের জীবনভাগবৎ যাহা তাহাতে বিশ্বাসের বল পাওয়া যায়। তিনি অনাথশরণ, আমার জীবনে তাঁহার যে লীলা দেখেছি তাহাই এখানে বলিতেছি। আমার বয়স যখন এক বৎসর মাত্র, আমি মাতার নিকট শুনিয়াছি, আমি আমাদের মাটীর ঘরের বারান্দায় শুইয়া আছি, মা রান্নাঘরে কার্য্যে ব্যস্ত, এমন সময় আমি গড়াইতে গড়াইতে ঘরের বারান্দা ও খুঁটীর মধ্যস্থিত সরু ফাঁকের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি, আমার গলা সেই সরু ফাঁকে আটকাইয়া গিয়াছে, আর আমি ঝুলিতেছি। এমন সময় রান্না করিতে করিতে মা যেন একটা ধাক্কা পেলেন, তাহার পর বাহিরে আসিয়া আমার এই অবস্থা দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পাড়ার রমণীরা আসিয়া আমায় উদ্ধার করিলেন। মাতাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ঘরের মধ্যে ছেলেকে রাখিস্ না কেন? তিনি বলিলেন, "ঘরের মধ্যে আমি সাপ দেখিয়াছি"; তাহারা বলিল, "বাহিরে তো শেয়াল আছে।" আমার মা বলিলেন, "ভগবান যদি রাখেন তবেই আমার শিশু বাঁচিবে।" আজ মা আর দেহে নাই, তবুও বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, "দেখ মা, তোমার শিশুকে ভগবান রক্ষা করিতেছেন।" সেদিন ভগবানকে ধন্যবাদ দিবার কিছু ছিল না। যেদিন মার কাছে এই ঘটনা শুনিয়াছিলাম, কৃতজ্ঞতায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

আর একটী ঘটনা,—তখন পিতার মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের ঘরের একটী ভূমিতে মিশাইয়া গিয়াছে। একখানি মাত্র ঘর, তাহার বারান্দাতে রান্না সম্পন্ন হয়। আমার বয়স ৯ বৎসর আর আমার একটি ছোট ভাই ছিল, তাহার বয়স ৭ বৎসর মাত্র। আমাদের গৃহটী জীর্ণ; অর্থাভাবে তাহার সংস্কার করা সম্ভব হয় নাই। মাঘ মাস, শীতনিবারণের জন্য একটী চট দিয়া গৃহের ছিদ্রগুলি আবৃত করা হইয়াছে। রাত্রে দুই ভাইয়ে মাকে জড়াইয়া শুইয়া আছি। এমন সময় একটী ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত। আমরা ভয়ে মাকে আরও জড়াইয়া ধরিলাম। মা আমার পাঠকের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, পদ্মপলাশলোচনকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকিলে বিপদ কাটিয়া যায়, ধ্রুবকে তিনি এই ভাবেই রক্ষা করিয়াছিলেন। আমার মা হরিকে ডাকিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র চলিয়া গেল, আমরা রক্ষা পাইলাম।

আরও দুই চারি বৎসর পরের কথা। আমি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে যাইতেছি। রাস্তায় হরিঠাকুরের প্রতিমার সম্মুখে প্রণাম করিবার জন্য দাঁড়াইলাম। পরীক্ষার সফলতা কামনা করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, এমন সময় একটী গোখুরা সাপ আমার পায়ের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমি এক লাফ দিলাম, সাপটী একবার ফিরিল বটে, কিন্তু আমার কিছু ক্ষতি করিল না। অনেকের জীবনে এরূপ কত ভগবৎলীলা চলিয়াছে; কিন্তু কেহ সে বিষয় স্মরণই করেন না। আমার বাবার অসুখের সময় তাঁহার চিকিৎসার জন্য আমরা সমস্ত বিক্রয় করিলাম, এমন কি সামান্য তৈজসপত্র যাহা ছিল তাহাও দিলাম, আমরা একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইলাম। তাহার পরে বাবা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আমরা একেবারে নিরাশ্রয় হইলাম। জগৎ জুড়িয়া প্রেমের নাড়ী রহিয়াছে। এক জায়গায় টান পড়িলেই সর্ব্বত্র তাহার অনুভূতি হয়। আমাদের মাতামহের এক পূর্ব্বতন ভৃত্য আমাদিগকে লইয়া সহরের (পাবনা) সর্ব্বত্র সাহায্য লাভের জন্য লইয়া গেল। সহৃদয় ব্যক্তিগণের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে স্বচ্ছলতার মধ্যে আসিলাম। কিরূপে কোথা হইতে যে তাঁহার করুণা আবির্ভূত হয় তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার লীলার কথাই কেবল স্মরণ করি।

ক্রমে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিলাম। পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়াছি যাহারা এখানে আসে তাহারাই উপবীত আর ধারণ করে না, জাতিভেদ মানিয়া চলে না। অখাদ্যভোজনে আগ্রহই তাহাদের অধিক। তাহাদের নিকট ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের কথা শুনিয়া ইহার প্রতি বিদ্বেষ ভাব আমার মনে জাগ্রত হইল। কলিকাতায় আসিয়া আর যাহা করি না কেন, ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কিছুতেই যাইতেছি না। কিন্তু কিরূপে সব সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইল তাহা বলিতে পারি না। মনে করিতাম ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অবাধ মেলা মেশার ফলে নৈতিক ভাব শিথিল হইয়া গিয়াছে। বিলাতী আচার ব্যবহারে ইহারা অধিক অভ্যস্ত। নানা ভ্রমাত্মক ধারণা মনে পোষণ করিয়াছিলাম। ভগবানের উপাসক যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে এই তীব্র ভাব ধারণ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে ধরিলেন। এই স্থানে আনিয়া বসাইলেন। ক্রমে ক্রমে দেখিলাম যে এই উপাসনা-গৃহ কত আরামের স্থান। এখন বুঝিতেছি তিনি অনাথের নাথ, সকলেরই আশ্রয়। এই লীলা কি কেবল তিনি ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গেই করেন? তাহা তো নয়। ভাই বোন, তোমরা প্রত্যেকেই তাঁহার লীলারসের সঙ্গী। একবার নিজের জীবন-ভাগবৎ পাঠ কর দেখি, তখন দেখিবে যদি কেহ তোমাদের সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে বলে তাহা হইলে—আমি বিশ্বাস করি—তোমাদের মধ্যে কত শত শত ব্যক্তি আছেন

যাঁহারা আমার অপেক্ষাও কত গভীর উদাহরণ দিতে সমর্থ হইবেন।

ভাই, তোমরা কত আলোচনা কর। তোমরা বল, হিন্দুর ধর্ম্ম ভাল না মুসলমানের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভাই, জান না কি যে তিনি কোন বিশেষ টিকিট লাগাইয়া তো ধর্ম্মে ধর্ম্মে কোন পার্থক্য করেন নাই? ভগবান যে কেবল মহম্মদের জীবনের রক্ষক আর তোমাদের জীবনের নয়, তাহা তো নয়। তাই বলি, আজ প্রত্যেকে নিজের নিজের জীবন-ব্যাপার আলোচনা ক'রে তাঁহার চরণে নিজেকে বাঁধা দেও।

আমার চারি পার্শ্বে আজ কত বন্ধুকে দেখিতেছি যাঁহারা তাঁদের জীবনে কতবার ভগবানের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন। আজ ভাই, তোমরা যে যে-ধর্ম্মাবলম্বীই হও না কেন, একবার জীবন-ভগবৎ আলোচনা কর দেখি; দেখিতে পাইবে তিনি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে তোমাকে রক্ষা ক'রে কত শিক্ষাই দিতেছেন! তখন দেখিবে হিন্দুর ঈশ্বর মুসলমানের ঈশ্বর হইয়াছেন ও মুসলমানের ঈশ্বর হিন্দুর হইয়া গিয়াছেন। সমস্ত একাকার হইয়া গিয়াছে এবং ভগবান হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন।

রুশিয়ায় দেখিয়াছ, তাহারা মনে করে ভগবানের নামোচ্চারণে মানুষের জীবন অহিফেন-সেবীর ন্যায় বিকারগ্রস্ত হয়। সেইজন্য তাহারা ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়াছে। তোমরা কি বুঝিতে পার না যে, আমরা সকলে অমৃতের মধ্যে গরল মিশ্রিত করিয়াছি, সেইজন্য আজ ধর্ম্মে ধর্ম্মে এরূপ বাদানুবাদ চলিতেছে? তাই আজ ইহার মধ্যে নানা বিরোধ। সেই জন্য আমি আজ তোমাদের নিকট ইহাই নিবেদন করিতেছি যে, ভাই, তোমরা যখনই ঈশ্বরের মন্দিরে মিলিত হইবে তখনই তাঁহার করুণার নিদর্শনগুলি তোমাদের সম্মুখে রাখিও; তাহা হইলে হৃদয়েশ্বরকে তোমার হৃদয়-সিংহাসনে আসীন দেখিতে পাইবে। আর যদি কোন নিদর্শন খুঁজিয়া না পাও, তাহা হইলে একবার নয়ন মুদ্রিত করিয়া কতবার কত দুঃখ, বিপদ, দারিদ্র্য বা সঙ্কটাপন্ন ব্যাধির কবল হইতে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিও। অথবা কতবার কুসঙ্গে পতিত হইয়া কোন্ নরকের পথে যাইতেছিলে, তিনি কেমন করিয়া তোমাকে সেই মোহ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এই সকল দেখিয়া তাহার পর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইও।

তখন তুমি দেখিবে যে, এই যে ধর্ম্ম তাহাকে কোন প্রচলিত ধর্ম্মের নামে অভিহিত করিতে পারিবে না। ইহাকে কেবল ঈশ্বরের ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন নামেই অভিহিত করিতে পারিবে না। এই জন্য আমরা ইহাকে ব্রহ্মের ধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম দিয়াছি।

ভাই বোন, ইহাই স্থির জানিও যে, তিনি স্বয়ং তোমাদের শিক্ষক, তিনিই দীক্ষাদাতা। বাহিরের দীক্ষাদাতা একজন ছিলেন বটে, কিন্তু তিনিই কেশে ধরিয়া এখানে আনিয়া আমাদিগকে উদ্দীপিত করিয়াছেন। তাই বলিতেছি, তোমরা একবার গীতা-ভাগবত, তোমাদের জীবন-ভাগবত পাঠ কর, জীবন ধন্য হইবে। দেখিবে তোমাদের যে পথে যাওয়া আবশ্যক বা যে তীর্থ তোমাদের জীবনে প্রয়োজন, তিনিই তোমাদের নিকট সেই দ্বার উদ্ঘাটিত করিতেছেন। ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিয়া জীবনপথে অগ্রসর হও। এই উৎসব সার্থক হইবে। আজ এই মনোভাব লইয়া লীলাময়ের চরণে পতিত হই ও তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি।

অনন্তর "সবে কর আজি তাঁর গুণগান" ইত্যাদি চতুর্থ সঙ্গীত ও "পদপ্রান্তে রাখ সেবকে" ইত্যাদি বন্দনা-গীত হইবার পর কিছুক্ষণ কীর্ত্তনান্তে এই বেলার উপাসনা শেষ হয়। কিন্তু মন্দির কখনও লোকশূন্য হয় না। কেহ কেহ ব্যক্তিগত ধ্যান, পাঠ, সঙ্গীতাদিতে নিযুক্ত থাকেন। অপর অনেকে বাহিরে প্রীতি-ভোজনে যোগদান করেন। ক্রমশঃ

## ব্রাহ্মসমাজ।

**কার্য্যনির্ব্বাহক সভা**—বিগত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের অধ্যক্ষসভার বিশেষ অধিবেশনে নিম্ন লিখিতরূপে বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে:—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দত্ত ও কুমারী শকুন্তলা রাও। প্রচারকগণ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ীকে তাঁহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন।

**উৎসব**—বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী সাধনাশ্রমের উন-চত্বারিংশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্ন লিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে—প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা; শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে সাধনাশ্রমের উপাসনা-গৃহে পাঠ ও আলোচনা; মধ্যাহ্নে প্রীতিভোজনান্তে আবার পাঠ ও আলোচনা—প্রচার বিষয়ে আলোচনা হয়,—এবং ৫ ঘটিকার সময় পুনরায় উপাসনা। শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষ আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

**কলিকাতা উপাসকমণ্ডলী**—কলিকাতা উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে নিম্ন লিখিত প্রণালীতে একটি বিশেষ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—২১শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার, অপরাহ্ণে মন্দির-প্রাঙ্গণে সামাজিক সম্মিলন। সায়ংকালে রজনীকান্ত গুহ "প্রোটোর নিবৃত্তিমার্গ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ২২শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার—প্রাতে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে কীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার,

সায়ংকালে বার্ষিক সভা ; তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির কার্য্য করেন এবং বার্ষিক কার্য্যবিবরণ ও হিসাব পঠিত ও গৃহীত হইলে পর কর্ম্মচারী ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ নিযুক্ত ও আচার্য্যগণ মনোনীত হন। আগামী বর্ষের জন্য শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার বসু সহকারী সম্পাদক পুনর্নিযুক্ত হইয়াছেন।

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে :—

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত হেমচন্দ্র দাসের পত্নী সিদ্ধেশ্বরী দাস দীর্ঘকাল জামাতা শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোমের গৃহে রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অতি সহৃদয়া মহিলা ছিলেন।

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত শশিকুমার দাস গুপ্তের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ (শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার দাসগুপ্তের পত্নী) উমা দেবী একটি মাত্র কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া ২৬ বৎসর বয়সে হঠাৎ অল্প সময়ের অসুখে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সুকবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

প্রায় একমাস হইল শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতানগরীতে অবিনাশ বাবু ভ্রাতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য এবং অবিনাশ বাবু প্রার্থনা করেন।

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী জামসেদপুর নগরীতে পরলোকগত হীরালাল সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ সরকার জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে পুত্র হীরেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রত্যেকে ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ প্রতিষ্ঠানে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বাণীবন গ্রামে শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সিংহ রায়ের মাতামহী ব্রহ্মময়ী দেবী দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

বিগত ২৫শে মাঘ তেজপুর নগরীতে কনিষ্ঠা কন্যা কিরণবালা বরকাকতি ও দৌহিত্র প্রণবানন্দ পরলোকগতা স্বর্ণলতা দত্তের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যা ও দৌহিত্র প্রার্থনা করেন, দৌহিত্রী নীলিমা জীবনী পাঠ করেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মমিশন ফণ্ডে ১০৲, তেজপুর মহিলা সমিতিতে ৩৲, ও তেজপুর ব্রাহ্মসমাজে একখানা বড় শতরঞ্চি দান করা হইয়াছে এবং পরদিন ভিখারীদিগকে চাউল, ডাইল, আলু, লবণ পয়সা প্রভৃতি ও অন্ধ আতুর ও অনাথা স্ত্রীলোককে ১১ খানা কাপড় দেওয়া হইয়াছে। উক্ত দিবস কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত প্রসন্নকুমার দাসগুপ্ত মহাশয়ের আলীপুরস্থ ভবনে তাঁহার আত্মীয়গণ কর্তৃক এবং কৃষ্ণনগরে জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাসগুপ্তের গৃহে কন্যা শ্রীমতী হিরণবালা দাসগুপ্ত কর্তৃক আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতাতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এবং কৃষ্ণনগরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৮ই ফাল্গুন কাঁথি নগরীতে পরলোকগত রাধাকৃষ্ণ মাইতির পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য এবং পৌত্র শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার জীবনস্মৃতি পাঠ করেন। এই উপলক্ষে প্রায় ৮০০ কাঙ্গালীকে ভোজন করান হয় এবং কাঁথি ব্রাহ্মসমাজে ৮৲, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৮৲, কাঁথি হাসপাতালে ৮৲, কাঁথি বালিকা স্কুলে ৮৲, এবং শিবনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারে ৮৲, প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

**শুভ বিবাহ**—বিগত ২৬শে জানুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী সুবর্ণা ও নদীয়া নিবাসী শ্রীমান বিমলকুমার নন্দীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৮শে জানুয়ারী গোবরডাঙ্গা গ্রামে শ্রীযুক্ত জীবনময় রায়ের আত্মীয়া বাল-বিধবা কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুষমা বসু ও শ্রীযুক্ত পাণ্ডবচন্দ্র সিংহের পালিত পুত্র শ্রীমান এ এম পিলে ওরফে বসন্তকুমার সিংহের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী কাওড়াইদ-প্রসাদপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র আচার্য্যের দৌহিত্রী কল্যাণীয়া কুমারী শিশিরকণা চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমান নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়ের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত লালমোহন চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী বেলা ও শ্রীমান প্রেমাঙ্কুর দের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী বাসন্তী ও শ্রীহট্ট জামসী নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান হরিপদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী কমলা ও শ্রীযুক্ত কামাখ্যাকুমার দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সচ্চিদানন্দের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

**দান**—রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ বসুর মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহারা চারি ভ্রাতা মিলিয়া সাধনাশ্রমে ১০০৲, ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে ১০০৲, মান্দ্রাজ ব্রাহ্মসমাজে ৫০৲, ও নব বিধান ব্রাহ্মসমাজের প্রচারাশ্রমে ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসুর দিদি শাশুড়ী পরলোকগতা নৃত্যকালী দাসীর দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস তাঁহার পিতা পরলোকগত দ্বিজদাস বিশ্বাসের চত্বারিংশত্তম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পিতার নামীয় স্থায়ী প্রচার ভাণ্ডারে ১০০৲ টাকার একখানি কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায় পিতার প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ বিভাগে ১০৲, প্রচার বিভাগে ৫৲, দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ৫৲, কলিকাতা উপাসক মণ্ডলীতে ৫৲, সাধনাশ্রমে ৫৲, শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারে ১০৲, ও শিবনাথ মর্ম্মরমূর্ত্তি ভাণ্ডারে ২৲, মোট ৪২৲, দান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দাতব্য বিভাগে ২৲ দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের পত্নী পরলোকগতা বসন্তকুমারী সেনের বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বসন্তকুমারী প্রচার ভাণ্ডারে ১০০৲ টাকার একখানি সিটিকলেজ-বণ্ড দান করা হইয়াছে।

এই সমস্ত দান সার্থক হউক এবং পরলোকগত আত্মাসকল চির শান্তিলাভ করুন।

**গৃহ প্রতিষ্ঠা**—বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জির রামরাজাতলাস্থিত নব নির্ম্মিত গৃহে প্রবেশ উপলক্ষে উপাসনাদি হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীযুক্ত শ্রীপতিনাথ দত্তের নব নির্ম্মিত ভবনে প্রবেশানুষ্ঠান নিম্ন লিখিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে:—পুরাতন বাসগৃহ-প্রাঙ্গণ হইতে প্রার্থনাপূর্ব্বক সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নূতন গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া উহাকে প্রদক্ষিণ করিলে পর, দ্বারে দাঁড়াইয়া পুনরায় প্রার্থনান্তর, দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু প্রার্থনা ও দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অনন্তর প্রথমে পত্নী শ্রীমতী সত্যবতী দত্ত ও সন্তানগণ সহ গৃহকর্ত্তা এবং তৎপশ্চাতে বন্ধু বান্ধবগণ গৃহে প্রবেশ করিলে পর উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে মাতা পিতার স্মরণার্থ "অন্নপূর্ণা-ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত ভাণ্ডার" নামে দরিদ্র ব্রাহ্ম বিধবাদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের জন্য ১০০৲ টাকার একখানি কোম্পানীর কাগজ প্রদত্ত হইয়াছে। সায়ংকালে আবার শ্রীমতী সুশীলা বসু প্রার্থনা করেন।

করুণাময় প্রেমস্বরূপ মঙ্গলবিধাতা নব গৃহে তাঁহার পুণ্য-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করুন।

**নামকরণ**—রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্রের শুভ অন্নপ্রাসন ও নামকরণ উপলক্ষে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। শিশুর নাম রজতেন্দ্র রাখা হয়। এতদুপলক্ষে হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ টাকা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচার বিভাগে ৩৲, টাকা এবং সাধনাশ্রমে ২৲, টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। মঙ্গলময় বিধাতা শিশুকে কল্যাণের পথে বর্দ্ধিত করুন।

---

**প্রচার**—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় কুমিল্লা হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া জেমসেদপুর গমন করেন। গত ১৮ই মাঘ পরলোকগত হীরালাল সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে প্রাতঃকালে উপাসনাদি করেন। সায়ংকালে ব্রাহ্ম-সমাজে উপাসনা করেন। জেমসেদপুর হইতে কটক গমন করিয়া দুই রবিবার উৎকল ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাদি করেন। কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া কাঁথি যান এবং পরলোকগত রাধাকৃষ্ণ মাইতির পত্নীর আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা করেন। কাঁথি পৌছিয়া শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার মাইতির বাড়ী পারিবারিক উপাসনা করেন। ৮ই ফাল্গুন প্রাতঃকালে আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। পাঁচদিন ঐ বাড়ীতে সকালে পারিবারিক উপাসনা করেন। ১০ই ফাল্গুন কাঁথি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে দুই বেলা আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ১১ই ফাল্গুন তথা হইতে কলিকাতা আসিয়া পৌছিয়াছেন।

---

**উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ**—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—২৪শে ডিসেম্বর প্রাতে রাস্তায় উষাকীর্ত্তন। পরে মন্দিরে উপাসনা। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। অনন্তর পরলোকগত কানাইলাল সেন মহাশয়ের স্মৃতি-সভা। অপরাহ্নে বার্ষিক সভা, বালক বালিকাদের উৎসব, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও ব্যাখ্যা। ২৫শে কাঙ্গালী ভোজন। অপরাহ্নে উপাসনা; শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রমোহন মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৬শে অপরাহ্নে কীর্ত্তন। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে কীর্ত্তন পরিচালনা করেন।

---

**আন্দুল ব্রাহ্মসমাজ**—আন্দুল ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে—

১০ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র সংকীর্ত্তন ও উদ্বোধন করেন। ১১ই জানুয়ারী প্রাতে আন্দুল ষ্টেশন হইতে উষাকীর্ত্তন করিতে করিতে ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইলে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন ও বাবু অমৃতকুমার দত্ত প্রভৃতি সঙ্গীত করেন। পাঞ্জাব হইতে আগত স্বামী রুক্মানন্দ ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে কীর্ত্তনে উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল ছায়াচিত্র সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

**মফস্বলে মাঘোৎসব**—কুমিল্লা—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় গত ৫ই মাঘ কুমিল্লা গমন করেন। ৬ই মাঘ সায়ংকালে মন্দিরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা হয়; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় প্রার্থনা করেন; শ্রীযুক্ত নবকুমার চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত রজনীনাথ নন্দী এবং বরদা বাবু বক্তৃতা করেন। ৭ই মাঘ কৈলাস ভবনে প্রাতে উপাসনা ও সঙ্গীত হয়; বরদা বাবু উপাসনা করেন। সায়ংকালে সমাজ মন্দিরে মহাপুরুষ প্রসঙ্গ হয়; বরদা বাবু প্রার্থনা করেন, রজনী বাবু ও শ্রীযুক্ত মদনমোহন ঘোষ বক্তৃতা করেন। ৮ই মাঘ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ রায়-বাহাদুরের বাড়ীতে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হয়; বরদা বাবু উপাসনা করেন। ৯ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সিংহের বাড়ীতে উপাসনা ও সঙ্গীত হয়; বরদা বাবু উপাসনা করেন (বীরেন্দ্র বাবুর মাতৃদেবীর রোগের শান্তির জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনাদি হয়)। ১০ই মাঘ প্রাতে সমাজ মন্দিরে বরদা বাবু উপাসনা করেন। বৈকালে মহিলা সমাজে পুনরায় বরদা বাবু উপাসনা করেন; সায়ংকালে পুনরায় মন্দিরে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। ১১ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন; মধ্যাহ্নে পাঠ ও আলোচনা হয়; সায়ংকালে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১২ই মাঘ প্রাতে রজনী বাবু উপাসনা করেন; অপরাহ্নকালে বালক-বালিকাদিগের উৎসব হয়; তৎপর সায়ংকালে যোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়; শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ বক্তৃতা করেন; তৎপরে উৎসব শেষ হয়।

---

**ছাত্রীদের কৃতিত্ব**—বিগত এম এ পরীক্ষাতে রায় সাহেব প্রমোদারঞ্জন রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা লীলা রায় ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ও অন্যান্য ছাত্রীগণ নিম্ন লিখিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম:—ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম বিভাগ—অরোরা ক্রেইটন (১ম স্থান অধিকার করিয়া); দ্বিতীয় বিভাগ—সান্ত্বনা বসাক, লীলালতিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুফলা রায়। ইতিহাস—দ্বিতীয় বিভাগ—চারুলতা দাস। অর্থনীতি—প্রথম বিভাগ—লীলা সেন (তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া)। ব্যবহারিক গণিত (নূতন)—প্রথম বিভাগ—শান্তিসুধা ঘোষ (দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া)। ঐ (পুরাতন)—তৃতীয় বিভাগ—পরিমল সেনগুপ্ত। পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান—দ্বিতীয় বিভাগ—শ্যামসোহাগিনী এমেলী ঘোষ। সংস্কৃত সাহিত্য (ক)—তৃতীয় বিভাগ—রেণু দাসগুপ্ত। ঐ (ঘ)—প্রথম বিভাগ—সুরমা মিত্র (প্রথম স্থান অধিকার করিয়া)। বিশুদ্ধ গণিত—প্রথম বিভাগ—মীরা দত্তগুপ্ত (দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্য—তৃতীয় বিভাগ—বনলতা চট্টোপাধ্যায়।

---

**ব্রাহ্ম যুবক ভবন**—প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্ম যুবকসমিতির তত্ত্বাবধানে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অতি সন্নিকটে এই প্রতিষ্ঠানটির সূচনা হইয়াছিল। মফস্বলের ব্রাহ্ম পিতা মাতা যাহাতে তাঁহাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদিগকে এখানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, ব্রাহ্মসমাজের যুবকগণ যাহাতে একটি মিলনের যায়গা প্রাপ্ত হন, এবং এখানে থাকিয়া যুবকগণ শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করিয়া, দেশের ও সমাজের মধ্যে এক নব জীবনের সূচনা করিতে পারেন, এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া যুবক সমিতি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন।

একণে এই ভবনে যতগুলি ব্রাহ্মযুবক আছেন, কলিকাতায় প্রবাসী ব্রাহ্মযুবকের সংখ্যার তুলনায় তাহা অতিশয় নগণ্য।

এই ভবনের কর্তৃপক্ষগণ প্রতিষ্ঠানটির প্রতি ব্রাহ্ম-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন।

তাঁহারা বিশেষ করিয়া এই আশা করেন যে মফস্বলস্থ ব্রাহ্ম পিতা মাতাগণ তাঁহাদিগের সন্তানদিগকে কলিকাতায় অন্যত্র প্রেরণ করিবার পূর্ব্বে এই যুবক-ভবনের কথা বিশেষরূপে স্মরণ করিবেন।

খরচ যথাসম্ভব কম; এবং যে বাটিতে এই ভবনটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ স্বাস্থ্যকর।

মফস্বলের ব্রাহ্মগণ কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদের থাকিবার বন্দোবস্তও করা হয়।

এ বিষয়ে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে, নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিতে পারেন:—শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র গুহ, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ব্রাহ্মযুবক-ভবন, ১১ সি ভুবনমোহন সরকার লেন, কলিকাতা।

শ্রীসুশীল কুমার দত্ত
সম্পাদক, ব্রাহ্ম যুবক সমিতি

## শিবনাথ মর্ম্মর-মূর্ত্তি ভাণ্ডার

শিবনাথ স্মৃতি মন্দিরের দ্বিতল গৃহটির নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইতে চলিল। জন সাধারণের নিকট, বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগের নিকট, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

এই দ্বিতলের বড় হলঘরটিকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থির করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয় এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বনামধন্য শিষ্য জ্ঞানীপ্রবর মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রদত্ত পাঠাগারটি এখানে স্থাপন করিবেন। অতএব আশা করা যায় যে, কালে এই হল ঘরটি একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইবে, এবং এখানে উহার মতাবলম্বী লোকদিগের একটি মিলন মন্দির গড়িয়া উঠিবে। এবং ইহাও আশা করা যায় যে, দেশের ভবিষ্যৎ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতামত এখানে গঠিত হইয়া উঠিতে পারিবে।

আমাদের মনে হয়, এই স্মৃতিমন্দিরটিকে সুন্দর করিতে হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি ইহার মধ্যে স্থাপন করা উচিৎ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ইহাও ঠিক করিয়াছেন যে, একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপন করা হইবে এবং সর্ব্বসমেত ইহার খরচ লাগিবে অন্যূন ১৫০০৲ টাকা।

শিবনাথ স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য পূর্ব্বের যে আবেদন করা হইয়াছে তাহাতে এ বিষয়ের উল্লেখ নাই; সেজন্য আমরা ত্রুটি স্বীকার করিতেছি, এবং পুনরায় সাধারণের নিকট এই আবেদন প্রেরণ করিতেছি।

আশা করি এই পুণ্যাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে তাঁহার শিষ্য ও অনুরক্তগণ অন্ততঃ প্রত্যেকে একটি করিয়া টাকা সাহায্য করিয়া এই মহৎ কার্য্যটি সফল করিয়া তুলিবেন।

যিনি যাহা সাহায্য করিবেন, তাহা শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, এম্ এ, কোষাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট ২১০।৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে প্রেরণ করিবেন।

কৃষ্ণকুমার মিত্র, সম্পাদক, সঞ্জীবনী।
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, প্রবাসী ও মডার্ণরিভিউ।
হেমচন্দ্র সরকার, সভাপতি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।
কুমুদিনী বসু।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ২৫শে ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ।

Registered No. 56

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খৃঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৫৪ ভাগ
২৩শ সংখ্যা।

১লা চৈত্র, রবিবার ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০২
15th March, 1931.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴৹
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা

হে প্রেমময় বিশ্ববিধাতা, আমাদের শত ত্রুটি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও, তুমি তোমার অসীম প্রেমে, আমাদিগকে গুরুত্ব কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব দিয়া, তোমার এই বিশ্ববিধানের অন্তর্গত করিয়াছ। আমরা যতই ক্ষুদ্র ও নগণ্য হই না কেন, আমাদের উপরও তোমার অনেক কার্য্যভার প্রদান করিয়াছ, এবং তাহার সঙ্গে সকলের কল্যাণ জড়িত করিয়া দিয়াছ। আমরা অনেক সময়ই আমাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথা ভুলিয়া, উদাসীনতা অবহেলাতে সময় কাটাইয়া দেই, শক্তি ও সুযোগ নষ্ট করিয়া জীবনকে ব্যর্থ করিয়া ফেলি, নিজের ও অপরের নানা অকল্যাণ সাধন করি। তুমি কৃপা করিয়া নিয়ত আমাদের চৈতন্যোদয়ের জন্য বিবিধ আয়োজন কর; আবার, উৎসবাদির মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থা কর। তুমি শুধু আনন্দ আরাম শান্তিই আমাদের জন্য বিধান কর নাই। অথচ অনেক সময় আমরা তাহার জন্যই ব্যস্ত হই, তাহাতেই মজিয়া থাকিতে চাই। তাই প্রতিদিন তুমি আমাদের সম্মুখে নানা কঠোর সংগ্রাম আনিয়া উপস্থিত কর, সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, দুঃখ ক্লেশের মধ্য দিয়া, অগ্রসর হইতে বাধ্য কর। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের নিকটে থাকিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্যও সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক, আমাদের ছাড়িয়া কখনও দূরে চলিয়া যাও না। কিন্তু আমরা যে সকল সময় তোমার সাহায্য পাইবার জন্য সেরূপ ভাবে আকাঙ্ক্ষিত হই না, অনন্যগতি হইয়া তোমার শরণ লই না! তাইত তোমার কার্য্য ভাল করিয়া করিতে পারি না,—পদে পদে বিভ্রান্ত হই। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের এই দুর্ব্বলতা দূর কর,—সর্ব্বদা তোমার অনুগত হইয়া, তোমার বলে বলীয়ান্ হইয়া, জীবনপথে চলিতে ও সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে তুমি আমাদিগকে সমর্থ কর। তোমার মঙ্গল-ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেক জীবনে ও সমগ্র সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

## একাধিক শততম মাঘোৎসব।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

**১১ই মাঘ ( ২৫শে জানুয়ারী ) রবিবার—** পুনরায় ১ ঘটিকার সময় মাধ্যাহ্নিক উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

আমরা প্রেমময় পিতার ব্যস্ত প্রেমের কথা অনেক সময়ই শুনিয়া থাকি। এই উৎসবের মধ্যেও নানা জনের মুখে সেই কথা শুনিয়াছি। তিনি যে ব্যস্ত হইয়া আমাদের সকলকে ডাকেন, ও খুঁজিয়া বেড়ান, ইহারই উপর যে উৎসব নির্ভর করে, সে কথাও আমরা শুনিয়াছি। তিনি যে জীবন্ত ভাবে আমাদের জীবনে লীলা করেন, যখন যাহা প্রয়োজন বিধান করেন, সাংসারিক প্রয়োজনও সাধন করেন, নিজ নিজ জীবনে তাঁহার জীবন্ত লীলার ইতিহাস পাঠ করিয়া, জীবন-ভাগবৎ আলোচনা করিয়া, বিশ্বাসের ভূমিতে যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, প্রেম ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তাঁহার হাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে, ইত্যাদি কথাও আচার্য্যের নিকট প্রাতে শুনিয়াছি। বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা অধিকতর সত্য কিছু আমি জানি না। তিনি যে শুধু ডাকিতেছেন, খুঁজিতেছেন, তাহা নহে। তিনি জীবন্ত মঙ্গলবিধাতারূপে প্রতিনিয়ত আমাদিগকে জীবনের সকল অবস্থার মধ্য দিয়া, সকল পাপ পুণ্য, উত্থান পতন, জয় পরাজয়, আনন্দ নিরানন্দ, বিচ্ছেদ মিলনের মধ্য দিয়া, তাঁহারই চির-

কল্যাণের পথে লইয়াও যাইতেছেন। জীবনে যদি কিছু নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিয়া থাকি, তবে ইহাই জানিয়াছি যে, তিনি জীবন্ত মঙ্গলবিধাতারূপে জগতে ও প্রত্যেক জীবনে নিয়ত কার্য্য করিতেছেন। জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা ঘটনায়, নানা অবস্থাতে, নানা স্থানে, নানা সময়ে, ইহার বহু পরিচয় পাইয়াছি। শুধু আধ্যাত্মিক বিষয়ে নয়, ক্ষুদ্রতম সাংসারিক বিষয়েও ইহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি—যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে, তিনি বিধান করিয়াছেন, আশ্চর্য্য ভাবে আনিয়া দিয়াছেন। এমার্সন যে বলিয়াছেন, "তোমার কল্যাণের জন্য যে বন্ধুটিকে পাওয়া দরকার, যে পুস্তকখানা পড়া দরকার, যে বাক্যটি শ্রবণ করা আবশ্যক, তাহা যথা সময়ে, সোজা পথেই হউক আর বাঁকা পথেই হউক, তোমার নিকট আসিবেই আসিবে," তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়াই প্রমাণ পাইয়াছি। যেখানে বাহিরে সাহায্য পাওয়ার কোনই আশার কারণ দেখিতে পাই নাই, সেখানেও আশ্চর্য্য রূপে সাহায্য পাইয়াছি। অযাচিত ভাবে তাঁহার অশেষ করুণা পাইয়াছি। তিনি যে শুধু ডাকিয়া আনিয়াছেন তাহা নহে, সকল উদাসীনতা, অবহেলা, বিদ্রোহিতার মধ্যে, পাপ তাপ মলিনতার মধ্যে, হাত ধরিয়া লইয়াও চলিয়াছেন; দুঃখ বেদনা লাঞ্ছনার কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়াই হউক, আর আনন্দ শান্তির প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়াই হউক, তিনি লইয়া চলিয়াছেন, গড়িয়া তুলিতেছেন, সকল বাধা বিঘ্ন ধীরে ধীরে অসীম ধৈর্য্যের সহিত দূর করিয়া দিতেছেন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা কিছুতেই কখনও ব্যর্থ বা পরাজিত হয় না।

অনেকে তাঁহার "ব্যস্ত প্রেমের" কথা বলেন। আমি তাহা বলি না,—কথাটা পছন্দ করি না,—আমি বলি "শান্ত প্রেম", "অবিচলিত মঙ্গলবিধাতৃত্ব"। তিনি কিছু মাত্র ব্যস্ত বা চঞ্চল না হইয়া, ধীর শান্ত ভাবে অসীম প্রেম ও অপরাজেয় সঙ্কল্পের সহিত আপনার মঙ্গল ব্যবস্থানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিয়া যাইতেছেন,—সকল বাধা বিঘ্ন পাপ মলিনতা সত্ত্বেও, প্রত্যেককে চির কল্যাণ ও উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহার এই মঙ্গল সংকল্পকে ব্যর্থ করিতে পারে এমন কোনও শক্তি জগতে নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান। মানুষকে তিনি অনেকটা স্বাধীনতা দিয়াছেন সত্য। সেই স্বাধীনতাবলে মানুষ কিছু পরিমাণে তাঁহার এই মঙ্গল কার্য্যে বাধা উৎপন্ন করিতে পারে, উদ্দেশ্যসাধনে বিলম্ব ঘটাইতে পারে, সন্দেহ নাই। যদিও তিনি এক মুহূর্ত্তে তাহার সকল স্বাধীন ইচ্ছাকে চূর্ণ করিয়া আপনার ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করিতে পারেন, তথাপি তিনি যে তাহা কখনও করেন না, ইহা আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু আমাদের এই স্বাধীনতাবলে যে আমরা তাঁহার ইচ্ছাকে চিরতরে ব্যর্থ করিতে পারি না, আমাদের শক্তি ও স্বাধীনতা দুই-ই যে নিতান্ত সীমাবদ্ধ, আমাদের শত স্বেচ্ছাচারিতা ও বিদ্রোহিতা সত্ত্বেও যে তিনি অন্তরে বাহিরে নানা ভাবে, নানা উপায়ে, অসীম প্রেম ও ধৈর্য্যের সহিত আমাদের ইচ্ছার পরিবর্ত্তনসংঘটনে, ও স্বেচ্ছাক্রমেই যাহাতে আমরা তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলিতে প্রস্তুত হই তৎসাধনে নিযুক্ত রহিয়াছেন, এবং অবশেষে যে আমাদিগকে তাঁহার অনুগত হইতেই হয়, তাঁহার ইচ্ছারই জয় হয়, সে বিষয়েও কোনই সন্দেহ নাই। ইহা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন, উভয় সম্বন্ধেই সত্য। সুতরাং কোনও বিষয়েই নিরাশা হইবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। আমি কিছুতেই নিরাশ নই।

আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা অনেকে উপাসনাতে আসেন না, উপাসনা করেন না, ব্রাহ্মসমাজের কাজে যথেষ্ট লোক ও অর্থ পাওয়া যাইতেছে না, ইত্যাদি নানা নিরাশা ও অভিযোগের কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা যে নিতান্ত দুঃখজনক অবস্থা তাহাতে সন্দেহ নাই। আমিও নিশ্চয়ই দুঃখ অনুভব করি; কিন্তু ইহার জন্য কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করি না, নিরাশও হই না; তাঁহাদিগকে বেশী দোষীও মনে করি না। কেন না, এদিকে আকর্ষণ না জন্মিলে, হৃদয়ে প্রেরণা অনুভব না করিলে, প্রাণে তাঁহার আহ্বান না বুঝিতে পারিলে, কেহ তাহা করিতে পারে না। অপরের আদেশে অনুরোধে বা প্রশংসালাভের জন্য দুই চারি দিন করিতে পারিলেও অধিক দিন পারে না; তাহাতে প্রকৃত কল্যাণও নাই, বরং অকল্যাণই সাধিত হয়। অবশ্য, অধিক আগ্রহ অনুরাগ না থাকিলেও, স্পষ্ট প্রেরণা অনুভব না করিলেও, শুধু কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে অথবা নিয়মরক্ষার জন্য বা সামান্য ইচ্ছা লইয়া করিলেও, প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। সুতরাং সেই ভাবে ইহা করাও প্রত্যেকের পক্ষে উচিত, করিতে পারিলে ভালই হয়। কিন্তু কেহ তাহা না করিলে, বা করিতে না পারিলে, বিরক্ত বা অস্থির হইয়া কোনই লাভ নাই; তাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণও নাই। অপরপক্ষে, উদাসীনতা, অবহেলা, বিদ্রোহিতা, কোনও প্রকারেই চিরদিন থাকিবে না, একদিন না একদিন ফিরিতেই হইবে,—তিনি কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না, কাহারও সম্বন্ধে তাঁহার প্রেম ও জীবন্ত মঙ্গলবিধাতৃত্ব এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিরত হয় না; উপযুক্ত সময়ে তাঁহার ইচ্ছা ও কার্য্য পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইবেই হইবে। ইচ্ছা করিয়া তাঁহার অধীন হইলে, অনুগত হইয়া চলিলে, সে জন্য আগ্রহান্বিত ও যত্নশীল হইলে, তাহা সহজে অল্প কালে সাধিত হয়; আর, তাহা না করিলে, অনেক দুঃখ ক্লেশ পাইয়া, সংগ্রামে ও আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া, দীর্ঘকাল পরে, পরাজিত হইয়া, ফিরিতে হয়,—বাধ্য হইয়া তাঁহার হাতে আত্মসমর্পণ করিতে হয়।

ব্রাহ্মসমাজের পশ্চাতেও তেমনি তাঁহার প্রেম ও জীবন্ত মঙ্গলবিধাতৃত্ব রহিয়াছে। এক দিন যেমন নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া তিনি তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন ও উন্নতির পথে আনিয়াছেন, যখন যেরূপ প্রয়োজন হইয়াছে আশ্চর্য্যরূপে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন—উপযুক্ত লোক ও আবশ্যকীয় অর্থ আনিয়া ইহার কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন, ঘোর দুর্দ্দিনেও ইহাকে পরিত্যাগ করেন নাই,—ভবিষ্যতেও তিনি ইহাকে তেমনি পরিত্যাগ করিবেন না, ইহার সুপরিচালনের যথোপযুক্ত উপায় করিবেন। কোথা হইতে কি উপায়ে নূতন কর্ম্মী ও অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার কার্য্য চালাইবেন, তিনিই জানেন;—আমরা কিছুই বলিতে বা বুঝিতে

পারি না। আমরা যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া আপনাকে অথবা আপনার অর্থ বিত্ত সেই কার্য্যে নিযুক্ত করি, তবে আমরাই ধন্য হইয়া যাইব। আর, তাহা না করিলেও তাঁহার কার্য্য বন্ধ হইবে না,—আমরা নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইব। আমরাই অযোগ্য বলিয়া তাঁহার কার্য্য হইতে অপসারিত হইব। আমাদের স্থলে তিনি নূতন লোক ডাকিয়া আনিবেন, অপরের দ্বারা তাঁহার কার্য্য করাইয়া লইবেন। কাজেই দুঃখিত হইবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, নিরাশ হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই

কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদিগকে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া অচল ভাবে ভবিষ্যতের আশায় বসিয়া থাকিতে হইবে, তাহা নহে। ইহা কোনও ক্রমেই সঙ্গত বা বিধেয় নহে—সম্ভবপরও নয়। ইহাতে আমরাই অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইব, অবনতির পথে দ্রুত ধাবিত হইব, দুঃখ ক্লেশে জর্জ্জরিত ও ক্ষত বিক্ষত হইব, আমাদেরই উন্নতি ও কল্যাণ, আনন্দ ও সুখ শান্তি সুদূর-পরাহত হইবে। আর, এ ভাবে যে খুব দীর্ঘকাল স্থির হইয়া থাকা যায়, তাহাও নহে; বিশ্ববিধাতার এমনই ব্যবস্থা যে, অস্থির হইয়া উঠিতেই হয়। সে যাহা হউক, বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, অনর্থক দুঃখ যাতনা ভোগ না করিয়া, আপনা হইতে উচ্চতর কল্যাণময় জীবন, আনন্দ শান্তি ও পুণ্য প্রেমের জীবন লাভ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত ও চেষ্টিত হওয়াই, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগত হইয়া চলিবার জন্য আপনাকে স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই, তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করাই যে বিধেয় এবং একান্ত স্বাভাবিক, তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং নিজ সুখ স্বার্থ কল্যাণের জন্যই আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা করিতে হইবে কিছুতেই আমরা উদাসীনতা অবহেলার মধ্যে নিশ্চেষ্ট ভাবে আলস্যে দিন কাটাইতে পারি না।

এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাঁহার প্রেমের শুধু একটা দিক দেখিলেই যথেষ্ট হইবে না। তাঁহার অসীম প্রেমের আর একটা দিকও আছে। তাহার একটা দাবিও আছে। প্রেমময় আমাদিগকেও প্রেম দিয়াই গড়িয়াছেন, প্রেমই আমাদের জীবনের প্রধান উপাদান এবং সেই প্রেমের বর্দ্ধন ও পরিপোষণ আমাদের একটি অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং প্রেমশূন্য হৃদয়ে অন্যের কথা ভুলিয়া, শুধু আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে আমরা কিছুতেই উন্নত কল্যাণময় জীবন, পুণ্য ও প্রেমের জীবন লাভ করিতে পারিব না। Doing nothing for others is the undoing of oneself—অন্যের জন্য কিছু না করা আপনারই বিনাশসাধন করা। এইজন্য আমাদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক, চেষ্টা যত্ন করিয়া, অন্যের কল্যাণের জন্য ভাবিতে হইবে, খাটিতে হইবে—অপরের জন্য উদার বিশুদ্ধ প্রেম ও শুভাকাঙ্ক্ষা সর্ব্বদা হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে। প্রেমস্বরূপ আমাদিগকে যেমন প্রেম দিয়া গড়িয়াছেন, তেমনি প্রেমে পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন—সকলের কল্যাণ একই সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। জীবনের বিশালতা গভীরতা ও পূর্ণতা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব, শুদ্ধতা ও পবিত্রতা প্রেমের উপরই নির্ভর করে। প্রেমহীন জীবন নিতান্তই সংকীর্ণ, শুষ্ক ও মরুসদৃশ। অপরের জন্য ভাবিয়া, অপরের জন্য খাটিয়া, আমরা তাহাদের যত উপকার না সাধন করি, তাহা অপেক্ষা নিজেরাই শত সহস্রগুণে উপকৃত হই। আপনারাই উন্নত ও বিকশিত হইয়া উঠি, প্রকৃত মনুষ্যত্বে উপনীত হই, চিরস্থায়ী আনন্দ ও শান্তিলাভ করি। আপনাকে ভুলিয়া অন্যের জন্য নিজেকে দান করিলে যে আনন্দ ও সুখ পাওয়া যায়, হৃদয়ের প্রশস্ততা ও বিশালতা লাভ করা যায়, তাহার তুলনা নাই। পাওয়া অপেক্ষা দেওয়াতেই অধিকতর সুখ ও কল্যাণ। এই জন্যই বলা হইয়াছে "একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।" তাহা ভিন্ন সে প্রেম পাইবার অন্য উপায় নাই। প্রেমে যেমন ত্যাগ আনে, তেমনি ত্যাগেই প্রেম বর্দ্ধিত করে। যখন সকলের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলি, তখনই আপনাকে ও সকলকে ভাল করিয়া পাই। যখন তাঁহার জন্য আপনাকে সর্ব্বতোভাবে অর্পণ করি, তখনই নিজেকে ও তাঁহাকে সত্যরূপে, উজ্জ্বল রূপে, পাই। তাই আমাদের সমস্ত ইচ্ছা অভিরুচি বিসর্জ্জন দিয়া আপনাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার এই প্রেমের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে—তাঁহার মধ্যে ও তাঁহার এই জগতের মধ্যে আপনাকে পূর্ণরূপে ডুবাইয়া দিতে হইবে। কোনও বিষয়ে আপনাকে রাখিতে গেলে, আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে দেখিতে গেলে চলিবে না। যখন আর কিছু না করিতে পারি, তখনও সকলের জন্য প্রার্থনা করিতে পারি, প্রেম ও শুভ কামনায় হৃদয়কে পূর্ণ রাখিতে পারি। এবং তাঁহার ইঙ্গিত ও আদেশ মানিয়া চলিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারি। তাহা হইলে প্রেম পুণ্য, আনন্দ শান্তি, শক্তি সামর্থ্য, কিছুরই অভাব হইবে না। আমাদের একমাত্র কাজ তাঁহার হাতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া। আমরা যদি এইটুকু করি, তবে আর সমস্ত আপনা হইতেই আসিবে, প্রেমময় জীবনবিধাতা নিজেই করিবেন। তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইবে, প্রেমের জীবন, সেবার জীবন, গড়িয়া উঠিবে—উৎসব যথার্থরূপে ফলপ্রদ হইবে। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগত করিয়া লউন, আমাদের জীবনে এই উৎসব সফল করুন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই প্রতি জীবনে সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হউক।

অনন্তর শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, ভাই সীতারাম ও শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায় এই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহার পরে ৪ ঘটিকার সময় আবার ইংরাজীতে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

ভগবদুক্তিরূপে কথিত আছে—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

আমি বৈকুণ্ঠে বা যোগিদের হৃদয়ে বাস করি না, কিন্তু আমার ভক্তেরা যেখানে আমার নাম গান করেন, আমি সেই

স্থানে অবস্থান করি। এই পুরাণ ও যোগমাহাত্ম্যের দেশে, এই উক্তিটি খুব সাহসের পরিচায়ক। কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যের একটা স্বাভাবিক তেজ আছে যাহা পরম্পরাগত সকল শ্রুত কথার বাধাকে সহজেই অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। এবং এই সত্যটি কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের অভিজ্ঞতার কথাও নয়। ভগবদ্গীতাও এই কথার উপর জোর দিয়াছেন—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

এখানে যে সাধনের কথা বলা হইল, তাহা নির্জ্জন সাধন নহে, উহা সমবেত সাধন। মহাভারতের অন্যত্রও (অনুশা, ১৭।১৬৩) এই উপদেশ আছে। যাহা হউক, গীতা পরমার্থ-জ্ঞানের এই পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

এই রূপেই সেই বুদ্ধিযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহার পরিণতি ব্রহ্মলাভে। সাধারণ মানুষ যে মনে করে ব্রহ্মলাভের জন্য জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়, গীতা এখানে তাহার প্রতিবাদই করিতেছেন। মণ্ডলীগত সাধনেই অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়, আত্মায় পরমাত্মার আবির্ভাব হয়।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

এই তত্ত্ব যে কেবল হিন্দুশাস্ত্রেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাও নহে। বৌদ্ধশাস্ত্রেও বুদ্ধের উক্তিরূপে আছে—"যেখানে বুদ্ধের আধ্যাত্মিক সন্তান সেই খানেই আমি।" ইহুদীদের Talmudএ আছে—"যেখানে দুই ব্যক্তি বসিয়া ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত হয়, সেই খানেই পবিত্রাত্মার আবির্ভাব হয়।" এই কথারই প্রতিধ্বনি মথি লিখিত সুসমাচারে পাওয়া যায়—Where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them." কোরাণে দেখি—"হে মহম্মদ, যখন আমার বিশ্বাসীরা আমার বিষয়ে উপদেশ শুনিবার জন্য তোমার নিকটে আসে, নিশ্চয় জেনো আমি নিকটেই রহিয়াছি।'

ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, যে সামাজিক জীব মানুষ—যাহার দেহ মন আত্মা, যার জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা তার সামাজিক জীবনেরই ফল, সমবেত জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে যে দুদিনে মনুষ্যপদবী হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া যায়, সে তার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি যে ব্রহ্মলাভ তার জন্য মণ্ডলীর সহায়তা আকাঙ্ক্ষা করিবে। স্বাভাবিক ভাবেই সে তাহা আকাঙ্ক্ষা করে। না করাটাই অস্বাভাবিক। সুফীরা বলেন,—"There are as many ways of God as there are men." সকলের মধ্যেই ব্রহ্ম নিজেকে প্রকাশিত করেন। আমার মধ্যে তাঁর প্রকাশটাই যদি সব হইত, তবে আর এই বিচিত্র সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা থাকিত না। সুতরাং এই বিচিত্রানন্দ অনন্তস্বরূপের সঙ্গলাভ করিতে হইলে সকল কেন্দ্রের সঙ্গে যোগরক্ষা করিতে হইবে—সকল রূপ আসিয়া এক কেন্দ্রে প্রতিফলিত হইবে। তবেই না প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন। সকল বিরহিত যে "আমি" তাহা ছিন্ন-সত্তা—কল্পনা মাত্র, সত্য বস্তু নহে। সেই জন্য সঙ্গত ছাড়া প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হয় না। এই তত্ত্বটাই, গীতার "বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্" এই কথায় প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকে একাকিত্বের কৈবল্য-লাভের দিকে চলিয়া যান; এমন অনেক প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহাতে যে আনন্দলাভ হয়, তার খাতিরে স্বাভাবিক সামাজিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, যে তাঁহাদের এই সুখস্পৃহা ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়বিলাসী বা মদ্যপায়ীর মাদকতার আকার ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে অধঃপাতিত করে। কেন না, একাকিত্বের সুখ মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক।

কোন ওজুহাতেই মানুষ মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মজীবন বলিতে বুঝায় যে মানুষ জ্ঞাতসারেই হউক, অজ্ঞাতসারেই হউক, সকলের জীবনে বাস করে, সকলকে প্রেম করে ও সকলের সেবা করে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বলিতেছি এই জন্য, যে এখন আর এরূপ আশা করা যায় না—ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সকলের ধারণা এক হইবে এবং সিদ্ধি কি সে বিষয়েও সকলে একমত হইবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বা মণ্ডলীগত স্বাধীনতার ভাব মানুষের পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা আর মধ্য-যুগের ধর্ম্মোন্মাদদের মত এখন দাবী করিতে পারি না যে সকলের ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস এবং উপাসনার বাহ্য আকার একই রকমের হইবে। অথবা লণ্ডনের বর্ত্তমান লর্ড বিশপের মত বলিতে পারি না:—"I have been round the world and have found in other religions no candle of truth to light them on their way." যে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এই বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানালোকিত যুগে এরূপ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে বলিতে পারে যে অন্য কোন ধর্ম্মে মানুষকে পথ দেখাবার মতন কোন সত্য নাই, তিনি তাঁর বেতনের টাকাটি নিয়ে দশম শতাব্দীতে যাইয়া বাস করিবারই উপযুক্ত, বিংশ শতাব্দীতে তাঁর স্থান নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, কংফুচমতাবলম্বী, সিণ্টোমতবাদী বা Tao ধর্ম্মাবলম্বী যাঁহারা নিজ নিজ মত ও বিশ্বাসের জন্য সর্ব্ব প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত, আমাদের ঈশ্বরের ধারণার মত তাহাদের ধারণা নয় বলিয়া বা আমাদের সঙ্গে এক পূজার মন্দিরে পূজা করিতে আসে না বলিয়া কি বলিব তাঁহারা পাষণ্ড (Secularist)? তেমনই বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা শিল্প বা বিজ্ঞানের অনুশীলনে বা অনুধ্যানে সর্ব্বদা নিরত, সর্ব্বপ্রকার শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া ও ভোগবিলাস পরিহার করিয়া কেবল মাত্র তত্ত্বের অনুসন্ধানে নিযুক্ত, ইঁহাদের আদর্শ অপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু ইঁহাদিগকেও Secularist বলিতে পারিব না। বাস্তবিক Secularist সেই যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে বলিয়া স্বীকার করে, ধর্ম্মের আচার নিয়ম পালন করে, বাহ্যতঃ অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেয়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেবলই সুখান্বেষণ তাহার জীবনের ব্রত। যেখান হইতেই হউক, সুখলাভ তাহার উদ্দেশ্য। ধর্ম্মও তার সুখের সাধন মাত্র। এই ব্যক্তিই বাস্তবিক secularist. তাই তাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে উপদেশ দিয়াছেন, যাহা আমাদের কথায়

স্বরূপ, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া শেষ করিতেছি—"Live in the life of other men who are around thee. Live with zest in this kindly earth which God hath furnished for thee, in thy home which is the sanctuary of mutual service; live in the society of men and women to do thy good work; live in the household of God—among thy fellow worshippers. Even as thou now act, live fully the mortal and immortal life which is one. But not for thine own pleasure or worldly profit, only that is the canker that eats out the very heart of life."

---

অতঃপর ৫॥ ঘটিকা হইতে সংকীর্ত্তন চলিতে থাকে এবং সংকীর্ত্তনান্তে যথাসময়ে সায়ংকালীন উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। "অমৃত ধনে কে জানে রে" ইত্যাদি প্রথম সঙ্গীতের পর তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন :—

পুরাণাদিতে এমন অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে, যাহা দ্বারা কোনও আধ্যাত্মিক সত্য বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। উৎসবের মধ্যে ইহুদীদের ইতিহাস ও খৃষ্টীয় পেন্টিকষ্টের কথা বলা হইয়াছে। কাল আচার্য্য বলিয়াছিলেন, কেনই যে ১১ই মাঘে এরূপ ব্রহ্মকৃপা বর্ষিত হইয়া আসিতেছে, জানি না। একেবারে জানি না, এমন নয়। কিছু বলিতে পারি বৈ কি। যেখানে দশটি ব্যাকুল আত্মা মিলিত হয়, ভগবানের কৃপা সেখানে বর্ষিত হয়। পেন্টিকষ্টের কথা সকলেই জানেন। কি যে ঘটিয়াছিল তাহা বলা যায় না। ব্যাখ্যাকারগণ রূপক বাদ দিয়া কিছু কিছু বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকে এক ঘরে আবদ্ধ, ব্যাকুল প্রার্থনায় নিযুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে এমন এক প্রেরণা আসিল, যে তাঁহারা যে সকল ভাষা জানিতেন না তাহাতেও কথা বলিতে লাগিলেন। জেরুজেলেম নগরীতে সে সময় নানা দেশের লোক মিলিত হইত। সহরে কোলাহল পড়িয়া গেল, অনেকে দেখিতে আসিল। ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—tongues (নানা ভাষা) কথার অর্থ ecstatic utterance of praise (উচ্ছ্বাসময় প্রশংসা-গীতি)।

বহুদিন পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে এক বন্ধু একদিন গান করিতেছিলেন, আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাব আসিল—মনে হইল অনন্তের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, প্রাণ অনন্তের পানে ছুটিয়া গেল। তাহার কিছু দিন পরে কার্লাইলের কথা পড়িলাম —"Music leads us to the edge of the Infinite and lets us for moments gaze into it"—(সঙ্গীত আমাদিগকে অনন্তের দ্বারে লইয়া যায়, কিছু কালের জন্য আমাদের দৃষ্টি তাহার ভিতরে প্রবেশ করে)। তাহার পর ফেবারের একটি কবিতায় পড়িলাম "The beauty of God becomes visible in music"—ভগবানের সৌন্দর্য্য সঙ্গীতে দৃষ্টিগোচর হয়। সেই অসীম সৌন্দর্য্য আত্মার সম্ভোগের বস্তু। সঙ্গীতই এই সৌন্দর্য্যবর্ণনার ভাষা। ইহার আভাস পাইয়া আমরা প্রলুব্ধ হই, আমাদের চিত্ত এই অসীমের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। আমাদের অন্তরে এই বর্ণনাতীত রূপের প্রকাশে বহুদিনের পাপ তাপের ব্যথা দূর হয়। ইহাই আমাদের নিত্য প্রার্থনার বিষয়। ইহাই আমাদের চির আকাঙ্ক্ষার বস্তু।

সাধনের একটী প্রধান অঙ্গ, চারিদিকে কত দুঃখ তাপ তাহা স্মরণ করিয়া নিয়ত সকলের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা। St Paulএর উপদেশ—তোমরা পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর। পরলোকবাসীগণের জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। উৎসবের সূচনা হইতে মনে হইতেছে পরলোকবাসী ধর্ম্মবন্ধুগণ আমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন। তাঁহাদের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছি, তাঁহাদের শান্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছি। কাল আচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিলাম আমাদের প্রার্থনা আকাশ পথে অমৃত লোকে যাইতেছে। প্রাণ আশায় পূর্ণ হইল। আমরা সেই লোকে সকলে ব্রহ্মের চরণে মিলিত হইব

আমি অতি দীন। উৎসবে যোগ দেওয়া অবধি এই প্রার্থনা করিতেছি, ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হউক। ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্। অন্য সম্বল নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী অমূল্য কথা স্মরণ হইতেছে। একবার বলিয়াছিলাম, "It does not require many words to give utterance to great truths"—(গভীর সত্য প্রকাশ করিবার জন্য অনেক কথার প্রয়োজন হয় না।) দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম বার্কের একটি বাক্য—"All law is only beneficence acting by rule", সকল রাজনৈতিক বিধিই নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর দ্বারা লোকহিত-সাধন মাত্র। আর একটি দৃষ্টান্ত যিশুর বিখ্যাত উক্তি—"Be ye perfect even as your Father is perfect"—তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ন্যায় পূর্ণরূপে শুদ্ধ ও পবিত্র হও। এখানে একটী কথায় ধর্ম্ম ও নীতির চরম তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে The science of Morals (নীতি-বিজ্ঞান) ও Religion (ধর্ম্ম) এর পার্থক্য লইয়া কত তর্ক বিতর্ক হয়! দার্শনিক ফিক্‌টে এক কথায় তাহার উত্তর দিয়াছেন। তুমি ভগবানকে ছাড়িয়া সাধুতার অর্থই বুঝিতে পার না, সাধুতা লাভও করিতে পার না। "পর দ্রব্য অপহরণ করিও না", "মিথ্যা কথা বলিও না"—এ ত নৈতিক জীবনের আরম্ভ মাত্র। অন্তরে ভগবৎপ্রকাশের সঙ্গে যে পুণ্যের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। সার ফিলিপ সিড্‌নি মৃত্যুকালে তাঁহার পিপাসা নিবারণের জন্য যে জল আনা হইয়াছিল, তাহা "Thy necessity is greater than mine" (আমার অপেক্ষা তোমার প্রয়োজন বেশী) বলিয়া এক মুমূর্ষ সৈনিককে দিলেন, এ নীতি না ধর্ম্ম?

এইরূপ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী কথা—"প্রকাশ-মন্দির"—যে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া ছায়াতে বসিলেও প্রাণ শীতল হয়। ইয়ুরোপে পূর্ব্বকালে নিয়ম ছিল অপরাধী ধর্ম্মমন্দিরে আশ্রয় লইলে নিরাপদ হইত—কেহ তাহার গায়ে হাত দিতে পারিত না। আমার অপরাধ স্মরণ করিয়া যদি সরল ভাবে

অনুতাপিত হই, তবে সেখানে নিরাপদ হইয়া যাই। কাহারও সাধ্য নাই সেখানে আমাকে আক্রমণ করে। ভিক্টর হুগোর একটি কথা পড়িয়াছি—অনুতাপযাতনার সময়ে মনে হইবে তুমি নরকে আছ; কিন্তু তাহাতে ভয় পাইও না, জানিও পরমেশ্বর তোমার নিকটেই দাঁড়াইয়া আছেন। যদি অনুতাপবেদনায় হৃদয় পূর্ণ হয় তাহাতে ভয় নাই, যে পথে গেলে তাঁহার নিকটে যাইতে পারিব তাহা অতি দুর্গম হইলেও সেই পথেই চলিতে হইবে। আমরা সেই প্রকাশ-মন্দিরের নিকটে আসিয়াছি। এখানে আশ্রয় পাইলে আর কোন ভয় নাই। উৎসব-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিয়ত স্মরণ করিতে হইবে তিনি স্বপ্রকাশ, দেখা দেন নিজ গুণে। তাঁহার পরিচয় সাধনের দ্বারা পাই নাই। বেদনার দ্বারা পাইয়াছি। "He does not despise a contrite spirit"—ভগবান অনুতপ্ত আত্মাকে ঘৃণা করেন না। ভগ্নহৃদয়বাসী পিতা আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হউন। অনেক বার তাঁহার প্রকাশ-মন্দিরের শীতল ছায়াতে আমাদিগকে শীতল করিয়াছেন। কত সময় মধুর বাণীতে সান্ত্বনা দিয়াছেন! যদি আজ না দেন তবে তাহার মধ্যে গূঢ় অভিপ্রায় রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। "Wait patiently for the Lord," (ভগবানের জন্য ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা কর) এই কথা মনে রাখিতে হইবে। যদি তাঁহার কৃপা-স্পর্শ না দেন, যদি আনন্দে ডাকিতে না পার, সহিষ্ণুতার সহিত প্রতীক্ষা কর। বিশ্বস্ত কুকুরের কথা পড়িয়াছিলাম। প্রভু যে দিন খাবার দিতেন সে দিন আনন্দে প্রভুর সেবা করিত, যে দিন খাওয়া মিলিত না সে দিনও তেমনি ভাবেই প্রভুর সেবা করিত—"a stomach empty, but conscience calm"—উদর শূন্য, কিন্তু বিবেক স্থির শান্ত। সেইরূপ বিশ্বস্ত কুকুরের মত হইতে হইবে, ভাব ভক্তি নাই, তবু গান করি—

"যখন যে রূপে বিভু রাখিবে আমারে
সেই সুমঙ্গল, যেন না ভুলি তোমারে।"

গীতায় যে "তৎপরঃ" কথাটী ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা "তদেকনিষ্ঠঃ।" তাঁহার দরজায় পড়িয়া থাকিতে হইবে। দশ জনের দরজায় বেড়াইয়া কি হইবে? এমার্সন বলিয়াছেন—"Let the Lord of my castle appear and I will lay the keys at his feet"—আমার হৃদয়-দুর্গের প্রভু আসুন, তাঁহার পদতলে আমি দুর্গের চাবি রাখিয়া দিব, তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিব। এই প্রকার নিষ্ঠার ভিখারী হইয়া প্রকাশমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হই।

হে পুরুষোত্তম, কৃপা করিয়া আমাদের নিকট প্রকাশিত হও, এই প্রার্থনা। আমরা তোমার প্রকাশরূপ পরম ধনের প্রার্থী, আজ আমাদের হৃদয় স্পর্শ কর। হৃদয় একটু কোমল করিয়া দিয়াছ। ভক্তবাণী শুনিয়া আনন্দ হইতেছে। শুনিয়াছি "তব প্রসাদলাভে পাপ তাপ না রহে।" এস তবে, তোমার চরণে আমাদিগকে স্থান দাও। তোমার কৃপা ভিক্ষা করিয়া তোমার পূজাতে প্রবৃত্ত হই।

"একবার এস হে ও করুণাসিন্ধু" ইত্যাদি দ্বিতীয় সঙ্গীতের পর আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনা। অনন্তর "মঙ্গল বিধান বিঘ্নেও কৃপাণ মুক্তির সোপান অন্য কেবা" ইত্যাদি তৃতীয় সঙ্গীতের পর, আচার্য্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করেন:—

"Commit thy ways unto the Lord." "Rest in the Lord and wait patiently for Him."—তোমার সমস্ত ভার প্রভু পরমেশ্বরের উপর অর্পণ কর। প্রভু পরমেশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর স্থাপন করিয়া ধৈর্য্যের সহিত তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা কর।

কিছুদিন হইতে অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছে—বড় উচ্চাভিলাষ, কিন্তু ইহা ভিন্ন গতি নাই—আত্মবিনাশ করিতে হইবে, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। কি খাইব, কি পরিব, কোথায় যাইব, কি করিব, সমস্ত বিষয়েই তিনি যন্ত্রস্বরূপ করিয়া লইবেন—যাহা বলাইবেন তাহা বলিব, যে ভাবে চালাইবেন সেই ভাবে চলিব। সম্পূর্ণরূপে তিনি অধিকার না করিলে উপায় নাই। একদিকে জ্ঞানীদের কথা শুনিয়া ভয় হয়—তাঁহার বাণী rare (দুর্লভ), সকল সময় তাঁহার বাণী আসিবে না। আর এক দিকে দেখিতেছি তাহা না হইলেও চলিবে না। "A man should learn to detect and watch that gleam of light which flashes across his mind from within more than the lustre of the firmament of bards and sages."—মানুষ কবি ও মনীষীদিগের উজ্জ্বল আলোক অপেক্ষা অন্তর হইতে তাহার হৃদয় মধ্যে যে ক্ষীণ আলোক-রেখা প্রকাশিত হয় তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে এবং তাহাকে চিনিয়া লইতে চেষ্টা করিবে। ওয়ার্ডসোয়ার্থ বলিয়াছেন—"It is the most difficult of tasks to keep heights which the soul is competent to gain"—আত্মা যে উচ্চ স্থানে সময় সময় পৌঁছিতে পারে সেখানে স্থির থাকা অতি কঠিন। বড়ই কঠিন, অনেকেই এই কথাই বলিয়াছেন। আধ্যাত্মিক জীবনের জোয়ার ভাটা বড় কঠিন কথা। কেবল ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভেই যে ইহা ঘটে, তাহা নয়। ম্যাডাম গিয়ঁর কথা সে দিন বলিয়াছিলাম। হঠাৎ প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায়। কেন হয় সকল সময় তাহা বলা যায় না। কিন্তু এই প্রার্থনা না করিয়া পারি না—কি করিব, কি ভাবে কাজ করিব, বলিয়া দাও।

দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণার কথা শুনিয়াছেন। কেবল বড় বড় ঘটনায় নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভারও তাঁহার উপর। দেরাদুন হইতে মসুরী যাইবেন—গাড়ী আসিয়াছে—জিনিষ পত্র উঠান হইতেছে আর নামান হইতেছে। চৌদ্দবার এরূপ হইল। যাবেন কি না যাবেন ঠিক হইতেছে না, প্রেরণা পাইতেছেন না। প্রাণ এরূপ ব্যাকুল যে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার নির্দেশ অনুসরণ করিয়া চলিবেন, তাহা স্পষ্ট না বুঝিয়া কিছু করিবেন না। এই রূপই হইতে হইবে। আর গতি নাই। কি করিব? ক্যাসাবিয়াঙ্কার কথা মনে হইতেছে। পিতা দাঁড়াইয়া থাকিতে আদেশ করিয়াছেন, দাঁড়াইয়াই আছেন। "আমি কি জানি, আমাকে পিতা যেখানে রাখিয়াছেন—অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইলেও—অন্য আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত সেখানেই

দাঁড়াইয়াই থাকিতে হইবে।" এইরূপ একান্ত অনুগত হওয়া ভিন্ন উপায় নাই।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, সকল অবস্থায় তাঁহার অনুপ্রাণন চাই। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার কি অভিপ্রায় জানা আবশ্যক। এই আকাঙ্ক্ষা প্রাণে আসিয়াছে। আমি উপদেষ্টারূপে আসি নাই। আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া আসিয়াছি।

"The steps of a good man are ordered by the Lord,"—সাধু ব্যক্তির পদবিক্ষেপ প্রভুর দ্বারা নিয়মিত। তিনি বলুন কি করিব, তিনি পথ দেখাইয়া দিলে সেই পথে চলিব। এই রূপেই চলিতে ইচ্ছা হয়। তাহা ভিন্ন যে আর চলিতে পারি না। পথ পাই না, আশ্রয় পাই না, কেবল ঘুরিয়া বেড়াই। এই ভাবেরই একটি কথা মাডাম গিয় বলিয়াছেন। অনেক দিন পরে, struggle (সংগ্রামের) এর অবস্থা পার হইয়া বলিয়াছেন—

"Alone as its were in the world, forsaken of all human aid and not knowing what God wants of me, I saw myself without refuge and retreat, wandering like a vagabond on the face of the earth. I walked in the streets, I saw the tradesmen busy in the shops: all seemed to be happy in having a home, a dwelling place to whicn they could retire. I felt sadly that there were none for me,"

আমি দেখিতে পাইলাম আমি যেন সকল প্রকার মানবীয় সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া এবং ভগবান আমার নিকট কি চাহেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া, একাকী গৃহ ও আশ্রয়হীন ভবঘুরের ন্যায় পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমি রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতাম, আর দেখিতাম দোকানী পসারীরা দোকানে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত আছে। তাহাদের বিশ্রামের জন্য গৃহ ও বাসস্থান আছে বলিয়া সকলকেই বেশ সুখী বোধ হইতে লাগিল। আমি দুঃখের সহিত অনুভব করিলাম, আমার কোন আশ্রয় নাই।

যিশুও এই কথা বলিয়াছিলেন, শিয়াল কুকুরেরও গর্ত্ত আছে, মাথা রাখিবার স্থান আছে, but the son of man has not where to lay his head—কিন্তু মানব সন্তান আমার একটু মাথা রাখিবার যায়গা নাই। ঠিক আমার মনের কথা। এই অবস্থার মধ্য দিয়া যাইয়া শেষে সেই পরা শান্তি, সেই গভীর যোগ লাভ করিলেন।

"The result of all religion is to bring in union with God. We are made one with him in understanding, when by renouncing our own wisdom we seek continually and believingly wisdom from on high; one in affection, when we desire and love what He desires and loves; one in will, when our purposes are same as His are."—ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করাই সকল ধর্ম্মের শেষ ফল। যখন আমরা আপনার জ্ঞানবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ হইতে জ্ঞানালোক পাইবার জন্য নিয়ত বিশ্বাসের সহিত চেষ্টা করি, তখনই আমরা তাঁহার সহিত জ্ঞানে যুক্ত হই; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন ও ভালবাসেন আমরা যখন তাহাই ইচ্ছা করি ও ভালবাসি, তখন তাঁহার সহিত প্রেমে এক হই; এবং তাঁহার যাহা ইচ্ছা ও অভিপ্রায় আমাদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা যখন তাহাই হয়, তখনই আমরা ইচ্ছাতে এক হইয়া যাই। "This life of union, which is the highest and most glorious result of our being, is the gift of God." এই যে আমাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় ফলস্বরূপ যোগের জীবন, ইহা ভগবানের কৃপার দান।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্। এই ভক্তি তাঁহার দান। ভক্তি কাহাকে বলে? আমি আর আমাতে নাই। তিনি যাহা বলিবেন তাহাই বলিব, তিনি যাহা করাইবেন তাহাই করিব। ইহাই ভক্তি। তবে এখন কি করি? নিয়ত ভিখারী হইয়া থাকিতে হইবে। তিনি "সবার দারিদ্র্যভঞ্জন", এই বলিয়া ডাকিতে হইবে।

জগতের লোক যাহাকে ধন বলে তাহা কিছু নয়। যশোমান খ্যাতি প্রতিপত্তি অতি তুচ্ছ জিনিস। সেণ্ট অগাষ্টিন বলিয়াছেন "those toys which men call fame"—যাহাকে মানুষ খ্যাতি বলে সে খেলনা মাত্র। ক্রমোয়েল যেদিন Lord Protector পদে অভিষিক্ত হইবেন সেদিন অভিষেকোৎসব দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক রাজপথে বাহির হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার এক বন্ধু বলিলেন, "দেখ, কত লোক তোমাকে দেখিতে আসিয়াছে।" তিনি বলিলেন, "কাল যদি আমার ফাঁসি হয়, এর চেয়ে অনেক অধিক লোক দেখিতে আসিবে।" সাভোনা রোলার কি খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল! তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য শীতকালের রাত্রি ৩টা হইতে বহু লোক গির্জ্জার দ্বারে রাস্তায় প্রতীক্ষা করিত। ৭।৮ হাজার লোক ধরে এমন প্রকাণ্ড গির্জ্জায়ও লোকের স্থান হয় নাই। তাঁহারই গায়ে লোকে শেষে থুথু দিল, ধূলি মাটি ছড়াইয়া দিল, তাঁহাকেই লোকে পোড়াইয়া মারিল! মিল্টন কি পুরস্কার পাইলেন? তাঁহাকে খেদ করিতে হইল—"Cut off from the cheerful ways of men, On evil days and evil tongues though fallen" লোকসমাজের সুখসন্মিলন হইতে বিচ্ছিন্ন, দুর্দ্দিনে ও লোকনিন্দার মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইয়াছে। নিন্দা লাঞ্ছনাকে তাঁহার কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিবার শক্তি কেবল তাঁহার কৃপায় পাওয়া যায়। টমাস এ কেম্পিস্ বলিয়াছেন, উহাতে তোমার পরম লাভ, অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ তোমার কি কল্যাণ হইয়াছে। রামমোহন বলিলেন, "যিনি অন্তরের অভিপ্রায় জানেন তিনিই প্রকাশ্যে পুরস্কার দিবেন।" তিনি কি ক্লেশই না পাইলেন! বিদেশে নানা দুঃখ ক্লেশের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মৃত্যুর সময়ও মুখে ওঁ ধ্বনি। পীড়া যখন কঠিন হইল, মহিলারা সেবা করিতে চাহিলেন, প্রথমে তাঁহাদিগকে সেবা করিতে দিলেন না। আমরা কি তাঁহাকে চিনিয়াছিলাম? কত দিন পরে তাঁহাকে আমরা একটু

সম্মান করিতে আরম্ভ করিলাম! সেক্সপীয়ারকে তাঁহার সময়ে কেহ জানিত না। ড্রাইডেন দেখাইলেন তিনি কত বড় প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। তখন লোকে চিনিতে আরম্ভ করিল।

কিছু দিন পূর্ব্বে কি অত্যাচার ও লাঞ্ছনাই না ভোগ করিয়াছি! মনে হইয়াছে বুকের উপর দিয়া লোহার রোলার চলিয়া গিয়াছে। গৃহ হইতে এই মনে করিয়া বাহির হইয়াছি, হয়ত আর গৃহে ফিরিব না। কিন্তু তাহাতে উপকৃত হইয়াছি। ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিয়াছি, একান্তভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছি। কিন্তু পথ হারাইয়া যায়, কর্ত্তব্য বুঝিতে পারি না, যখন তাঁহার বাণী না পাই। তোমার মন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে অনুগত কি না, এই ভাবিয়া দেখ। টমাস এ কেম্পিস্ বলিয়াছেন "God is will"—ঈশ্বর ইচ্ছাময়। তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলিতে হইবে। সাথে মীরার পত্রিকাতে বোধহয় কেশবচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"Leave all sweetness to him," সকল সরসতার ভার তাঁহার হাতে ছাড়িয়া দাও। কেবল তাঁহার অনুগত হইয়া চলিতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে সকল অবস্থায় পথ পাওয়া যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে দেশের অত্যাচার লাঞ্ছনার কথা ভাবিয়া প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগিল। বাধা দিবার কোনও উপায় নাই। লর্ড বায়রণ গ্রীসের দুর্দ্দশা সহিতে না পারিয়া তাহার জন্য প্রাণ দিয়া সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। প্রাণে প্রার্থনা জাগিল, কি করিব তুমি বল, দেশের জন্য যদি প্রাণ যায় যাউক। সকল বিষয়ে যেন সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত হইয়া চলিতে পারি।

কি প্রকারে এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে? এক উপায় আছে—"Love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul and with all thy mind"—পরমেশ্বরকে সমগ্র হৃদয় মন প্রাণের সহিত ভালবাস। প্রেমে সব হইতে পারে। প্রেমে আনুগত্য আনে। শুধু অপরের দুঃখে দুঃখিত নয়, অপরের আনন্দেও আহ্লাদিত হইতে না পারিলে বুঝিতে হইবে প্রেম হয় নাই। প্রেমে আপন পর ভেদ থাকে না, সকলকে এক করিয়া দেয়। এই প্রেম পাইলে সবই সম্ভবপর হয়।

বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দত্ত আমার নিকটে সমুদ্র তীরে বসিয়া গাইতেন—

"তুমি আমার মন ল'বে হ'রে
আমি ব'সে আছি সেই আশা ধ'রে।"

তিনি মন প্রাণ অধিকার করিলে আর কোনও অভাব থাকে না, সবই সহজ হইয়া যায়। তখন তাঁহার জন্য সকলই বিসর্জ্জন করা যায়। আত্মলোপ আর কঠিন থাকে না।

ম্যাট্সিনী ২০ বৎসর একটী ক্ষুদ্র ঘরে আবদ্ধ ছিলেন। ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া সমুদ্র ও আকাশ দেখিতে পাইতেন মাত্র। অনন্তস্বরূপের এই প্রকাশেই তাঁহার তৃপ্তি। ডাক্তার আর্ণল্ড এই প্রার্থনা করিলেন—'ক্লেশ দিও না, আমি এ প্রার্থনা করি না। যাহাই দেও তাহা যেন সহ্য করিবার শক্তি পাই, এই প্রার্থনা।' হৃদরোগে তাঁহার মৃত্যু হইল, যখন বুকে ব্যথা আরম্ভ হইল, তখন পুত্রকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, এ বেদনা পরমেশ্বরের কৃপা।" এর অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার দেহত্যাগ হইল। এই সকল মহাপুরুষের ভক্তিভাব আমাদের চির অনুকরণের, চির প্রার্থনার বস্তু।

এই ভক্তি gift of God—পরমেশ্বরের দান। তিনি না দিলে, কেমন করিয়া পাইব? এখানে যে কাজ করি, তাহা অন্তঃপ্রেরণা হইতে না করিলে সুখ নাই। যদি বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিতে কাজ করা যায় তবে মহা অকল্যাণ হয়। সেণ্টপলের কথা এই, আকাঙ্ক্ষা করি না যে রচনানৈপুণ্যের দ্বারা যশ লাভ করি। আমার বাক্যের দ্বারা যেন অপরের কল্যাণ হয়।

"The littleness of all that is not God"—অনন্তস্বরূপ ব্যতীত আর যাহা কিছু সকলই অল্প, নিয়ত এই অমূল্য সত্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক দিন পরে বুঝিতে পারিয়াছি আত্মবিনাশ ভিন্ন গতি নাই। আবার প্রেম ভিন্ন তাহা হয় না। যদি সেই প্রেমমুখ দেখা যায় তবে আত্মবিনাশ সহজ হয়, আর কঠিন থাকে না।

প্রতিবাসীর বাড়ীতে দেবতার পূজার আয়োজন করিয়া দেওয়া এক ভদ্র নারীর নিত্যকর্ম্ম ছিল। একদিন কাজে যাইতে গৌণ হইল। গৌণ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দিলেন—ছেলে যাত্রা করিলেন, তাই দেরী হইয়া গেল। প্রশ্ন হইল কোথায় যাত্রা করিলেন? উত্তর, মহাযাত্রা করিলেন। কি বিশ্বাস! কি নিষ্ঠা! ঢাকা কলেজের একজন ইংরেজ অধ্যাপক খুব punctually, ঠিক সময়ে, কলেজে আসিতেন। একদিন দেড় ঘণ্টা পরে আসিয়া ছাত্রদের নিকট এই বলিয়া ক্ষমা চাহিলেন যে, তাঁহার একটি কন্যা আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছেন, তাহার দেহকে পরিষ্কার বস্ত্রাদিতে সজ্জিত করিয়া আসিতে দেরী হইয়া গিয়াছে।

আমার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত করিতে হইবে। আত্মবিনাশ সাধন করিতে হইবে। এই আমার নিবেদন, নিয়ত এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

ভক্তেরা এই পথ পাইয়াছেন। প্রত্যেক কাজেই উহা তাঁহার অভিপ্রেত কি না, জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি পথ বলিয়া দিউন, তিনি সত্যম্ জ্ঞানম্, তিনি অখিল গুরু। তিনি স্বামীরূপে প্রিয়তমরূপে হৃদয়ে আসন গ্রহণ করুন। তিনি সকল হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হউন। সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগত হওয়া ভিন্ন পথ নাই।

## প্রার্থনা।

তুমি হৃদয়ে হৃদয়ে আসন গ্রহণ কর, দেশে দেশে গৃহে গৃহে আসন গ্রহণ কর, তোমার রাজ্য সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। আমাদের দ্বারাও তাহার সাহায্য হউক।

"ওহে দীন নাথ কর আশীর্ব্বাদ এই দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানে" ইত্যাদি সংগীতটি গীত হইলে পর, অনেকক্ষণ "আজি গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়" ইত্যাদি সংকীর্ত্তন হইয়া অদ্যকার উৎসব শেষ হয়

**১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারী) সোমবার**—প্রাতে সাধনাশ্রমের উৎসব উপলক্ষে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম হস্তগত হইলে পরে প্রকাশিত হইবে।

অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় "প্রচার" বিষয়ে আলোচনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির কার্য্য এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রেভাঃ এম সি র‍্যাটার, স্বামী কৃষ্ণানন্দ, শ্রীযুক্ত শিবনাথ দত্ত, রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাই সীতারাম, শ্রীযুক্ত কুলদাচন্দ্র নিয়োগী, শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ ও শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র বিশ্বাস বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ অসুস্থ হওয়াতে সায়ংকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "অমৃতের সন্তান" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

**১৩ই মাঘ (২৭শে জানুয়ারী) মঙ্গলবার**—প্রাতে সংকীর্ত্তন ও হিন্দীতে উপাসনা। ভাই সীতারাম আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম প্রাপ্ত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

অপরাহ্ণে বালক বালিকা সম্মিলন। তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রার্থনা করেন এবং শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু বালক বালিকাদিগকে কিছু বলেন। অনন্তর অন্যান্য বৎসরের ন্যায় স্যার নীলরতন সরকার মহাশয়ের ব্যয়ে তাহাদিগকে আহার করান হয়। বালক বালিকাদিগের নিকট হইতে তাহাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত দানও সংগৃহীত হয়।

সায়ংকালে ইংরাজীতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় অসুস্থ হইয়া পড়াতে, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

**১৪ই মাঘ (২৮শে জানুয়ারী) বুধবার**—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

সেদিন প্রাতঃকালীন উপাসনার সঙ্গীতে শুনিলাম—"মুখের কথা সব ফুরা'ল, কই জুড়া'ল আমার মন, নয়নের যে জল শুকা'ল, কই দিলে নাথ দরশন"। সঙ্গীতশ্রবণে সকলের প্রাণ বিগলিত হইয়া গেল। সঙ্গীতরচয়িতার ব্যাকুলতা যেন সকলের প্রাণকে স্পর্শ করিল। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে যেন কে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "ওরে মন, বলতো সত্যই কি তাঁকে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ, তথাপি তোমার প্রাণ জুড়ায় নাই? সত্যই কি তাঁর দর্শনের জন্ত কাতর হ'য়ে চক্ষের জল ফেলেছ, অথচ তাঁর দর্শন পাও নাই?" আমি আমার অন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, আমি এমন কথা বলিতে পারি না। আমার মন বলিয়া উঠিল, "না, না, আমি এমন কথা বলিতে পারি না।" তাঁর নাম একটীবার কাতর হ'য়ে করতে পারলে যে প্রাণ মন জুড়িয়ে যায়! এতো কল্পনার কথা নয়, ভাবুকতা নয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের কথা শুনিয়াছি যে "ওঁ ব্রহ্ম" নামের গুণে পুত্রশোক ভুলিয়াছিলেন। স্বর্গীয় নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়কে একদিন স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অসহনীয় শূল বেদনায় যখন অস্থির, যখন কোন ঔষধে বেদনার উপশম হয় নাই, তিনি তখন 'দয়াল' 'দয়াল' বলিতে বলিতে দয়ালের কোলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। চিকিৎসকেরা বেদনা উপশমের জন্য ঔষধ injection করে। দয়াল নামের injection এ নবদ্বীপচন্দ্র বেদনা ভুলিয়া গেলেন। দয়াল নামের injection এ না যায় এমন দুঃখ কষ্ট কি আছে? ঘোর শুষ্কতার দিনে ঐ নাম নিতে নিতে প্রাণ সরস হ'য়ে উঠে না কি? পাপে তাপে যখন প্রাণ তাপিত, তখন ঐ নাম নিয়েই প্রাণ শীতল হয় না কি? ঘোর নিরাশায় যখন এ পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে যায়, তখন ঐ নাম নিতে নিতেই পুনরায় আশার আলোক দেখা যায় না কি? অন্তরাত্মা বলিতেছে, তাঁর নামে শুষ্ক প্রাণ সরস হয়, তাপিত প্রাণ শীতল হয়, নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। তবে তাঁর নাম ক'রেও জীবনের দৈন্য ঘোচে না কেন, প্রাণের হাহাকার যায় না কেন, পাপের আগুন নির্ব্বাপিত হয় না কেন? অন্তর বলিতেছে, তাঁকে ডাকের মত ডাকা হয় না ব'লে, সরল প্রাণে তাঁর নাম করা হয় না ব'লে।

এ পৃথিবীতে কেহ বলিতে পারে নাই যে তাঁর নাম সরল প্রাণে করা হইয়াছে, তথাপি প্রাণ শীতল হয় নাই। ভক্ত সঙ্গীতে গাহিয়াছেন, "ডাকিলে কাতর প্রাণে (সরল অন্তরে) শীতল হয় হৃদয়।" ভক্তেরা তো এই সাক্ষ্য চিরদিনই দিয়াছেন, জগতের যত পাপী তাপী, তাহারাও ঐ একই সাক্ষ্য দিয়াছে। তবে কাতর প্রাণে ডাকা চাই। অন্তরের ডাক হওয়া চাই। এই কথা কি কেহ বলিতে পারেন যে, তাঁর দর্শনের জন্য চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, তথাপি তাঁর দেখা পাওয়া গেল না? একথা তো বিশ্বাস করিতে মন চায় না। তবে যে সাধুদিগের উক্তি সব মিথ্যা হ'য়ে যায়! জগতের সাধু মহাজন সকলে এক বাক্যে বলিয়াছেন, "কাতর প্রাণে যে ডেকেছে পেয়েছে তোমায়"। কাতর প্রাণে ডাকা ছাড়া তাঁর দেখা পাওয়ার আর অন্য উপায় তো জানি না। ভক্ত গাহিলেন "এখনি পাবি দরশন, একবার ডাকের মত ডাকা হ'লে"। আর একজন বলিলেন, "প্রাণ যদি চাহে তোমারে, তুমি থাকিতে কি পার দূরে, তাই পতিতপাবন নাম তোমার"। সাধু মহাজনেরা সকলেই তো সেই সাক্ষ্য দিলেন।

শুধু কি সাধু মহাজনেরাই সেই সাক্ষ্য দিলেন? না, তা নয়। পাপীতাপীরাও সেই একই সাক্ষ্য দিল। সাধু ভক্তকে তো তিনি চিরদিনই দর্শন দিয়াছেন। কিন্তু তিনি তো শুধু সাধু ভক্তের ঈশ্বর নন; তিনি যে পাপী তাপীরও ঈশ্বর। তাই তিনি পাপী তাপীকেও নিজ গুণে দেখা দেন। নতুবা পাপী তাপীরা উদ্ধার হয় কি ক'রে? তাঁর দেখা না পেলে কি পাপীর পাপ যায়, না পাপী উদ্ধার পায়? ভক্ত গাহিয়াছেন, "যে জন তোমায় চায় সে তো তোমায় পায়, যে জন না চায় সেও তোমায় পায়"। আর একজন বলিয়াছেন, "যে তোমারে ভুলে থাকে, দয়া

যে তারেও ডাকে"। এত যাঁর দয়া, তিনি কি পাপী তাপীর ক্রন্দন শু'নে, চক্ষের জল দে'খে, দয়া না করিয়া থাকিতে পারেন? তিনি তো নিষ্ঠুর দেবতা নহেন। তাই আজ এই কথাই মনে হইতেছে, যদি তাঁর নাম ক'রে প্রাণ শীতল না হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তাঁর নাম সরল ও কাতর প্রাণে করা হয় নাই। যদি তাঁর দর্শন লাভ না হইয়া থাকে, তবে জানিতে হইবে, তাঁর জন্য তেমন ক'রে কাঁদা হয় নাই।

ধর্ম্মপথের যাত্রী মাত্রই এই সাক্ষ্য দিবেন যে, আমরা ঈশ্বরের দিকে এক পা ফেলিলে তিনি দশ পা অগ্রসর হইয়া আসেন। আমরা তাঁকে পাবার জন্য যতটুকু ব্যস্ত, তিনি আমাদিগের নিকট আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যস্ত। তাই তাঁর নাম হয়েছে স্বপ্রকাশ। তিনি যদি স্বপ্রকাশ না হইতেন, তিনি যদি সন্তানের নিকট ধরা না দিতেন, আপনাকে প্রকাশ না করিতেন, তবে কার সাধ্য ছিল তাঁকে খুঁজিয়া বাহির করে? তিনিই মানব প্রাণে তাঁকে পাবার জন্য ক্ষুধা তৃষ্ণা দিয়াছেন। তিনি জানেন, তিনিই আত্মার একমাত্র ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার বারি,—তাঁকে না পাইলে মানবাত্মা বাঁচিতে পারে না। দেহধারণের জন্য তিনি বায়ুকে কেমন সহজপ্রাপ্য ক'রে দিয়েছেন! এই কলিকাতা নগরীতে মুক্ত বাতাসের জন্য মানুষ কত ব্যস্ত! আর দেখ সেই বাতাসও কত বাধা অতিক্রম করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তোমার গৃহে প্রবেশ-লাভের জন্য ব্যস্ত। দৈহিক জীবনে যে ব্যবস্থা, আত্মিক জীবনেও ঈশ্বরের আত্ম-দানেরও, সেই ব্যবস্থা। তোমার হৃদয়-গৃহের সম্মুখে কত উচ্চ প্রাচীর, কত পর্ব্বতসমান বাধা। সে সকল অতিক্রম করিয়া তিনি নানা পথ দিয়া তোমার আমার হৃদয়ে প্রবেশলাভের জন্য ব্যস্ত। তাঁর এই ব্যস্ততা একটীবার দেখতে পে'লে আর নিরাশা থাকে না। জগতের পিতামাতা যিনি, সর্ব্বশক্তিমান যিনি, পাপী তাপীর পরিত্রাতা যিনি, তিনি তোমার আমার নিকট ধরা দিবার জন্য ব্যস্ত, ইহা জানিতে পারিলে আর কি ভয় থাকে?

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কিছু সময়ের জন্য কোন মফস্বল সহরে বাস করিতেছিলাম। একদিন রাত্রিতে গৃহস্থ সকলে নিদ্রিত হইয়াছেন। আমি একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতেছি। সেই ঘরের বারান্দায় একটী কুকুরের ছানা ছিল। তাহাকে একাকী রাখিয়া তাহার মাতা খাদ্যসংগ্রহের জন্য পাশের বাটীতে গিয়াছিল। এমন সময় একটী শৃগাল আসিয়া সেই কুকুরের ছানাটীকে মুখে করিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল। কুকুর ছানাটীর একটী মাত্র শব্দ শোনা গেল। তাহা শুনিবামাত্র তাহার মাতা ছুটিয়া আসিল। কিন্তু সে আসিতে আসিতে শৃগাল তাহার ছানাটীকে লইয়া অন্ধকার রজনীতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। সারা রাত্রি কুকুরটী ছানার উদ্দেশ্যে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। তাহার চীৎকারে আমার সারা রাত্রি নিদ্রা যাওয়া সম্ভব হইল না। প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া বাহির বাটীতে আসিয়া দেখি, সেই কুকুর তাঁর ছানাটীর ছিন্ন মস্তক সম্মুখে রাখিয়া, একটী গাছের তলায় সম্মুখের দুই পা ছড়াইয়া, এক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। কুকুরটীর সর্ব্বাঙ্গ জল কাদায় মাখা। দেখিয়াই বোধ হইল সে তাহার ছানাটীকে উদ্ধার করিবার জন্য নিকটস্থ স্রোতস্বতী পার হইয়া গিয়াছিল। শৃগালের মুখ হইতে ছানার মস্তকটিকে উদ্ধার করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। তাহাই সম্মুখে রাখিয়া বসিয়া আছে। বালক বালিকারা প্রত্যূষে বাগানের ফুল চয়ন করিতে আসিয়াছিল। তাহারা বলিল কুকুরকে তাহার ছানার মস্তকটী মুখে করিয়া নদীর দিক হইতে আসিতে তাহারা দেখিয়াছে। এই দৃশ্যটী যেই দেখিলাম, তৎক্ষণাৎ কে যেন অন্তরে এই কথা বলিলেন, দেখ, সামান্য কুকুর-মাতা তাহার ছানাটীকে উদ্ধার করিবার জন্য কি করিল, আর জগতের মাতা যিনি, তিনি কি তাঁর সন্তানকে বিনষ্ট হইতে দিতে পারেন? কখনও না। ঐ কুকুর তাহার ছানাটীকে শৃগালের মুখ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যতটা ব্যস্ত হইয়াছিল, জগতের মাতা কি তাঁহার সন্তানদিগকে পাপ তাপের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, তাহাদিগকে প্রেম পুণ্যে ভূষিত করিবার জন্য, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ব্যস্ত নন? এখানেই তো পাপী তাপীর আশা। এস সকলে তাঁর সেই করুণার কথা, প্রেমের কথা, মহিমার কথা স্মরণ করি, এবং তাঁর কৃপাতে সকল নিরাশার হাত হইতে মুক্তি লাভ করি।

অপরাহ্নে মেরী কার্পেণ্টার হলে রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রার্থনা, রেভাঃ এম্ সি র্যাটার সভাপতির কার্য্য ও শ্রীমতী প্রতিভা দত্ত পুরস্কার বিতরণ করেন। সম্পাদিকা বার্ষিক কার্য্য বিবরণ পাঠ ও বালক বালিকাগণ নানা আবৃত্তি প্রভৃতি করেন।

সায়ংকালে রেভাঃ এম্ সি র্যাটার "A Visitor on the Future of the Brahmo Samaj" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

ক্রমশঃ

মফস্বলে মাঘোৎসব—কাশী—কাশীতে নিম্ন লিখিত পদ্ধতিতে মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, :—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর আগমনে কাশীস্থ ক্ষুদ্র উপাসকমণ্ডলী উৎসাহ ও আনন্দের সহিত উৎসব কার্য্য শেষ করিয়াছেন। ১লা মাঘ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ও স্থানীয় উপাসকদের গৃহে পারিবারিক প্রার্থনা। ৭ই মাঘ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুদিন উপলক্ষে বিবেকানন্দ বাণীভবন স্কুল গৃহে অপরাহ্নে স্মৃতি সভা। অবসর প্রাপ্ত জেলাম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহ, শ্রীযুক্ত যোগানন্দ দাস, রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসী, ডাক্তার কেশবচন্দ্র দাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১০ই মাঘ—শ্রীমতী ভুবনমোহিনী সেনগুপ্তের বাড়ীতে সায়ংকালে উপাসনা; শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১১ই মাঘ—প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর ভবনে উপাসনা।

তিনিই আচার্য্যের কার্য্য করেন। "ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান" বিষয়ে উপদেশ দান করেন। সায়ংকালে শিবালয়স্থিত ডাক্তার উমেশচন্দ্র দাসের ভবনে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। "অনন্তের উপাসনা" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ১২ই মাঘ—সায়ংকালে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র আচার্য্যের ভবনে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। "ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ" বিষয়ে উপদেশ দান করেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ৭ই অগ্রহায়ণ হইতে ১০ই ফাল্গুন কাশীতে ছিলেন। মাঘোৎসবের কার্য্য ব্যতীত ২১শে ও ২৮শে অগ্রহায়ণ, ৫ই, ১২ই, ১৯শে পৌষ ও ১৮ই মাঘ স্থানীয় উপাসকমণ্ডলীর উপাসনাস্থলে সঙ্গীত ও উপাসনা করেন এবং উপদেশ প্রদান করেন।

১৩ই পৌষ তাঁহার শ্বশুর স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাস মহাশয়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে, এবং ২৫শে মাঘ তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর মৃত্যুদিন উপলক্ষে তাঁহার নিজ বাসায় উপাসনা করেন

১০ই মাঘ তারিখে উপাসকমণ্ডলীর সাপ্তাহিক উপাসনা তাঁহার নিজ বাসাতেই সম্পন্ন হয়। তিনিই সঙ্গীত ও উপাসনা করেন। দুই দিবস রামকৃষ্ণমিশনে বক্তৃতা করেন।

ঢাকা—করুণাময় ঈশ্বরের কৃপায় ঢাকার পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব নিম্ন লিখিত প্রকারে সম্পন্ন হইয়াছে—এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে প্রচারক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী এবং ময়মনসিংহ হইতে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকায় যাইয়া উৎসবে কয়েক দিন উপাসনাদি করিয়াছেন।

৪ঠা মাঘ—রাত্রে উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ৫ই মাঘ সকালে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বসু উপাসনা এবং রাত্রে মনোরঞ্জন বাবু "জাতীয় জীবনে ব্রাহ্মসমাজের স্থান" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। ৬ই মাঘ প্রাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুদিন উপলক্ষে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উপাসনা করেন। রাত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভা। সভাপতি শ্রীযুক্ত মথুরানাথ গুহ, বক্তা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল। ৭ই মাঘ প্রাতে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত সরকার উপাসনা এবং রাত্রে সঙ্গত সভার উৎসব উপলক্ষে "সাধন প্রসঙ্গ" বিষয়ে অমর বাবু ও অশ্বিনীবাবু বক্তৃতা এবং শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র দাস বক্তৃতা সভার সভাপতির কার্য্য সম্পন্ন করেন। ৮ই মাঘ পূর্ব্বাহ্নে মন্দিরে মহিলাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা এবং ইষ্টবেঙ্গল ইনষ্টিটিউশন হলে পুরুষদিগের জন্য উপাসনা হয়। মহিলাদিগের বিশেষ উপাসনায় অমৃত বাবু এবং অন্যত্র অশ্বিনীবাবু উপাসনা করেন। রাত্রে ব্রহ্মমন্দিরে "ধর্ম্মের উপরে আশা ও নির্ভর" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত। ৯ই মাঘ প্রাতে ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত যোগজীবন পাল উপাসনা, এবং রাত্রে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "সাধনা ও ভগবৎকৃপা" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। অপরাহ্ণ ৩টার সময় বালক-বালিকা সম্মিলন উপলক্ষে সঙ্গীত, প্রার্থনা, আবৃত্তি ও বালক বালিকাদিগকে জলখাবার খাওয়ানো হয়। ১০ই মাঘ প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন ও সায়ংকালে উপাসনা হয়; সকালে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী এবং সন্ধ্যাকালে অমৃতবাবু উপাসনা করেন। ১১ই মাঘ সমস্তদিনব্যাপী উৎসব; উষাকাল হইতেই মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, তৎপরে ৭॥০ টার সময় উপাসনা হয়, অমৃতবাবু উপাসনা করেন। উপাসনার পরেও সঙ্কীর্ত্তন হইতে থাকে। মধ্যাহ্ন দুইটার সময় পুনর্ব্বার উপাসনা হয়, [শ্রীযু]ক্ত মথুরানাথ গুহ উপাসনা করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং [শ্রীযু]ক্ত উমাচরণ সেন "ব্রহ্মানন্দ" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। রাত্রিকালে অবিনাশ বাবু কর্ত্তৃক উপাসনা সম্পন্ন হয়। ১২ই মাঘ সকালে উপাসনা হয়, অবিনাশ বাবু উপাসনা করেন। অপরাহ্নে দরিদ্রদিগকে দান করা হয়। রাত্রে ইংরাজিতে বক্তৃতা; শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ Tendencies in Religion বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৩ই মাঘ সকালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় "মহাপুরুষ প্রসঙ্গ"; শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পরে, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী, কাজি আব্দুল ওদুদ, শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাশঙ্কর সেন ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষের বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১৪ই মাঘ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উপাসনা; শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত গোলোকচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। ১৭ই মাঘ রাত্রে ছাত্রসমাজের সভ্যদিগের উদ্যোগে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রহ্মমন্দির-প্রাঙ্গণে একটি প্রীতি সম্মিলন হয়, উহাতে বিস্তর ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা আগমন করেন। প্রার্থনান্তে গীতবাদ্য, আবৃত্তি ও জলযোগ হয়। ১৮ই মাঘ সকালে পরলোকগত আনন্দমোহন দাস মহাশয়ের গেণ্ডারিয়াস্থ উদ্যানে প্রীতি সম্মিলন ও প্রীতিভোজন এবং রাত্রে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়; অমৃত বাবু উদ্যানে ও অক্ষয় বাবু মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দু মিত্র, শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা উৎসবের উপাসনাদির সাহায্য করিয়াছেন।

কোন্নগড় ব্রাহ্মসমাজ—নিম্ন লিখিত প্রণালীতে কোন্নগড় ব্রাহ্মসমাজের অষ্টষষ্টিতম বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে —৩রা মার্চ্চ সন্ধ্যায় নগর কীর্ত্তন। শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিলে পরে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দীর বাগানবাড়ী হইতে কীর্ত্তন বাহির হইয়া নগরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলে, শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য উৎসবের উদ্বোধন করেন। ৪ঠা তারিখে প্রভাতে গঙ্গার অপর তীরে সুখচর গ্রামে কীর্ত্তন করা হয়। ৯ ঘটিকায় মন্দিরে শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচার্য্যের কার্য্য করেন। তৎপর "যোগেন্দ্রমোহিনী" সেবাশ্রমেতে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়

প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা ও তৎপরে সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার নন্দী তাঁহার বাগানবাড়ীটী ব্যবহার করিতে দিয়া উৎসবের কার্য্যে সহায়তা করায়, কোন্নগড় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

---

**মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ**—মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের ৮৫তম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্ন লিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে—৬ই মার্চ্চ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল উদ্বোধন করেন। ৭ই মার্চ্চ প্রাতঃকালে সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্তের বাটীতে বিপিন বাবু উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় 'পাবলিক হলে' তিনি 'ব্রাহ্মসমাজের শতবৎসর' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ৮৷৷০ ঘটিকায় 'সঙ্কীর্ত্তনে উপাসনা' হয়। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে কীর্ত্তন পরিচালনা করেন। ৮ই মার্চ্চ প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা; শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে 'গোপ পাহাড়ে' সকলে সমবেত হইয়া কীর্ত্তনাদি ও উপাসনা করেন। শ্রীযুত অমৃতকুমার দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকুমার বসু প্রার্থনা করেন এবং শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন

**হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ**—নিম্ন লিখিত প্রণালীতে হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের চতুঃষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—২৮শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র রায়ের বাটী হইতে কীর্ত্তন আরম্ভ হইয়া গ্রাম পরিভ্রমণান্তে মন্দিরে উপস্থিত হইলে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে কীর্ত্তন পরিচালনা করেন; শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১লা মার্চ্চ প্রাতে উষাকীর্ত্তনের পরে সমাধিক্ষেত্রে প্রার্থনা হয়; শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত প্রার্থনা করেন। অনন্তর উপাসনা; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রমোহন মিত্র উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে উৎসবের কার্য্যের সুবিধার জন্য তাঁহার মোটর বাসখানা দিয়া সাহায্য করায় সম্পাদক ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১লা মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত তামসকুমার মল্লিকের ভগিনী কুমারী যমুনা মল্লিক টাইফয়েড রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি মেডিকেল কলেজে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন।

বিগত ৪ঠা মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে ডাক্তার বনওয়ারীলাল চৌধুরী হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সুপণ্ডিত ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

বিগত ১০ই মার্চ্চ মোরাদাবাদ নগরীতে শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সেনের মধ্যমা কন্যা (শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সান্যালের পত্নী) একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ করিয়া তজ্জনিত জরাদি রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। শিশুটীও জন্মিবার ৩ দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বিগত ৮ই মার্চ্চ পরলোকগতা উমা দেবীর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার লধ ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং ভাশুর শ্রীযুক্ত সুকুমার দাসগুপ্ত জীবনী পাঠ করেন।

বিগত ৮ই মার্চ্চ বাণীবন গ্রামে পরলোকগতা ব্রহ্মময়ী দেবীর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রপাঠ, দৌহিত্র শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ সিংহ রায় জীবনীপাঠ ও কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণলতা সিংহ রায় প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ভাণ্ডারে ৮৲, বাণীবন বালিকা স্কুলে ৪৲, ঐ বালক স্কুলে ৪৲, ও বাণীবন ব্রাহ্মসমাজে ৪৲, প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা নগরীতে নববিধান মণ্ডলীর প্রবীণতম ব্রাহ্ম কিশোরীগঞ্জ নিবাসী জগন্মোহন বীর মহাশয় শতাধিক বর্ষ বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অতি মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

**শুভ বিবাহ**—বিগত ১৩ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা-নগরীতে বিক্রমপুর বাহেরক নিবাসী পরলোকগত বরদাকান্ত দাস গুপ্তের চতুর্থকন্যা কল্যাণীয়া কুমারী বেলা ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘটকের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান গুণীন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

**দান**—শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকুমার বসু পত্নী প্রফুল্লনলিনী বসুর প্রথম বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ২৲, দান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসুর পুত্র কন্যাগণ তাঁহাদের মাতা পরলোকগতা ইন্দুমতি বসুর পঞ্চদশ বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচার বিভাগে ২৲, সাধারণ বিভাগে ১৲ ও দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ২৲ দান করিয়াছেন।

এ সমস্ত দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মাসকল চির শান্তিলাভ করুন।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ১৬ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ।

Registered No. 56

অসতো মা সদ্গময়,
তমসো মা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময় ॥

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত

৫১ ভাগ
২৪শ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র, সোমবার ১৩৩৭, ১৮৫২ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ১০২
30th March, 1931.

প্রতি সংখ্যার মূল্য ৴৹
অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

## প্রার্থনা।

হে অনন্তস্বরূপ বিশ্ববিধাতা, তুমি স্বয়ং কালাতীত হইয়া অনন্ত কালপ্রবাহে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ও আমাদিগকে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া চির উন্নতি ও কল্যাণের পথে লইয়া চলিয়াছ। আমরা যদি সকল সময় সম্পূর্ণরূপে তোমার এই ব্যবস্থার হাতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরাও তোমার জগতের ন্যায় অবিরাম চির উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে পারিতাম। কিন্তু আমরা স্বেচ্ছাচারিতা বশতঃ সকল সময় তাহা পারি না বলিয়াই, আমাদিগকে নিত্য নানা উত্থান পতন, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, ক্ষত বিক্ষত হইয়া, পথ চলিতে হইতেছে—আনন্দ ও শান্তির পরিবর্ত্তে বিবিধ প্রকারের দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, জীবনে সেরূপ উন্নতির কোনও লক্ষণই দেখিতে পাইতেছি না। তবুও আমরা যে সম্পূর্ণরূপে আপনার ভাবে আপনার পথে চলিতে পারি না, ইহা তোমারই অপার করুণা। তুমি কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ কর না। সর্ব্বদা অসীম প্রেম ও ধৈর্য্যের সহিত আমাদিগকে নানারূপে তোমার পথে টানিয়া আনিতেছ বলিয়াই আমরা রক্ষা পাইতেছি, আশা ও উৎসাহ লাভ করিতেছি, দুঃখ বেদনার আঘাতে মাঝে মাঝে সচেতন হইয়া উঠিতেছি। হে সর্ব্বদর্শী দেবতা, তুমিই জান কত দিনে আমাদের এই দুর্ব্বলতা ও দুর্ব্বুদ্ধি বিদূরিত হইবে, আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমার হাতে আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া, তোমার চির কল্যাণের স্রোতে ভাসিয়া, তোমার পথে চলিতে, অবিরাম উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে, সমর্থ হইব। হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা কর, আমাদের দীর্ঘকালের অভ্যস্ত বিরোধিতা দূর হউক। কত বৎসর যে চলিয়া গেল! আর যেন আমরা এভাবে জীবন বৃথা নষ্ট না করি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

## একাধিক শততম মাঘোৎসব।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

**১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) বৃহস্পতিবার**—প্রাতে উপাসনা। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী ঢাকা ও ময়মনসিংহের উৎসব হইতে যথা সময়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সমর্থ না হওয়াতে, শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র সোম আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম হস্তগত না হওয়াতে প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

সায়ংকালে সংকীর্ত্তন ও শান্তিবাচক উপাসনা। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। সঙ্গীতান্তে তিনি নিম্ন লিখিত মর্ম্মে উদ্বোধন করেন :—

আজ উৎসবের শেষ দিনে সকলকে নমস্কার করি। পূর্ব্বেও অনেকবার উৎসবের শেষ দিনের উপাসনার ভার আমার উপর পড়িয়াছে—উৎসবে আচার্য্যগণ যে সকল অমৃতময়ী বাণী দিয়াছেন, তার সার মর্ম্ম বলিয়াছি। এ বৎসর সে সকল সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারি নাই। দুই এক দিনের কথা মাত্র বলিব; তাহাই যদি স্মরণ রাখিয়া এই এক বৎসর ভগবানের কৃপায় জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারি, ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

উদ্বোধনের দিন আচার্য্য বলিয়াছেন, মানুষ যে ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, তাহাকে বলে সাধন, আর ঈশ্বর যে মানুষকে অন্বেষণ করেন, তাহাই হলো উৎসব। তিনি যে আমাকে চান, তোমাকে চান, পাপী তাপী সকলকে চান; ৯৯টি মেষ পথে

রেখে একটি হারাণ মেষের সন্ধানে তিনি ছোটেন। তাহা ত জীবনেও অনুভব করেছি; এই উৎসবের ভিতরে তিনি আমাদিগকে—প্রত্যেককে—খুঁজেছেন, জীবনের কত অবস্থার ভিতরে তিনিই আমাকে, তোমাকে খুঁজছেন। এই পরম সত্যটি আমরা যেন মনে রাখি; তিনি আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁকে পরিত্যাগ না করি। তিনি যে আমার জন্যও ব্যাকুল, এইটি জীবনের সম্বল হউক।

১১ই মাঘ প্রাতঃকালে আচার্য্য বলিয়াছেন, জীবনই বেদ—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র জীবনকে, প্রত্যেকের নিজ জীবনকে, বেদ বলিয়াছেন; আমি বলি, জীবন ভাগবৎ; জীবনেই ভগবানের প্রেমের লীলা প্রকটিত হয়। বাস্তবিক প্রত্যেকে নিজের জীবন-ভাগবৎ প্রার্থনাসহকারে পাঠ কর। জীবনের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, উত্থান পতনের মধ্যে ভাগবতী লীলা অনুভব করতে পারবে। কেবল সুখের দিনে নয়, তিনি যেদিন বিপদ হইতে উদ্ধার করেছেন, কেবল সেদিন নয়, তিনি যেদিন নানা সুযোগ সুবিধা এনে দিয়েছেন, কেবল সেদিন নয়। যেদিন দুঃখ পেয়েছি, শোক পেয়েছি, প্রিয়জনের উপেক্ষা পেয়েছি, ব্যর্থতা এসেছে, সেদিনও তাঁর রুদ্র মূর্ত্তির পশ্চাতে করুণাময়ী মূর্ত্তি, প্রেমময়ী মূর্ত্তি, জাগিয়া উঠিয়াছে। এই প্রেমের লীলা কি জীবনে—নিজ জীবনে—দেখছ? জীবন-গ্রন্থ প্রার্থনাসহকারে পাঠ কর, দেখিবে তোমার সুখ দুঃখ, আশা নিরাশার মধ্যে তাঁর প্রেমের লীলা; দেখবে, তিনি হাতখানি ধ'রে কল্যাণের পথে নিয়ে চলেছেন। এই উৎসবের দানরূপে জীবন-ভাগবৎ পাঠ করিবার ব্রত লইয়া গৃহে যাও।

আবার ১১ই মাঘ সায়ংকালে আচার্য্য অনেক কথা বলেছেন; একটি কথা এই—ভগবান্ যা বলেন, তাই কর; তাঁর বাণী শুনবার জন্য কাণ পেতে থাক। speak thou, o Lord, thy servant heareth—প্রভু তুমি বল, তোমার দাস শুনবার জন্য প্রতীক্ষা কর্চ্ছে, এই ব'লে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাক। তাঁর কৃপা দেখে ধন্য হবে। আজ উৎসবের শেষ দিনে তাঁর কৃপা জীবনে দেখি; আমরা দুর্ব্বল, জীবনগতি কোনদিকে চালাব, সব সময়ে বুঝতে পারি না; তাঁর বাণী শুনবার জন্য প্রতীক্ষা করি; আমরা বলি,

বিপদে সম্পদে সুখে দুঃখে নাথ
করোহে আমায় করুণা ইঙ্গিত।
কোথায় কি করিব, কারে কি বলিব,
দিও ব'লে সব যে হয় উচিত।

আরও অনেক কথা আচার্য্যগণ ব'লেছেন। জীবনে তাঁর কৃপা, তিনি তোমার আমার জন্য ব্যস্ত, তোমাকে আমাকে তিনি অন্বেষণ করেন, তিনি ডাকেন, তিনি প্রাণের ভিতরে কথা বলেন, জীবনে তাঁর লীলা—এই কথাগুলি স্মরণে রাখিয়া আমরা জীবন তাঁর হাতে সঁপে দেই।

---

আরাধনা ও মিলিত প্রার্থনান্তে আচার্য্য নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন:—

আজ মাঘোৎসবের শেষ দিন; বাহিরের দিক দিয়া আজ উৎসব শেষ হ'ল। কিন্তু যাঁর প্রাণ জাগ্রত হয়েছে, হৃদয়-দেবতা যিনি, তাঁর সঙ্গে যাঁর প্রেমের যোগ স্থাপিত হয়েছে, উৎসব-দেবতা যাকে ধ'রেছেন, যে তাঁর প্রেমের লীলা দেখে, তার উৎসব শেষ হয় না, সে নিত্য নূতন ভাবে প্রাণের দেবতাকে দেখে, সম্ভোগ ক'রে, উৎসবানন্দ উপভোগ করিবে। সেই সৌভাগ্য কি আমাদের হয়েছে? আমার হয়ত হয় নাই; কিন্তু এখানে নানা দেশ হইতে, এই কলিকাতারও নানা স্থান হইতে, অনেক ব্যাকুলচিত্ত সাধক এসে সমবেত হয়েছেন; তাঁদের অনেকের হয়ত প্রাণের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে—নূতন দৃষ্টি লাভ হইয়াছে; প্রাণে প্রেমের উৎস উৎসারিত হইতেছে। তবুও বলি, এই আমাদের যে শুভ সম্মিলন, আজই এ বৎসরের জন্য শেষ। আপনারা অনেকে গৃহে যাবেন; আমরা সকলেই আবার দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যাপৃত হইব। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া যাইয়া আমরা কি সম্বল লইয়া দিন কাটাইব? উৎসবের দান কি দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে? আমরা কি কিছু সম্বল লইয়া বাড়ী ফিরিব না? এমন কিছু সঞ্চয় করিব না, যাহা লইয়া সমস্ত কাজ কর্ম্মের মধ্যে, চিত্তবিক্ষোভকারী ঘটনার মধ্যে, জীবনের দৈনন্দিন সুখ দুঃখের মধ্যে, নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ থাকিতে পারি? গৃহে যখন এই পুণ্যতীর্থ হইতে ফিরিয়া যাইব, তখনত লোকে জিজ্ঞাসা করবে, এত কষ্ট ক'রে, নানা অসুবিধা ভোগ ক'রে তীর্থে গিয়াছিলে, কি লইয়া গৃহে ফিরিলে? তীর্থযাত্রীরা বালক বালিকাদের জন্য খেলনা লইয়া যায়; তারা তাতেই সন্তুষ্ট হয়। আমরাও কি মাত্র কতগুলি খেলনা লইয়া ফিরিব? অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হলো, অনেক বক্তৃতা হলো, সুন্দর গান হলো, ইহাই কি মাত্র সঞ্চিত রহিয়া গেল? কিছু প্রসাদ কি লইয়া যাইতে পারিব না? কি প্রসাদ লইয়া আজ গৃহে যাইব? আমার কিন্তু অনেক দিন হইতে একটা প্রসাদ—একটা মন্ত্রের কথা মনে হইয়াছে। আমাকে যখন জেলে যাইতে হইয়াছিল, তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল, এবার হয়ত কারাগারে যেতেই হবে। অবশ্য কারাগারে বেশ ভালই ছিলাম। সুখ সুবিধা, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আলাপ আলোচনার খুবই সুযোগ ছিল; সেণ্ট্রাল জেলে রাজনীতিক বন্দীদিগের মধ্যে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলাম ও আমিই প্রাচীনতম কংগ্রেসের লোক ছিলাম; সুতরাং সকলেই দয়া করিয়া আমার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন ও আমার যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তাহা করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ হবে ত মনে করি নাই। জেলে তো নিজের ইচ্ছামত থাকিতে পারা যায় না। হয়-ত খাওয়ার কষ্ট হবে, হয়-ত নির্জ্জনে একাকী থাকিতে হইবে—হয়ত কাহারও সঙ্গে কথা বলিবার সুযোগ থাকিবে না। হয়ত দিন রাত প্রায় সব সময় দরজা তালাচাবি বন্ধ থাকিবে, হয়ত পড়িবার পুস্তক পাওয়া যাবে না। তখন কি ভাবে, কি লইয়া, জীবন কাটাব? কে আমার সঙ্গী হবেন? তখন একটি ভাব আমার মনে আসিয়াছিল। তাহা পরে মন্ত্রাকারে ফুটিয়া উঠিল। তাহা আপনাদিগকেও বলি।

এই এখন আমরা সকলে সমবিশ্বাসী, ঈশ্বরের চরণে বসিয়া একত্রে উপাসনা করিতেছি, কত আলোচনা করিতেছি, পরস্পরের মনের ভাব পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিতে পারিতেছি। একের সংস্পর্শে আসিয়া অন্যে অনুপ্রাণন লাভ করিতেছি! কিন্তু যখন সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিব তখন এরূপ সুযোগ থাকিবে না; অনেকে হয়ত এমন স্থানে যাবেন, যেখানে ব্রাহ্ম সমাজ নাই, একটি ব্রাহ্ম নাই; প্রাণের কথা বলা যায় এমন কেহ নাই। অনেককে হয়ত নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে। কত দুঃখ শোক আসিবে, দরিদ্রতা আসিবে; নিরাশা আসিবে, প্রাণের কথা বলিতে পারি এমন লোক থাকিবে না। প্রাণ শুকাইয়া যাইবে; সত্য পথ ধরিয়া থাকা কঠিন হইবে। তখন কে সহায় হবে? কার কাছে অনুপ্রাণনা লাভ করিব? তাই আজ আমি যে মন্ত্রটি লাভ করিয়াছিলাম, সেই মন্ত্রটি বলিব। মন্ত্রটি আপনারা সকলেই জানেন। মন্ত্র অনেক সময় পুঁথিতেই থাকে, সাধনাদ্বারা তাহা সঞ্জীবিত হয়। সেদিন মহর্ষির স্মৃতি-সভাতে তাঁহার প্রদত্ত কয়েকটি মন্ত্রের কথা বলিয়াছি; আজ আর একটি মন্ত্রের কথা বলিব। এ মন্ত্রটিও মহর্ষি সাধন করিয়া আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। এই মন্ত্রটি সাধন করিলে নির্জ্জনে, বিপদসঙ্কুল স্থানে, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে, নিরাশার অন্ধকারেও, প্রাণে আশা, বল ও আনন্দ পাওয়া যাবে—সে মন্ত্রটি —"স পর্য্যগাৎ"।

"স পর্য্যগাৎ"—তিনি চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী, তিনি বিশ্বতশ্চক্ষু!—বিশ্বের সর্ব্বত্র তাঁর চক্ষু—তাঁর দৃষ্টি সর্ব্বত্র রহিয়াছে। শুনিয়াছি, সত্যং বলিলে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের শরীর রোমাঞ্চিত হইত, মাথার চুল পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিত; শুনিয়াছি "স পর্য্যগাৎ" বলিলেও তাঁহার শরীরের রোম খাড়া হইত। এই যে তিনি আছেন, এই যে সম্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে, ঊর্দ্ধে অধোতে অন্তরে বাহিরে তিনি রহিয়াছেন —এই ভাবটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, এই ভাবের অনুভূতি হইলে, প্রাণে কত আনন্দ হয়, হৃদয়ে কত বল পাওয়া যায়, মনে কত শান্তি আসে। অপর দিকে কোনও ভয় থাকে না, ভাবনা থাকে না, শোক থাকে না, পাপ থাকে না। তিনি বিশ্বরাজ, অথচ আমার জীবনস্বামী হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন। তিনি যে স্নেহের সহিত আমার দিকে অহর্নিশি তাকিয়ে আছেন। আমি যখন নিদ্রিত থাকি তখন তিনি আমার কাছে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছেন, আমাকে দেখিতেছেন; আমি যেখানেই যাই, যে অবস্থাতেই থাকি, আর কেহ সঙ্গে থাকুক আর না থাকুক, আর কেহ জাগুক, আর না জাগুক, তিনি আমার সঙ্গে আছেন, তিনি আমার সব দেখিতেছেন। বালক যখন পিতার সঙ্গে থাকে, সে যেখানেই থাকুক, নিশ্চিন্ত নির্ভর থাকে; যখন বিপদ আসে, বিভীষিকা দেখে, পিতার ক্রোড়ে আসিয়া মুখ লুকায়। সে জানে আমার ভয় নাই, পিতা যে সঙ্গে আছেন; তিনি আমাকে সকল বিপদে রক্ষা করিবেন। যিনি পিতার পিতা, কেবল পিতা কেন, তিনি মাতা, তিনি প্রভু, তিনি সখা, তিনি জীবনস্বামী, তিনি কত ভালবাসেন, তাঁর প্রেম—আমার প্রতি, প্রত্যেকের প্রতি—অপরাজিত ও অপরাজেয়; আমরা ঘোরতর পাপে পড়িলেও তাঁহার প্রেমের, তাঁহার স্নেহের অভাব হয় না; তিনি পিতা, মাতা, প্রভু, সখা ও হৃদয়স্বামী, তিনি আমাকে দেখিতেছেন। তিনি আমার চারিদিক অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। "স পর্য্যগাৎ," "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ", তবে আমার ভয় কি?

না থাকে পাপ, না থাকে তাপ, যায় হৃদয় তার।

আমরা সংসারে সুখ পাই, দুঃখও পাই; তার মধ্যে তিনি সঙ্গে আছেন, ইহা জানিলে দুঃখ থাকে না, আনন্দ আসে। কত সুন্দর দৃশ্য দেখি, কত সুমধুর সঙ্গীত শুনি; কত সুমিষ্ট রস আস্বাদন করি; সুগন্ধ গ্রহণ করি; তাহাতে প্রাণে আনন্দ আসে; কিন্তু তাহা যখন প্রিয় জনের সঙ্গে সম্ভোগ করি, তখন আনন্দ কত বৃদ্ধি পায়! আর যিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতে প্রিয়, সেই সত্যং শিবং সুন্দরং আমার সঙ্গে আছেন, তিনিই সব সুখ ও আনন্দ দিতেছেন, তাহা অনুভব করিতে পারিলে আমাদের প্রাণ আনন্দসাগরে ভাসিয়া যায়। আমাদের বন্ধুসম্মিলন, আমাদের প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন, তাতে কত সুখ! কিন্তু তখনও সেই প্রিয়তম সঙ্গে আছেন, ইহা জানিলে আমাদের প্রাণের আনন্দ কত বৃদ্ধি পায়!

"সকল মিলন সফল তখন, আসন যখন তুমি লও।
সকল জীবন মিষ্ট তখন তুমি যখন কথা কও।"

প্রিয়তম যিনি তাঁহাকে লইয়া সুখ-সম্ভোগে কত আনন্দ! সে আনন্দের তুলনা নাই।

আবার আমরা সংসারে কত সময় নিজকে অসহায় মনে করি; বন্ধু বান্ধব আছেন, তাঁরা সাহায্য করেন; কিন্তু তাঁদের সাহায্যেও সব সময়ে প্রাণে বল পাই না। অনেক বিষয় আছে, যাতে তাঁরাও সহোয্য করেন না, অথবা করিতে পারেন না। কত স্থানে যেতে হয়, সঙ্গে কেহ নাই; কত বিপদ্-সঙ্কুল অবস্থাতে পড়িতে হয়, কেহ সাথী নাই। সাথী থাকিলেও তারা তখন সাহায্য করিতে পারে না। তখন আমাদের আশা কোথায়? কার দিকে তাকাতে পারি? আমরা দুর্ব্বল, প্রাণে বল পাই না, হৃদয়ে আশা জাগে না। তখনও যে তিনি কাছে থাকেন—"স পর্য্যগাৎ" "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ"। তিনি সব দেখিতেছেন। ব্যারাম হয়েছে, পিতা কাছে আছেন, চিকিৎসক ডেকেছেন, যা করবার করিতেছেন; আমি নিশ্চিন্ত। একস্থানে বেদনা, একটু অসোয়াস্তি, বাবা দেখ্‌ছেন, ডাক্তার ডেকে ব্যবস্থা কর্চ্ছেন। সব সময়ে ঔষধেও বেদনা দূর হয় না, রোগ সারে না। কি করা যায়? যা করবার তা ত করা হয়েছে। আমরা ত সংসারপথে চলিতে সব সময়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারি না; সকল আশা পূর্ণ হয় না; সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাই না। ভাবি, এ কি হলো! তখনও তিনি সঙ্গে আছেন; তিনি ত আমাকে ভালবাসেন। তিনি ত আমাদের কল্যাণ দেখিতেছেন। ঐ যে ব্যর্থতা আসিল, আমি ভাবি এ কি অকল্যাণ! তিনি দেখিতেছেন, উহাতেই আমার কল্যাণ। ব্যর্থতা, দুঃখ দৈন্য এমন কি মৃত্যুও ত অকল্যাণ নয়। তাঁকে যখন না দেখি,

তখন এই সবই অকল্যাণ ব'লে মনে হয়; তাই আমাদের কষ্টের অবধি থাকে না। কিন্তু প্রেমময় দেবতা, জীবনস্বামী, মঙ্গলময়, তিনি কাছে থেকে, অন্তরে থেকে, সব দেখিতেছেন; তিনি আমাকে দুঃখ দৈন্য ব্যর্থতা, মৃত্যুর ভিতর দিয়া কল্যাণের পথে নিয়ে যেতেছেন; একথা যখন ভাবি, বুঝি, অনুভব করি, তখন শোকেও ভয় নাই, রোগেও ভয় নাই, মৃত্যুকেও ডরাই না। শোক তাপ, দুঃখ দৈন্য, ব্যর্থতা—মৃত্যু, জীবনে আসিবেই। মানুষ বলে নিয়তি; নিয়তিতে সব ঘটে। তাই তারা শান্তি পায় না। কিন্তু এর মধ্যে যে মঙ্গলময় দেবতা সঙ্গে থেকে কল্যাণ ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তাই যদি দেখি, তবে যে দুঃখের মধ্যেও সুখ, বিপদেও আনন্দ, মৃত্যুতেও অমৃতত্ব লাভ।

"আমি সুখ ব'লে দুঃখ চেয়েছিনু,
তুমি দুখ ব'লে সুখ দিয়েছ।"

আমাদের কত শুভ আকাঙ্ক্ষা প্রাণে উদয় হয়! কত সময়ে কত শুভ কাজ করি! নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করি, দেশের কল্যাণ সাধন করি; আদর্শের পশ্চাতে ছুটিয়া কত সময়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি; কত পাহাড় পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে হয়; কত কণ্টকাকীর্ণ পথে চলিয়া পা ক্ষত বিক্ষত হয়, শরীর রক্তাক্ত হয়! মানুষ তাহা দেখে না; সংসার তাহা বোঝে না; একটা আশার কথা, একটা সহানুভূতির কথা হয়ত কেহ বলে না। লোকে পাগল বলে; বন্ধুজন—প্রিয়জনও উপহাস করে; অনেকে বিরুদ্ধাচরণও করে। তখন "বিশ্বতশ্চক্ষুঃ" যিনি, তিনি সব দেখেন; 'সপর্য্যগাৎ" তিনি কাছে আছেন। অন্যে কিছু না বলুক, তিনি যদি বলেন, "বেশ হয়েছে" তবে আর ভাবনা কি? আমি যে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে, স্নেহ আলিঙ্গনের মধ্যে, আছি। আমি ত একাকী নহি। আমার সংগ্রাম তিনি জানেন; আমার ব্যথা তিনি বোঝেন, কেবল তাহা নহে; আমার নিভৃত হৃদয়ে থাকিয়া তিনি কত বল দিতেছেন, কত আশা প্রাণে জাগাইতেছেন! আমার ক্লান্তির সময়ে তিনি উৎসাহ দিতেছেন; আমার অপমান নির্য্যাতনের ভিতরে তিনি বলিতেছেন, ভয় নাই, আমি সঙ্গে আছি। আমার পায়ের কাঁটা তিনি স্বহস্তে তুলিতেছেন; আমার শুভ কামনা, শুভ চেষ্টার পুরস্কার তিনি অন্তরে থাকিয়া দিতেছেন।

আমাদের প্রাণে কত সময়ে অশুভ চিন্তা আসে; দুর্ব্বল আমরা, রিপুকুলের উত্তেজনার মধ্যে অনেক সময়ে সংযত থাকিতে পারি না; ভক্ত পাপের সংগ্রামে পড়িয়া গাহিয়াছিলেন—

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়,
পারে কি তৃণ পশিতে জলন্ত অনল যথায়?
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব নাথ, বল ওপদ আশ্রয়।

আজ ভাবি এই শেষ, আর অন্যায় করিব না; কাল প্রলোভন আসে, আপনাকে সংযত রাখিতে পারি না। কঠোর দরিদ্রতা এবং পরিবার প্রতিপালন করিতে পারি না; একটু সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলে অর্থ আসে; পরিবার, স্ত্রী, পুত্র আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়, রোগের চিকিৎসা হয়। প্রলোভন হয়, একটু নিখুঁত সত্য হ'তে দূরে গেলামই; পরিবারপালন, যাদের দায়িত্ব আমার উপর ভগবান দিয়াছেন, তাদের রক্ষা করা কি কর্ত্তব্য নয়, ধর্ম্ম নয়? ধর্ম্মের আবরণে, কর্ত্তব্যের আবরণে কত অশুভ ভাব প্রাণে জাগে। এ ত গেল, বাহিরের কথা! অন্তরে কত রকম পাপ চিন্তা জাগ্রত হয়। লোকে তাহা দেখে না, লোকে বুঝিতে পারে না; কিন্তু কত অপ্রেম, কত বিদ্বেষ ভাব, কত হিংসা দ্বেষ, কত অপবিত্র চিন্তা, কত আত্মাভিমান গোপনে, লোক চক্ষুর অগোচরে প্রাণে জাগে। অনেক অপকর্ম্ম আমরা করি না, করিতে পারি না, লোকের ভয়ে, সমাজের ভয়ে, বন্ধুদের ভালবাসা হারাবার ভয়ে। শুনেছিলাম, একবার ভক্তিভাজন অশ্বিনীকুমার দত্ত কুসঙ্গে পড়ে তাদের প্ররোচনায় মদের গ্লাস মুখের কাছে তুলেছিলেন, তখন মনে পড়িল, প্রিয়বন্ধু ভুবনেশ্বরের মুখ—ভুবন কি বলিবে? কত দিন এক সঙ্গে মদ্যপানের বিরুদ্ধে আলোচনা করেছি; আর আজ—আমি কি করিতেছি? তার কাছে কি মুখ দেখাতে পারব, সে কি আর আমাকে ভালবাসবে? না, হবে না, মদ খাওয়া হবে না; হাতের গ্লাস নামাইয়া রাখিলেন। ঐ বন্ধুর দৃষ্টি তাঁর উপর ছিল। কিন্তু অনেক কুচিন্তা মনে জাগে, যাহা প্রিয়তম বন্ধুও জানিতে পারে না; সঙ্গে যারা আছে তারাও দেখিতে পায় না। তখন কে রক্ষা করে? কেহ দেখিল যদি বুঝি, তবে কুকর্ম্ম করিতে পারি না; কেহ জানিল যদি বুঝি, তবে কুচিন্তা আসিতে পারে না। তিনি আছেন; অন্তর-দেবতা তিনি; স পর্য্যগাৎ, বিশ্বতশ্চক্ষুঃ, তিনি বাহিরের কাজ ত দেখেনই—যখন কেহ কাছে থাকে না, তিনি থাকেন, যাহা কেহ দেখে না, তিনি দেখেন; যখন আমি একাকী আছি, নির্জ্জন কক্ষে আছি, তখনও তাঁর দৃষ্টি আমার উপর। কেবল বাহিরের কাজই তিনি দেখেন না; অন্তর-দেবতা, অন্তরের চিন্তা, ভাব, সব তিনি দেখিতেছেন; তিনি সব জানিতেছেন। এই যদি অনুভব করি, তিনি সব দেখেন, স পর্য্যগাৎ, বিশ্বতশ্চক্ষুঃ তিনি—ইহা যদি হৃদয়ে স্পষ্ট বুঝি, তবে ত অন্যায় কার্য্য করিতে পারি না; পাপচিন্তা প্রাণে আসিতে পারে না। তিনি যে দেখিতেছেন, ঐ যে তাঁর চক্ষু জল জল করিতেছে। তিনি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্—তাঁর রুদ্র দৃষ্টিতে তিনি শাসন করেন; দণ্ড দিয়া তিনি পাপ হইতে উদ্ধার করেন; তাঁর রুদ্র দৃষ্টির ভিতরে স্নেহ ও করুণা ভাসিয়া উঠে; কেবল তাহা নহে, এই যে অভ্যস্ত পাপের সংগ্রাম, এই যে রিপুর উত্তেজনা, এই যে পাপ-চিন্তা, পাপ কার্য্যর প্রলোভন, তাতে তিনিই সহায়; তিনিই এই পাপের সংগ্রামে নিকটে থাকিয়া বল বিধান করেন। তিনি কাছে আছেন, অন্তরে আছেন, আমাকে হাত ধরিয়া তুলিতে চাহিতেছেন, ইহা জানিলে কত বল পাই, আশা পাই, আনন্দ পাই; পাপের সংগ্রামে আপনাকে বাঁচাতে পারি।

ছেলে বেলা পুস্তকে পড়েছিলাম,—

সাবধান সাবধান ওরে মূঢ়মতি
সতত জাগ্রত রন জগতের পতি।

তিনি জাগ্রত হ'য়ে রয়েছেন; মানুষের কাছে একটা অন্যায়

কাজ করিতে পার না, ভয় হয়, লজ্জা হয়। মানুষ যদি মনের কথা জানিত, তবে পাপচিন্তা করিতেও ভয় হইত, লজ্জা হইত। কিন্তু আর একজন যে সর্ব্বদা জাগ্রত হইয়া রহিয়াছেন! নির্জ্জনে অন্ধকারেও তাঁর চক্ষু অচঞ্চল দৃষ্টিতে আমার উপর রহিয়াছে; তিনি চারিদিক আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাহা যদি বুঝিতাম, অনুভব করিতাম, তবে পাপচিন্তা, পাপকার্য্য সম্ভব হইত না। কেবল তাহা নহে, তিনি পাপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্ম নিয়ত ব্যস্ত; তিনি প্রেমে টানিতেছেন, তিনি আমায় সংগ্রামে সাহায্য করিতেছেন। আমি যদি এক পা অগ্রসর হই, তিনি দশ পা অগ্রসর হ'য়ে আমাকে গ্রহণ করেন; আমি হাবুডুবু খেতে খেতে যদি একটু হাত তুলি, তিনি টানিয়া ধরেন। God helps those who help themselves; আবার God helps those who cannot help themselves—যারা নিজে চেষ্টা করে, তাদের তিনি সহায়তা করেন; যারা নিজে চেষ্টা করিয়াও পারে না, তাদেরও তিনি সহায়তা করেন; কিন্তু those who do not help themselves—যারা চেষ্টা করে না—তাদেরও তিনি ছাড়েন না; এক একটা অবস্থায় ফেলে, সুখের ভিতরে বা দুঃখের ভিতরে ফেলে, শোক তাপের আঘাত দিয়ে, তাকেও তুলে নিতে তিনি ব্যস্ত আছেন। প্রেমময় দেবতা—তিনি সর্ব্বদা কাছে—তাঁর স্নেহ চক্ষে দেখিতেছেন। আমি যেখানে যাই, একাকী থাকি, নির্জ্জনে থাকি, কারা-কক্ষে আবদ্ধ থাকি, উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোভিত সমুদ্রে পড়ে যাই, দস্যুর হস্তে পড়ি, হিংস্রজন্তুর মুখে পড়ি, তিনি কাছে আছেন। তিনি জানেন কিসে আমার মঙ্গল। যদি মৃত্যুই কল্যাণ হয়, তবে তাহাই হবে। যদি দুঃখ অপমানই কল্যাণ হয়, তবে তাহাই হইবে।

তুমি সেবাকার্য্যে ব্রতী হয়েছ, রোগীর সেবা কর, দুঃস্থের সেবা কর; প্রাণপণে খাটিতেছ; রোগী বাঁচিল না; দুঃস্থের দুঃখ সম্যক্ মোচন করিতে পারিলে না; তোমার মনে ক্লেশ হয়, নিরাশা আসে। ভয় কি? তিনি তোমাকে দেখিতেছেন; সেই রোগী, সেই দুঃস্থ—তার নিকটেও তিনি আছেন। তিনি জানেন কিসে তাদের মঙ্গল; তিনি জানেন কিসে তোমার কল্যাণ। তুমি খাটিতে খাটিতে, রাত জাগিতে জাগিতে, দুঃস্থের জন্য, দুর্ভিক্ষ পীড়িতের জন্ম ভিক্ষা করিতে করিতে শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ; ভয় কি? তিনি নিকটে আছেন, অনন্ত শক্তির আধার, প্রেমের প্রস্রবণ দেবতা তোমাকে দেখিতেছেন, তোমার ক্লেশ, বাধা, ক্লান্তি, তোমার নিরাশা সবই জানিতেছেন; তাঁর দিকে তাকাও, বল পাবে, আশা পাবে, আনন্দ পাবে; নবীন উৎসাহে আবার কাজ করিবার অনুপ্রাণনা পাবে।

তুমি দেশসেবক—দেশের দুর্নীতি দুর্গতি দূর করিতে চাহিতেছ; সমাজের কুসংস্কার দূর করিতে চাহিতেছ। কত সংস্কারক প্রাণ দিয়া আজীবন চেষ্টা করিলেন; কত বিদ্যাসাগর জীবন দিয়া চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ ফল পাইলেন না! কত রামমোহন দেশের কল্যাণ, সমাজের কল্যাণ করিতে যাইয়া তৎকালে দেশবাসী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইলেন! যীশুখৃষ্টকে ক্রুশ-কাষ্ঠে বিদ্ধ হইতে হইল। তবুও ভয় পেও না! তিনি দেখিতেছেন। যাহা ভাল, যাহা কল্যাণকর, তাহার বীজ মরে না; আজ না ফল প্রসূত হউক, দশ দিন পরে, দশ বৎসর পরে, শত বৎসর পরে তার ফল মানুষ ভোগ করিবে। এই ব্রাহ্মসমাজই যে সব সমাজব্যাধি দূর করিতে চাহিয়াছিল, যে সকল কল্যাণকর কাজ করিতে চাহিয়াছিল, দেশ তখন তাহা গ্রহণ করে নাই; ব্রাহ্মদিগকে নির্য্যাতন করিয়াছে, সমাজবক্ষ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে; পিতা মাতার স্নেহের বন্ধন হইতে ছিন্ন হইতে হইয়াছে। কিন্তু আজ? সমাজ, দেশ, সেই সকল কল্যাণকর ব্যবস্থা একে একে গ্রহণ করিতেছে। তাই বলি, ভয় পেওনা, নিরাশ হয়োনা, তোমার নিকটে তিনি; অন্তরে তিনি, বাহিরে তিনি। সব দেখিতেছেন। তোমার শুভ চেষ্টা, কল্যাণ-কামনা কখনও বৃথা যাবে না।

তুমি দেশের রাজনীতিক দুর্গতি দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছ; দেশের স্বাধীনতা আনিবার জন্ম চেষ্টা করিতেছ; স্বরাজ-সংগ্রামে আপনাকে অর্পণ করিয়াছ। তোমার প্রাণে যে আলোক আসিয়াছে, তদনুসারে চলিতেছ। কত দুঃখ দারিদ্র্যও বরণ করিয়া লইয়াছ! কিন্তু কাজ ত এগুতেছে না। রাজশক্তি তোমাকে বাধা দিতেছে, কারারুদ্ধ করিতেছে; ঘোরতর উৎ-পীড়ন করিতেছে; দেশের লোকও আপনাদের কল্যাণ বুঝিতেছে না; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থ লইয়া ঝগড়া করিতেছে, মারামারি করিতেছে, ভাই ভাইয়ের রক্তপাত করিতেছে। তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, সে পথকে অন্যেরা নিন্দা করিতেছে। তুমি রক্তাক্ত কলেবরে কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া চলিতেছ, ভাই বন্ধু তাহাতে সহানুভূতি করে না। ভয় কি? তিনি সঙ্গে থাকিয়া তোমার সংগ্রাম দেখিতেছেন। তোমার এই ত্যাগ, তোমার এই ক্লেশসহন, এই কারাবরণ, বৃথা যাবে না। হয়ত এপথে সিদ্ধিলাভ হবে না, তবুও তোমার চেষ্টা বৃথা যাবে না; তোমার চেষ্টার ফলে, তোমার ত্যাগ ও ক্লেশ-স্বীকারের ফলেও দেশ অগ্রসর হবে। তিনি যে কাছে আছেন!

সপর্য্যগাৎ, বিশ্বতশ্চক্ষুঃ—এ কথা ভুলিও না। যদি ভোল, তবে বিপথে যাবে; বিপদে পড়িবে; নিরাশা আসিবে; ক্লেশ সহিতে পারিবে না। এক একবার মনে হবে, ঠিক পথ, খাঁটি পথ হইতে বিচ্যুত হই; বিরোধীদের যে কোন উপায়ে পরাজিত করি। সাবধান, তিনি দেখিতেছেন, তোমার সংগ্রাম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন, আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ, কার্য্যপ্রণালী—উপায়—সৎ, আমাদের ভয় নাই, ঈশ্বর আমাদের সহায়। সাধুপথ হইতে, সত্য পথ হইতে বিচ্যুত হইও না। সত্য পথ হইতে বিচ্যুত হইবে অথচ ন্যায়ের দোহাই দিবে, সত্যের দোহাই দিবে—ইহা কপটতা, আত্মপ্রবঞ্চনা। হইতে পারে, আজ তোমার চেষ্টার ফল দেখিতেছ না; কিন্তু ফলদাতা তিনি; তিনি সঙ্গে থাকিয়া চক্র ঘুরাইতেছেন। তুমি যদি তাঁকে হারাও, তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে আছ, ইহা যদি ভুলিয়া যাও, তবে কেবল যে অসত্য পথে যাবে তা নয়, বিফলতার সময়ে আশা হারাবে; প্রলোভনের সময় বল হারাবে। তুমি যে কোথায় যেয়ে পড়িবে, কে জানে?

তাই এক একজন লোক অনেক দিন সংগ্রাম করিয়া পরে আত্মবিক্রয় করিল ; নিরাশ হ'য়ে পড়িল। সপর্য্যগাৎ, বিশ্বতশ্চক্ষুঃ—তিনি কাছে আছেন, তোমার অন্তরে আছেন, তোমার শুভ কামনা, কল্যাণচেষ্টা, দুঃখ ক্লেশ, তোমার প্রাণপণ সংগ্রাম তিনি দেখিতেছেন ; তিনি অন্তরালে থাকিয়া আশা উৎসাহ ও বল দিতেছেন। তাঁহার বিদ্যমানতা অনুভব কর ; তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্ভয়ে চল।

তোমার প্রিয়জন, তার ঘোর ব্যাধি ; তুমি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছ ; তুমি দিন রাত অনাহারে অনিদ্রায় তাহার সেবা করিতেছ ; তাহাকে তবুও একটু শান্তি দিতে পারিতেছ না ; হয়ত চিকিৎসা, পথ্য ও শুশ্রূষার যতটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তাহা পারিতেছ না, শক্তিতে কুলাইতেছে না। এক একবার মন ব'সে যাচ্ছে। নিরাশ হইও না ; তিনি দেখিতেছেন ; তিনি তোমার এই ক্লান্তিতে শান্তি দিবেন। তিনি ত তোমার প্রিয়জনকেও ভালবাসেন ; তোমার চেয়েও বেশী ভালবাসেন ; তিনিও তাঁর ক্লেশ, যন্ত্রণা দেখ্‌ছেন। তুমি তাঁর দৃষ্টির দিকে তাকাইয়া তোমার কাজ ক'রে যাও। তিনি তার বিষয় ভাব্‌বেন। যদি আরোগ্য লাভই না হয়, যদি মৃত্যুই আসে ; তাতেই বা ভয় কি ? তিনি তাঁর ক্রোড়ে নিয়ে গেলেন। মৃত্যুত হবেই। কত রকমে মৃত্যু হয়! কেবল ত ব্যাধি নয়, শত দ্বার মৃত্যুর। মৃত্যু যে অমৃতের সোপান। স্নেহময়ী পরম জননী যদি তাহাকে ঐ লোকে লইয়া যান,—যেখানে ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, জরা নাই, ব্যাধি নাই, মরণও নাই, যেখানে কত প্রিয়জন গিয়াছেন, তুমি আমিও যাব,—সেখানে যদি নিয়ে যান, ভয় কি ? তিনি সেখানে তাকে যত্নে রাখিবেন। তুমিও ত সেখানে যাবে ; প্রীতি রক্ষা কর, তার স্নেহস্মৃতি যত্নে রাখ—তুমি যখন যাবে, ঈশ্বরের ক্রোড়ে তাকে আবার পাবে। তিনি কাছে আছেন, তিনি তোমাকে ভালবাসেন, তাকেও ভালবাসেন ; সুতরাং সেবা ক'রে যাও, ভয় পেও না।

তুমি যাকে ভালবাস, স্নেহ কর, যার কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর, সে তোমা হ'তে দূরে চ'লে গেল ; সে তোমার স্নেহ উপেক্ষা করিল ; হয় ত সে তোমার নিন্দা করিল, অমঙ্গলচিন্তা, অকল্যাণচেষ্টা করিল। তবুও ভয় পেও না, তাকে তবুও ভালবাসিবে। যে ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসা দেয়, কল্যাণের প্রতিদানে কল্যাণ দেয়, তাকে ত সকলেই ভালবাসে ; যে ভালবাসার প্রতিদানে ঘৃণা দেয়, উপেক্ষা দেয়, কল্যাণের প্রতিদানে অকল্যাণ করে, তাকেও ভালবাসাই ত প্রকৃত ভালবাসা। ভগবান কাছে আছেন ; তিনি দেখিতেছেন। প্রীতি, স্নেহ ভালবাসা কখনও বৃথা যায় না। আজ যে তোমার স্নেহ প্রীতি বুঝিল না, কাল বুঝিবে ; ইহকালে না বুঝিলে পরকালে বুঝিবে। তুমি স্নেহ করিবে, প্রীতি করিবে, কল্যাণচিন্তা করিবে, কল্যাণচেষ্টা করিবে। তোমার হৃদয়ের ভাব, তোমার প্রাণের চেষ্টা তিনি দেখিতেছেন। তিনি তোমার ক্লেশ, মনের অশান্তি জানিতেছেন। এই বেদনার ভিতর দিয়াই তোমাকে গড়িয়া তুলিতেছেন, বিকসিত করিতেছেন। তোমাকে প্রেম শিক্ষা দিতেছেন। উপেক্ষা পাইয়াও যে প্রেম, তাহাই যে প্রকৃত প্রেম ; এখানেই প্রেমের শিক্ষা ও পরীক্ষা। প্রিয়জনের উপেক্ষাতে ক্লেশ হয়, প্রিয়জনের মৃত্যুতে আরও ক্লেশ হয়। কিন্তু প্রিয়জন যদি বিপথে যায়, তখন যে ক্লেশ হয়, তার তুলনা নাই। প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়ে ; অশ্রুতে বক্ষ ভাসিয়া যায়। প্রভু, কেন এমন করিলে ? আমার প্রিয়জন, যাকে কত ভালবাসি, সে কোথায় গেল ? কোনও কথা শুনিল না। সে যে কোথায় চ'লে গেল ; তাকে একবার দেখিবারও হয়ত সুবিধা হয় না। জীবন ফিরাবার জন্য দুটি কথা যে বলিব, তার কাছে ব'সে যে একটু কাঁদিব, তাকে বুঝাতে চেষ্টা করিব, সে সুযোগও পেলেম না! তখন যে আর আশা থাকে না, প্রাণ ভেঙ্গে পড়ে ; কূল কিনারা পাওয়া যায় না। এরূপ যদি হয়, তবুও নিরাশ হইও না ; তিনি তাকেও ভালবাসেন। তাকে তিনি মরিতে দিবেন না। তার জন্য তোমার প্রাণে এত বেদনা, প্রভুর প্রাণে আরও কত গভীর বেদনা! একটি আত্মা বিপথে গেলে প্রেমময় পিতার প্রাণে ক্লেশ হয়! তুমি আর কিছু না পার, ক্রন্দন কর, প্রার্থনা কর। প্রভু তোমার কাছে থেকে দেখিতেছেন। মণিকা মাতা পুত্রের জন্য কত বৎসর ক্রন্দন করিয়াছিলেন! ভগবান সে ক্রন্দন শুনিলেন। তোমার ক্রন্দনও তিনি শুনিবেন, তিনি যে তাকেও ভালবাসেন ; তাকে ত মরিতে দিতে পারেন না। তুমি ক্রন্দন কর, প্রার্থনা কর, প্রীতির বন্ধনে আকর্ষণ কর। কাছে যেতে পার না ? কথা বলিতে পার না ? তবুও দূর হ'তে ভালবাস ; কল্যাণ কামনা কর, প্রার্থনা কর। স পর্য্যগাৎ, বিশ্বতশ্চক্ষুঃ—তিনি কাছে রয়েছেন। ভয় নাই, এখানে নিরাশার স্থান নাই।

তুমি সমাজের দুঃখ দুর্দশা, পাপ তাপ দেখিয়া ব্যথা পেতেছে। দেশের মধ্যে দুর্নীতি, ক্লেশ, দরিদ্রতা, ধর্ম্মহীনতা, দাস ভাব দেখিয়া ক্লেশ অনুভব করিতেছ। তুমি মানবের কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাব, দুর্গতি, ধর্ম্মহীনতা দেখিয়া দুঃখ পাইতেছ ; ভয় নাই ; তোমার শক্তি অনুসারে কল্যাণ সাধন করিয়া যাও। There is a Divinity that shapes the ends, roughew them as you will—মানুষের উপরে আর একটা শক্তি আছে। The battle is not yours, but God's ; Fear not, nor be dismayed ; for the Lord will be with you." এই যে সত্য ন্যায় পবিত্রতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম—এই সংগ্রাম তোমার নয়, ইহা ঈশ্বরেরই সংগ্রাম। ভয় পেও না, হতাশ্বাসও হইও না, কারণ ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকিবেন। তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সব দেখিতেছেন, তিনি কল্যাণ করিতেছেন। ভয় নাই ; সপর্য্যগাৎ, বিশ্বতশ্চক্ষু—এইটা সাধন কর। এই সত্য অনুভব কর। তবে ভয় থাকিবে না, নিরাশা আসিবে না, মঙ্গল বিধানে অবিশ্বাস আসিবে না। প্রাণে শান্তি হবে, আশা পূর্ণ হবে, আনন্দময়কে দেখে আনন্দলাভ করিবে।

ভাই বোন সকল, উৎসবান্তে যাও, তবে গৃহে যাও ; বন্ধুবান্ধবদের যেয়ে বল, আমরা উৎসবে উৎসব-দেবতার প্রসাদ পেয়েছি ; আমরা কেবল খেলানা নিয়ে আসি নাই ; প্রসাদ

আনিয়াছি—স পর্য্যগাৎ—তিনি সঙ্গে রহিয়াছেন এই মন্ত্র পাইয়াছি; এই মন্ত্র সাধন করিলেই নির্জ্জনতায় সঙ্গী পাব, নিরাশ প্রাণে আশা পাব, সংগ্রামে বল পাব, দুঃখে শান্তি পাব, শোকে সান্ত্বনা পাব, পাপে মুক্তি পাব, বেদনায় প্রলেপ পাব। এই মন্ত্র সাধন করিলেই জীবন আনন্দময় হবে, প্রেমে পূর্ণ হবে, হৃদয় পবিত্র হবে।

উৎসবান্তে আলিঙ্গনাদি করিয়া সকলে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। এবার উৎসবের সংশ্রবে উদ্যান-সম্মিলন না হইলেও ছাত্র সমাজ ও ব্রাহ্ম যুবকদিগের চেষ্টায় ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে তাহার ব্যবস্থা হইয়াছিল। উৎসব উপলক্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও একদিন কাঙ্গালী-বিদায় হইয়াছিল।

এখানেই আমাদের অসম্পূর্ণ বিবরণ শেষ হইল। আমাদের সকল ত্রুটি ও অযোগ্যতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি, এবং করুণাময় পিতা যে অতি সামান্য ভাবেও তাঁহার একটু কাজ আমাদের দ্বারা করাইয়া লইলেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহারই নিকট প্রণত হইতেছি। তিনি কৃপা করিয়া আমাদের প্রতি জীবনে ও সমগ্র সমাজে উৎসবের ফল স্থায়ী করুন। তাঁহার সিংহাসন সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

---

## ধর্ম্মজীবনের সত্যতা

[ মাঘোৎসবে ১২ই মাঘ সোমবার প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর উপদেশের মর্ম্ম ]

গত দুই বৎসর ১২ই মাঘে আমি "প্রেমের সেবা" ও "প্রেম-ভক্তির অনুকূল ক্ষেত্র রচনা" বিষয়ে কিছু নিবেদন করিয়াছিলাম। এবার আমি "ধর্ম্মজীবনের সত্যতা" বিষয়ে কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।

ধর্ম্মজীবন সত্য হয় না কিসে, তাহার আলোচনায় অগ্রে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

প্রথমতঃ, সুখ অন্বেষণ ধর্ম্মজীবনের সত্যতার পরিপন্থী। ধর্ম্মসাহিত্যে বলে, জ্ঞানী ভক্ত যোগী অতি উন্নত আনন্দের অধিকারী হন, পরা শান্তি লাভ করেন। জ্ঞানী যখন জ্ঞান-তপস্যায় নিযুক্ত, এক একটি পবিত্র তত্ত্ব যখন তাঁহার চিত্ত-আকাশে উদ্ভাসিত হইতেছে, তখন তাঁহার হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়! ভক্ত যখন ঈশ্বরের প্রেমানুভূতিতে মগ্ন, ঈশ্বরের নামগানে কীর্ত্তনে যখন তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত, তখন তাঁহার হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়! ধ্যানী ধ্যানস্থ হইয়া যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকলের চঞ্চলতা হইতে মুক্ত, যখন তাবৎ বস্তু তাবৎ সত্তা তাবৎ জগদ্‌ব্যাপার তাঁহার কাছে বিগলিত হইয়া গিয়াছে, স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছে, যখন একানুভূতির বিমল রস তাঁহার চিত্তকে পূর্ণ করিয়াছে, তখন তাঁহার হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়! কিন্তু এ সকল আনন্দ তো ধর্ম্মজীবনের লক্ষণ। এ আনন্দকে যাই তুমি লক্ষ্য-স্থানে রাখিলে, আর তোমার ধর্ম্মজীবনে সত্যতা রহিল না। সুখ-অন্বেষণকে যত ঊর্দ্ধেই লইয়া যাও না কেন, তাহা সুখ-অন্বেষণই। তাহা সত্য ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা নহে, তাহা সত্য ধর্ম্মজীবন নহে।

আজকাল যাঁহারা নবযুগের নব শিক্ষার ফলে ঈশ্বরানুভূতিকে বিশ্ব-জগতে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, যাঁহারা জীবধর্ম্মের সকল আনন্দ, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দে, সঙ্গীতে, সৌন্দর্য্যে ঈশ্বরের আনন্দলীলা দর্শন করিতে মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারা ধর্ম্মকে সহজ ভূমিতে লইয়া আসিয়া মানব-মনের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে-পরিমাণে ঐ সহজ আনন্দকে মানব জীবনের লক্ষ্য-স্থানে রাখেন, সেই পরিমাণে তাঁহারা সত্য ধর্ম্মজীবন হইতে চ্যুত। এ ক্ষেত্রেও বলিতে হয়, সুখ-অন্বেষণ সুখ-অন্বেষণই। সুখকে যত ইচ্ছা মার্জ্জিত কর, তাহাকে "আনন্দ" নাম দিয়া যত ইচ্ছা গৌরবান্বিত কর,—মানব-মনে তাহার জন্য যে অন্বেষণটি, তাহার মূল্য ঐ পর্য্যন্তই।

যাহা ফল রূপে প্রাপ্য, যাহাকে সাধনা দ্বারা আত্মসমর্পণের দ্বারা লাভ করিয়া কৃতজ্ঞ হইতে হইবে, তাহাকে লক্ষ্য-স্থানে রাখিলে মানব-মন প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের অবস্থা হইতে নীচে নামিয়া যায়। সুখ-অন্বেষণের ভাবটি ধর্ম্মজীবনের সত্যতার একটি বড় বাধা।

দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মজীবনের সত্যতার আর এক বাধা, আত্মতৃপ্তি, self-complacency, "আমার অবস্থা কত ভাল" এই বলিয়া মনে মনে আপনাকে অভিনন্দিত করা। সকলেই জানেন, মানুষের ধনাভিমান জ্ঞানাভিমান এ সংসারে অতি অশোভন বস্তু। কিন্তু মানুষের ধর্ম্মাভিমান ও সাধনাভিমান ততোধিক কদর্য্য বস্তু। "চারিদিকে সকলেই সাধনভজনবিহীন; ইহার মধ্যে আমি বা আমরা কয়জন সাধনে অনুরাগী"—এইরূপ একটি ভাব যদি গূঢ় ভাবে মনের গোপনে বিদ্যমান থাকে, তবে সে আত্ম-অভিনন্দন, সে self-congratulation ধর্ম্মজীবনের সত্যতাকে একেবারে বিনষ্ট করিয়া দেয়। "চারিদিকে সকলেই সংসারাসক্ত; আমি বা আমরা কয়জন ত্যাগী"—এই ভাব যদি মনের গোপনে কার্য্য করে, তাহা তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মজীবনকে অসত্য ও অসার করিয়া তোলে। "চারিদিকে ভারত তিমিরাচ্ছন্ন; ইহার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ আলোক-প্রাপ্ত,"—এইরূপ বা ইহার অনুরূপ ভাবটি যদি ব্রাহ্মসমাজ আপনার অন্তরে পোষণ করিয়া আপনাকে অভিনন্দিত করিতে থাকেন, তবে তাহাই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের সত্যতাকে বিনষ্ট করিবে।

যে ভূমিতে দাঁড়াইয়া কোনও মানুষ বা মণ্ডলী বা সমাজ আত্ম-অভিনন্দনের ভাবে পূর্ণ হন, হয় তো সেই ভূমিতে পৌঁছিতে তাঁহাকে অনেক সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সে সময়ে তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন সত্য ছিল। তাঁহারা ধর্ম্মজীবনের সত্যতার পথ দিয়াই ঐ স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু যাই ঐ প্রকার আত্ম-অভিনন্দন আরম্ভ হইল, অমনি তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনে অসত্যতা প্রবেশ করিল। তখন হইতে তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনে অসারতার ভাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যদি এই অসারতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া হয়, তবে শেষে অতি

শোচনীয় ফল ফলে। আত্ম-অভিনন্দনের ফল অন্ধতা। এবং এইরূপ অন্ধতা হেতু কত ব্যক্তিগত ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কত ধর্ম্মমণ্ডলীর অধঃপতন হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

তৃতীয়তঃ, সংসারে ভদ্রতারক্ষা, খেলা, অভিনয় প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপার আছে। তাহাতে সত্য গোপন অথবা মিথ্যা আচরণ নাই। সত্য গোপন ও মিথ্যা আচরণ সর্ব্বদাই দূষণীয়। এ সকল ব্যাপার সেভাবে দূষণীয় নহে। সংসারে যখন আমরা ভদ্রবেশে সজ্জিত হইয়া কোনও সামাজিক মিলনক্ষেত্রে যাই, তখন আমরা সকলেই জানি যে এই পোষাক আমাদের কাহারও প্রতিদিনের অথবা অষ্ট প্রহরের পোষাক নয়। এইরূপ জানা থাকে বলিয়া সকলে নিঃসঙ্কোচে পরস্পরের সঙ্গে মিশিতে পারি। কিন্তু যাই কাহারও মধ্যে সত্যকে অতিক্রম করিয়া একটু প্রদর্শনের ভাব আসে, তখনই তাহা বিসদৃশ বোধ হয়। কত ধনী পরিবার ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়াও পূর্ব্বের ন্যায় "ঠাট বজায় রাখিতে" গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়।

ছেলে মেয়েরা যখন খেলা করে, তখন একজন রাজা হয়, একজন মন্ত্রী হয়, একজন প্রজা হয়। তখন তাহারা যাহা করে বা বলে, তাহা কেহই সত্য বলিয়া ভ্রম করে না।

বয়স্কেরা যখন অভিনয় করেন বা অভিনয় দর্শন করেন, তখন কেহই এ ভ্রম করেন না যে সত্য সত্যই রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠির বা বিক্রমাদিত্য তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যেও কি এই জাতীয় ব্যাপারসকলের স্থান আছে? আমার বিশ্বাস, তাহা নাই। সত্যতা, reality,—ইহাই ধর্ম্মের একমাত্র ভিত্তি। মিথ্যা না হইলেও, যাহাতে ঠাট বজায় রাখা, অভিনয়, সাজসজ্জা, প্রভৃতির ভাব মনে আসে, এমন সকল ব্যাপারকে ধর্ম্মরাজ্য হইতে দূরে রাখা আবশ্যক।

যাহারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগত কার্য্যের অথবা সমাজের কার্য্যের রিপোর্ট লিখিতে হয়। এই কাজটি অতি সাবধানে করা প্রয়োজন। রিপোর্টটি এতখানি দীর্ঘ না হইলে কেমন দেখাইবে, এই ভাব যেন মনের ত্রিসীমাতেও আসিতে না পায়। অথবা, কোনও সমাজের উৎসব উপস্থিত। পূর্ব্বে তথায় প্রাণবান্ মানুষের সংখ্যা অধিক ছিল, এখন আর তত নাই। তখন তাঁহারা কি করিবেন? যাহা আছে তাহা লইয়াই ঈশ্বরচরণে উপস্থিত হইবেন। এতখানি দীর্ঘ না করিলে উৎসবটি শোভন হয় না,—এভাব যেন মনের ত্রিসীমাতেও আসিতে না পায়। এ সকল ভাব "ঠাট বজায়" রাখিবার আকাঙ্ক্ষা সূচনা করে। ধর্ম্মরাজ্যে এ সকলের কোন স্থান নাই।

ইউরোপের কোন কোন স্থানে যিশু খ্রীষ্টের জীবনের অভিনয় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে Oberammergau নামক স্থানের Passion-play অতি প্রসিদ্ধ। অনেকে তথায় গিয়া উপকৃত হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন শাখাতে ধর্ম্মমূলক অভিনয় করা হইয়া থাকে। আমরাও আমাদের নীতিবিদ্যালয়ের উৎসবের সময়ে ছেলে মেয়েদের দিয়া অভিনয় করাই।

এ বিষয়েও আমি বলি, এ সকল ব্যাপারকে প্রশ্রয় হইতে দূরে রাখাই ভাল। ধর্ম্ম ও অভিনয়, ধর্ম্ম ও প্রদর্শন,—এই দুই বস্তু কোনও কারণে, কোনও রূপে, কোনও আকারে মিশিয়া থাকিতেছে, ইহা আমি দেখিতে পারি না। ধর্ম্ম সত্যতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে দিনটি, যে সপ্তাহটি আমি উৎসবের ভাবে কাটাইব, প্রাণকে ভাজিয়া চুরিয়া, অনুতাপে প্রদীপ্ত করিয়া, ব্যাকুলতায় আলোড়িত করিয়া, ঈশ্বরচরণে সমর্পণ করিব, সেই দিনটিতে সেই সপ্তাহটিতে আমি আবার অভিনয়ও করিব অথবা অভিনয় দর্শনও করিব,—ইহা আমি সহিতে পারি না। ব্যাকুলতার ও খেলার, সত্যের ও অভিনয়ের, এই মেশামিশি, এই juxtaposition, আমার সহ্য হয় না।

আমি নির্দ্দোষ আমোদের বিরোধী নই, নির্দ্দোষ অভিনয়ের বিরোধী নই। কিন্তু ধর্ম্ম ও আমোদের, ধর্ম্ম ও অভিনয়ের, মাঝের রেখাটি অস্পষ্ট করিয়া ফেলা অতি বিপজ্জনক মনে করি।

সংসারে সাজ পোষাকের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে মানুষের মন সাজ পোষাক লইয়া অতিরিক্ত ব্যস্ত, তাহাকে বড় কৃপাপাত্র মনে হয়। আমার একবার একটি নেপালী চাকর ছিল। সে কাজে কর্ম্মে বড় দক্ষ ছিল। কিন্তু তাহাকে কোন কাজে বাড়ীর বাহিরে যাইতে বলিলেই দেখিতাম, সে নিজের ঘরে গিয়া ভাল পোষাকটি পরিতেছে, জুতা পায়ে দিতেছে, চুল আঁচড়াইতেছে; এদিকে আমার কাজে দেরী পড়িয়া গিয়া ক্ষতি হইতেছে। তাহার এই অতিরিক্ত সাজ সজ্জার ভাবেই সে ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে লব্ধ জ্ঞান ঈশ্বরের সেবার জন্য ব্যবহার করা যায়। তাহা যেন ঈশ্বরের ভৃত্যের হাতের যন্ত্র, ঈশ্বরের সৈনিকের অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু তাহাকে সাজসজ্জার মত ব্যবহার করা উচিত নয়। জ্ঞানের জন্য ব্যাকুলতাকে যদি ডিগ্রীর জন্য ব্যাকুলতা গ্রাস করিয়া ফেলে, অথবা ডিগ্রী লাভ করিবার পর তাহার চিহ্নের অক্ষর কয়টি নামের পশ্চাতে যত্র তত্র ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি যদি প্রকাশ পায়, তবে তাহা অচিরে ধর্ম্মজীবনের সারবত্তা নষ্ট করিয়া ফেলে। অথবা ইহাও বলা যায় যে, এ সকল প্রবৃত্তিতে, ধর্ম্মজীবনে অসারতা রহিয়াছে, তাহারই সূচনা করে। যদি উপাধি লাভ করিয়া কাহারও মনে আত্মতৃপ্তির ভাব আসে, তবে সে তখন হইতে নিজ ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অসাবধান হইয়া পড়ে।

জ্ঞানগত বিষয়ে পরীক্ষা করা, বিচার করা, উপাধি দান করা সম্ভব। ঈশ্বরসেবকের পক্ষে সে পরীক্ষা দেওয়া, পরিশ্রম করিয়া সে উপাধির যোগ্যতা অর্জ্জন করা সম্ভব। কিন্তু ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধীয় কিংবা চরিত্র বিষয়ক উপাধি গ্রহণ অথবা ব্যবহার করা, ধর্ম্মজীবনের সত্যতা ও সারবত্তা নষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট হেতু। মানুষ শ্রদ্ধাবশতঃ মানুষকে এইরূপ উপাধিও কখনও কখনও দিয়া থাকে। কিন্তু তিনি স্বয়ং এইরূপ উপাধি ব্যবহার করিতেছেন, ইহা কল্পনা করিতেও ক্লেশবোধ হয়।

কখনও কখনও কাহারও কাহারও নামের সঙ্গে "ভক্তিবিনোদ" প্রভৃতি উপাধি সংযুক্ত হইতে দেখিয়াছি; নিজ উক্তিতে নিজের নামে তাহা ব্যবহার করিতেও দেখিয়াছি। দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে ভক্তির সর্ব্বনাশ করা হইতেছে।

সত্য ধর্ম্মজীবন কিসে হয়, কিসে যায়, তাহা কি একটি সঙ্কেতবাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব? ইহা চিন্তা করিলে আমার মনে এই কথা আসে যে, যে-অবস্থায় মানবাত্মা একাকী স্বাধীন ও স্বায়ত্ত, যে-সাধনায় মানবাত্মা আপনাকে একক ও স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করে, সে-অবস্থা ও সে-সাধনা যতই উন্নত হউক না কেন, তাহা সত্য ধর্ম্মজীবন লাভের অবস্থা নয়, সত্য ধর্ম্ম-জীবন লাভের সাধনা নয়। দ্বিতীয় একজনের সম্মুখীন না হইলে, দ্বিতীয় একজনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শাসিত ও শৃঙ্খলিত না হইলে, দ্বিতীয় একজনের প্রেমের দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচালিত না হইলে, ধর্ম্মজীবন সত্য হইতে পারে না। যাহা শুধু subjective, তাহা দ্বারা ধর্ম্মজীবন সত্য হয় না।

সাধারণতঃ বলা হয়, জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম এই তিন লইয়া ধর্ম্মের ত্রিবিধ সাধন। প্রাচীনকালে "সাধন" কথাটির অর্থ ছিল, গুরুপরম্পরা-নির্দিষ্ট অথবা সাধন-শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রণালী শ্রদ্ধার সহিত শিক্ষা করা ও নিষ্ঠার সহিত অভ্যাস করা। ইহারও মূল্য অল্প নহে। উপনিষদে যে একাত্মানুভূতির শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, সমগ্র বিশ্বজগতে ব্রহ্মের প্রকাশ দর্শন করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, সে শিক্ষাটি অতি মূল্যবান্। ভক্তিমার্গে পরমেশ্বরের মহিমা ঐশ্বর্য্য এবং আপনার দীনতা অকিঞ্চনতা অনুভব করিয়া নম্র ও বিনীত হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত করিতে, পুলকিত হইতে, শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; সে শিক্ষাটিও অতি মূল্যবান্। গীতাতে সংসারের সকল কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া সম্পন্ন করিতে মানুষকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। এ আদর্শটিও অতি মূল্যবান্। এ সকলের মূল্য আমরা অস্বীকার করি না। একাত্মানুভূতি, ধ্যান-ধারণা, অশ্রু কম্প স্বেদ পুলক মূর্চ্ছা, নিষ্কাম কর্ম্ম, সবই ভাল। কিন্তু এ সকলের দ্বারাই ধর্ম্মজীবন সত্য হইয়া উঠে না। মানুষ সেই পরম পুরুষের দ্বারা অধিকৃত হইলে তাহাতে সত্য ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। হে মানব, তিনি কি তোমাকে ধ'রেছেন? তিনি কি তোমার কাছে দেখা দিয়ে তোমার হাতখানি দৃঢ় মুষ্টিতে ধ'রেছেন? তোমার কি তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হ'য়েছে? Has He held you by His eyes? তাঁহার হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিয়া মানুষ যখন আর একাকী থাকে না, স্বায়ত্ত থাকে না, স্ববশ থাকে না, ঈশ্বরের জলন্ত সন্নিধানে বাস করে, তাঁহার দ্বারা ধৃত হইয়া জীবনধারণ করে, তখনই সে সত্য ধর্ম্মজীবনে জীবিত। সত্য ধর্ম্মজীবন যাহার মধ্যে আছে তাহার ছবিটি কিরূপ? A man before his master,—দাসের সমুদয় মন বুদ্ধি, তাহার সমগ্র চেতনা, তাহার দেহের সর্ব্বাঙ্গ প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তিতার ভাবে পরিপূর্ণ। তোমাতে কি সেই ভাব এসেছে? তা'হ'লেই তুমি সত্য ধর্ম্মজীবন কি, তাহা জেনেছ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম মানুষকে সেই পরমপুরুষের সম্মুখে স্থাপন করেন, ও তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া দেন। পরমপুরুষের সহিত সম্বন্ধের নামই ধর্ম্মজীবন; সেই সম্বন্ধের যত বিভিন্ন দিক আছে, ধর্ম্মেরও তত বিভিন্ন দিক আছে। এই সম্বন্ধের ভাবে যিনি ধর্ম্মসাধন করেন, তাঁহার জীবনে জ্ঞান ভাব কর্ম্ম সকলই সেই সম্বন্ধের অঙ্গরূপে প্রকাশিত হয়।

স্কুলের ছাত্রেরা কখনও কখনও তাহাদের খাতায় দুই প্রকার বস্তুর পার্থক্যের বর্ণনা লিখিবার জন্য পাতাটির মাঝখান দিয়া খাড়া একটি রেখা টানিয়া তাহাকে দুই অংশে বিভক্ত করে। সেইরূপ, হে ধর্ম্মসাধক, তোমার অন্তরে দুই প্রকার সাধনার পার্থক্য বুঝিবার জন্য একটি রেখা টানিয়া লও। তার বাঁ দিকে রাখ, ধ্যান ধারণা জপ তপ অর্চ্চনা বন্দনা। ডান দিকে রাখ, ঈশ্বরের কাছে বসিয়া তাঁহার ইচ্ছা অনুভব, তাঁহার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ। ডান দিকে যাহা রাখিলে, তাহা লইয়াই ধর্ম্মজীবনের সত্যতা গড়িয়া উঠিবে। যদি এই দিকটি দুর্ব্বল হয়, তবে তুমি চিন্তাবিলাসী ধ্যানবিলাসী অর্চ্চনাবিলাসী ভাব-বিলাসী কবিত্ববিলাসী হইতে পার, কিন্তু ধর্ম্মজীবনের সত্যতার তুমি কি জানিবে? আবার, যদি এই দিকটি সতেজ হয়, তবে তোমার চিন্তা ভাব ধ্যান ধারণা সঙ্গীত কবিত্ব সবই সার্থক।

সেই পরমপুরুষের সহিত সম্বন্ধের আকারে ধর্ম্মকে সাধন করিলে জীবনে ঐ প্রকার প্রবল ব্যাকুলতার উদয় হয়। তাঁহার ইচ্ছাপালনের জন্য অন্তরে একটি নিত্য সজাগ নিত্য উদ্যত ভাবের উদয় হয়। ইহা যেন মানুষকে ঈশ্বরের নিত্য আদেশ-ও-নিষেধের একটি জলন্ত অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করে। তার মন তখন বলে, "হে প্রভু, আমায় পদে পদে ব'লে দাও, আমি কি কর্‌ব, কেমন ভাবে চল্‌ব।" হে সাধক, হে সেবক, হে সাধনাশ্রমের তরুণ সেবার্থী, তোমাদের অন্তরে কি ঈশ্বরের আদেশ ও নিষেধ শ্রবণের জন্য, তাঁর আদেশ ও নিষেধ গ্রহণ ও পালনের জন্য, সেই প্রবল ব্যাকুলতা জেগে আছে? আমি কখন উঠ্‌ব, কখন কাজ আরম্ভ কর্‌ব, কখন বিশ্রাম কর্‌ব, আমার কর্ম্মস্থলে আমি কেমন ক'রে আমার কাজগুলি কর্‌ব, কেমন ক'রে আমার কলমটি ধর্‌ব,—আমি কেমন ক'রে মানুষের সঙ্গে কথাটি বল্‌ব, প্রত্যেক ব্যবহারটি কর্‌ব, আমি গুরুজনের প্রতি বন্ধুর প্রতি নারীর প্রতি কেমন দৃষ্টিটি ফেল্‌ব, আমি উপাসনাক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে অবসর সময়ে আমোদের মুহূর্ত্তে রসনাকে কিরূপে চালিত কর্‌ব,—এসব বিষয়ে কি অন্তরবাসী দেবতাকে নিত্য উপস্থিত প্রভুরূপে দেখ্‌তে অভ্যাস ক'রছ? তুমি কি নিত্য তাঁর কাছ থেকে আদেশ চাও, নিষেধবাণী শুনতে চাও? তবেই সাধনের ঠিক পথটি পেয়েছ; নতুবা নয়।

যে-ঈশ্বর কেবল পূজা লন, ভাব ভক্তি গ্রহণ করেন, চিন্তা ও ধ্যানের বিষয়ীভূত হন, কিন্তু আদেশ ও নিষেধ দেন না, যিনি উদ্যত হস্তকে উদ্যত রসনাকে কখনও নিরস্ত করেন না, অনুদ্যত চরণকে কখনও চল্‌তে বাধ্য করেন না,—এমন মনঃকল্পিত ঈশ্বরের উপাসনা ক'রে কখনও জীবন্ত জলন্ত সত্য ধর্ম্মজীবন লাভ কর্‌তে পার্‌বে না,—অন্যকে কিছু সাহায্য করা তো দূরের কথা।

এই সত্য ধর্ম্মজীবনের ভাবটি যখন একটি সমাজের বা একটি মণ্ডলীর অধিকাংশ মানুষে ব্যাপ্ত হয়, তখন তাহা নৈতিক ব্যাকুলতার (ethical earnestness-এর) আকারে আত্মপ্রকাশ করে। সত্য ধর্ম্মের ইহা একটি বিশেষ কার্য্য। ধর্ম্মের এই কাজটিকে তাহার তত্ত্বজ্ঞান, তাহার পূজার প্রণালী, ও তাহার মতসমষ্টি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখা দরকার। ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের প্রধান মূল্য, মানব মনে চরিত্র বিষয়ে, জীবনের বিশুদ্ধতা বিষয়ে, উন্নত আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে একটি প্রবল আগ্রহ সঞ্চার করা; মানুষকে সত্যের ন্যায়ের পবিত্রতার পথে দৃঢ় করা; অসত্য অন্যায় ও অপবিত্রতার বিরুদ্ধে বীরের মতন দণ্ডায়মান হ'তে শিখান। মানুষ পূজার মন্ত্র ও পূজার প্রণালী ঠিক ভাবে শিখুক কি না-ই শিখুক, সে তার অন্তরবাসী প্রভুর চরণে বসিতে শিখুক; অন্তরে তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে শিখুক; সেই ইচ্ছাপালন বিষয়ে দৃঢ়চিত্ত হইতে শিখুক। তত্ত্বজ্ঞানে ভুল হইলে, পূজার মন্ত্রে ভুল হইলে, এমন কি ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে ভুল হইলেও তাহা তত মারাত্মক নয়,—ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিয়া তাহা পালন না করার অভ্যাস, সত্য জানিয়া তাহার অনুসরণ করিতে দ্বিধা, অপবিত্রতাকে সতেজে বর্জ্জন করিবার উদ্যোগ ও সাহসের অভাব,—এসকল যত মারাত্মক। এই নৈতিক ব্যাকুলতার ও নৈতিক দৃঢ়তার অভাবই ভারতের প্রধান শত্রু। জনসমাজ হইতে ইহাকে অপসারিত করিবার জন্যই ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে।

মানব সমাজে এই নৈতিক ব্যাকুলতার আর একটী ফল,—আপেক্ষিক গুরুত্ববোধ। এই নৈতিক ব্যাকুলতা যাহার মধ্যে আছে, সে সর্ব্বদা আপনাকে প্রশ্ন করে, কোন্ প্রয়োজনটি অধিক গুরুতর? কোন্ কর্ত্তব্যটীর দাবী অধিক? জীবনে কোন্ বস্তুর জন্য কোন্ বস্তুটি ছাড়িতে হইবে? কোন্ বস্তুকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করিতে হইবে?

কিছুদিন পূর্ব্বে একজন বক্তা ভারতের পুরাতন ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি বলছিলেন, সেই ব্রহ্মবাদ পতিতা নারীর মধ্যেও ব্রহ্মদর্শন করতে মানুষকে শিক্ষা দেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি পতিতা নারীর মধ্যে ব্রহ্মদর্শন করতেই মানুষকে আগে শিখাব, না, তার অপবিত্র সংস্পর্শ হ'তে মানুষকে বাঁচাবার চেষ্টাটাই আগে করব? অভিনয় ছবি গান ও নাচের মধ্য দিয়ে আর্টের চর্চ্চাটাই দেশময় আগে ব্যাপ্ত করব, না, পবিত্রতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি ও সতর্কতার ভাব দেশময় আগে সঞ্চার করব? কোন্‌টা আগে?

দাঁড়ি-পাল্লার দুখানি পাল্লার উপরে মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টান্‌টি যে-কার্য্য করে, তাহার একটি প্রকাশ এই যে, একদিকের গুরুত্ব সামান্য পরিমাণে অধিক হইলেই সে পাল্লাটি নীচের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। তেমনি মানব-অন্তরের এই নৈতিক ব্যাকুলতা যেন তাহাকে একটি সূক্ষ্ম তৌলদণ্ডে পরিণত করে। সে তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লয় কাহার গুরুত্ব অধিক। সে তৎক্ষণাৎ মীমাংসা করে যে কাহার জন্য কাহাকে ছাড়িতে হইবে।

মূর্ত্তিপূজা লইয়া এদেশে অনেক আলোচনা হইয়াছে; এখনও হইতেছে। উহার ভিতরে যে একটি আর্টের দিক আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের প্রাণের ব্যাকুলতা তাঁহাকে এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত করিল যে, যাহা সত্যস্বরূপ চিন্ময় পরমেশ্বরকে চিনিতে বাধা দেয়, তাহাকে পূজার বস্তুরূপে মানবের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত কিনা? একদিকে মানবাত্মার শাশ্বত কল্যাণ, অপরদিকে তত্ত্বানুসন্ধান ও আর্ট। কোন্ দিকের গুরুত্ব অধিক? ইহার মীমাংসা করিতে রামমোহন রায়ের বিলম্ব হইল না। তিনি নিজের সমুদয় শক্তি অকল্যাণ বিনাশে নিযুক্ত করিলেন। তিনি বিলম্ব করিতে পারিলেন না। কিন্তু দেশের চিন্তাবিলাসী মানুষ এখনও আর্টের দিক হইতে মূর্ত্তিপূজার আলোচনা করিতেছেন।

হে ব্রাহ্ম, তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার পক্ষে খাঁটি ব্রাহ্ম হওয়াটা আগে, না, ভারতে স্বরাজ আসাটা আগে? তোমার পরিবারে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠা করাটা আগে, না, বাহিরের কোনও আন্দোলনে তোমার মত্ত হওয়াটা আগে? ধর্ম্মজীবন যেখানে সত্য, সেখানে এই প্রকার আগে-পরের মীমাংসা অতি দ্রুত হইয়া যায়।

আমার শেষ কথা এই যে, যাহার ধর্ম্মজীবন সত্য, তাহার মন নিত্য আশাশীল থাকে। কাহারও কি মনে হয় যে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ কিছু নাই? আমি তো বলি, যে আদর্শ আমাদের কাছে এসেছে, তার শতাংশের একাংশও এখনও আয়ত্ত করা হয় নাই। হে ভীরু ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করছেন না, অতএব স্বরাজ লাভ হ'লে ব্রাহ্মদের শেষে আর কেউ ডেকেও জিজ্ঞাসা করবে না,—এই ব'লে কি তুমি ভয় কর? জিজ্ঞাসা করি, স্বরাজ হ'লে কি আর উন্নত মনের, অটল চরিত্রের, অনমনীয় সত্য-পরায়ণতার, অক্ষয় সাধুতার প্রয়োজন থাকবে না? বিধাতার চিরন্তন বিধি কি তখন উল্টে যাবে? যদি বাহিরের চিহ্ন দেখে তোমার মনে সেরূপই আশঙ্কা হয়, তবে হে অল্পবিশ্বাসী ব্রাহ্ম, বুঝে নিও, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ও দেশের ইতিহাসে এমন এক যুগ এসেছে, যে-যুগে আদর্শরক্ষা ধর্ম্মরক্ষা চরিত্ররক্ষার জন্য দলে দলে না খেতে পেয়ে ম'রে গিয়েই ব্রাহ্মসমাজ স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করবেন; যখন ম'রে যাওয়াই ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে সতেজ জীবনে জীবিত থাকা।—না! না! ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরায় নাই! ম'রে যাওয়াও একটি কাজ; সে কাজের ডাক আসতে পারে। প্রস্তুত থাক ও মানুষকে প্রস্তুত কর, যে কয়জন বিশ্বাসী আছ!

আমি উদ্বোধনের দিনই বলেছি, যখন বিপরীত বাতাস বয়, নৌকা চালান অসম্ভব হয়, তখন বার বার নৌকা বাঁধিবার খুঁটিটিকে মজবুত করতে হয়। যদি অন্য কোন কাজে অগ্রসর হওয়া ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এখন সত্য সত্যই অসম্ভব হ'য়ে থাকে, তবে বার বার বিশ্বাসের খুঁটিকে শক্ত কর। ইহাই এখন কাজ! ব্রাহ্মসমাজ এই কাজ করুন, সাধনাশ্রমও এই কাজ করুন!

ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, মার্জ্জিত সুখ-সেবা, আত্মতুষ্টি ও

প্রদর্শনের ভাব হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণের দ্বারা আমরা আমাদের ধর্মজীবনকে সত্য করিয়া লই; এবং আশাশীল হইয়া এই সত্য ধর্মের সাধন ও প্রচার করি।

## পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

সকলের যত্নে অল্পকালের মধ্যে ১০০৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া ১৮৮৩ সালে আন্দুল আত্মোন্নতি সভার দরিদ্র-পোষক চিকিৎসালয় নামে উহাকে অভিহিত করা হইয়াছিল। তখন অবিনাশবাবু চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন।

ইংরাজী ১৮৮৮ খৃঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পিতৃব্য কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আন্দুল আত্মোন্নতি সভার উদ্যোগে স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী তাঁহার একমাত্র পুত্র হীরালাল মল্লিকের বিশেষ যত্নে প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতে পিতা চাকরীর বাসনা ত্যাগ করিয়া ব্যবসায় নিযুক্ত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। প্রথমে তেজরাতি ও ধানের ব্যবসা করিয়া ১॥বৎসর পরে লোকসান হওয়ায় তাহা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার পর সন ১৩০০ সালে ৩০শে শ্রাবণ হইতে কাপড়ের ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

সন ১৩০১ সালে আত্মোন্নতি সভা হইতে আর একটী সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। জমিদার স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ মল্লিকের সহধর্ম্মিণী অধরমণি পিতাকে ও অবিনাশবাবুকে ডাকাইয়া তাঁহার স্বামীর জীবনী লিখিয়া সমাজ হইতে যাহাতে প্রকাশিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলেন। পিতাঠাকুর অবিনাশবাবু ও নটবর ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ জীবনীর নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। সন ১৩০১ সালে ১৪ই শ্রাবণ তারিখে এক সভা আহূত করিয়াছিলেন। তাহাতে শিবচন্দ্র মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সভা স্কুল ভবনে হইয়াছিল। সেই সময় যোগেন্দ্রনাথের তৈল-পটস্থাপন করা হইয়াছিল। সংসারের বহু পরিবার এক সঙ্গে থাকিলে নানা কারণে মনোমালিন্য হইতে পারে, এই ভাবিয়া পিতাঠাকুর মহাশয় ছোট খুল্লতাত মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন। তিনি এই সমস্ত চিন্তা করিয়া শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী খরিদ করিয়া বাসের উপযোগী করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সময় সাবেক বাটী ছাড়িয়া বর্ত্তমান বাটীতে আসেন। ১৩০০ সালের ১১ইমাঘ উপাসনাকালে পিতাঠাকুর মহাশয় একটী বাণী পাইয়াছিলেন,—দৈনিক নিজ জীবনী লেখা প্রয়োজন—সেই অবধি দৈনিক জীবনী লিখিতেন।

এই সময় কলিকাতা জোড়াসাঁকোস্থিত ঠাকুরবংশীয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। এই সময় কাপড়ের ব্যবসা বড় ভাল চলিতেছিল না। অবশেষে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয়ের বিশেষ যত্নে এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধ-পত্রের জোরে ১৯০৪ খৃঃ Indian Stores Ltd. এর দোকানে নিযুক্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে পচাগলিতে কর্ম্মকারকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৬ই ফাল্গুন ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী দীক্ষা লইবার কারণ প্রস্তুত হইবার জন্য একমাসকাল নিয়মিত উপাসনা করা আবশ্যক স্থির করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

সন ১৩১৪ সাল ইং ১৯০৭ খৃঃ ৪ঠা আষাঢ় ইং ১২ই জুন বুধবার আদি ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি দীক্ষার কর্ত্তব্য কার্য্য পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পরে প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অনুষ্ঠানের দান প্রদান করিয়াছিলেন।

২১শে জ্যৈষ্ঠ ইং ৪ জুন পারিবারিক শোকের জন্য মানসিক অবস্থা বড় খারাপ হয়। ইহার কিছুদিন পরে কাপড়ের দোকান তুলিয়া দিয়া প্রায় ৬ মাসকাল ব্যাটরা কদমতলায় ব্রহ্মানন্দাশ্রমে সপরিবারে গিয়া থাকেন। ১৬ই শ্রাবণ শুক্রবার বেলা ৮ ঘটিকার সময় তাঁহার মাতাঠাকুরাণী মানবলীলা সম্বরণ করেন। ২৬শে শ্রাবণ সোমবার আদি ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১লা অগ্রহায়ণ হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমীদারীতে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সন ১৩১৬ সালে কটকের অন্তর্গত অরছিনি নামক স্থানে কিছুদিন নায়েবের কার্য্য করিয়া পাণ্ডুয়া নামক স্থানে ম্যানেজারী কার্য্য প্রায় ১৫ বৎসর যাবত সম্মানের সহিত করিয়াছিলেন। শেষে কিছুকাল চাকরী ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে জীবন কাটাইবার মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইল না। কিছু ঋণ হইয়াছিল; তাহা শোধ করিবার মানসে পুনরায় অরছিনিতে নায়েবী পদ গ্রহণ করিয়া প্রায় ৩ মাস কাল কার্য্য করিয়া ১৩৩৬ সালের পৌষমাসে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। প্রায় এক বৎসরকাল ভুগিয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে প্রায় ভাল হইয়াছিলেন। কিন্তু শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। নিজে হাঁটিয়া আসিয়া নূতন সমাজমন্দির দেখিয়া তাঁহার কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। এইরূপ অসুখ অবস্থায়ও সমাজের জন খাটান প্রভৃতি কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সর্ব্বদা আমাদের উপদেশ দিতেন প্রতিদিন সমাজের উন্নতির জন্য অন্ততঃ এক ঘণ্টা কার্য্য করা প্রত্যেক মেম্বারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তিনি সমাজমন্দিরের জন্য চাঁদা আদায় প্রভৃতি কার্য্য করিতে জীবনপাত করিয়াছেন। সমাজের জানালা দরজা প্রভৃতির জন্য সর্ব্বদাই আমাদের তাগাদা করিতেন। তিনি সময় সময় বলিতেন, "আমার যদি পা ভাল থাকিত আমি ভিক্ষা করিয়া সমাজের কার্য্য শেষ করিতাম।" সমাজমন্দিরের জন্য ঋণ করিয়া ১০ টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি ১লা জুন রবিবার ১৯৩০ খৃঃ সমাজে শেষ উপাসনা করিয়াছিলেন। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার সকালে বেড়াইয়া আসিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে মাথার অসুখ হয়; তাহাতে আর চাহিতে পারেন নাই, কিম্বা ভাল করিয়া কথা বলিতে পারেন নাই। তিনি ৪টী পুত্র ও ৪টী কন্যা রাখিয়া ২রা

আষাঢ় মঙ্গলবার রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার আত্মার সংগতি হউক। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

## ব্রাহ্মসমাজ।

**পারলৌকিক**—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২৪শে মার্চ্চ কলিকাতানগরীতে পরলোকগত বাবু কালীশঙ্কর শুকুলের দ্বিতীয় পুত্র বিমলচন্দ্র শুকুল ৪৬ বৎসর বয়সে নিউমোনিয়া রোগে ইহ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন।

বিগত ২৭শে মার্চ্চ কলিকাতানগরীতে পরলোকগত রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার দাস গুপ্তের ভাগিনেয়ী-জামাতা বাবু অনুকূলচন্দ্র দাস গুপ্ত পত্নী ছয়টি কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন-দিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

বিগত ১৫ই মার্চ্চ পরলোকগত ডাক্তার বনওয়ারীলাল চৌধুরীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের আচার্য্যের কার্য্য এবং জামাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র নাগ জীবনী পাঠ করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়-স্বজনদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা বিধান করুন।

**দান**—শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু তাঁহার পরলোকগত পিতা মদনমোহন বসুর দ্বাবিংশতিতম বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডারে ১৲, দাতব্য বিভাগে ১৲, ও শিবনাথ স্মৃতিভাণ্ডারে ১৲, দান করিয়াছেন। এ দান সার্থক হউক ও পরলোকগত আত্মা চির শান্তি লাভ করুন।

**শুভ বিবাহ**—বিগত ২৮শে মার্চ্চ কলিকাতানগরীতে রায় বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাসের দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া সতিলা ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান অজয়কৃষ্ণের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা নিম্ন লিখিত দান প্রতিশ্রুত হইয়াছেন—কলিকাতা উপাসকমণ্ডলী ৭৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—সাধারণ বিভাগ ২৫৲, প্রচার বিভাগ ২৫৲, দুঃস্থ ব্রাহ্ম পরিবার ভাণ্ডার ২৫৲, সাধনাশ্রম ২৫৲, নবদ্বীপচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার ১৫৲, ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ ৫০৲, ও দার্জিলিং ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, মোট ২৫০৲।

বিগত ২৯শে মার্চ্চ কলিকাতানগরীতে পরলোকগত হেমন্তকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয়া কন্যা কল্যাণীয়া লীলাময়ী ও শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ বসুর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নব দম্পতিদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

**মালীয়াটে ব্রহ্মোৎসব**—যশোহর জেলার অধীন মালিয়াট ও ইহার সংলগ্ন গ্রাম সকলের অধিবাসিগণ মালিয়াট গ্রামে একটী ব্রাহ্মসমাজ ও মন্দির এবং তাহার সংসৃষ্ট একটী বালিকা স্কুল ও একটী বালকদের স্কুল কয়েক বৎসর যাবৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রতি বৎসর ইহাদের ব্রহ্মোৎসব ও স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে সভা সমিতি হইয়া আসিতেছে। এবার যশোহর, নড়াইল, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত লোক যাইয়া সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় তথায় গমন করেন। নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে উৎসব ও সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে :—

৩০শে ফাল্গুন সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্গীত ও উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১লা চৈত্র প্রাতে মন্দিরে উপাসনা উপদেশ সঙ্গীতাদি হয়; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-কুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় বালক বালিকাদের পারিতোষিক বিতরণ সভা হয়। সভাস্থলে প্রায় সহস্রাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় এবং প্রায় ৮।৯ জন হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই সভার কার্য্য শেষ হইলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বহু লোকের অনুরোধে পুনরায় বক্তৃতা করেন। দুইটী মুসলমান ভদ্রলোকও বক্তৃতা করেন। ২রা চৈত্র—প্রাতে প্রমত্ততার সহিত নগর সংকীর্ত্তন হয়; মন্দিরে আসিয়া পুনরায় উপাসনা উপদেশ সঙ্গীতাদি হয়। বরদাবাবু উপাসনা করেন; কৃষ্ণকুমারবাবু প্রার্থনা করিয়া উৎসব শেষ করেন।



ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীত্রিগুণানাথ রায় কর্ত্তৃক ২রা বৈশাখ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু, বি-এ।